# পরিবার

# সুখ

# সম্মান

জানবেন—পারিবারিক বহুমুখী চ্যালেঞ্জকে নতুন সুযোগ ও সম্ভাবনায় রূপান্তরিত করার উপায়

মহাজাতক

সুখী পরিবারই সুখী সমাজের ভিত্তি। কিন্তু সম্পর্কের টানাপোড়েন, অবিশ্বাস ও সহিংসতায় আজ সেই পরিবার হয়ে পড়ছে বিপর্যস্ত।

এই বাস্তবতায় ৩৩ বছর ধরে কোয়ান্টামের শত শত প্রোগ্রামে সদস্যদের করা পরিবার ও পারস্পরিক সম্পর্ক সংক্রান্ত বাছাইকৃত প্রশ্নের উত্তর রয়েছে এ বইতে। উত্তরে দেয়া সূত্রগুলোর প্রয়োগ এবং চর্চায় আপনার পরিবার পাবে এক নতুন আনন্দলোক।


মহাজাতকের লেখা অন্যান্য বই

- সাফল্যের চাবিকাঠি কোয়ান্টাম মেথড
- শুদ্ধাচার
- আত্মনির্মাণ
- কাজ প্রেম দেশ
- বন্ধুত্ব প্রেম বিয়ে
- জীবন বদলের চাবিকাঠি অটোসাজেশন
- কোয়ান্টাম ভাবনা ফিউশন (অণু বই)
- নিত্যদিন শত টিপস প্যারেন্টিং (অণু বই)
- আলোকিত জীবনের হাজার সূত্র কোয়ান্টাম কণিকা
- 1001 Autosuggestions to change your life

# পরিবার সুখ সম্মান

# পরিবার
# সুখ
# সম্মান

মহাজাতক

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
quantummethod.org.bd

# পরিবার সুখ সম্মান

মহাজাতক

*প্রকাশক*

**মায়িশা তাবাসসুম । কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন**
৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
**ফোন :** ২২২২২১৪৪১, ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩, ০১৭১১-৬৭১৮৫৮
**E-mail :** info@quantummethod.org.bd

*গ্রন্থস্বত্ব*

**লেখক**

*প্রথম প্রকাশ*

ফেব্রুয়ারি ২০২৬

*মুদ্রাকর*

**প্রজ্ঞাপ্রকাশ**
ইসলাম ভবন (২য় তলা)
৬৮ ফকিরাপুল বাজার রোড, ঢাকা-১০০০

*মূল্য*

**৫০০ টাকা**
[এ বই থেকে প্রাপ্ত আয় সৃষ্টির সেবায় নিবেদিত]

**ISBN : 978-984-35-8785-5**

**Paribar Shukh Shomman**
(Family Happiness Dignity)

By : **Mahajataq**

Published by

**Quantum Foundation**
quantummethod.org.bd

**Price : $15**
[All earnings dedicated to charity]

# উৎসর্গ

মহাজাগতিক সফরসঙ্গী
নাহার আল বোখারী
ও তার সহযোদ্ধাদের—
যাদের আন্তরিক প্রয়াসে
জীবনকে উদযাপন করতে
শিখেছে লাখো মানুষ।

# সূচিপত্র


| | | |
|---|---|---|
| সুখী সমাজের ভিত্তি—পারিবারিক সুখ | □ | ১৫ |
| বড় পরিবার সুখী পরিবার | □ | ২৬ |
| সন্তান না হওয়া | □ | ৫২ |
| সন্তান গ্রহণে অনীহা | □ | ৬০ |
| সন্তান ॥ বিবিধ | □ | ৬২ |
| পারিবারিক সম্পর্ক ॥ স্বামী-স্ত্রী | □ | ৬৬ |
| দাম্পত্য কলহ | □ | ৯২ |
| স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে তৃতীয় পক্ষ | □ | ১০৪ |
| স্বামী/ স্ত্রীর ভুল ধরা | □ | ১০৬ |
| দাম্পত্য সম্পর্কে অবহেলা/ উদাসীনতা | □ | ১১১ |
| স্ত্রীকে হাতখরচ দেয়া/ স্ত্রীর জন্যে ব্যয় | □ | ১১৬ |
| প্রসঙ্গ ॥ কর্মজীবী স্ত্রী | □ | ১২৩ |
| স্ত্রীকে শারীরিক-মানসিক নির্যাতন | □ | ১২৬ |
| নারী অধিকার | □ | ১৩৯ |
| স্বামী/ স্ত্রীকে সন্দেহ | □ | ১৪৫ |
| পরিবার কোয়ান্টাম চেতনায় উদ্বুদ্ধ না হলে | □ | ১৫০ |
| পারিবারিক দুর্ভোগ ॥ কারণ যখন ঋণ | □ | ১৬০ |
| সম্পত্তি নিয়ে যত দ্বন্দ্ব | □ | ১৮৭ |
| পরিবার থেকে দূরে থাকা | □ | ১৯৪ |
| পরিবার ॥ বিবিধ | □ | ১৯৬ |
| পারিবারিক সম্পর্ক ॥ মা-বাবা | □ | ২০৩ |
| মা-বাবার প্রতি ক্ষোভ | □ | ২১০ |
| বয়োবৃদ্ধ মা-বাবার যত্ন | □ | ২২৮ |
| আপনজন হারানো | □ | ২৩৬ |
| পারিবারিক সম্পর্ক ॥ বউ-শাশুড়ি | □ | ২৪৩ |
| পারিবারিক সম্পর্ক ॥ ভাইবোন | □ | ২৬৪ |
| পারিবারিক সম্পর্ক ॥ অন্যান্য | □ | ২৭১ |
| পারস্পরিক সম্পর্ক | □ | ২৭৮ |
| সুখী পরিবার ॥ সংসার পর্ব | □ | ২৯৭ |
| পারিবারিক কিছু শুদ্ধাচার | □ | ৩০১ |

# লাখো মানুষের মতো আপনিও বলবেন ...

অন্ধকারকে মানুষ ভয় পায়। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। তাই অজানা আশঙ্কা চেপে বসে তার মনে। ভোরের আলোয় আঁধার কাটতে শুরু করলে অজানা আশঙ্কাও কেটে যায়। সে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। নেমে পড়ে কাজে। এগিয়ে যায় সামনের দিকে।

সকল অন্ধকারের নিকৃষ্ট অন্ধকার অবিদ্যা। অবিদ্যা জন্ম দেয় নেতিবাচকতা অশান্তি লোভ লাম্পট্য শোষণ বঞ্চনা প্রতারণা ব্যর্থতা রোগ শোক হতাশা। অফুরন্ত সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেও তারুণ্য ও যৌবনের শক্তি পরিণত হয় প্রতারক শোষক লম্পট শোষিত বা দাসে।

অবিদ্যার অন্ধকার দূর হয় বিদ্যার আলোয়। বিদ্যার সূচনা হয় মুক্ত বিশ্বাস থেকে। আর মুক্ত বিশ্বাসের পথে অন্তরায় হচ্ছে অহেতুক প্রশ্ন। শয়তানের কৌশল হচ্ছে বিশ্বাস থেকে বিরত রাখতে না পারলে সংশয় সৃষ্টি করে দেয়া। আর অহেতুক প্রশ্ন ঢুকে পড়ে মানুষের স্বভাবজাত কৌতূহল বা জানার আগ্রহের সদর দরজা দিয়ে। সৃষ্টি হয় সংশয়।

অবিদ্যার অন্ধকার দূর করার জন্যেই কোয়ান্টাম ডাক দিয়েছে মুক্ত বিশ্বাসের। বলেছে, হে মানুষ! শক্তি আপনার মধ্যেই রয়েছে। অন্তরের শক্তিকে জাগ্রত করুন। কোনো অভাব থাকবে না। যা দেখে আপনি বিস্মিত হন, সে বিস্ময় সৃষ্টি করার ক্ষমতা আপনার মধ্যেই আছে।

হাজারো মানুষের কৌতূহল আর আগ্রহ সৃষ্টির পাশাপাশি এসেছে অসংখ্য প্রশ্ন। আর এ প্রশ্নগুলোর জবাব থেকে দ্বিধা সংশয় ভেসে গেছে বাস্তবতা ও বিদ্যার আলোয়। কোয়ান্টাম মেথড চর্চার গত ৩৩ বছরের এমনি অসংখ্য প্রশ্নের জবাব নিয়েই এ বই। আপনার মধ্যে সন্দেহ সংশয় যদি কিছু থাকে, তা দূর হবে অনায়াসে। কৌতূহল ও জানার আগ্রহ পাবে পূর্ণ তৃপ্তি। উপলব্ধি করবেন জীবনের আসল সত্য। লাখো মানুষের মতো আপনিও বলবেন—

আমি বিশ্বাসী আমি সাহসী।
আমি পারি আমি করব।
আমার জীবন আমি গড়ব।

এই সিরিজের অন্যান্য বই—

## বন্ধুত্ব প্রেম বিয়ে

নারী-পুরুষের সম্পর্ক জটিল ও রহস্যময়। ৩৩ বছর ধরে কোয়ান্টামের শত শত প্রোগ্রামে সদস্যদের করা অসংখ্য প্রশ্নের মধ্য থেকে এই সম্পর্কের নানা পর্যায়—বন্ধুত্ব, প্রেম ও বিয়ে-বিষয়ক বাছাইকৃত প্রশ্নের উত্তর রয়েছে এ বইতে। এ থেকে নারী-পুরুষের সম্পর্কের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য এবং ইতিবাচক ও নেতিবাচক পরিণতি ক্রমশ উন্মোচিত হতে থাকবে আপনার সামনে।

জীবনের প্রতিটি সংকটে সম্পর্ককে প্রাণবন্ত ও গতিশীল করার ক্ষেত্রে আপনার করণীয় কী তা পরিষ্কার হয়ে উঠবে। ভালবাসা, সমমর্মিতা ও সুখে ভরে উঠবে আপনার জীবন।

## প্যারেন্টিং চ্যালেঞ্জ আনন্দ

৩৩ বছর ধরে কোয়ান্টামের শত শত প্রোগ্রামে সদস্যদের করা প্যারেন্টিং সংক্রান্ত বাছাইকৃত প্রশ্নের উত্তর রয়েছে এ বইতে। এসব উত্তর থেকে সন্তান লালনের নানা দিক এবং করণীয়-বর্জনীয়গুলো আপনার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। 'মাইন্ডফুল প্যারেন্টিং'-এর পরীক্ষিত সাফল্যসূত্র অনুসরণ করলে আপনার সন্তান গড়ে উঠবে অনন্য মানুষরূপে। আর আপনার জীবনের প্যারেন্টিং অধ্যায়টিও হয়ে উঠবে সফল ও আনন্দময়।

# সুখী পরিবারের পথ-নকশা

সুখী জীবনের অপরিহার্য অনুষঙ্গ সুখী পরিবার। কিন্তু পরিবারে সুখ ক্রমাগত হারিয়ে যাচ্ছে। 'আমারটা আগে'—এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি এবং সেইসাথে কনজ্যুমারিজম ও ডিজিটাল আসক্তির কারণে মমতার জায়গা দিনে দিনে দখল করে নিচ্ছে স্বার্থপরতা।

পাশ্চাত্যের ভোগবাদী সমাজে পারিবারিক সহিংসতা এখন মহামারির রূপ নিয়েছে। আর এই মহামারির প্রধান শিকার হচ্ছে নারী। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর ৪৭ লক্ষ ৭৪ হাজার নারী স্বামী বা বয়ফ্রেন্ডের হাতে নির্মম প্রহারের শিকার হচ্ছে। আর যুক্তরাজ্যের একজন শিক্ষাবিদের মন্তব্য হচ্ছে—'ব্রিটেনে নিজের ঘরের চেয়ে অনেক নারী রাস্তায়ই বেশি নিরাপদ'।

আমাদের অবস্থা কী? ১৯৯৫ সালে বিশ্বের সুখী মানুষের তালিকায় বাংলাদেশ ছিল শীর্ষে। এরপর শুরু হলো ডিজিটাল আগ্রাসন। আত্মকেন্দ্রিক জীবনধারা, ভোগবাদী মানসিকতা ও সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তি গত ৩০ বছরে আমাদের সামাজিক বুননকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। অতীতে আমাদের পরিবারগুলোতে নারী কখনো এত সহিংসতার শিকার হয় নি। নারীর প্রতি মমতাহীনতার ছাপ এত প্রকটরূপে কখনো দেখা যায় নি। পারিবারিক বন্ধন কখনো এত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে নি।

আপনি স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করতে পারেন—উত্তরণের উপায় কী? উপায় একটাই—আমাদের শাশ্বত সমমর্মিতার পুনর্জাগরণ। নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের পুনরুত্থানই পরিবারের পারস্পরিক সম্মান ও মমতার বন্ধনে নতুন প্রাণসঞ্চার করতে পারে।

পরিবার ও পারিবারিক সম্পর্ক নিয়ে আমাদের প্রশ্নের কোনো অভাব নেই। *পরিবার সুখ সম্মান* বইটিতে এই প্রশ্নগুলোরই জবাব দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সুখী পরিবার ও সুখী নতুন প্রজন্মের লালিত স্বপ্নই এই আন্তরিক প্রয়াসের প্রেরণা।

# অভিমানের দেয়াল ভেঙে গড়ে তুলুন মমতার বন্ধন

# সুখী সমাজের ভিত্তি—পারিবারিক সুখ

**প্রশ্ন :** ‘সুখী পরিবার’ কথাটা শুনলে মনে হয় এটা নাটক-সিনেমার মতো কাল্পনিক বিষয়। ঘরে ঘরে কলহ, অশান্তি এবং সমস্যার শেষ নেই। আসলেই কি সুখী পরিবার গঠন সম্ভব? কিছু পরামর্শ দিলে উপকৃত হবো।

**উত্তর :** প্রথমেই বুঝতে হবে—পরিবার কী? পরিবার শুরু হয় মা-বাবাকে দিয়ে। তারপর স্বামী/ স্ত্রী এবং এর পরের ধাপ হলো সন্তানসন্ততি। অর্থাৎ পরিবারের শুরু হচ্ছেন মা-বাবা। মমতা, দায়িত্ববোধ ও সেবার ক্ষেত্রে যদি এই ধারাক্রম অনুসরণ করেন, আপনার সন্তানও তার জীবনে একই ধারাক্রম অনুসরণ করবে। প্রাকৃতিক নিয়মেই তখন দেখা যাবে—আপনার সন্তানও আপনার প্রতি তেমন মমতা ও দায়িত্ব অনুভব করবে। সুখী পরিবারের জন্যে এটি অনেক জরুরি একটি উপাদান।

মনে রাখবেন, সন্তানের ওপর সবচেয়ে বেশি অধিকার তার মা-বাবার। তাই পুরুষকে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্ত্রী-সন্তানের চেয়েও অগ্রাধিকার দিতে হবে তার মা-বাবাকে। স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই বিশ্বাস করতে হবে—আমার স্বামী বা স্ত্রীর মা-বাবা আমারও মা-বাবা। এটাই মানবিক।

আর সুখী পরিবার গঠনের জন্যে পরিবার বড় হওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ। যে পরিবারে পাঁচ/ সাত সন্তান এবং মা-বাবা, দাদা-দাদি মিলে অনেক মানুষ, সে পরিবারে আনন্দ সবসময় ছোট পরিবারের চেয়ে বেশি থাকে। সেখানে একা ও বিষণ্ন থাকার সুযোগ কম। চ্যালেঞ্জ থাকলেও বড় পরিবার মানেই সুখী এবং শক্তিমান পরিবার। একইসাথে কোয়ান্টামে সুখী পরিবারের যে পঞ্চসূত্র রয়েছে, তা অনুসরণ করাটা খুব জরুরি।

সুখী পরিবারের জন্যে প্রথম প্রয়োজন পারিবারিক মনছবি। পরিবার কী অর্জন করতে চায়—এই লক্ষ্যটা স্পষ্ট থাকতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর চাওয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব সাধারণত পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টি করে। এসব থেকে বেরিয়ে এসে ঐকমত্যের ভিত্তিতে পারিবারিক মনছবি করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, সরাসরি কথা বলা। যে-কোনো ভুল বোঝাবুঝি হোক, যার সাথে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, তার সাথে সরাসরি কথা বলতে হবে। তাকে সরাসরি বলুন, আমার যদি কোনো অন্যায় হয়ে থাকে, আমাকে শাস্তি দাও অথবা ক্ষমা করে দাও। তাহলে দেখবেন, তিন মাস ধরে হয়তো যে বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছিলেন, তিন মিনিটে তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। অর্থাৎ যোগাযোগ হতে হবে সরাসরি। কোনোভাবেই তৃতীয় কাউকে জড়াবেন না।

তৃতীয়ত, পারিবারিক কিছু রেওয়াজ তৈরি করা। যে-কোনো প্রোগ্রাম করবেন পরিবার-পরিজন সবাইকে নিয়ে। ভ্রমণ করুন পরিবারের সবাইকে নিয়ে। শুধু মিস্টার এবং মিসেস দাওয়াত যথাসম্ভব এড়িয়ে যাবেন। সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন পরিবারের সাথে সময় কাটাবেন। প্রতিদিন অন্তত একবেলা পরিবারের সদস্যদেরকে নিয়ে একত্রে আহার করবেন।

চতুর্থত, সমমর্মিতা সৃষ্টি করা। সুখী পরিবার নির্মাণে পারস্পরিক সমমর্মিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরস্পরকে বোঝার জন্যে প্রয়োজন একটু মমতা, ভালবাসা। স্বামী-স্ত্রী, মা-বাবা, সন্তান—সবার প্রতি দায়িত্ব পালন করবেন হাসিমুখে, সমমর্মিতার সাথে। আমাদের বেড়ে ওঠা ও লালনপালনে মা-বাবার শ্রম ও মমতার গুরুত্ব কতখানি, সেটা তারাই বুঝতে পারেন—যারা শৈশবে মা-বাবার স্নেহ-মমতা-সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। দুঃখজনক হলেও সাধারণভাবে দেখা যায়—যারা এটা পান, অধিকাংশ সময় তারা এই মমতার গুরুত্ব বুঝতে পারেন না।

সন্তান যদি দেখে—আপনি আপনার মা-বাবার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেন নি, সবসময় সদাচরণ করেছেন ও সহিষ্ণু থেকেছেন, সেটাই হবে সন্তানের জন্যে সবচেয়ে বড় শিক্ষা। আপনি তখন সন্তানের আদর্শ হতে পারবেন। সে-ও আপনার সাথে একই আচরণ করতে শিখবে। এভাবেই প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষ নিজ নিজ কর্মের পুরস্কার পায়।

পঞ্চমত, ধর্মীয় ও আত্মিক মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেয়া। পরিবারে যদি ধর্মীয় মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেয়া না হয়, সেই পরিবার কখনো সুখের হয় না। কারণ ধর্মের ফলিত রূপ হচ্ছে সদাচরণ। যে পরিবারে গীবত ও পরচর্চা হয়, আত্মীয়স্বজনের নিন্দা হয়, সেই পরিবারে অশান্তি লেগে থাকে। তাই পরিবারে কখনো ঘৃণার চর্চা করবেন না, সদাচরণের চর্চা করবেন। আমরা এমন কিছু যেন না করি, যা পারিবারিক সুখ নষ্ট করে। অর্থাৎ পরিবারের সাথে বিশ্বস্ত, শুদ্ধাচারী ও সদাচারী হতে হবে। এজন্যে সুন্দর কথা বলার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত।

সুন্দর কথার প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা অনেক। নরম কথায় রাগ কম হয়। আবার শক্ত কথায় রাগ বেশি হয়। খেয়াল করবেন, আমরা যখন বাইরে থাকি, তখন কিন্তু রাগারাগি কম করি। যখন ঘরে ফিরি, আপনজনের সাথে আমরা রাগটা বেশি করি। কেন? ঘরোয়া পরিমণ্ডলে আমরা সাধারণত শুদ্ধ ভাষায় কথা কম বলি। আপনি যখন শুদ্ধ ভাষায় কথা বলবেন, ৮০% ক্ষেত্রে আপনার রাগের প্রকাশটা সেভাবে হবে না। কারণ শুদ্ধভাবে কথা বলতে হলে তো একটু সচেতনভাবে বলতে হবে। আর একটু সচেতন হলেই আপনি কিন্তু

গালিগালাজ করতে পারবেন না, রাগ করতে পারবেন না। তাই শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে হবে। এটা একদিনে হবে না। প্রথম প্রথম যখন সুন্দর করে কথা বলবেন, চারপাশের লোকেরা বা আত্মীয়স্বজন হয়তো এটা নিয়ে কথা বলবে, হাসিঠাট্টাও করতে পারে। কিন্তু সুন্দর কথা যখন আয়ত্ত করবেন এবং বলার অভ্যাস করে ফেলবেন, তখন সদাচারী মানুষ হিসেবে আপনি আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবেন।

সুখী পরিবারের এ সবগুলো সূত্র সহজেই আয়ত্ত করতে পারবেন, যখন আপনি নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা করবেন। মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, পরিবারের ভাঙন রোধ ও মেরামতের জন্যে প্রয়োজন মেডিটেশন। কারণ মেডিটেশন মানুষকে সম্পর্ক বা রিলেশনশিপের প্রতি মনোযোগী হতে শেখায়। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। নিজেকে সংশোধনের মধ্য দিয়ে দৈনন্দিন জীবনের ভুল বোঝাবুঝি দূর হয়।

মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমে মানুষ মমতার ভাষা আয়ত্ত করতে শেখে। রাগ-ক্ষোভ পুষে না রেখে ক্ষমা ও আস্থার হাত ধরে সম্পর্ককে এগিয়ে নিতে পারে। মেডিটেশন চর্চা করে পৃথিবীজুড়ে লাখো মানুষ দূর করেছেন সম্পর্কের জটিলতা। পরিবারে এসেছে প্রশান্তি দায়িত্ববোধ শ্রদ্ধা এবং অনাবিল সুখ।

**প্রশ্ন :** অধিকাংশ সময় দেখা যায়, বিয়ের পর স্বামীরা বউকে নিয়ে আলাদা হয়ে যায়। এর মূল কারণ কী? পরিবারগুলো এভাবে টুকরো টুকরো হয়ে গেলেই কি সুখ বাড়বে?

**উত্তর :** আসল সত্য হচ্ছে, পরিবার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলে সুখ বলেন আর শক্তি বলেন, সবই কমে যায়। পরিবার যত বড় হবে এবং যত সবাই মিলে একত্রে থাকতে পারবে, তত সেই পরিবারের প্রত্যেকের সাহস, মনের জোর এবং শক্তি বেড়ে যাবে। অবশ্য বড় পরিবারে চ্যালেঞ্জ কম নয়, কিন্তু দিন শেষে সবার মানসিক সুখ এবং নিরাপত্তাবোধ বেশি থাকে।

বড় পরিবারে শিশুরাও দেখা যায় একজনের কাছ থেকে বকা খেলে আরেকজনের কাছ থেকে মানসিক ও আবেগিক সাপোর্ট পায়, আশ্রয় পায়। ফলে শিশুর মানসিক বিকাশ হয় সুষ্ঠুভাবে। তবে বাস্তব কোনো কারণে আলাদা শহরে বা আলাদা সংসারে থাকতে হলে ভিন্ন কথা। আসলে এই আলাদা হতে চাওয়ার অনেকগুলো কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ হচ্ছে, স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা। দ্বিতীয়ত, মিডিয়ার প্রভাব। কারণ মিডিয়া ও টিভি সিরিয়াল যৌথ পরিবারের ঝামেলা, জটিলতাগুলোকেই উপজীব্য করে।

সিরিয়ালগুলোর একটা মূল উপাদানই হচ্ছে যৌথ পরিবারের সমস্যা, জটিলতা, ঝামেলা। ফলে অধিকাংশ ছেলেমেয়েই মনে করে, যৌথ পরিবার মানেই একটা যন্ত্রণা। অনেক সময় ছেলে একত্রে থাকতে চাইলেও ছেলের বউ মনে করে, বিয়ের পর শাশুড়ি-ননদের সাথে থাকলে শুধু কষ্টই বাড়বে। কাজেই আলাদা হতে হবে।

এই ভুল দৃষ্টিভঙ্গিটা সবদিক থেকে খুব ক্ষতিকর। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনতে হবে। পরিবার হতে হবে সবাইকে নিয়ে। পরিবারের প্রধান যে মা-বাবা এবং ছেলেসন্তানের ওপর মা-বাবার হক/ অধিকার যে সবচেয়ে বেশি, এটা মনে রাখতে হবে। মা-বাবার যত্ন নিতে হবে মমতার সাথে, যাতে আপনার সন্তানও আপনাকে দেখে শিখতে পারে। তাহলে বার্ধক্যে আপনি নিজেও প্রাকৃতিকভাবে সুখী হবেন। তাছাড়া যথাযথভাবে মা-বাবার যত্ন নিলে সেই সন্তানের জীবনে ইহকালে যেমন প্রাচুর্য আসবে, বরকত আসবে; তেমনি পরকালীন সাফল্য তো আছেই। মনে রাখতে হবে, শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেউ সত্যিকারের সুখী হতে পারে না।

**প্রশ্ন :** একদিকে ব্যক্তি স্বাধীনতা, অন্যদিকে পারিবারিক বন্ধন। কীভাবে বর্তমান যুগে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি আসবে? কারণ ব্যক্তি স্বাধীনতার ফলে পারিবারিক বন্ধন বর্তমানে ক্ষুণ্ন হচ্ছে এবং সমাজে এত বিশৃঙ্খলা।

**উত্তর :** আমরা যেটাকে ব্যক্তি স্বাধীনতা বলি এটা ব্যক্তি স্বাধীনতা নয়, এটা হচ্ছে আত্মকেন্দ্রিকতা বা স্বার্থকেন্দ্রিকতা। স্বাধীনতা আর স্বার্থকেন্দ্রিকতা আলাদা বিষয়। হাম দো হামারা দো, হাম হাম তুম তুম, এরকম স্বার্থকেন্দ্রিকতার কারণে আমাদের পরিবারগুলো ভেঙে যাচ্ছে। আমরা এই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার ঊর্ধ্বে যখন উঠতে পারব, যখন আমার কাছে নিজের সুখের চেয়ে স্ত্রীর সুখ বা স্বামীর সুখ গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে, যখন নিজের সুখের চেয়ে মায়ের সুখ ভাইয়ের সুখ বোনের সুখ বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে, তখন আমরা মানুষ হবো। তখন এটা পরিবার হবে। একঘরের নিচে কিছু মানুষ বাস করলেই পরিবার হয় না।

এখন সমাজের কী অবস্থা? সমাজ, পরিবার, বন্ধুবান্ধব সবকিছু থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন। পাশাপাশি বসে থেকেও আমরা কি পাশে আছি? এর মধ্যে বিবিসির একটা রিপোর্ট দেখলাম—সুখী হওয়ার পাঁচটি উপায়, অধ্যাপকের পরামর্শ। এখানে একটা ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। ছবিটিতে পাঁচ জন বসে আছে গা ঘেঁষে, কিন্তু প্রত্যেকে হয় ট্যাব, নয়তো স্মার্টফোন নিয়ে মশগুল।

কারো দিকে কেউ তাকাচ্ছে না, সবাই ডুবে আছে স্ক্রিনের মধ্যে। এভাবে পাশাপাশি বসে থাকলেই কি পাশে থাকা হয়? এভাবে কোনো বন্ধন তৈরি হয় না। অর্থাৎ আমাদের সমস্যাটা ব্যক্তি স্বাধীনতা নয়, বরং সমস্যা হলো আত্মকেন্দ্রিকতা, শুধু নিজেকে নিয়ে পড়ে থাকা।

সুখী হওয়ার পাঁচটি উপায় নিয়ে বিবিসির রিপোর্টটিতে দেখানো হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ল্যরি স্যান্তোস নতুন একটা কোর্স চালু করেছেন। সেটা হচ্ছে, সুখী হওয়ার বিজ্ঞান—সায়েন্স অব হ্যাপিনেস। সুখী হওয়ার পাঁচটি উপায় হলো কৃতজ্ঞতার একটা তালিকা তৈরি করা, রাতের ভালো ঘুম, ধ্যান করা, পরিবার ও আত্মীয়-বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বর্জন করে বাস্তবে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা।

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কোর্সটাকে বলা যেতে পারে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের শিশুতোষ ভার্সন। কারণ আমরা কোয়ান্টামে কী করি? আমরা আমাদের দিন শুরু করি শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা দিয়ে। এই শোকরগোজারি, গ্রাটিচ্যুড, কৃতজ্ঞ থাকার গুরুত্ব আমরা কোর্সে প্রথম দিন থেকে বলে এসেছি। আমাদের প্রতিটি কাজই কৃতজ্ঞচিত্ত থাকার ফসল।

আমরা কোয়ান্টামের শুরু থেকেই বলে আসছি, রাত ১১টায় স্ক্রিনসহ সবকিছু বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ুন। রাতের ঘুম নিশ্চিত করলে অনেক সমস্যা এমনিই সমাধান হয়ে যায়। ছেলেমেয়ে হয়তো বলবে যে, শিক্ষক পড়া দিয়েছেন, অনলাইনে এটা দেখতে হবে। অনলাইনে রাত ১১টার পর কেন? সারারাত কি শিক্ষক পড়া দিচ্ছেন? রাত হচ্ছে ঘুমের জন্যে। এটা ছোট থাকতেই বোঝাবেন এবং পারিবারিক নিয়ম তৈরি করবেন, যেন সবাই রাত ১১টায় ঘুমাতে যান। পরীক্ষা থাকলে বড়জোর ১২টা।

তৃতীয় পয়েন্ট হলো, ধ্যান বা মেডিটেশন। পরিবারের সবাই নিয়মিত মেডিটেশন করলে প্রত্যেকের মনোদৈহিক স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, জীবনের ছন্দ ও সুর একই হবে এবং পারস্পরিক সুসম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে।

চতুর্থত, পরিবার ও বন্ধুদের সাথে আরো সময় কাটানো, এ ব্যাপারে আমরা সবসময় জোর দিয়ে বলেছি। আমরা বলি, মানুষের সাথে বাস্তব যোগাযোগ করুন, সাদাকায়নে আসুন। পরিবারের জন্যে যে সময়, এই সময়টা পুরোপুরি পরিবারের। এই সময়ে গল্প করুন, হুড়াহুড়ি দৌড়াদৌড়ি করুন। ছোট শিশুর জন্যে নিজে ঘোড়া হোন। অর্থাৎ শিশুকে সময় দেবেন তার বয়স অনুসারে। সন্তান একটু বড় হয়ে গেলে সে আপনাকে ঘোড়া বানাবে না, সে আপনার বন্ধু হবে। তাকে নিজের বন্ধু মনে করুন, যাতে সে

খোলামেলা আপনার সাথে সব কথা বলতে পারে। তাহলে আপনি তাকে গাইড করতে পারবেন।

অর্থাৎ ঘরে যখন ফিরবেন, অফিস বা বন্ধুবান্ধবদের ঘরে নিয়ে যাবেন না। বায়বীয় কোনোকিছুর সাথে থাকবেন না। জলজ্যান্ত মানুষদের সাথে সময় কাটাবেন। ধরুন, বাবা বাসায় ফেরার পর ছেলেমেয়ে হয়তো দৌড়ে এসেছে। কিন্তু বাবা তাদেরকে বলল, ফ্রেশ হয়ে নিই। ফ্রেশ হওয়ার পর দেখা গেল বাবা স্মার্টফোনে স্ক্রল করতেই ব্যস্ত হয়ে গেছে। শিশু আবার এসে দাঁড়িয়েছে বাবার মনোযোগ পাওয়ার জন্যে, কিন্তু সে লাইক দিচ্ছে আরেক জায়গায়। এতে কি সন্তানের কাছে বাবার সম্মান বাড়ল, নাকি কমে গেল? কমে গেল। সন্তানকে তো ভালবাসা দিতে হবে, সময় এবং মনোযোগ দিতে হবে। আমরা অনেক সময় বলি যে, ছেলে বেয়াদবি করছে। কেন করছে এটা দেখি না। আপনি হয়তো আগে তার সাথে দুর্ব্যবহার করেছেন অথবা এমন আহ্লাদ দিয়েছেন যে, কোনটা ভদ্রতা আর কোনটা বেয়াদবি, কোনটা শুদ্ধাচার কোনটা অশুদ্ধাচার, সেটাই সে শিখতে পারে নি।

আমরা বলেছি যে, স্মার্টফোন থেকে ফেসবুক অ্যাপস ডিলিট করুন। পেশাগত প্রয়োজনে কম্পিউটারে এটা ব্যবহার করুন। তাহলে আপনি বেঁচে যাবেন। অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর কোনো অ্যাপস স্মার্টফোনে রাখবেন না। এগুলোকে ভালো দিয়ে অর্থাৎ কোয়ান্টামের যত অ্যাপস—ইয়োগা অ্যাপস, উইশবোর্ড অ্যাপস ইত্যাদি দিয়ে রিপ্লেস করে নিন। ডিজিটাল টক্সিন থেকে মুক্ত থাকুন। মেডিটেশনসহ কোয়ান্টাম সূত্রগুলো অনুসরণ করুন। ধীরে ধীরে আপনি শৃঙ্খল মুক্ত হতে পারবেন, আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত হয়ে উপভোগ করবেন সত্যিকারের স্বাধীনতা।

একজন ব্যক্তি যখন সত্যিকারের স্বাধীন হয়, তখন সে নির্বাণ লাভ করে। ব্যক্তি তখনই স্বাধীন হবে, যখন সে ধ্যানস্থ হবে, যখন সে ধ্যানের গভীরে ডুবে যাবে। তখন তার অন্তর্গত সত্তা স্বাধীন হবে। আর স্বাধীন অন্তর্গত সত্তা সবসময় অন্য সবার কল্যাণ কামনা করে। মানুষ সত্যিকার অর্থে স্বাধীন হলে সে নিজের কল্যাণ এবং অন্যের কল্যাণ করতে পারে। আমাদের *কোয়ান্টাম মেথড* বইয়ের প্রথম অধ্যায়টা হচ্ছে, মেডিটেশন : শৃঙ্খল মুক্তির পথ। এর শেষ লাইন হলো, 'মেডিটেশনের পথ ধরেই আপনি অতিক্রম করবেন আপনার জৈবিক অস্তিত্বের সীমাবদ্ধতা। আপনার উত্তরণ ঘটবে অনন্য মানুষে। আপনি পাবেন আপনার প্রথম ও পরিপূর্ণ স্বাধীনতা।' আমাদের সমস্যাটা মূলত স্বার্থকেন্দ্রিকতায়, স্বাধীনতায় নয়। মনোজাগতিক পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ব্যক্তির সত্যিকারের স্বাধীনতাই বরং কাম্য।

**প্রশ্ন :** আমার পরিবারের সদস্যদের ধ্যানধারণা আমার সাথে মেলে না। আমি সর্বাত্মক চেষ্টা করা সত্ত্বেও তারা আমাকে বুঝতে চায় না। আমার পথ সঠিক থাকলেও সব ব্যাপারে তারা আমার বিপক্ষে অবস্থান নেয়। এ অবস্থায় পরিবারে থাকা খুব দুঃসাধ্য। এখন আমি কী করব?

**উত্তর :** আপনি পরিবারেই থাকবেন। কারণ পালিয়ে যায় তো কাপুরুষ, যার মধ্যে সাহস নেই, বিশ্বাস নেই, আস্থা নেই। একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট কেন পালিয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করবে? বরং আপনাকে যা করতে হবে তা হলো, পরিবারকে সঠিক ধারণা বা চিন্তায় নিয়ে আসা। সেজন্যে সবর দরকার। পৃথিবী সাহসী মানুষের জন্যে। সবসময় প্রো-একটিভ থাকবেন। বিপদে পড়লে আনন্দিত হবেন। যেখানে বাধা আছে, সেখানে কাজে আনন্দ আছে। ফার্মের মুরগির জীবনে কোনো আনন্দ আছে?

কোয়ান্টামম লামাতে আমাদের মুরগির ফার্মে বাচ্চা দেখার সুযোগ হলো। এ বাচ্চাগুলো খুব কম নড়াচড়া করে। কোনো কোনো বাচ্চা খাবারের ট্রে থেকে পর্যন্ত নামে না। ওখানে খায়, ওখানেই ঘুমায়। ওখানেই মলত্যাগ করছে। ফার্মের মোরগকে কেউ কি মনে রাখে? এদের আয়ু হচ্ছে ২১ দিন থেকে ২৮ দিন। কারণ ২৮ দিন পরে তাকে যা খাওয়ানো হবে, সে তুলনায় তার বৃদ্ধি কম হবে। তাই ২৮ দিনের মধ্যেই বিক্রি করে দেয়া হয়। ওটা খাবার হয়ে মানুষের পেটে চলে যায়। এটা কোনো জীবন নয়।

আবার দেখুন ফাইটার মোরগ। কী চেহারা! কী ভঙ্গি! একটা ফাইটার মোরগের তৈরি হতে লাগে ছয় মাস থেকে একবছর। তারপরে দুই-তিন বছর সে ফাইট করে। মারা গেলেও কেউ ওটা খায় না, মাংস এত শক্ত! মাটিতে কবর দেয়। ফাইটার মোরগের একটা নামও থাকে। ফার্মের মোরগের কোনো নাম আছে? নেই। কেন? কারণ তার জীবনে কোনো প্রতিকূলতা নেই।

কোয়ান্টামে আমাদের সাফল্যের অন্যতম কারণ আমরা চাপের মুখে থাকি। আমাদেরকে মানুষ পাগল বলেছে এবং আরো কত কিছু বলেছে! আমাদের নিয়ে সমালোচনার কোনো শেষ ছিল না। কিন্তু আমরা তো পালিয়ে যাই নি কখনো। বরং সাহসের সাথে আমাদের লক্ষ্যের সাথে লেগে ছিলাম। আমাদের গতি ছিল ফাইটার মোরগের মতো, আলহামদুলিল্লাহ! এরকম আপনিও প্রতিকূলতাকে সবসময় স্বাগত জানাবেন।

আমরা বলি, 'প্রতিকূলে বাড়ে মেধা, অনুকূলে বাড়ে মেদ'। ব্যায়াম যেমন দেহকে মজবুত করে, শরীর সুস্থ রাখে; প্রতিকূলতা তেমনি ব্রেনকে ক্ষুরধার করে। যে জাতি যত বেশি প্রতিকূলতা মোকাবেলা করেছে, সেই

জাতির উন্নতি হয়েছে তত বেশি। যত প্রতিকূলতা, তত প্রাপ্তি; তত আপনার মস্তিষ্ক বিকশিত হবে। প্রতিকূলতা মানসিক শক্তিরও বিকাশ ঘটায়। তখন সে যে-কোনো চাপ সইতে পারার সক্ষমতা অর্জন করে। অতএব পরিবারে থেকেই প্রতিকূলতাকে স্বাগত জানাবেন। তাহলে একসময় আপনি আপনার পরিবারকে জয় করতে পারবেন এবং যত পরিবারের সাথে একাত্ম থাকবেন, তত আপনি সুখী হবেন।

**প্রশ্ন :** পরিবারে নারীদের অবদান ৮০%, পুরুষদের ২০%। আপনি শুধু বলেন সংসার টিকেই আছে নারীর জন্যে। মেয়েদের এই স্যাক্রিফাইসটা, ত্যাগ করার প্রবৃত্তিটা কি এতটাই প্রশংসা পাওয়ার মতো?

**উত্তর :** অবশ্যই। মেয়েরা এত দায়িত্ব না নিলে সংসার টিকে থাকত না। বাস্তবতা হচ্ছে, আমাদের সমাজে পুরুষকে উপার্জন করতে হয়। স্ত্রীর ভরণপোষণসহ সংসারের যাবতীয় খরচ সামলাতে হয়। তাই পুরুষের কাছে পেশাজীবন হচ্ছে স্বাভাবিকভাবেই প্রথম অগ্রাধিকার; সংসার হচ্ছে অগ্রাধিকার তালিকায় দ্বিতীয়। কিন্তু অধিকাংশ নারীর কাছে সংসার হচ্ছে প্রথম অগ্রাধিকার। এজন্যে সংসারে নারীর এত অবদান।

মনে রাখবেন, নারীর কাছে পরিবারটা হচ্ছে তার জীবন। নারীরা সংসার ধরে রাখতে চায়, আগলে রাখতে চায়। সংসারটাকে ঘিরেই নারীর সমস্ত স্বপ্ন লালিত হয়। যে নারী যত সহনশীল বা সমমর্মী হতে পারে, তার সংসার ততটা ভালো হয়, সুখের হয়।

অন্যদিকে পুরুষের কাছে পরিবারটা জীবন নয়, জীবনের আনন্দ। সাধারণভাবে এটাই বাস্তবতা। আনন্দ ছাড়াও জীবন চলে। পারিবারিক জীবনে আনন্দ না পেলে পুরুষ হয়তো অন্য কোথাও আনন্দ খুঁজতে যায়। তাদের অত মাথাব্যথা থাকে না। কিন্তু স্ত্রীকে সে যে সন্তান দিয়ে গেল সেই সন্তানকে তো মা ছাড়তে পারছেন না। এখানে নারীদের স্যাক্রিফাইসটা অনেক বেশি। নারীরা ত্যাগ স্বীকার করেন বলেই সংসার টিকে থাকে। আর পারিবারিক সুখ হচ্ছে একটা সুখী সমাজের মূল ভিত্তি। আমি যেহেতু এই বাস্তবতাটাকে বুঝেছি, এজন্যেই নারীদেরকে আমি এত সম্মান করি। এজন্যেই বলি যে, সংসার বা পরিবার টিকেই আছে নারীর জন্যে।

আবার ব্যতিক্রমও আছে। কোনো কোনো সংসার টিকে আছে স্বামীর জন্যে। স্বামী স্ত্রীকেও দেখে, চাকরিও দেখে, সন্তানও সামলায়, সবই করে। সেটা খুব বিরল এবং ব্যতিক্রম।

**প্রশ্ন :** পরিবারের সদস্যদেরকেও আপনি সালাম দিতে বলেন। এর কারণ কী? ছোটবেলা থেকে সালাম দিতে অভ্যস্ত হই নি বলেই হয়তো কাজটা কঠিন মনে হচ্ছে। আর আমাদের সবার জন্যে কি বলবেন যে, পারিবারিক সুখ ও শান্তির জন্যে আমরা কী কী করতে পারি?

**উত্তর :** পারিবারিক শান্তির জন্যে পরিবারে সালামের রেওয়াজ চালু করা উচিত। আমাদের পরিবারগুলো থেকে এখন সালামের রেওয়াজ প্রায় উঠেই গেছে। আমাদের ছেলেমেয়েরা আমাদেরকে সালাম দেয় না। আমরাও ছেলেমেয়েদের সালাম দেই না। হাই ড্যাডি! হাই মাম্মি! এসব সম্বোধনে তো শান্তি আসবে না। কারণ যে দেশে হাই ড্যাডি হাই মাম্মির সংস্কৃতি রয়েছে সেখানে পারিবারিক শান্তি নেই বললেই চলে।

অতএব পরিবারে সালাম চালু করবেন। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আপনার সন্তানকে আগে সালাম দেবেন। 'আসসালামু আলাইকুম' মানে হচ্ছে—আপনার ওপরে শান্তি বর্ষিত হোক। সনাতন ধর্মের যারা আছেন সকালবেলা উঠে ছেলেমেয়েদের 'ওঁম শান্তি' বলুন। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা সকালবেলা বলুন, 'জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক'। এই সুখ এবং শান্তির কথাটা বেশি বেশি বলতে হবে। যখন আমরা পরিবারে সকালবেলা উঠেই সালাম বিনিময় করব, তখন সমাজেও সালামের এই প্রচলন শুরু হবে।

এভাবে ছয় মাস চর্চা করুন। আপনি যখন সন্তানকে সালাম দেবেন, সে প্রথমে একটু লজ্জা পাবে। এরপর সে প্রতিযোগিতা করবে আপনাকে আগে সালাম দিতে। ছেলেমেয়ে মা-বাবাকে এবং মা-বাবা যদি ছেলেমেয়েকে অন্তর থেকে সালাম বিনিময় করে, তাহলে দেখবেন, ভুল বোঝাবুঝি দূর হয়ে পারস্পরিক বোঝাপড়াটা ভালো হচ্ছে।

এ-ছাড়া পরিবারকে শান্তিপূর্ণ করার জন্যে সমমর্মিতা, সমঝোতা এবং পরস্পরের প্রতি সম্মান থাকতে হবে। এই সম্মান মানে বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা আর ছোটদের প্রতি ভালবাসা, মমতা এবং তাকে স্নেহ করা। বকা দিয়েছে? আমার ভাই-ই তো বকা দিয়েছে! অন্য কেউ তো বকে নি। আমার স্ত্রী-ই তো বকাবকি করছে, অন্যের স্ত্রী এসে তো বকছে না। স্বামী-ই তো বকাবকি করছে, আরেকজনের স্বামী তো বকছে না।

অর্থাৎ একটু অপেক্ষা তো করেন। এখনই জবাব দিতে হবে, দরকার কী? এই সম্পর্কগুলো তো একদিনের না। তাই যত্ন করতে হবে। সবর করতে হবে। একহাতে কি কখনো তালি বাজে? তালি বাজার জন্যে দুই হাত লাগে। তো একহাত থেমে গেলে অন্য হাত আর কী করবে? কতক্ষণ আর বকবে?

সমঝোতা, সমমর্মিতা ও সম্মান—এই তিনটা যখন একত্র হয়, তখন পরিবার সুখের হয় এবং পরিবারে শান্তি থাকে। কারণ সমঝোতা সম্মান সমমর্মিতা সবাই পেতে চায়। বড়রা যেমন চায়, ছোটরাও একইভাবে চায়। একজন একটা ভুল করে ফেলেছে, ঠিক আছে! তাকে সংশোধন করে নিন, শুধরে নিতে সাহায্য করুন। নিজের পাগলকে মানুষ কী করে? নিজের পাগল হলে তাকে বেঁধে রাখে। আপনজনকেও মমতার বন্ধন দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়। পরিবারের শান্তির জন্যেই এটা করতে হয়।

আর কী করবেন? সময় যত অল্প হোক, পরিবারের সবার প্রতি মনোযোগ দেবেন। যখন বাসায় যাবেন বাসার প্রতি মনোযোগ দেবেন, স্ত্রীর প্রতি মনোযোগ দেবেন, স্বামীর প্রতি মনোযোগ দেবেন, সন্তানের প্রতি মনোযোগ দেবেন। অন্য কোনোকিছু যেন মনোযোগ কেড়ে না নেয়। টিভি, স্মার্টফোন এসব আহাম্মকের বা শয়তানের বাক্সে মনোযোগ দেবেন না। মনোযোগ দেবেন পরিবারের প্রতি।

যখনই কোনো ভুল বোঝাবুঝি হয়, হতেই পারে, সে-ক্ষেত্রে সবসময় সরাসরি কথা বলবেন, কোনো মাধ্যম হয়ে নয়। যার সাথেই ভুল বোঝাবুঝি হোক না কেন, মানুষটাকে আপন ভাববেন, সম্পর্কটাকে গুরুত্ব দেবেন এবং কারো মাধ্যমে না গিয়ে সরাসরি মানুষটার সাথে যোগাযোগ করবেন। তার সাথে বসে আলাপ করে ভুল বোঝাবুঝি ঠিক করে ফেলবেন।

মনে রাখবেন, যে সম্পর্ক ছিন্ন করা যায় না, সে সম্পর্কের মাঝে কখনো দেয়াল তুলবেন না। মমতার সেতুবন্ধন তৈরি করবেন, ক্ষমা করবেন বার বার। যত বেশি ক্ষমা করতে পারবেন, তত আপনি সুখী হবেন। পৃথিবীতে যত মহামানব এসেছেন, তারা সবসময় ক্ষমা করেছেন। কারণ তারা এই রহস্যটা জানতেন—যে অন্তরে ক্ষমা আছে, সেই অন্তরে কৃতজ্ঞতা আছে, প্রশান্তি আছে। আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমাশীল না হচ্ছেন, কৃতজ্ঞ না হচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার অন্তরে প্রশান্তি আসবে না।

মানুষের অন্তর্গত প্রশান্তি—সুখী ও পরিতৃপ্ত জীবনবোধ খুব প্রয়োজন পরিবারের শান্তির জন্যে। এই শান্তির জন্যে প্রয়োজন শোকরগোজার দৃষ্টিভঙ্গি ও কৃতজ্ঞতা। আর যে-কোনো অবস্থায় আপনি মন থেকে তখনই কৃতজ্ঞ হতে পারবেন, যখন নিয়মিত মেডিটেশন করবেন। তাই পরিবারের সদস্যদেরকে নিয়ে একত্রে মেডিটেশন চর্চা করুন।

যেমন, কানাডিয়ান লেখক কেরি লি ম্যাকলিন ও তার স্বামী হেক্টর নিজেরা ধ্যানচর্চা করতেন। কিন্তু তাদের পাঁচ সন্তানকে এতে যুক্ত করার কোনো প্রয়োজন বোধ করেন নি। উঠতি বয়সের পাঁচ সন্তানের অগণিত দ্বন্দ্ব,

ঝগড়াঝাঁটি ও দিনভর কোলাহল থেকে কিছুটা শান্তি খুঁজতেই তাদের মেডিটেশনে যুক্ত হওয়া। তারা চান নি প্রশান্তির এ সময়টুকু হাতছাড়া হয়ে যাক। কিন্তু একসময় সন্তানদের রেষারেষি মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। বাধ্য হয়েই কেরি ও হেক্টর সন্তানদের সাথে নিয়ে মেডিটেশনে বসতে শুরু করলেন।

কিছুদিন পরই ঘটতে লাগল আশ্চর্য কিছু পরিবর্তন। সন্তানদের একে অপরের প্রতি অভিযোগ কমতে লাগল, ক্ষোভ প্রশমিত হতে লাগল। উত্তেজিত ও প্রায়শই হিংস্র সন্তানরা এখন শান্ত স্বরে কথা বলে এবং অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে। কেরি লি-র ভাষায়, 'আমরা রাতারাতি একটা সুখী পরিবারে রূপান্তরিত হই নি। মেডিটেশন চর্চার ফলে কীভাবে যেন পারস্পরিক যোগাযোগের নতুন নতুন পথ তৈরি হয়েছে।' (*দ্য ফ্যামিলি মেডিটেশন বুক*, কেরি লি ম্যাকলিন, অন দ্য স্পট! বুকস, ২০০৪)

অতএব পরিবারে ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে সবসময় ইতিবাচক কথা বলুন, কৃতজ্ঞ থাকুন। নিয়মিত মেডিটেশন করুন এবং সুখী পরিবারের মনছবি করুন। প্রতি শুক্রবার কোয়ান্টামের সেন্টার শাখা সেলে সাদাকায়নে আসুন। সঙ্ঘের ভালো কাজে অংশ নিন—পরার্থে সময় দিন। সবাইকে আগে সালাম দিন। কারণ পরিবারে যত প্রশান্তি আসবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বিকাশ তত সুন্দর হবে, আমাদের সমাজ তত সুখী হবে।

**প্রশ্ন :** পরিবারের ক্ষেত্রে আপনি বলে থাকেন, এক আর এক যোগ করলে ১১ হয়। কীভাবে—একটু বুঝিয়ে বলবেন কি?

**উত্তর :** পরিবার কীভাবে শুরু হয়? পরিবারের শুরু হচ্ছে—একজন পুরুষ (বাবা) এবং একজন নারী (মা)। কিন্তু এখন অবস্থা হচ্ছে, 'হাম দো, হামারা দো'। এর পরের বাক্যটা আমরা মজা করে বলতে পারি—'ড্যাডি-মাম্মি গো গো'। এভাবে পরিবার ক্রমশ হয়ে উঠছে শুধু টোনাটুনির সংসার।

সাদা চোখে পরিবারে ১+১ = ২ হলেও এটা মূলত দুই থাকে না। কারণ যখনই সমমর্মিতা, পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে একের পাশে এক আসে—শক্তিতে এটা হয়ে যায় ১১। গণিত কিন্তু বলে না যে, ১+১ = ১১। তাহলে পরিবারে ১১ হয় কীভাবে? যে এক (স্ত্রী) এলো, সেই একের ওপরে আবার এক যোগ—তার মা-বাবা। আবার এই এক (স্বামী) যে বিয়ে করল, এরও আবার এক যোগ এক আছে। মা-বাবা আছে। হলো কজন? এভাবে কিন্তু ছয় হয়ে গেল। কারণ চার মা-বাবা আর তারা স্বামী-স্ত্রী দুজন মিলে ছয় হলো। কয়েকটি সন্তান হওয়ার পরে তা ৮/১০ হয়ে গেল।

তারপরে আবার ডালপালা আছে। স্বামীর পক্ষের ভাইবোন আছে। স্ত্রীর পক্ষের ভাইবোন আছে। এসব মিলিয়েই আমরা বলি, পরিবারে এক যোগ এক মানে হচ্ছে ১১। অর্থাৎ হাত হচ্ছে দুটো, কিন্তু ১১টা বল নিয়ে খেলতে হবে। যিনি দক্ষ, তিনি সামলাতে পারেন। যিনি ভয় পেয়ে যান তিনি পারেন না। আপনারা তো জাগলিং দেখেছেন। অনেকগুলো বল শূন্যে ছুড়ে দিয়ে আবার ধরে ফেলে; হাত থেকে কোনো বল কিন্তু পড়ে না।

জাগলার কেন পারেন? কারণ তিনি বিশ্বাস করেন। তিনি দায়িত্ব নেন যে, আমি ১১টা বল নিয়ে দুই হাতে খেলতে পারব—কোনো বল নিচে পড়ে যাবে না। তাই নিচে পড়েও না। অবশ্য এজন্যে অনেক অনুশীলন করতে হয়, চেষ্টা থাকতে হয়, লক্ষ্য থাকতে হয়। তিনি পারবেন বলে বিশ্বাস করে দায়িত্ব নিয়েছেন এবং এটা দেখানোর জন্যে অনেক মানুষ জড়ো করেছেন। তাই তিনি পারেন। এই চেষ্টা এবং দায়িত্ব নেয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

**প্রশ্ন :** শুধু পরিবার ও মা-বাবাই কি আদর্শ সন্তান তৈরিতে ভূমিকা রাখে? এজন্যে পরিবেশ ও সমাজব্যবস্থা কি অধিকতর অনুকূল হওয়া জরুরি নয়?

**উত্তর :** ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে লাভ নেই। গাড়ি থাকবে ঘোড়ার পেছনে। ঘোড়ার আগে যদি গাড়ি জুড়তে যান, ঘোড়াও কোনো দিকে যেতে পারবে না, গাড়িও কোনো দিকে যেতে পারবে না। পরিবেশ ও সমাজব্যবস্থা অনুকূল হলেই যে সন্তান মানুষ হবে এমন কোনো কথা নেই। ইউরোপ-আমেরিকায় সমাজব্যবস্থা অনুকূল। কিন্তু সেখানে সন্তানরা সবাই কি আদর্শ হচ্ছে?

সমাজের যে-কোনো পরিবর্তন আসবে মূলত ব্যক্তি ও পরিবার থেকে। ব্যক্তির পরিবর্তন হলে পরিবার, পরিবারের পরিবর্তন হলে সমাজ, সমাজের পরিবর্তন হলে রাষ্ট্র বদলায়। অর্থাৎ ওপর থেকে কখনো নিচে পরিবর্তন আসে না। একজন একজন করে পরিবারের প্রত্যেকটা মানুষ ভালো হলে ধীরে ধীরে সেই সমাজ এবং রাষ্ট্রও ভালো হয়, সুন্দর হয়। অতএব পরিবার এবং পারিবারিক শিক্ষাটা এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

## বড় পরিবার সুখী পরিবার

**প্রশ্ন :** গুরুজী, আপনি তো পরিবার বড় করার কথা বলেন; কিন্তু আমরা গত কয়েক বছর ধরে সন্তান নিতে চেষ্টা করছি। এখনো একটা সন্তানও হলো না, বড় পরিবার তো দূরের কথা। তাছাড়া বড় পরিবারের ঝামেলাও অনেক...।

**উত্তর :** বিয়ের পর অনেক স্বামী-স্ত্রী মনে করেন, আগামী তিন-চার বছর তারা ঘুরে বেড়াবেন, নিজেদের মতো সময় কাটাবেন, ক্যারিয়ার গুছিয়ে নেবেন এবং এই সময় সন্তান নেবেন না। আবার অনেকে ভাবেন, পরিবার বড় হওয়া মানেই ঝামেলা বাড়ানো। এতে অবচেতনভাবেই তাদের ব্রেনে সন্তান না নেয়ার প্রোগ্রাম সেট হয়ে যায়। এদের অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, পরবর্তীকালে তারা চাইলেও আর সন্তান হচ্ছে না। কারণ ব্রেনে তো ইতোমধ্যেই একটা অনীহা তৈরি হয়ে গেছে সন্তানের ব্যাপারে।

সন্তান নেয়ার ব্যাপারে এই যে অনীহা এবং পরিবার ছোট রাখার জন্যে হাজারো প্রচারণা—এর সবই হলো একটা সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের অংশ। যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট তাদের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের পক্ষ থেকে ১৯৭৬ সালে সে-দেশের প্রেসিডেন্টকে যে মেমোরেন্ডাম দিয়েছিল, তার মূল বিষয়টিই ছিল—বিশ্বের যে দেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেখানে জনসংখ্যা কমানোর জন্যে কী কী নীতি অবলম্বন করা উচিত তার বিস্তারিত বিবরণ।

চীন ভারত তুরস্ক ইন্দোনেশিয়া-সহ ১৩টি দেশের ব্যাপারে তারা একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে। যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু খুব ভালোভাবে জানত এবং এখনো জানে যে, জনসংখ্যা হচ্ছে সম্পদ এবং একটি জাতির সুপার পাওয়ার হয়ে ওঠার প্রাথমিক ভিত্তি। তাদের বহু বছরের গবেষণায় তারা ঠিকই বুঝেছিল—সেই দেশগুলোই হয়ে উঠবে আগামীর পরাশক্তি, যেখানে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটবে এবং একে যারা জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারবে। একটি গবেষণা রিপোর্টে তারা প্রশ্ন তুলছে—উন্নয়নের জন্যে জনসংখ্যাই কি নিয়তি? (*দ্য ইকনোমিস্ট*, ১৭ এপ্রিল ২০১৯)

নিজেদের অনুসন্ধানে তারা দেখল, তাদের তুলনায় এশিয়ার জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। এশিয়ার জনসংখ্যা যদি বেড়ে যায়, বিশ্বব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব খর্ব হবে। এ অপপরিকল্পনার অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র চীনকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল—তোমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা জনসংখ্যা। এটা কমাও। 'ওয়ান চাইল্ড পলিসি' করো। এমনিতেই তোমাদের অনেক মানুষ। 'এক সন্তান নীতি' চালু করলে তোমরা লাভবান হবে।

চীন তাদের ফাঁদে পা দিয়ে কঠোরভাবে 'এক সন্তান নীতি' অনুসরণ করল। গর্ভপাত, বন্ধ্যাকরণ কর্মসূচি সবই শুরু করল। এমনকি কারো দ্বিতীয় সন্তান হয়ে গেলে তাকে বার্থ সার্টিফিকেট দেয়া হতো না, নাগরিকত্ব বাতিল করা হতো এবং এরকম অসংখ্য দম্পতিকে বিপুল অংকের জরিমানা দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। ফল হলো অত্যন্ত ভয়াবহ।

এই ভ্রান্ত নীতির ফলে মা-বাবা, দাদা-দাদি, নানা-নানি মিলে একটি বৃহত্তর পরিবারের ছয় জন মানুষের পরবর্তী বংশধর হচ্ছে মাত্র একজন! অথচ একসময় চীনের বড় শক্তি ছিল তাদের পরিবার, যা শেষ হয়ে গেছে। ফলে নানান সামাজিক অস্থিরতাও দেখা দিয়েছে। একটি সন্তান তো কখনোই ছয় জনকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। আবার চীনে যেহেতু প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটেছে, যখনই বোঝা গেছে গর্ভস্থ সন্তান মেয়ে, তখন তারা ভ্রূণহত্যা করেছে। শিশুহত্যার সাথে এর কোনো পার্থক্য নেই। এর শাস্তি তো পেতে হবে। কন্যাশিশুর ভ্রূণহত্যার ফলে সমাজে নারী-পুরুষের সংখ্যায়ও সৃষ্টি হয়েছে ভারসাম্যহীনতা।

চীন এত বছর পর বুঝতে পেরেছে যে, এই এক সন্তান নীতি ছিল জাতির জন্যে একটি ভুল সিদ্ধান্ত, যা চীনকে সামাজিকভাবে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে। তাই বর্তমানে চীন এই সর্বনাশা নীতি থেকে বেরিয়ে এসেছে। *সিএনএন*-এর সাম্প্রতিক (৬ আগস্ট ২০২৫) রিপোর্ট হচ্ছে, এক সন্তান নীতি যে অদূরদর্শী নীতি এটা মাত্র ১০ বছর আগে চীন বুঝতে পারল। ২০১৫ সালে তারা দুই সন্তানের ব্যাপারে উৎসাহ দিতে শুরু করল। এখন জনসংখ্যার ঘাটতি মোকাবেলায় তিন সন্তান নেয়ার কথা বলছে তারা।

চীনের সংশোধিত পরিবার পরিকল্পনা আইন অনুযায়ী, দম্পতিরা তিন সন্তান নিতে পারবে। ৩১ মে ২০২১ আনুষ্ঠানিকভাবে এ আইন পাস করা হয় চীনে। এমনকি জন্মহার বাড়ানোর জন্যে তারা কর ছাড় থেকে শুরু করে আবাসন সুবিধা ও আর্থিক প্রণোদনা দিতে শুরু করল। এখন চীনে বড় বড় বিলবোর্ড টানানো হচ্ছে—বড় পরিবার সুখী পরিবার। কিন্তু এত প্রণোদনা দিয়েও তেমন কোনো লাভ হচ্ছে না। ২০২৪ সালে চীনে বিয়ের পরিমাণ ২১ শতাংশ কমে গেছে। যারা বিয়ে করছে তারাও সন্তান নিতে চাচ্ছে না।

জনসংখ্যার দিক থেকে আরো বেশি বিপদে আছে দক্ষিণ কোরিয়া। এক সন্তান নীতির ফাঁদে পড়ে তাদের জন্মহার হয়ে গেছে পৃথিবীতে সবচেয়ে কম—০.৭৫। এভাবে চলতে থাকলে আগামী ৫০ বছরে দক্ষিণ কোরিয়ার জনসংখ্যা আরো এক-তৃতীয়াংশ কমে যাবে। তাই তারা মরিয়া হয়ে লক্ষ্যস্থির করেছে ২০৩০ সাল নাগাদ জন্মহার ০.৭৫ থেকে অন্তত এক-এ নিয়ে যাবে; যদিও জনসংখ্যার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে ২.১ হওয়া প্রয়োজন।

এজন্যে সরকার তো প্রণোদনা দিচ্ছেই, সেইসাথে কোরিয়ার একটা বড় কোম্পানি বুইয়ং তাদের কর্মীদের সন্তান জন্ম হলেই ১০ কোটি ওন দেবে, যা আমাদের টাকায় ৯০ লক্ষ টাকা! অন্যান্য কোম্পানিগুলোও কেউ ৭০ লক্ষ, কেউ ৬০ লক্ষ, কেউ ৫০ লক্ষ টাকা দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে প্রণোদনা

হিসেবে। কেউ তিন সন্তানের মা-বাবা হতে পারলে প্রণোদনা পাবে আরো বেশি। কিন্তু এতকিছু করেও কোনো লাভ হচ্ছে না।

কারণ সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী জন্মহার একবার কমতে শুরু করলে এটা কমতেই থাকে। কারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি আর মাইন্ডসেট বদলে যাওয়ার সাথে সাথে ব্রেনের কর্মকাঠামোও বদলে যায়। যেটা শুরুতে বলেছিলাম—একবার অনীহা তৈরি হয়ে গেলে এটা খুব কঠিন। তাই এত প্রণোদনার পরেও তারা ভাবছে যে, খামোখা সন্তান দিয়ে কী হবে?

বাংলাদেশের কী অবস্থা ছিল? এখানেও স্লোগান ছিল—'দুই সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভালো হয়'। অবশ্য আমাদের সরকার নীতিগতভাবে তার অবস্থান বদলেছেন। এখন নতুন স্লোগান হচ্ছে, ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তানই যথেষ্ট। 'একটি হলে ভালো হয়'—অন্তত এই নীতি থেকে সরে আসাটা ভালো হয়েছে। আমরা সেদিনের প্রত্যাশায় যেদিন সরকারিভাবে বলা হবে—'চারের কম নয়, সাত হলে ভালো হয়।'

বাংলাদেশে ৭০-এর দশকে জন্মহার ছিল ৬। তখন সরকারি, দেশি-বিদেশি এনজিওকর্মীরা প্রবল উদ্যোগে মাঠে নামল যে, জন্মহার কমাতে হবে। ফলে ১৯৮২ সালে এটা নেমে গেল ৫.০৭। কারণ তখন জোরজবরদস্তি চলছিল, এমনকি বন্ধ্যাও করা হয়েছে অনেককে। ১৯৯৪ সালে আরো কমে হলো ৩.৪। ২০০৪ সালে প্রজনন হার ৩।

২০২৪-এ সরকারের লক্ষ্য ছিল ২.১, কিন্তু এটা হলো ২.১৭। জনসংখ্যাবিদরা ধরে নিয়েছেন ২০২৫ সালে জন্মহার কমে গিয়ে ২-এ চলে আসবে। কিন্তু ঘটে গেল উল্টো। এখন আবার প্রজনন হার বাড়তে শুরু করেছে। দেশের পত্রিকাগুলোর রিপোর্ট (১৭ নভেম্বর ২০২৫) হচ্ছে, 'বাংলাদেশ কি উল্টো পথে হাঁটছে?' দেশে এখন প্রজনন হার ২.৪। স্বাধীনতার পর ৫৪ বছরে এই উল্টোযাত্রা এর আগে কখনো দেখা যায় নি! এটা বিবিএস (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো) এবং ইউনিসেফের জরিপ।

আমরা মনে করি, দেশের জনগণ এক সন্তান নীতি গ্রহণ না করে সঠিক পথে যাত্রা শুরু করেছে। কারণ একটা বড় জাতি, মহান জাতি হওয়ার জন্যে দরকার হচ্ছে পপুলেশন বুম। গত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে একমাত্র আমরাই স্রোতের বিপরীতে গিয়ে জনসংখ্যা বাড়ানোর কথা বলে আসছি। তখন আমাদেরকে নিয়ে হাসাহাসি কম হয় নি। কিন্তু আমরা যা সত্য বলে বিশ্বাস করি, সেই বিশ্বাস থেকে কখনো বিচ্যুত হই না এবং অবলীলায় বলে যাই। ফলে আমাদের এই ভাবনার সামাজিকায়ন হতে হতে দেশে জন্মহারের নিম্নমুখী গতিটা এখন উল্টো উর্ধ্বমুখী হচ্ছে।

এটা একটা বিশাল অর্জন। যেখানে অন্যান্য দেশে সরকারি প্রণোদনা, বিজ্ঞাপন এবং উৎসাহ দেয়ার পরেও জন্মহার ক্রমাগত কমছে, সেখানে বাংলাদেশে এসব ছাড়াই বাড়ছে। কেননা কোয়ান্টাম ৩০ বছর ধরে পরিবার বড় করার কথা বলছে। ইতিহাসের এই যে বাঁকবদল, এই ঘুরে দাঁড়াতে পারার পেছনে আছে মেডিটেটিভ লেভেলে আমাদের সম্মিলিত ভাবনার শক্তি। ধ্যানের স্তরে কোনো ভাবনা যখন ডিকোহেরেন্স লেভেলে (যেখানে ভাবনা এবং বিশ্বাস একাকার) চলে যায়, তখন তা অন্তর থেকে অন্তরে ধ্বনিত হতে থাকে। এই বাণী মানুষের অন্তরে পৌঁছেছে এবং মানুষ এটা গ্রহণ করেছে। সবটাই পরম করুণাময়ের দয়া যে, এর অনুঘটক ছিল কোয়ান্টাম।

তাই শুকরিয়ার সাথে আমরা বলতে পারি, ২০২৫ আমাদের দেশের জন্যে একটা যুগান্তকারী এবং সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত থেকে বেরোনোর বছর। আসলে আমাদের শক্তি নাশ করার জন্যেই পরিবারকে ছোট করাটা ছিল একটা আন্তর্জাতিক ফাঁদ। সেই ফাঁদ থেকে আমরা বেরোতে পেরেছি। অর্থাৎ জন্মহার কমে যাওয়ার পর আবার যে বাড়তে পারে এটা পৃথিবীতে অনন্য উদাহরণ, যা আমরা সৃষ্টি করতে পেরেছি।

মনে রাখবেন, যারা এদেশের জনসংখ্যা কমাতে চায়, তারা আমাদের বন্ধু নয়। তারা সাম্রাজ্যবাদী ও শোষকদের এজেন্ট। একথা বলতে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই। কারণ আমরা জাতির কল্যাণে ও আমাদের জাতিসত্তার বিকাশের জন্যেই কথাগুলো বলছি। তাই সাম্রাজ্যবাদী ও শোষকদের চক্রান্তে কেউ পড়বেন না। আসল সত্য হলো, জনসংখ্যাই শক্তি—পরিবারের জন্যে, জাতির জন্যে এবং দেশের জন্যে।

তাছাড়া বিয়ের প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে, পরিবার গঠন। শুধু দুজনে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে বিয়ে নয়। ঘুরে বেড়াবেন, কিন্তু মূল বিষয় হচ্ছে সন্তানসন্ততিসহ একটা বড় পরিবার গড়ে তোলা, একটা প্রজন্ম গড়ে তোলা। কারণ বড় পরিবার হচ্ছে সুখী পরিবার। ধরুন, এক পরিবারে পাঁচ-সাত ভাইবোন, আরেক পরিবারে একজন। এই একজনের পরিবার কি কখনো পাঁচ-সাত জনের পরিবারকে ফেস করতে পারবে? জনশক্তি হচ্ছে এমন এক শক্তি, যা ইতিহাসকে পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের অভাব তো মানুষ ছাড়া কোনোকিছু দিয়ে পূরণ করা যায় না।

তাই বিয়ের পর থেকেই সন্তানকে প্রত্যাশিত মনে করবেন। যত দ্রুত সম্ভব সন্তান নিয়ে নেবেন এবং পর পর কমপক্ষে চারটা। ১০ বছর পর আপনাকে এদের দেখাশোনা করতে হবে না। তারাই একে অন্যকে দেখে রাখবে। বড় সন্তান হবে ছোটদের লিডার। প্রত্যেকেই তো লিডারশিপ চায়।

ওরা চার জনই যথেষ্ট—গল্প করা, খেলাধুলা এবং সেইসাথে একে অপরের দেখাশোনা করার জন্যে।

তবে আরেকটি বিষয় মনে রাখবেন—কোনো কারণে স্বাভাবিকভাবে যদি সন্তান না আসে, বুঝবেন যে, টেস্টটিউবে কোনো কল্যাণ নেই। এখন আপনারা নিজেদের জন্যে নিয়মিত হিলিং করবেন, সুস্থ সন্তানের মনছবি করবেন এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবেন। আমরা দোয়া করি।

**প্রশ্ন :** পর পর দুই বা তিন সন্তান হলে মা সন্তানের দুধ বা অন্যান্য দাবি যথাযথভাবে পূরণ করতে পারেন না। কিছুদিনের জন্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা কি এ-ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

**উত্তর :** পরিকল্পিত পরিবার ঠিক আছে। কিন্তু সন্তান সংখ্যা কমানো—অর্থাৎ সচ্ছল/ অবস্থাপন্ন পরিবারে সন্তান সংখ্যা অন্তত চারের নিচে নামানোর কোনো যুক্তি আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, সমাজে যাদের সন্তান মানুষ করার সামর্থ্য আছে তাদের সন্তান কম। কিন্তু যারা সন্তানের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক বিকাশে কোনো অবদান রাখতে পারে না, তাদের সন্তান সংখ্যা অনেক বেশি। হওয়া উচিত ছিল উল্টোটা। সন্তান লালনপালনে যাদের আর্থিক বা অন্য কোনো অসুবিধা নেই, তাদের সন্তান সংখ্যা বেশি হলে সেই শিশুরা সুন্দরভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়। ফলে তারা মানবসম্পদে পরিণত হয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

**প্রশ্ন :** আমাদের অনেকের মনে গেঁথে গেছে যে, এক বা দুই সন্তানের ছোট পরিবারই ভালো, এর সুবিধা অনেক। কিন্তু আপনি বলেন বিপরীত কথা। আমাদের একক পরিবার। এখানে ডে কেয়ার সেন্টারের সুবিধাও নেই। কীভাবে পরিবার পরিকল্পনা করব? দয়া করে পরামর্শ দেবেন।

**উত্তর :** পরামর্শ খুব সহজ—সুখী পরিবার গঠন এবং সন্তানদের সুষ্ঠু বিকাশের জন্যেই ন্যূনতম চার সন্তান নেয়ার কথা চিন্তা করুন। সন্তান দেয়া না দেয়াটা তো আল্লাহর হাতে, কিন্তু পরিকল্পনায় থাকতে হবে চারের কম নয়। কারণ একমাত্র সন্তান সাধারণত নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। সে মনে করে, কোনো বিপদে তার পাশে দাঁড়ানোর মতো আপন কেউ নেই।

সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের প্রচারণার ফলে অনেকেই মনে করে, ছোট পরিবারের সুবিধা অনেক। আসলে ছোট পরিবার হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল

পরিবার, নিঃসঙ্গ পরিবার। ছোট পরিবারে পারস্পরিক শেয়ারিংয়ের সুযোগ কম। ফলে সহযোগিতা, পরার্থপরতা এবং স্যাক্রিফাইসের মনোভাব সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ কমে যায়। মা-বাবার সমস্ত মনোযোগ থাকে ওই এক সন্তানের পেছনে। সন্তান এবং নিজেদের বাইরে তারা আর কাউকে নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না। যখন সন্তান দেখে যে, মা-বাবা শুধু তাকে নিয়েই ব্যস্ত, অন্যদের খোঁজখবর নিতে তেমন যত্নশীল নয়, তখন সে-ও আত্মকেন্দ্রিক মানুষ হয়ে বেড়ে ওঠে।

এভাবে একমাত্র সন্তান শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবতে শেখে এবং তার মধ্যে স্বার্থপর মনোভাব তৈরি হয়। ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তা ও আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে আস্তে আস্তে সে হয়ে পড়ে নিঃসঙ্গ, হতাশ ও বিষণ্ণ। কারণ মানুষ ছাড়া, মমতা ছাড়া, সম্পর্ক ছাড়া, কানেক্টিভিটি ছাড়া কখনো সত্যিকার অর্থে ভালো থাকা যায় না। স্বার্থপর মানুষের সোশ্যাল মাসলটা দুর্বল হয়ে পড়ে। তার আত্মবিশ্বাস কম হয়। সে ভীরু ও দুর্বল হয়ে পড়ে। পাশাপাশি এই স্বার্থপরতা তাকে অপরাধপ্রবণ ও দুর্নীতিগ্রস্ত পর্যন্ত করে তুলতে পারে। গবেষণা বলছে, যে দেশের মানুষ যত বেশি স্বার্থপর সে দেশে তত বেশি দুর্নীতি (সূত্র : *ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল*)।

আবার একমাত্র সন্তানের সাথে মা-বাবাও প্রয়োজনে দৃঢ় হতে পারেন না, শাসন করতে পারেন না। ফলে একমাত্র সন্তানদের বখে যাওয়া এবং স্বেচ্ছাচারী হওয়ার দৃষ্টান্ত চারপাশে কম নয়। এরা সাধারণত কম্প্রোমাইজ করতে শেখে না। মনে করে যে, আমি রিকুইজিশন দেবো, মা-বাবা হবে আমার সাপ্লায়ার। যা চায়, তা-ই তার পেতে হবে। মা-বাবাও কখনো নিরুপায় হয়ে বা চাপে পড়ে দিয়ে দেন। কারণ না দিলে হয়তো সে ইমোশনাল কিছু করে বসে, নয়তো রাগ দেখায় যে, দিতে না পারলে মা-বাবা হয়েছ কেন? এসব কেন করে? কারণ সে স্বার্থপর হয়ে বড় হচ্ছে।

আরেকটা বাস্তব সমস্যা হলো, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুই সন্তানের মধ্যে রেষারেষি হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। কারণ এদের মধ্যে দূতিয়ালি করার কেউ থাকে না। রাগ-অভিমান ভাঙানোর ক্ষেত্রে এদের মধ্যে কোনো সংযোগ সেতু নেই। তৃতীয় সন্তান হলো সেই সংযোগ সেতু।

যখনই তৃতীয় একজন এলো, এরা নিজেদের মধ্যে মারামারি ভুলে নতুনটির প্রতি মনোযোগ দেয়। তখন প্রথম সন্তান লিডারশিপ নেয় এবং পরের সন্তানেরা মিলে একটা টিম হয়ে যায়। মা-বাবা বাইরে কাজ করছেন বলে সময় দিতে পারছেন না। সে-ক্ষেত্রে ভাইবোনগুলো পরস্পর পরস্পরকে সময় দিতে পারবে।

এজন্যেই বলি—চারের কম নয়, এর বেশি যত হয়। এই স্লোগানটাকে সংশোধন করে সম্প্রতি (২১ নভেম্বর ২০২৫ থেকে) আমরা বলছি—'চারের কম নয়, সাত হলে ভালো হয়'। যখনই একটি পরিবারে কয়েকজন সন্তান থাকে, তাদেরকে আর আলাদা করে দেখে রাখতে হয় না। বড় ভাই বা বড় বোনটি ছোটদের দেখাশোনা করে। যে-কোনো পরিস্থিতিতে একজন আরেকজনের পাশে দাঁড়ায়। একজন আরেকজনের কাছ থেকে সাপোর্ট পায়। ফলে এদের বেড়ে ওঠাও সুন্দর হয়।

গত ৩০ বছরে অটিজম এত যে বিস্তার লাভ করেছে, এত শিশুর স্পিচ ডিলে হচ্ছে—এর একটা বড় কারণ হলো একক পরিবার। শিশু কথা বলতে শেখে চারপাশের মানুষের কাছ থেকে। এখনকার শিশুরা কথা বলার মানুষ তেমন পাচ্ছে না, বরং স্ক্রিনের সামনে নানান ভাষার কার্টুন দেখে সময় কাটাচ্ছে। সে একতরফা শুধু শুনছে। তাকে কেউ সাড়া দিচ্ছে না। তাই সে নিজের ভাষাটা আয়ত্ত করতে পারে না সময়মতো। 'টারজান' কার্টুন বা মুভি যারা দেখেছেন, তারা নিশ্চয়ই জানেন, জঙ্গলে থাকার ফলে টারজান পশুপাখির ভাষা ও ভঙ্গি আয়ত্ত করেছে। এটাই বাস্তবতা। আসলে মানুষের গড়ে উঠার জন্যে চারপাশে মানুষের সংস্পর্শ প্রয়োজন। যারা মানুষের সংস্পর্শ কম পায়, তারা একভাবে আর যারা মানুষের সংস্পর্শ বেশি পায়, তারা আরেকভাবে গড়ে ওঠে।

এক সন্তানের কত সমস্যা এটা চীন টের পাচ্ছে হাড়ে হাড়ে! চীনে ৪০ বছর ধরে এক সন্তান নীতি ছিল। এর মানে বেশিরভাগ পরিবারে একটাই ছেলে; মেয়েশিশু হবে জানলেই ভ্রূণ অবস্থায় মেরে ফেলা হতো। আর ছেলেকে সবসময় তুলুতুলু করে রাখা হয়, আগলে রাখা হয়। ফলে এই এক ছেলেরা হয়ে গেছে ভীরু কাপুরুষ। তাদের সেনাবাহিনী সাহসী মানুষ শূন্য হয়ে গেছে। চীনে আগের যে পিপলস আর্মি, তাদের যুদ্ধ করার যে শক্তি ও সাহস ছিল সেটা পরের প্রজন্মের নেই। কারণ সে একা। সে মারা গেলে ওই বংশের আর কেউ থাকছে না। তাই সে ভীত থাকে যে, যদি মরে যাই!

চীন এই অদূরদর্শী নীতি থেকে সরে এলেও তাদের এখন কী অবস্থা? পহেলা জানুয়ারি ২০২৬ সিএনএন-এর রিপোর্টের সারসংক্ষেপ হলো—

'পহেলা জানুয়ারি চীনে বিতর্কিত এক সন্তান নীতি বাতিলের ১০ বছর পূর্ণ হয়েছে। কয়েক দশক ধরে কড়া জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতির কারণে দেশটির জনতাত্ত্বিক কাঠামোতে বড় ধরনের ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়েছে। গড়ে উঠেছে এমন এক প্রজন্ম, যাদের কোনো ভাইবোন নেই। এখন চীনের দুর্বল সামাজিক সুরক্ষাব্যবস্থার কারণে বৃদ্ধ মা-বাবার সেবার পুরো দায়িত্ব এই



৩—

একাকী সন্তানের কাঁধে বর্তায়। চীন সরকারের আশঙ্কা দেশটি ধনী হওয়ার আগেই বুড়ো হয়ে যাবে। তাই ভারসাম্য ফেরাতে তরুণদের অধিক সন্তান নিতে উৎসাহিত করা হচ্ছে, যদিও তা চীন সরকারের জন্যে এক কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একের পর এক নানা উদ্যোগ নেয়া হলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে তার প্রভাব খুব একটা পড়ছে না।

গত তিন বছরে চীনের জনসংখ্যার হার কমে গিয়ে এখন মাইনাস ওয়ান পারসেন্ট। গত বছর জন্মহার বাড়লেও বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন এই প্রবণতা স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। চীনে বর্তমান ১৪০ কোটি জনসংখ্যার ২০ শতাংশের বেশি মানুষ ৬০ বছরের ওপরে। জাতিসংঘের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২১০০ সাল নাগাদ দেশটির অর্ধেক জনসংখ্যাই প্রবীণ হয়ে যেতে পারে। এই পরিস্থিতি কেবল চীনের অর্থনীতির জন্যে হুমকি নয়, সামরিক শক্তিতেও অন্যদের সমান হওয়ার যে লক্ষ্য সেটা তারা অর্জন করতে পারবে না।

চীন সরকার এখন বিয়ে এবং সন্তান জন্ম দেয়াকে জাতির ভবিষ্যতের জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে বিবেচনা করছেন। নতুন নীতির কঠোর বার্তা দিতে পহেলা জানুয়ারি থেকে দেশটিতে কনডম, পিল এবং সব ধরনের জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর ওপর ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে। সেইসাথে জন্মহার বাড়াতে চীনের স্থানীয় প্রশাসনগুলো নানান প্রলোভন দেখাচ্ছে। যেমন : কর ছাড়, বাড়ি কেনা বা ভাড়ায় আর্থিক সহায়তা, নগদ অর্থ প্রদান, মাতৃত্বকালীন ও পিতৃত্বকালীন ছুটি।

চীন সরকার ঘোষণা করেছে, ২০২৬ সালে হাসপাতালে সন্তান জন্মদানের যাবতীয় খরচ তারা বহন করবে। এ-ছাড়া শিশুর যত্ন ও প্রয়োজনীয় সেবাগুলো আরো সুগঠিত করবে। তিন বছর বয়সী শিশু রয়েছে এমন পরিবারগুলোর জন্যে বছরে তিন হাজার ছয়শ ইউয়ান নগদ বোনাস দেয়া হবে। পুরো বিষয়টি ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেছে। চীনের জনসংখ্যা সংকট নিয়ে সাংহাই ইউনিভার্সিটি অব ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইকোনমিকসের ডিশুইহু অ্যাডভান্সড ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউটের ডিন ইয়াও ইয়াং বলেন, আমরা যদি ২০ বছর আগে এই এক সন্তান নীতি পরিবর্তন করতাম, তবে পরিস্থিতি হয়তো এত খারাপ হতো না। এখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে।’

পাশ্চাত্যের মডেল অনুসরণ করলে এমন অবস্থাই হয়। পাশ্চাত্য প্রথমে নিজেদের পরিবার ও সমাজকে নষ্ট করেছে। তারা প্রচারণা চালাল যে, মানুষ হচ্ছে একটা ঝামেলা। মানুষ বাড়লে সম্পদ কমে যাবে। কষ্ট বেড়ে যাবে। তারা বলতে শুরু করল, ছোট পরিবার হচ্ছে সুখী পরিবার। পরিবার ছোট করতে করতে এখন তারা আর বিয়েই করে না। তাদের কী অবস্থা হলো?

সাম্প্রতিক সংবাদ হচ্ছে, ইতালির একটি গ্রামে ৩০ বছরে প্রথম একটি শিশু জন্মগ্রহণ করেছে! এ নিয়ে ব্যাপক হইচই।

জাপানের অবস্থাও ভয়াবহ। *জাপান টাইমস*-এর নিউজ হচ্ছে, '২০৫০ সাল নাগাদ আজকের কিশোররা এমন এক জাপানের উত্তরাধিকারী হবে, যেখানে প্রবীণ মানুষের সংখ্যা হবে নজিরবিহীন বেশি। যা এর আগে কোনো সমাজ দেখে নি। জাপানের জাতীয় জনসংখ্যা ও সামাজিক নিরাপত্তা গবেষণা ইনস্টিটিউটের হিসাব অনুযায়ী, ২০৫০ সালে সে দেশের জনসংখ্যা কমে দাঁড়াবে ১০ কোটি এবং বহু এলাকা কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হবে। মৌলিক সরকারি সেবা চালু রাখা মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে। অনেক হাসপাতাল, সেবাকেন্দ্র ও বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাবে। এমনকি পরিবার কাঠামো বদলে যাবে। একা বসবাসকারী প্রবীণ, বিশেষত নারীর সংখ্যা অনেক বাড়বে। সামাজিক বন্ধন দুর্বল হবে। অবকাঠামো জীর্ণ হবে। দুর্যোগ মোকাবেলার সক্ষমতাও কমে যাবে। সবচেয়ে ভয়ংকর হলো, ২১২০ সালে জাপানের অর্ধেক শহরই হারিয়ে যাবে।'

তারা এখন অনুভব করছে যে, জনশক্তির বিকল্প হয় না। আমরা আগে থেকেই জনশক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করে বলেছি, পরিবার বড় হতে হবে। ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ নির্মাণ এবং সুখী সমৃদ্ধ সফল জীবনের জন্যেই প্রয়োজন বড় পরিবার। অতএব সন্তান নেয়ার ব্যাপারে কোনো দ্বিধায় ভুগবেন না।

**প্রশ্ন :** গুরুজী, আপনি অধিক সন্তান নেয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন, কিন্তু সন্তান মানুষ করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এত খরচ কীভাবে সামলাব?

**উত্তর :** যদি অর্থ দিয়ে সন্তান মানুষ হতো, তাহলে ভালো মানুষ সব অভিজাত এলাকাগুলোতেই পাওয়া যেত। সন্তান মানুষ করা আর প্রচুর অর্থ থাকা, দুটো আলাদা বিষয়। শুধু অর্থ দিয়ে তো কখনো সন্তান মানুষ হয় না। আপনি খোঁজ নেন, যাদের অর্থ রয়েছে তাদের কয়জনের কয়টা সন্তান মানুষ হয়েছে আর কয়জন বখে গেছে।

সন্তান কীভাবে মানুষ হবে না হবে—সবই সৃষ্টিকর্তার পরিকল্পনায় থাকে। মা-বাবার মধ্য দিয়ে সন্তানকে পাঠিয়েছেন স্রষ্টা। অতএব এই ক্ষুদে মানুষটির চিন্তা স্রষ্টারও কম নয়। মা-বাবা যখন উদ্যোগী হয়, আল্লাহর রহমত তখন আরো বেশি পরিমাণে বর্ষিত হয়। ধরুন, গত ৩০ বছরে অনেক সচিব অবসর নিয়েছেন। তাদের কয়জন সচ্ছল বাবার সন্তান ছিলেন? একটু খোঁজ নিলেই দেখবেন, তাদের বেশিরভাগ এসেছেন একেবারে সাধারণ পরিবার থেকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের খবর নেন, অধিকাংশই সাধারণ পরিবার থেকে এসেছেন। প্রভু চাইলে একজন মানুষকে যে-কোনো জায়গা থেকে যে-কোনো উচ্চতায় তুলতে পারেন।

মনে রাখবেন, প্রত্যেকে নিজ নিজ রিজিক নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তার লালনপালন কীভাবে হবে সেটার দায়িত্ব আল্লাহর। আপনি শুধু চেষ্টার মালিক। আপনি অনেককিছু রেখে যেতে পারেন। ১০ তলা বিল্ডিং সন্তানকে লিখে দিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু তার যদি যোগ্যতা সৃষ্টি না হয় সেই বিল্ডিং বিক্রি করে টাকা উড়িয়ে দিয়ে ফতুর হতে তার খুব বেশি সময় লাগবে না। অথবা অন্যরা বেদখল করে ফেলতেও সময় লাগবে না। যদি যোগ্যতা তৈরি করতে পারে, সন্তান নিজেই সম্পদে পরিণত হবে। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখবেন, অনেক এতিম সন্তান অনেক বড় মানুষ হয়েছেন। আর্থিক প্রাচুর্য দূরের কথা, সে-রকম শক্তিমান কোনো অভিভাবকও তাদের ছিল না। অতএব অকারণে বেশি চিন্তা করবেন না।

**প্রশ্ন :** আমি দুই সন্তানের মা। একইসাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত। আরো সন্তান নেয়ার ব্যাপারে কিছুটা দ্বিধায় ভুগছি। এত সন্তানের দেখাশোনা এবং ক্যারিয়ারে অগ্রগতি কি একসাথে সম্ভব?

**উত্তর :** কোনোকিছু সম্ভব হবে কি হবে না, এটা নির্ভর করে মূলত মাইন্ডসেটের ওপর। সাফল্য বলেন, সুখী পরিবার গঠন বলেন আর সন্তান লালন বলেন, সবকিছুর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এই মাইন্ডসেট। মাইন্ডসেট যদি পজিটিভ থাকে, তাহলে আল্লাহর রহমত তার ওপর বর্ষিত হয়। সাধারণত আমাদের যে-কোনো অর্জনের অন্তরায় হচ্ছে নেতিবাচক মাইন্ডসেট। আগেই ভয় পেয়ে ভাবি যে, পারব কিনা, হবে কিনা, এটা সম্ভব না, ওটা সম্ভব না। আপনার আগে অনেকেই যা পেরেছে, আপনি কেন পারবেন না? অথবা কেউ যদি আগে না-ও পারে, আপনি কেন নতুন উদাহরণ সৃষ্টি করবেন না?

*সাইকোলজি টুডে* সাময়িকীর ৩ জুলাই ২০২৪ সালের রিপোর্ট হচ্ছে, ইতিবাচক বা ভালো ভাবনা ব্যক্তির মানসিক সক্ষমতা বাড়ায়। সেইসাথে যে-কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার সামর্থ্য বাড়ায় এবং আবেগীয় ভারসাম্য বজায় রাখে। মানুষ যখন ভালো ভাবে, তার সৃজনশীলতা বাড়ে এবং সমস্যা সমাধান করার দক্ষতা বাড়ে। ভালো ভাবলে এবং ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করলে যে-কোনো সমস্যা সমাধানের পথ সহজে বের হয়ে যায়।

সারা পৃথিবীতে অনেক দৃষ্টান্ত আছে যে, বেশি সন্তান মা-বাবার সাফল্যের পথে কখনো বাধা নয়। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখোঁ ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে বক্তব্য দিলেন, ‘প্লিজ প্রেজেন্ট মি দ্য লেডি হু ডিসাইডেড—বিয়িং পারফেক্টলি এডুকেটেড—টু হ্যাভ সেভেন এইট নাইন চিলড্রেন।’ এর কিছুদিনের মধ্যে ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন একজন নারী। তিনি জার্মানির প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন—উরসুলা ভন ডার লিয়েন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী মানে তো ডাকসাইটে মহিলা। তিনি চিকিৎসক ছিলেন এবং মেডিকেল কলেজে পড়াতেন, জনস্বাস্থ্যে উচ্চতর ডিগ্রিধারী। তার স্বামী স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ছিলেন। তাদের সন্তান সংখ্যা সাত! উরসুলা সাত সন্তানের মা হয়েও জার্মানির প্রতিরক্ষামন্ত্রী হয়েছেন, ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, তো বুঝতেই পারছেন!

বাংলাদেশে যারা সবচেয়ে বেশি চাপ দিয়েছে জনসংখ্যা কমানোর জন্যে সেই আমেরিকার দিকে যদি তাকাই, তাদের প্রেসিডেন্ট এবং অন্য সব ভিআইপিদের সন্তান সংখ্যা কত? ১৯৭৭-১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট ছিলেন জিমি কার্টার, যিনি তার শাসনামলে দরিদ্র দেশগুলোর জনসংখ্যা কমানোর জন্যে সবচেয়ে জোর দিয়েছিলেন, তার চার সন্তান। এর আগে প্রেসিডেন্ট ছিলেন জেরাল্ড ফোর্ড, চার সন্তানের পিতা।

জিমি কার্টারকে পরাজিত করে প্রেসিডেন্ট হন রোনাল্ড রিগান, তার পাঁচ সন্তান। রিগানের উত্তরসূরি সিনিয়র জর্জ বুশ, তিনি ছয় সন্তানের পিতা। জো বাইডেন, তার দুই ছেলে, দুই মেয়ে—চার সন্তান। প্রেসিডেন্ট বাইডেন হেরে গেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে, যার পাঁচ সন্তান। এটাও ইন্টারেস্টিং যে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট চার সন্তানের পিতা পরাজিত হয়েছে পাঁচ বা ছয় সন্তানের পিতার কাছে।

ব্রিটেনের রানি এলিজাবেথ, তারও চার সন্তান। ফ্রান্সের সাবেক প্রেসিডেন্ট ফ্রঁসোয়া ওলঁদ এবং তার আগের প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সার্কোজি, দুজনেরই চারটি করে সন্তান। ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন স্পষ্ট করে জানান নি যে, তার কয়টা সন্তান। তবে এখন পর্যন্ত তার নয় সন্তানের খোঁজ পাওয়া গেছে! তার পূর্বসুরি দুই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার এবং ডেভিড ক্যামেরন প্রত্যেকেরই চার সন্তান।

এটা তো পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রনায়কদের অবস্থা; আবার যদি তাদের বিভিন্ন অঙ্গনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের দেখি, তারা কিন্তু সবসময় বেশি সন্তান নেন। কারণ তারা বোঝে যে, জনসংখ্যাই শক্তি। বিল গেটস এত দাবি করেন যে, পৃথিবী জনসংখ্যার ভারে আক্রান্ত, তারও তিন সন্তান। স্টিভ জবস, তার চার

সন্তান। ওয়ারেন বাফেটের তিন সন্তান। বিশ্বের শীর্ষ ধনীদের একজন জেফ বেজোস, তার চার সন্তান। এখনকার শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ক, তার ১৪ সন্তান!

পাশ্চাত্যের বিনোদন তারকাদের দিকে যদি তাকাই, হলিউডের সবচেয়ে নামি পরিচালক স্পিলবার্গ, যার ছয় সন্তান। অস্কারের জন্যে ২১ বার মনোনয়নপ্রাপ্ত অভিনেত্রী মেরিল স্ট্রিপ চার সন্তানের জননী। একসময়ের পাওয়ার কাপল ব্র্যাড পিট এবং অ্যাঞ্জেলিনা জোলি, তাদের চার সন্তান। আমেরিকার পপ সম্রাজ্ঞী বলা হয় ম্যাডোনাকে, তার ছয় সন্তান।

ক্রীড়া-তারকাদের কী অবস্থা? খ্যাতনামা সাঁতারু মাইকেল ফেলপস, তার চার সন্তান। আমেরিকার বিখ্যাত বাস্কেটবল খেলোয়াড় মাইকেল জর্ডানের পাঁচ সন্তান। কিংবদন্তী বক্সার মোহাম্মদ আলীর নয় সন্তান! ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর পাঁচ সন্তান। কোয়ান্টামের ফর্মুলা দেখা যাচ্ছে তারাই অনুসরণ করছে, যারা অন্যদের দেশে জনসংখ্যা কমাতে বলে! তারা কিন্তু নিজেদেরটা বাড়াচ্ছে। কারণ তারা জানে, সন্তান হচ্ছে সম্পদ।

যাদের কথা উল্লেখ করলাম, তারা সবাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। আমরা বিশ্বাস করি, সন্তান কখনো কারো সাফল্যের পথে অন্তরায় নয়। তবে এজন্যে জরুরি হচ্ছে পজিটিভ মাইন্ডসেট। কারণ সন্তান নেবেন কিনা বা কয়টা নেবেন, সন্তান নিয়ে সবকিছু ম্যানেজ করতে পারবেন কিনা, এগুলো স্রষ্টার রহমতের পাশাপাশি নিজেদের মাইন্ডসেট, ইচ্ছা এবং আপনার দৃষ্টিভঙ্গির ওপরেও নির্ভর করে।

অতএব সবসময় ইতিবাচক থাকবেন—সেটা হোক বিয়ে, সন্তান ও পারিবারিক ব্যাপারে অথবা অন্য যে-কোনো কাজের ব্যাপারে। মনে কখনো কোনো নেতিবাচক ভাবনা আসতে দেবেন না। নিয়ত ঠিক থাকলে আল্লাহ আপনাকে ঠিকই সুযোগ বের করে দেবেন। দেখা যাবে যে, ভালো মানের ডে কেয়ার সেন্টার থেকে শুরু করে সব ধরনের সুবিধা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আপনি শুধু কাজের অংশ হোন, প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকুন। কাজ করে গেলে অগ্রগতি নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না, সর্বশক্তিমান আল্লাহই সেটা দেখবেন। যখন আপনি আল্লাহর রহমতের ওপরে নির্ভর করবেন, দেখবেন তিনি দায়িত্ব নিয়ে নিচ্ছেন। আল্লাহ চাইলে সবই সহজ হয়ে যায়।

**প্রশ্ন :** এখনকার মেয়েরা দুইয়ের বেশি সন্তান নিতে ইচ্ছুক নয়। তাদেরকে কীভাবে বোঝানো যাবে? যারা সচ্ছল এবং সুস্থ পুরুষ, তাদের বেশি সন্তান নেয়ার ক্ষেত্রে কী করণীয়? এটা যদিও স্পর্শকাতর একটা প্রশ্ন, তারপরও অনেকের পক্ষ থেকে সাহস করে করলাম।

**উত্তর :** আপনি কি ভাবছেন যে, আরো সন্তানের জন্যে আমি আপনাকে আরেকটা বিয়ে করতে বলব? সেই সম্ভাবনা নেই। কারণ আমি আপনার শত্রু নই যে, ঘরে আগুন লাগাতে যাব! স্ত্রীকে বোঝাবেন বেশি সন্তান নেয়ার গুরুত্ব। যত মিষ্টি করে পারেন, স্ত্রীকে উদ্বুদ্ধ করবেন। এমনভাবে বলবেন যেন তিনি নিজেই অধিক সন্তান নিতে আগ্রহী হন।

সন্তানের ব্যাপারে একটা পয়েন্ট আবারও পরিষ্কার করে বলি। কারো জীবনে যদি অনেক বড় কোনো নেয়ামত থাকে সেটা হচ্ছে সুসন্তান। শুধু দুনিয়ার জীবনে নয়, পরকালের জন্যেও সুসন্তান একটা আশীর্বাদ। কারণ সুসন্তানের ভালো কাজের পুণ্য সে নিজে তো পাবেই, তার মা-বাবাও সেই পুণ্য পেতে থাকবে।

নবীজীর (স) সাত সন্তান—তিন ছেলে, চার মেয়ে। তিনি জনশক্তির গুরুত্ব বিবেচনা করে মদিনায় রাষ্ট্র নির্মাণের শুরু থেকেই বড় পরিবার গঠনে উৎসাহিত করতেন। মাকিল ইবনে ইয়াসর (রা) বর্ণিত সুনান আবু দাউদ শরীফের সহীহ হাদীস হচ্ছে, 'রসুলুল্লাহর (স) কাছে একজন এসে বলল, আমি এক নারীর খোঁজ পেয়েছি। সে উচ্চবংশীয়া এবং রূপবতী, কিন্তু গর্ভধারণে অক্ষম। আমার কি তাকে বিয়ে করা উচিত? রসুলুল্লাহ (স) বললেন যে, না। কিছুদিন পর লোকটি এসে একই প্রশ্ন করলে তাকে এই বিয়ে করতে নিষেধ করলেন তিনি। লোকটি তৃতীয় বার একই প্রস্তাব নিয়ে এলে রসুলুল্লাহ (স) বললেন, তোমরা এমন নারীকে বিয়ে করবে, যারা তোমাদের ভালবাসবে এবং তাদের গর্ভে তোমাদের সন্তানধারণ করবে। কেননা অন্য উম্মতের চেয়ে বিপুল সংখ্যা থাকাটাই তোমাদের সাফল্যের কারণ হবে।'

নবীজীর (স) এই নির্দেশ পালনে সাহাবী, তাবেঈ, তাবে তাবেঈনরা যথেষ্ট আন্তরিক ছিলেন। ফলে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটল সেই সমাজে এবং রাজনীতি ও জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে দুইশ বছরের জন্যে পৃথিবীতে ছিল তাদেরই সুসন্তানদের আধিপত্য। অর্থাৎ সপ্তম থেকে নবম শতাব্দী পর্যন্ত বৈশ্বিক রাজনীতি এবং জ্ঞানচর্চা, উভয় ক্ষেত্রেই আরবরা একচ্ছত্র অধিপতি ছিল। সারা পৃথিবীতে তারা ছড়িয়ে পড়েছিল। আসলে একটা বড় সভ্যতার উত্থানের জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে বিপুল জনশক্তি।

অতএব যাদেরই সন্তান নেয়ার বয়স ও শারীরিক-মানসিক সক্ষমতা আছে তারা কমপক্ষে চার সন্তান নিয়ে নেবেন, যাতে পরিবারটা ভালো বোঝাপড়ার মধ্যে থাকে। এই বাণীটা সবার কাছে আমরা পৌঁছে দিতে চাই যে, মহান জাতি হওয়ার জন্যে জনশক্তি হচ্ছে বড় শক্তি। স্বর্গভূমি বাংলাদেশ গড়ার জন্যে আমাদের প্রচুর মানুষ দরকার—দক্ষ মানুষ, যোগ্য মানুষ, যারা

সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং মানুষের সেবা করবে। এ কথাগুলো বলে আপনার স্ত্রীকে সুন্দর ভাষায় উদ্বুদ্ধ করলে নিশ্চয়ই রাজি হবেন, যদি তিনি সুস্থ সক্ষম হন। আগে নিজের চাওয়াটাকে জোরদার করুন।

**প্রশ্ন :** আমার তিন সন্তানকে সাথে নিয়ে আমি নিয়মিত মেডিটেশন থেকে শুরু করে সবকিছুই করতে পারি আলহামদুলিল্লাহ। এখন আমার ৪০ বছর বয়সে চতুর্থ সন্তানের গর্বিত মা হতে চাচ্ছি। দোয়া এবং পরামর্শ চাই।

**উত্তর :** তিন সন্তান সামলেও কোনো বিরক্তি নেই এবং সবই করতে পারছেন, আলহামদুলিল্লাহ। দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক হলে চারপাশের সবই আসলে পজিটিভ থাকে। দেখা যায় যে, তিন সন্তান নিজেরাই একটা গ্রুপ হয়ে পরস্পরকে দেখে রাখছে। এখন চতুর্থ সন্তানের চাওয়াটা আল্লাহ কবুল করুন।

চতুর্থ সন্তানের জন্যে এটা খুব একটা বেশি বয়স বলা যায় না। আপনি বরং চতুর্থ বারের পরও যদি সন্তানের মা হতে চান, আমাদের দোয়া থাকবে। কারণ আমরা যে অভাবে ভুগছি সেটা হচ্ছে সুসন্তান, ভালো মানুষ। আমরা সবাই দোয়া করি যেন আপনার সন্তান মেধাবী সুস্থ এবং ভালো মানুষ হয়।

এই সময়টাতে আমরা আমাদের সামর্থ্যবানদেরকে সন্তান নেয়ার জন্যে বেশি উৎসাহিত করছি কেন? কারণ আমাদের দক্ষ এবং ভালো মানুষের একটা বিস্ফোরণ দরকার। তাছাড়া একেকটা সময় আসে ঘুরে দাঁড়ানোর সময়। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখবেন যে, প্রত্যেক জাতির ইতিহাসে একটা সময় মেধার বিচ্ছুরণ ঘটে। অর্থাৎ জাতির সবচেয়ে কীর্তিমান মেধাবীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ কাছাকাছি সময় জন্মগ্রহণ করে।

২০০৮ সালে আমেরিকান লেখক ম্যালকম গ্ল্যাডওয়েল তার *আউটলায়ার্স : দ্য স্টোরি অব সাকসেস* বইতে গত চার হাজার বছরের মানব ইতিহাসে সবচেয়ে ধনী ৭৫ জন মানুষের একটা তালিকা করেন। এতে একটা বিস্ময়কর ব্যাপার দেখা গেল যে, ৭৫ জনের মধ্যে ১৪ জন আমেরিকান, যাদের জন্ম হয়েছে ১৯ শতকের মাঝামাঝি, ১৮৩১-১৮৪০ সালের মধ্যে। অর্থাৎ ধনকুবেরদের সেই তালিকার ২০ শতাংশ মানুষ একটি দেশের এবং একই প্রজন্মের! এই তালিকায় আছেন এন্ড্রু কার্নেগি, জন্ম ১৮৩৫ সালে। জে পি মরগান ১৮৩৭ সালে। জন ডি রকফেলার ১৮৩৯ সালে। বাকি ১১ জনের জন্ম মাত্র নয় বছরের ব্যবধানে।

মধ্যযুগ থেকে বিশ্ব অর্থনীতি যেভাবে পরিচালিত হয়েছিল তার আমূল পরিবর্তন ঘটে ১৮৬০-১৮৭০ দশকে। আবিষ্কারের বিপ্লব শুরু হয় এই সময়,

যার নেতৃত্ব দেয় আমেরিকা। কারণ আবিষ্কারের দিক থেকে ইউরোপ এগিয়ে থাকতে পারল না। আবিষ্কার এবং প্রযুক্তির দিক থেকে আমেরিকানরা এগিয়ে গেল এবং সেই পালাবদলের সময়কে যেহেতু আমেরিকা নেতৃত্ব দিয়েছে, তারা সময়টাকে কাজে লাগিয়েছে, তাই পরবর্তীকালে তাদের হাতে চলে গেছে সারা দুনিয়ার অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ।

এ-ছাড়া তথ্য-প্রযুক্তি খাতে যারা সারা পৃথিবীকে শাসন করছে তাদের যদি দেখি, মাইক্রোসফট-এর প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস, জন্ম ১৯৫৫ সাল। অ্যাপেল-এর প্রতিষ্ঠাতা স্টিভ জবস, জন্ম ১৯৫৫। গুগলের প্রথম সিইও এরিক স্মিথ, জন্ম ১৯৫৫। সান মাইক্রোসিস্টেমের প্রতিষ্ঠাতা বিল জোয়া, জন্ম ১৯৫৪। অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোস, জন্ম ১৯৬৪। ডেল কম্পিউটারের প্রতিষ্ঠাতা মাইকেল ডেল, জন্ম ১৯৬৫। একই টাইমস্প্যানে এদের জন্ম এবং এরাই বর্তমানে সারা পৃথিবীর কর্ণধার।

আবার উনবিংশ শতাব্দীর দিকে তাকালে দেখি যে, বাঙালি নবজাগরণে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন, সামাজিক সাংস্কৃতিক বুদ্ধিবৃত্তিক শৈল্পিক যে উত্থান ঘটেছে তারাও কাছাকাছি সময়ের। যেমন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জন্ম ১৮২০। ইতিহাসবিদ অক্ষয় কুমার দত্ত, জন্ম ১৮২০। শিক্ষাবিদ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, জন্ম ১৮২২। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, জন্ম ১৮২৪। রাজ নারায়ণ বসু, জন্ম ১৮২৬। সমাজ-সংস্কারক ভূদেব মুখোপাধ্যায়, জন্ম ১৮২৭। এটা তো হলো প্রথম পর্ব।

দ্বিতীয় পর্ব হচ্ছে, চর্যাপদের আবিষ্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, জন্ম ১৮৫৩। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু, জন্ম ১৮৫৮। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জন্ম ১৮৬১। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, জন্ম ১৮৬১। স্বামী বিবেকানন্দ, জন্ম ১৮৬৩। উপেন্দ্রকিশোর রায়, জন্ম ১৮৬৩। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখার্জী, জন্ম ১৮৬৪। বাংলা সাহিত্যে চলিত গদ্যরীতির প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী, জন্ম ১৮৬৬।

আবার ১৮৮০ আরেকটা টাইম পিরিয়ড। মোহাম্মদ আলী, শওকত আলী ভাতৃদ্বয়ের মধ্যে শওকত আলীর জন্ম ১৮৭৩, মোহাম্মদ আলীর জন্ম ১৮৭৮। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, জন্ম ১৮৮০। কামাল আতাতুর্ক, জন্ম ১৮৮১। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, জন্ম ১৮৭৬। মোহাম্মদ ইকবাল, জন্ম ১৮৭৭। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, জন্ম ১৮৭৩। ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, জন্ম ১৮৮৫। খাজা ইউনুস আলী, জন্ম ১৮৮৬। শাব্বির আহমদ ওসমানি, জন্ম ১৮৮৬। বাঙালি মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, জন্ম ১৮৮০।

অর্থাৎ একেকটা টাইম পিরিয়ড আসে, যখন একসাথে অনেক জিনিয়াসের আগমন ঘটে। এই ধারাবাহিকতায় এখন আমরা আরেকটা সুন্দর সময়ের আশাবাদ ব্যক্ত করছি, যখন সব জিনিয়াসরা জন্ম নেবে, যারা আমাদের দেশকে শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান গবেষণা সবক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবে।

অতএব যাদের সুযোগ আছে, এই সুযোগটা কাজে লাগাবেন। যাদের নিজেদের সন্তান নেয়ার আর সুযোগ নেই, তাদের কর্তব্য হবে ছেলেমেয়ে এবং নাতি-নাতনিদেরকে উৎসাহিত করা এবং তাদের জন্যে দোয়া করা। এতে জাতির এবং সমাজের অনেক উপকার হবে।

**প্রশ্ন :** সম্প্রতি আমার এক মেয়ে কলিগ বিয়ে করেছে ৩০ বছর বয়সে। সে অসুস্থ শুনে আমি তার খোঁজ নিলাম যে, কোনো সুখবর কিনা? সে উত্তরে বলল, দোয়া করেন যেন আগামী তিন বছরে সন্তান না হয়। এখন অনেকেই বিয়ের প্রথম দুই-তিন বছর নিজের মতো থাকতে চায়। দীর্ঘসময় হানিমুন মুডে থাকে বলে তারা সন্তান নিতে দেরি করে। বেশ কয়েকবার কক্সবাজার এবং দেশের নানান রিসোর্টে আর অন্তত একবার দেশের বাইরে ঘুরতে যাওয়া হলো মিনিমাম কাপল গোল, ম্যাক্সিমাম যত পারা যায়। এটার জন্যে আবার ঋণের ব্যবস্থাও আছে। আরেকটা গ্রুপ আছে, যারা কাঙ্ক্ষিত চাকরি না হওয়া পর্যন্ত সন্তান নিতে চায় না। অনেকে বিদেশে চলে যেতে চায়। যতদিন সেই লক্ষ্য পূরণ হচ্ছে না ততদিন সন্তান নিতে চায় না। আরেকটা গ্রুপ প্রথম সন্তান নেয়ার অনেক বছর পরও দ্বিতীয় সন্তান নেয় না। কারণ চাকরি সামলে সন্তান লালনে যে চ্যালেঞ্জ ভোগ করছে তারপর আর সাহস করে না। এই বিরতি দিতে গিয়ে আমার দুজন বান্ধবীর আর সন্তানই হচ্ছে না। এগুলো তো বাস্তবতা। তাদেরকে কী বলা উচিত? আপনার মতামত কী?

**উত্তর :** হানিমুন মুড নষ্ট হবে বলে সন্তান নিতে না চাওয়াটা যে কত বড় ভুল দৃষ্টিভঙ্গি—এটা তারাই বেশি বুঝবেন, যাদের অনেক চেষ্টার পরও সন্তান হচ্ছে না। আবার যারা এক সন্তান নিয়ে দ্বিতীয় সন্তান নিতে ভয় পায়, এরাও হতভাগা। কারণ এই এক সন্তান সবসময় নিজেকে অনিরাপদ ও অবহেলিত মনে করে, এর মা-বাবাও তাকে নিয়ে আতঙ্কিত থাকে। আবার যারা মনে করেন আগে চাকরি পাই, ঘুরে বেড়াই বা বিদেশে সেটেল হই, তারপর সন্তান নেব, তারাও অত্যন্ত হতভাগা।

বিয়ে মানে তো পরিবার গঠন করা। বিয়ের মধ্য দিয়ে পরিবার অর্থাৎ একটা টিম তৈরি করতে পারাটাই সার্থকতা। এতে মানুষ সুখী হয়। বিয়ে তো

শুধু স্বামী-স্ত্রী বা টোনাটুনির সম্পর্ক নয়। বিয়েকে যদি স্বামী-স্ত্রীর লিভ টুগেদার মনে করা হয়, তাহলে সেখানে দীর্ঘমেয়াদে সুখ আসে না। এ বিষয়ে নানান প্রশ্নের উত্তর পেতে পারেন আমাদের *বন্ধুত্ব প্রেম বিয়ে* বইটা পড়লে এবং আপনাকে কেউ প্রশ্ন করলেও লজিক্যাল উত্তর দিতে পারবেন।

সন্তান নেয়ার ব্যাপারে নেতিবাচক মাইন্ডসেট যাদের থাকে, পরবর্তীকালে দেখা যায় তাদের অনেকেরই আর সন্তান হয় না। কারণ মাইন্ড নেগেটিভলি সেট হয়ে গেছে। তখন 'নো চাইল্ড মুড' অটোমেটেড হয়ে যায়। ফলে সন্তানহীনতার কষ্ট মেনে নিতে না পেরে ছোটাছুটি করে চিকিৎসকের পেছনে, নিতে চায় টেস্টটিউব বেবি। তখন হানি আর মুন থাকে না, হানিটা সান হয়ে যায়। কারো কারো ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদও হয়ে যায়। যারা একটু ডেসপারেট তারা ছাড়াছাড়িতে চলে যায়, আর অন্যরা কোনোরকমে দাম্পত্য জীবন পার করে। কারণ দুজনের পারস্পরিক আকর্ষণ আর কয়দিন থাকে?

সম্পর্কের মধ্যে তো বৈচিত্র্য থাকতে হয়, নয়তো একটা সময় বিরক্তি চলে আসে। ছেলেমেয়ে এবং পরিবারের অন্যান্যরা হচ্ছে এই বৈচিত্র্য। সন্তান হচ্ছে একটা সুন্দর বন্ধন। পর পর কয়েকটা সন্তান হয়ে গেলে তখন একটা মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে মানুষ, যেটা তাকে সুস্থ রাখে, ভালো রাখে। মায়া এবং দায়িত্ববোধ বেড়ে যাওয়ার ফলে স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনটাও সুদৃঢ় হয়।

এজন্যে যখন যা করা উচিত, সেটা করে ফেলতে হয়। কাঙ্ক্ষিত চাকরি পাওয়ার চিন্তা বা চাকরি সামলে সন্তান লালনের চ্যালেঞ্জ সবই ঠিক আছে, কিন্তু সুখী হতে হলে অবশ্যই ব্যালেন্স করতে হবে। ব্যালেন্স করতে পারাটা একটা আর্ট। পরিবারে ঝামেলা থাকবে, চ্যালেঞ্জ থাকবে। তা সামলাতে গিয়ে মানুষ বরং দক্ষ হয়ে ওঠে। ম্যানেজমেন্টের আর্টটা শিখে ফেলতে পারলে সে তখন সবই পারে। যে পরিবারকে সুন্দরভাবে সামলাতে পারে, সে অফিসও সামলাতে পারে, সমাজকেও সামলাতে পারে।

অতএব কেউ এমন হতভাগা হবেন না। বিয়ের পরে হানিমুন মুডে চলে যাবেন না। সন্তানকে সবসময় কাঙ্ক্ষিত মনে করবেন। প্রস্তুতি বা পরিকল্পনার আগেই কোনো কারণে সন্তান গর্ভে চলে এলে এবং তাকে মেনে নিতে না পারলে সেটার প্রভাব আরো ভয়াবহ হতে পারে। কারণ একটা অনাকাঙ্ক্ষিত শিশুর ডিএনএ-র মধ্যে মা-বাবার নেতিবাচক ভাবনাটা ট্রান্সমিটেড হয়ে যায়। সে নিজেকে পরবাসী মনে করে এবং বড় হয়ে সে মা-বাবাকেও আপন ভাবতে পারে না। কারণ তাকে সাদরে চাওয়া হয় নি। এরকম অনাকাঙ্ক্ষিত শিশুর ভেতর একধরনের অনিশ্চয়তাবোধ এবং হীনম্মন্যতা থেকে যায়, সে যতই বড় হোক না কেন।

এজন্যে দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক রাখাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সন্তান না হলে, আল্লাহ না দিলে আলাদা ব্যাপার। কিন্তু সন্তান না চাওয়ার মতো বোকামি কেউ করবেন না। বরং বিয়ের পর সন্তান যত দ্রুত হয় তত তাড়াতাড়ি আপনি সেটেলড হয়ে গেলেন। অন্তত চার সন্তান হয়ে গেলে পরিবার গোছানো হয়ে গেল। এরপর যত ইচ্ছা ঘুরতে পারেন। সন্তান নিয়ে হানিমুন করবেন। এতে হানিমুনের আলাদা আনন্দ হবে। সুখ বাড়বে পরিবারে। কারণ বিয়ের পর সন্তান হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার পারস্পরিক সংযোগ, বন্ধন এবং মমতা বাড়ানোর একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। অতএব কোনো অজুহাতে সন্তান নিতে দেরি করা উচিত নয়।

**প্রশ্ন :** বিয়ের পরে বাচ্চা নেয়ার সংখ্যা প্রসঙ্গে আমাকে এক বন্ধু জিজ্ঞেস করায় আমি বলেছিলাম, পাঁচ-ছয় সন্তান না হলে তো আমার মনই ভরবে না। সে এবং আমার অন্য বন্ধুরা মিলে বলল, তুই একটা আস্ত ছোটলোক। আপনার আলোচনা থেকে বুঝলাম, আমি আসলে বড়লোক। প্রশ্ন হলো, কীভাবে তাদেরকে বোঝাব যে, আমি মোটেই ছোটলোক নই?

**উত্তর :** এখন কাউকে কিছু বোঝাতে যাওয়ার দরকার নেই। আপনি পাঁচ-ছয় সন্তানের বাবা হয়ে তাদেরকে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলুন। বাকিটা তারা সময়ের সাথে সাথে নিজেরাই বুঝে নেবে।

**প্রশ্ন :** গুরুজী, আপনি যে বলেন, সন্তান বেশি হতে হবে, জনসংখ্যার বিস্ফোরণ দরকার। অধিক জনসংখ্যা কি আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করবে না? আমাদের ছোট দেশ কি ভারসাম্য হারাবে না? বিষয়টা নিয়ে বিস্তারিত বলবেন প্লিজ।

**উত্তর :** আমরা সবসময় দায়িত্ব নিয়েই বলেছি যে, জনসংখ্যার বিস্ফোরণ দরকার। কারণ গ্রেট নেশন কিংবা পরাশক্তি হিসেবে যে-কোনো জাতির উত্থানের পূর্বশর্ত হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি। ইতিহাস এটাই বলে যে, প্রত্যেকটা সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে তখনকার পপুলেশন বুম থেকে।

আমরা ইউরোপের উত্থান এবং পতনের ইতিহাস যদি দেখি, এর পেছনেও আছে জনসংখ্যার ভূমিকা। ষোড়শ শতক থেকে ইউরোপের উত্থান শুরু। ১৬ শতাব্দীতে বিশ্ব জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ ছিল ইউরোপিয়ান। ১৭ শতাব্দীতে ২০ শতাংশ, ১৮ শতাব্দীতে ২৫ শতাংশ এবং ১৯ শতাব্দীতে বিশ্ব

জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ ছিল ইউরোপিয়ান। ১৮ শতাব্দীতে বিশ্ব জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ নিয়ে ইউরোপ ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান ভূখণ্ড। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সারা পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করেছে তারা।

ইউরোপে যখন পপুলেশন বুম হলো, তাদের কী অবস্থা হলো? ১৫৫০ সালে ইংল্যান্ডের জনসংখ্যা ছিল ৩০ লাখ। ১৬০০ সালে হলো ৪০ লাখ। দ্রুত জনসংখ্যা বাড়ার কারণে সেখানে বেকারত্ব বেড়ে গেল। ফলে সুযোগের সন্ধানে, খাবারের সন্ধানে তারা বেরিয়ে পড়ল। ইউরোপের বিপুল জনশক্তি ছড়িয়ে পড়ল সারাবিশ্বে।

সেই সময় বিশেষ করে হল্যান্ডের জনসংখ্যা ১৪৪ শতাংশ বেড়ে গেল। এর একশ বছরের মধ্যে তারা বিশ্ববাণিজ্যে পরাশক্তিতে রূপান্তরিত হলো। রাশিয়ার উপকূল, ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণ আমেরিকা, গায়ানা, ব্রাজিল, বাংলা, সবখানে তারা বাণিজ্যঘাঁটি স্থাপন করল।

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয় ১৬ শতাব্দীতে। ১৬০৩ সালে জাভায় বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে ব্রিটিশরা। ১৬০৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়াতে প্রথম ইংরেজ জনবসতি হয়। ১৬১২ সালে গুজরাটের সুরাটে ব্রিটিশ বাণিজ্যকুঠি। ১৬২৭ সালে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে এবং ১৬৩৩ সালে বাংলায় বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে ইংরেজরা। ১৬৩৯ সালে তারা মাদ্রাজে বিশাল দুর্গ গড়ে তোলে। ১৬৬১ সালে তারা আফ্রিকায় প্রথম ঘাঁটি গাড়ে।

এই সময়কালে জার্মানি, ইতালি, ফ্রান্স, স্পেনে জনসংখ্যা কমে গেল। জনসংখ্যা কমে যাওয়ার ফলে এই দেশগুলো উপনিবেশ গড়ার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ল। অর্থাৎ অন্যদেরকে পেছনে ফেলে সারাবিশ্বে পরাশক্তি হিসেবে ইংরেজদের আবির্ভূত হওয়ার প্রধান কারণ ছিল জনশক্তি।

ইউরোপে ওই সময় জনসংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি ঔপনিবেশবাদের জন্যে তাদের নিজেদের একটা স্ট্র্যাটেজি ছিল, সেটা হলো ডিপপুলেশন। ইউরোপিয়ানরা যেখানে গেছে তারা সেখানকার জনসংখ্যা ধ্বংস করে দিয়েছে। কারণ কাউকে পদানত করতে হলে প্রথমে সেই এলাকার জনসংখ্যা কমাতে হবে। সেটা সম্ভব না হলে তাদের নিজস্ব অবকাঠামো ও জ্ঞানচর্চার ঐতিহ্য ধ্বংস করে দিতে হবে এবং স্থানীয় জনগণের মনোবল দুর্বল করে দিতে হবে, যাতে ওখানকার নেটিভদের মধ্যে হীনম্মন্যতা তৈরি হয়।

এটা জার্মান সমর বিশারদ ক্লাউজেভিটজের (Carl von Clausewitz) যুদ্ধনীতি ছিল—শত্রুকে পুরোপুরি ধ্বংস করতে হবে। এই নীতি দ্বারা প্রভাবিত ছিল ইউরোপিয়ান জেনারেলরা। যে-কোনো দেশ দখল করলে সেই দেশের শুধু সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করলে হবে না, অধিবাসীদেরও নিশ্চিহ্ন

করতে হবে। কারণ সেখানে জনসংখ্যা বেশি থাকলে তাদেরকে পদানত করা খুব কঠিন। তাই শত্রুর এই জনশক্তি কমাতে হবে।

২০১৯ সালে ব্রিটিশ গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রতিবেদন ছাপানো হয় যে, European colonization of Americas killed so many, it cooled Earth's climate. আমেরিকাতে ইউরোপের উপনিবেশ স্থাপনের পর ইউরোপিয়ানরা এত মানুষ মেরেছিল যে, সমস্তটাই বিরানভূমিতে পরিণত হয়। এই প্রতিবেদনে বলা হয়, ইউনিভার্সিটি কলেজ অব লন্ডনের বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে জানিয়েছেন ইউরোপিয়রা উত্তর ও মধ্য আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনের পর সেখানকার সাড়ে পাঁচ কোটি আদিবাসী (রেড ইন্ডিয়ান) মানুষকে হত্যা করে।

ক্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকায় পৌঁছানোর একশ বছরের মাথায় আমেরিকার জনসংখ্যা ৯০ শতাংশ কমে যায়। প্রতি ১০ জনের মধ্যে নয় জন আদিবাসীকে হত্যা করা হয়। ফলে বিশাল আয়তনের কৃষিজমি বিরান হয়ে পড়ে। ব্রিটিশরা অস্ট্রেলিয়া দখল করার পরে সেখানে ৫০-৭০ শতাংশ আদিবাসীকে মেরে ফেলে। ১৭৮৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী সংখ্যা ছিল সাত লাখ। সেখান থেকে আদিবাসীদের সংখ্যা মাত্র ৯০ হাজারে নেমে আসে ১৯০১ সালে, মাত্র ১১২ বছরের ব্যবধানে।

আফ্রিকাতেও একই অবস্থা। নামিবিয়ার হেরেরো জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল এক লাখ। ১৮৮৪ সালে জার্মানরা তাদের এলাকা দখল করে এবং নির্বিচারে গণহত্যা শুরু করে। প্রতি চার জনের একজনকে হত্যা করে জার্মানরা। ২০ বছরের মাথায় হেরেরো জনগোষ্ঠীর সংখ্যা এক লাখ থেকে ২৫ হাজারে নেমে আসে। কঙ্গোতে গিয়েও তারা অর্ধেক মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে।

বাংলাতে কী করেছিল? ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (বাংলা ১১৭৬, ইংরেজি ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে) সৃষ্টি করল, এতে তিন কোটি মানুষের মধ্যে এক কোটি মানুষ না খেয়ে মারা যায়। অর্থাৎ বাংলার এক-তৃতীয়াংশ মানুষকে তারা মেরে ফেলল। এভাবে ইউরোপিয়ানরা নিজেদের জনসংখ্যা বাড়ানোর সাথে সাথে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে দখলকৃত দেশের জনসংখ্যা কমাল। কারণ তারা জানে যে, জনসংখ্যা হচ্ছে একটা বিশাল শক্তি।

অথচ জনসংখ্যার গুরুত্ব আমরা বোঝার চেষ্টা করি না। আমরা চিন্তা করি, জনসংখ্যার ভারে অর্থনীতি ভারসাম্য হারাবে বা অর্থনৈতিক উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করবে। এই চিন্তাটার পেছনে আছে সাম্রাজ্যবাদীদের কূটচাল, সেটা ভালোভাবে বুঝতে হবে। ১৯৬০-এর দশকে যারা পৃথিবীর শাসক ছিল, তারা দেখল যে, আগামী বিশ্বে রাজত্ব করার জন্যে দক্ষ এবং বড় জনসংখ্যা

হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। আর তাদের হিসাব অনুযায়ী, এশিয়ার এই প্রান্তে অর্থাৎ ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া চীন—এসব দেশে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটবে।

তাই তাদের পলিসি ছিল যে, এশিয়ার এই দেশগুলোর জনশক্তি কমাতে হবে। যদি কমানো না যায়, ডেমোগ্রাফির নিয়ম অনুসারে এই জনগোষ্ঠীই আগামীতে সারা পৃথিবীতে কর্তৃত্ব করবে। আগের মতো দখল করে হত্যা করার চেয়ে তারা বরং উদ্বুদ্ধ করল যে, তোমাদের জনসংখ্যা তোমরাই কমাও। এ লক্ষ্যে ১৯৭০-এর দশক থেকে প্রচারণা শুরু হলো, জনসংখ্যা তোমাদের এক নম্বর সমস্যা, তোমাদের উন্নতির পথে বাধা।

আমরাও মনে করলাম, পাশ্চাত্যের জ্ঞানীদের প্রেসক্রিপশন মেনে চললেই আমাদের কল্যাণ হবে। আমরা বুঝি না যে, তাদের প্রেসক্রিপশন তাদের জন্যে একরকম, আমাদের জন্যে আরেকরকম। এটা তো আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, তারা পরামর্শ দিয়েছে তাদের স্বার্থ রক্ষায়, আমাদের স্বার্থে নয়। মূলত আমাদেরকে দাবিয়ে রাখার কৌশল স্বরূপ তারা জনসংখ্যাকে আমাদের উন্নতির পথে বাধা হিসেবে দেখিয়েছে।

উত্থানের মতো ইউরোপের পতনের পেছনেও আছে জনসংখ্যার ভূমিকা। ১৯৫০ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের জনসংখ্যা কমে দাঁড়াল ২০-২২ শতাংশ এবং ২১ শতকে এসে বিশ্ব জনসংখ্যার মাত্র ১০ শতাংশ হচ্ছে ইউরোপের জনসংখ্যা। ফলে শক্তি হিসেবে ইউরোপ এখন পৃথিবীর কোথাও কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে আস্তে আস্তে আমেরিকা এবং তারপরে জাপানের উত্থান ঘটল শক্তি হিসেবে। কারণ পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম দক্ষ জনশক্তির মালিক হচ্ছে আমেরিকা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের চেয়েও বেশি জনসংখ্যার জোরেই তারা এক নম্বর অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। তারা পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চল থেকে পাঁচ কোটি মানুষ নিয়ে গেছে অভিবাসী হিসেবে। এই ইমিগ্রেন্টদের কারণে তাদের জনসংখ্যার গতি উর্ধ্বমুখী। শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের চেয়ে অভিবাসীদের সন্তান সংখ্যা বেশি। ১৯৪০ সাল থেকে এখনো আমেরিকা তার শীর্ষ অবস্থান ধরে রেখেছে এবং ২০৪০ সাল পর্যন্ত আমেরিকা পৃথিবীর তৃতীয় জনবহুল দেশ হিসেবে থাকবে।

আমরা যদি আরো পেছনের দিকে তাকাই, তাহলে দেখব যে, পৃথিবীতে যত সভ্যতার আবির্ভাব ঘটেছে সব জায়গায় জনসংখ্যা বাড়ানোর প্রচেষ্টা ছিল শাসকদের। পৃথিবীর প্রাচীনতম আইনবিধি হলো ‘কোড অব উর-নাম্মু’, এটা মেসোপটেমিয়ায়। এতে সুমেরীয় রাজা উর-নাম্মু প্রজাদেরকে বড় পরিবার

গঠনে উৎসাহিত করেন এবং যাদেরই পরিবারে জনসংখ্যা বেশি, তাদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দেয়া হতো।

দ্বিতীয় প্রাচীন আইনবিধি হলো ৩,৯৬০ বছর আগের 'লিপিট-ইশতার'। এই আইনেও সন্তান বাড়ানোর গুরুত্ব বলা হয়েছে। যিশুখ্রিষ্টের জন্মের ১৭ বছর আগে ব্যাবিলনের সম্রাট হাম্মুরাব্বি যে আইন জারি করেন তাতে প্রজাদেরকে বলেন যেন তারা বেশি সন্তান নেয়। তাহলে রাজ্য শক্তিশালী হবে, সুরক্ষিত থাকবে। অর্থাৎ সুপ্রাচীনকাল থেকেই, যখন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন থেকেই বড় পরিবারকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

গ্রিক ইতিহাসবিদ হেরোডোটাস তার বইতে উল্লেখ করেছেন যে, পারস্য সাম্রাজ্য এত বিস্তার লাভ করার কারণ জনসংখ্যা। পারস্যে কারো বেশি ছেলেমেয়ে থাকলে তাকে বিশেষ সম্মান দেয়া হতো। পরাশক্তি হওয়ার জন্যে যে পর্যাপ্ত সৈনিক এবং পরিশ্রমী কর্মী দরকার এটা রোমানরা প্রথম বুঝতে পারল পার্সিয়ানদের দেখে। যে কারণে রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার প্রথম জন্মহার বাড়াতে প্রজাদেরকে আর্থিক প্রণোদনা দিতে শুরু করেন। তিন বা এর বেশি সন্তান হলে রোমান নাগরিকদের জমি দেয়া হতো।

এরপর এই সুযোগ-সুবিধাটাকে আরো বাড়ান রোমান সম্রাট অগাস্টাস। ফলে দ্রুত জনসংখ্যা বাড়তে লাগল। দ্বিতীয় শতাব্দীতে সম্রাট ট্রাজানের শাসনামলে (৯৮ থেকে ১১৭ খ্রিষ্টাব্দ) রোমান সাম্রাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতিও তুঙ্গে পৌঁছে গেল।

ইউরোপের মধ্যযুগীয় চিন্তাবিদ টমাস অ্যাকুইনাস এবং *দ্য প্রিন্স*-এর রচয়িতা চিন্তাবিদ ম্যাকিয়াভেলি জনসংখ্যা বৃদ্ধির ওপর প্রবল গুরুত্ব দিয়েছেন। ম্যাকিয়াভেলি বলেন, জনসংখ্যা কমে গেলে রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে যায়। ১৬ শতকের প্রভাবশালী ফরাসি চিন্তাবিদ ও ইতিহাসশাস্ত্রবিদ জঁ বোদাঁ (Jean Bodin) লিখেছেন, প্রজার সংখ্যা বেড়ে গেলে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা রাজার জন্যে মানুষের চেয়ে মূল্যবান কোনো সম্পদ বা শক্তি আর হয় না।

ইউরোপের সামরিক ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকৌশলী হচ্ছেন সেবাস্তিয়ান। ১৭০৭ সালে তিনি তার গ্রাউন্ড ব্রেকিং ইকোনমিক প্রবন্ধে সফলভাবে প্রমাণ করেন যে, একজন সম্রাটের বিশালত্ব প্রমাণিত হয় তার প্রজার সংখ্যা থেকে। ২০১৯ সালে আমেরিকান প্রভাবশালী সাময়িকী *ফরেন অ্যাফেয়ার্স ম্যাগাজিন* একটা দীর্ঘ নিবন্ধ প্রকাশ করে, যার শিরোনাম ছিল With great demographics comes great power : why population will drive geopolitics.

নিবন্ধটির মূল কথা হচ্ছে, ভূ-রাজনীতি এবং ডেমোগ্রাফি হচ্ছে সমার্থক। শক্তিধর দেশগুলোর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদে কে এগিয়ে যাবে সেটা হাতে গোনা যে ফ্যাক্টরগুলোর ওপর নির্ভর করে তার অন্যতম হলো জনসংখ্যার আকার, দক্ষতা, সামর্থ্য ও গুণাবলি। আগামীর পরাশক্তি কে হবে তা নির্ভর করে একটি দেশের জনসংখ্যা কত, তারা ব্রেনকে কতটা ব্যবহার করে এবং তাদের কোয়ালিটি কী—এসবের ওপর।

এটা হচ্ছে আসল সত্য যে, একটা দেশের দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক সমৃদ্ধি এসবই নির্ভর করে জনশক্তির ওপরে। প্রথমত, শ্রমশক্তি অর্থাৎ কর্মীর সংখ্যা কত বেশি? দ্বিতীয়ত, তাদের উৎপাদন ক্ষমতা কত? এটা *দ্য ওয়াল স্ট্রিট* জার্নালের বিশ্লেষণ (২২ নভেম্বর ২০১৫)। তারা বলছে, How Demographics Rule the Global Economy। জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়া মানেই হচ্ছে কর্মীর সংখ্যা কমে যাওয়া। তখন জনসংখ্যা হয় বাইরে থেকে আনতে হবে, না হয় নিজেদেরকে বাড়াতে হবে। জনসংখ্যা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ!

অতএব আমরা চাই জ্ঞানে বিজ্ঞানে প্রাচুর্যে সম্মানে মানবিকতা ও মমতায় একটা বড় ও মহান জাতি হয়ে উঠতে। সে কারণেই আমাদের সুদক্ষ এবং সমৃদ্ধ জনশক্তির জন্যে দরকার জনসংখ্যার বিস্ফোরণ।

**প্রশ্ন :** নতুন প্রজন্মকে কমপক্ষে চার সন্তান নিতে বলেছেন। কিন্তু আমার বড় ভাই ও দুই বোনকে দেখেছি, চাকরি করে সন্তান লালন কত কষ্টের! বড় বোন মা-বাবার কাছে থাকাতে কিছু সুবিধা পায়। কিন্তু আরেক বোন মা-বাবা থেকে দূরে থাকে। তারা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকরি করে বলে তিন বছরের ছেলেকে গৃহকর্মীর কাছে রেখে যায়। বোন ও দুলাভাই যখন কর্মস্থলে যায়, তখন তাদের সন্তানকে গৃহকর্মীই খাওয়ায়, দেখাশোনা করে। এটাই তো একক পরিবারের বাস্তবতা। আরেকটি শিশু জন্ম নিলে শিশুটির কি সমস্যা হবে না? আমি বিবাহিত না হয়েও এই শিশুর কষ্ট দেখে প্রশ্নটি করেছি।

**উত্তর :** কমপক্ষে চার সন্তানের বিষয়টি কোনো আদেশ বা নির্দেশ নয়, এটি একটি পরামর্শ। পরিবার মানে ‘হাম দো হামারা দো’ নয়। আপনার বোনের পরিবারে যদি শিশুটির দাদা-দাদি থাকত, তাকে তখন গৃহকর্মীর কাছে রাখতে হতো না। একটি শিশুর জন্যে দাদা-দাদি ও নানা-নানির চেয়ে ভালো বন্ধু বা কেয়ারটেকার আর হয় না। সাধারণত তাদের কাছে শিশু ইমোশনাল সাপোর্টটা তার মা-বাবার চেয়েও বেশি পায়।

পরিবার বড় হলে সেখানে শিশুকে আদর করার মানুষের অভাব হয় না। বড় পরিবারে একটা সুরক্ষা বলয় থাকে, তা টোনাটুনির সংসারে থাকে না। বড় পরিবারে কোন সন্তান যে কার কাছে খাচ্ছে আর কার কাছে ঘুমাচ্ছে, অনেক সময় মা-বাবা টেরও পেতেন না। দাদা-দাদি, নানা-নানি, খালা-মামা, ফুপু-চাচা এবং অনেক ভাইবোন-কাজিনের মাঝে সন্তান বেড়ে উঠত। অনেক সময় আপন ভাইবোনের চেয়েও সমবয়সী কাজিনদের সাথে বেশি বন্ধুত্ব থাকত। এভাবেই আমাদের প্রাচ্যে সামাজিক বন্ধনটা গড়ে উঠেছে।

সম্প্রতি (১৯ নভেম্বর ২০২৫) *রিডার্স ডাইজেস্ট*-এর একটা রিপোর্ট হচ্ছে, এখন অনেক পরিবারেই শিশুর কাজিনের সংখ্যা হাতেগোনা। আগের মতো বড় পরিবার বড় আড্ডা ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসছে। সমাজবিজ্ঞানীরা এ প্রবণতাকে বলছেন 'গ্রেট কাজিন ডিক্লাইন'। এটা বিশ্বজুড়েই হয়েছে।

কয়েক দশক আগেও কিন্তু যৌথ পরিবার ছিল আমাদের সমাজে। জীবন ছিল অনেককে নিয়ে, অনেকের ভালো-মন্দ মিশিয়ে। মা-বাবাদের সাথে আমাদের নৈকট্য ছিল অনেক। তারা কিন্তু পাশ্চাত্যের অনুকরণে আমাদেরকে ছেড়ে দেয় নি, বরং আমরা মা-বাবাকে ছেড়েছি। বিয়ের পরেই মনে করেছি যে, আমাদের এখন আলাদা সংসার দরকার। আবার অনেক সময় কর্মসূত্রে দূরে থাকার ফলে বা অন্যান্য কারণে একক পরিবার গড়ে উঠল। এভাবে আমাদের যৌথ পরিবারগুলো ভাঙতে শুরু করল।

পাশ্চাত্য সমাজ এখন যৌথ পরিবারে ফিরে যাচ্ছে। কানাডাতে গত ৩০ বছরে যৌথ পরিবারের সংখ্যা ৫০ শতাংশ বেড়েছে। আগে ১৮ বছর বয়সে যেমন তাদেরকে স্বনির্ভর হয়ে আলাদা হতে হতো, এখন আবার পরিবারে ফিরে আসাটাকে তারা অ্যাক্ট অব রেসপনসিবিলিটি মনে করছে। আমেরিকাতে যৌথ পরিবারে ফেরত যাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে।

অথচ আমাদের কী অবস্থা? একটা লেখা পড়ে শুনাচ্ছিল একজন—বাড়িতে ফ্রিজ আছে, স্মার্ট টিভি আছে, লেটেস্ট মডেলের স্মার্টফোন আছে। অনেক লকার আছে, ভল্ট আছে, সাপের চামড়ার জুতো আছে, গাড়ি আছে, উলের কার্পেট আছে। দুটো বিলাতি কুকুর আছে, পাঁচটা পার্সিয়ান বিড়াল আছে। সবই তো আছে, কিন্তু আপনি বাড়ির আছেন কোথায়?

আমাদের মধ্যবিত্ত আর উচ্চবিত্তের অবস্থা এখন এমনই। কারণ সবই আছে, কিন্তু বাড়ির বুড়ো অথবা বুড়িকে দেখার কোনো আপন মানুষ নেই। পরিবার ছোট হতে হতে একসময় হয়তো দেখা যাবে, টাকার বিনিময়ে কথা বলা বা কথা শোনার মানুষ খোঁজা হবে, বিজ্ঞাপন দিয়ে লোক নিয়োগ করা হবে সঙ্গ দেয়ার জন্যে।

এর মধ্যে এক বাড়িতে একজন মারা গেছেন। বেশ কয়েকদিন পরে দরজা ভেঙে ভেতরে দেখা গেল, তিনি মরে পচে আছেন। এটা তো আমাদের প্রাচ্যের জীবনাচার ছিল না।

মনে রাখবেন, বড় পরিবার হচ্ছে একটা বড় সমাজের ভিত্তি। মানুষ ছাড়া, পরিবার ছাড়া সুন্দর সমাজ হয় না। ছোট পরিবার হচ্ছে দুঃখী পরিবার। ছোট পরিবারে শিশুদের বঞ্চনাও অনেক। তাদের অনেক পুতুল, অনেক খেলনা, কম্পিউটার, গাড়িঘোড়া, আরো অনেক কিছু থাকতে পারে, কিন্তু তাদের সঙ্গ দেয়ার মতো আপন মানুষ নেই। এই হাহাকার আমরা আমাদের সমাজেও টের পাচ্ছি।

আমার এক পরিচিতজনের এক ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ের পরে মেয়েদের কিছু সুযোগ কমে যায়। তার স্বামী তাকে এ-মুখো হতে দেয় না। ওদিকে ছেলেও তার বউ নিয়ে বিদেশে চলে গেছে। এখন ড্রাইভার ছাড়া বুড়োবুড়িকে দেখার কেউ নেই। এই পরিবার যদি বড় হতো, কোনো না কোনো সন্তান তাদের কাছে থাকত।

এই বাস্তবতা নিয়ে কথা বলতে বলতেই এক কোয়ান্টাম সদস্যের একটা চিঠি পেলাম—'সমন্বিত নয় ব্যাংকের পরীক্ষায় আমি প্রথম হয়েছি। আপনার দেখানো পথে মেডিটেশন করে ও ডিভাইসমুক্ত হয়ে নিয়মিত পড়াশোনা করার ফলে তা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু নিয়োগের পরবর্তী ধাপ কোথায় আমাকে পোস্টিং দেবে তা নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তা হচ্ছে। আমি মা-বাবার একমাত্র সন্তান। ছোটবেলা থেকে ঢাকায় বড় হয়েছি। ঢাকার বাইরে গিয়ে আমি চাকরি করতে চাই না। এটা নিয়ে আমি সারাদিন আতঙ্কে ভুগি। আমার কোনো লিংক নাই, যার মাধ্যমে আমি তদবির করতে পারি। আমাকে মা-বাবার খেয়াল রাখতে হবে এবং পরীক্ষায় প্রথম হয়েছি সেই মর্মে হেড অফিসে একটা দরখাস্তও দিয়ে এসেছি। বড্ড অসহায় লাগে সারাক্ষণ।'

এই চিঠিটা পেয়ে আরো বেশি মনে হলো যে, আমরা সঠিক কথাই বলছি—সন্তান যেন চারের কম না হয়। কারণ পরীক্ষায় প্রথম হয়েও কত অসহায় অনুভূতি! যদি তার আরো তিন/ চার ভাইবোন থাকত, তাহলে এই আতঙ্ক এবং অশান্তি থাকত না। তার শক্তিটা তখন অন্যরকম হতো।

এর মধ্যে এক দম্পতির সাথে দেখা হলো। তাদের একমাত্র সন্তান বিদেশে চলে যেতে চায়। এটা নিয়েই তাদের দুশ্চিন্তায় খারাপ অবস্থা যে, বিদেশ গিয়ে যদি সন্তান ফিরে না আসে! একমাত্র সন্তানের মা-বাবারও কত ইনসিকিউরিটি ফিলিংস! আমাদের মা-বাবাদের কখনো এত টেনশন ছিল না। কেন? কারণ দুই-চারটাকে যদি ছেলেধরা নিয়েও যায়, আরো তো পাঁচ-ছয়টা

আছে! সন্তান বেশি থাকলে মা-বাবার মধ্যেও অনিরাপত্তাবোধ কমে যায় এবং মানসিকভাবে তারা তুলনামূলক সুস্থ থাকে।

চীনের সুচাউ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরাও গবেষণা করে বলছেন, মানসিক সুস্থতার জন্যে বেশি সন্তান নিন। যুক্তরাজ্যের ৫৫ হাজারের বেশি নারীর তথ্য বিশ্লেষণ করে তারা দেখেছেন, যেসব নারীর সন্তান রয়েছে, তাদের মধ্যে মানসিক রোগের ঝুঁকি ৩০ শতাংশ কম থাকে সন্তানবিহীন নারীদের তুলনায়। গবেষণাপত্রে বলা হয়, বাইপোলার ডিজঅর্ডার এবং মেজর ডিপ্রেশনের বিরুদ্ধে একটি স্বতন্ত্র সুরক্ষা উপাদান হিসেবে কাজ করে সন্তান জন্ম দেয়া। সন্তান জন্ম দেয়ার পর মা ও সন্তানের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠা এবং নবজাতকের যত্ন নেয়া মায়ের ডোপামিন রিওয়ার্ড সিস্টেমকে উদ্দীপ্ত করে, যা মানসিক তৃপ্তি এনে দেয় এবং বিষাদ থেকে সুরক্ষা দেয়। ১৫ জানুয়ারি ২০২৫ *জার্নাল অব অ্যাফেকটিভ ডিজঅর্ডার্স*-এ তাদের এ গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়।

পরিবার যত বড় হয়, তত প্রত্যেকের সিকিউরিটি ফিলিংস বৃদ্ধি পায়, মানসিক সুখ বাড়তে থাকে। তাই আপাতদৃষ্টিতে যতই কঠিন হোক না কেন, সবদিক বিচারে অধিক সন্তানই উপকারী। অবশ্য ইতোমধ্যেই যাদের পরিবার ছোট হয়ে গেছে, ইচ্ছে করলেও ছেলেমেয়ে বাড়ানোর কোনো উপায় নেই, তাদের জন্যে আছে কোয়ান্টাম পরিবার—দেশের সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু পরিবার।

## সন্তান না হওয়া

**প্রশ্ন :** আমার বিয়ের ১০ বছর হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আমার কোনো সন্তান নেই। আমি অনেক চেষ্টা করেছি। এ নিয়ে আমি চার বার কনসিভ করি, কিন্তু প্রতিবারই ১১ থেকে ১৪ তম সপ্তাহে মিসক্যারেজ হয়ে গিয়েছে। একবার আইভিএফ পদ্ধতিতেও চেষ্টা করেছি। সেটাও ব্যর্থ। আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, বিগত ৬ মাস ধরে ১৮টি ইনজেকশন নেয়ার পরও আইভিএফ ব্যর্থ হয়েছে। এজন্যে আমি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছি এবং হীনম্মন্যতায় ভুগছি। ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবনে সফল হওয়ার পরও আমার নিজেকে ব্যর্থ মনে হয়। সত্যি বলতে আমার কেউই নেই, যার সাথে আমি নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে পারি। কারণ কেউ আমার ব্যথাটা সেভাবে বোঝার চেষ্টা করে না। আল্লাহ যে আমার এরকম পরীক্ষা নিচ্ছেন, এটা মেনে নিতেই আমার খুব কষ্ট হয়। আমি কী করতে পারি? আপনার কাছে দোয়া চাই যেন আমি মাতৃত্বের স্বাদ পেতে পারি।

**উত্তর:** আমরা অবশ্যই অত্যন্ত সমব্যথী আপনার প্রতি। বায়োলজিক্যাল কোনো ফ্যাক্টর যদি ম্যাচ না করে, তাহলে এই ব্যর্থতা আসতেই পারে। এটাকে সহজভাবে দেখুন। মা-বাবা হওয়ার জন্যে চেষ্টা করার মধ্যে দোষের কিছু নেই। তবে অতিরিক্ত চেষ্টা করারও কোনো অর্থ নেই। কারণ একটা স্বাভাবিক বিষয় যদি অল্প চেষ্টায় না হয় তো বুঝতে হবে যে, বেশি চেষ্টা করেও তেমন সুবিধা করতে পারবেন না। আপনি যেহেতু চেষ্টা করেও মা হতে পারেন নি, এখন এটা নিয়ে অপরাধবোধে ভোগার কিছু নেই।

এ-ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত—সন্তান হলে ভালো; না হলে আরো ভালো। সন্তান হওয়া না হওয়াটা আপনার শারীরিক, মানসিক কোনো অক্ষমতা বা ব্যর্থতা নির্দেশ করে না এটা প্রভুর ইচ্ছা। তিনি যাকে ইচ্ছা প্রচুর দেন, আবার কাউকে একেবারেই দেন না। প্রভুর ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা হওয়া উচিত। তাহলে হতাশা আসবে না। সব অবস্থায় রাজি খুশি থাকা সহজ হয়। আমরা দেখা যায় যে, প্রভুর ইচ্ছাটাকে বুঝতে চেষ্টা করি না। তাঁর সিদ্ধান্তটাকে মেনে নিতে চাই না।

আপনি অপরাধী হতেন তখনই, যদি 'ডবল ইনকাম নো কিডস' (ডিংক) গ্রুপের হতেন। এরা আজকাল সন্তান চায় না, কিন্তু কুকুর বিড়ালকে অনেক গুরুত্ব দেয়। এটা শুধু পাশ্চাত্যে নয়, আমাদের দেশেও তাদের অনুকরণ করে একটা শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে, যারা সন্তানের চেয়েও কুকুর বিড়াল নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পছন্দ করছে। পৃথিবীর সব সভ্যতার মধ্যেই মানুষরূপী বানর আছে, যারা বানরের মতো অন্যকে অনুকরণ করতে চায়।

আমরা নবীজীর (স) জীবন যদি দেখি, মা আয়েশা (রা) কিন্তু মা হন নি। তিনি কি কখনো নিজেকে ব্যর্থ মনে করেছেন? প্রথম পাঁচ জন মুহাদ্দিসের একজন হচ্ছেন মা আয়েশা (রা)। তার সাফল্য, সম্মান, মর্যাদা কোনো অংশে কি কম ছিল? একজন মানুষ সম্মানিত হয় তার কাজ দিয়ে, অবদান দিয়ে। আপনার সেই কাজ করার সুযোগ আছে। আপনি কেন হতাশ হবেন? আমরা দোয়া করব যাতে আপনি এমন কিছু কাজ করে যেতে পারেন।

আর সন্তান হলেই যে আপনি সুখী হবেন এমন নিশ্চয়তা তো দেয়া যায় না। আমি দেখেছি, মা-বাবা হওয়ার পরে বলছেন যে, এমন সন্তান তাদের জীবনে না এলেই ভালো হতো। সন্তান কতটা কষ্টের কারণ হলে মা-বাবা একথা বলতে পারেন! আমরা দোয়া করি আল্লাহ তায়ালা যদি কল্যাণ মনে করেন, তাহলে যেন তিনি আপনাকে সন্তান দান করেন। কিন্তু যদি আল্লাহ না দেন তো নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করবেন যে, এর মধ্যেই আপনার মঙ্গল রয়েছে, কল্যাণ রয়েছে। অতএব এটাকে সহজভাবে নেবেন।

**প্রশ্ন :** আমি খুব মানসিক বিভ্রান্তিতে আছি। আমার বিয়ে হয়েছে নয় বছর। কিন্তু এখনো সন্তান হয় নি। ডাক্তার বলেছেন, কোনো সমস্যা নেই। আমি স্কুলে চাকরি করতাম। সহকর্মীদের দুর্ব্যবহারের জন্যে চাকরি ছাড়তে বাধ্য হই। এখনো কোনো চাকরি পাই নি। এ অবস্থায় কী করণীয়?

**উত্তর :** যাদের সন্তান নেই, তারা অনেক সময় মনে করেন—সন্তান না হওয়াটা পৃথিবীতে বোধহয় একমাত্র তারই সমস্যা। আর কারো এই সমস্যা নেই। অথচ পৃথিবীতে এমন অসংখ্য দম্পতিকে পাবেন, যাদের কোনো সন্তান হয় নি। আর যাদের সন্তান হয়েছে, তারাও কি সবাই সুখী? যে মা-বাবার ছেলে মাদকাসক্ত হয়ে গেছে, নেশার টাকা জোগাড়ের জন্যে মা-বাবাকে মারধর করে, সেই মা-বাবাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখুন, এমন সন্তান পেয়ে তারা কেমন সুখী।

ডাক্তার বলেছেন, আপনার সমস্যা নেই। সে-ক্ষেত্রে আপনার স্বামীর সমস্যা থাকতে পারে। চিকিৎসায় সারলে তো ভালো, নয়তো এটাকে সহজভাবে গ্রহণ করুন। আর যদি মনে করেন নিজের সন্তান চাই, তাহলে অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারেন। দেখতে পারেন, সন্তান হয় কিনা।

আবার এমনও হতে পারে, স্বামীর প্রতি ভালবাসা থেকে সিদ্ধান্ত নিলেন, সন্তান না থাকুক, স্বামীর পাশে থাকবেন বাকি জীবন। সে-ক্ষেত্রেও খুব সুন্দর একটা জীবন যাপন করতে পারেন। আপনি যদি লালন করতে চান তো পৃথিবীতে সন্তানের অভাব নেই। লামায় আমাদের শিশুকানন আছে, শিশুসদন আছে। সেখানে একটি শিশুর আত্মিক মা হোন।

আমাদের দেশের মহিলাদের দুর্ভাগ্য, সন্তান না হওয়ার দোষ সব তার ওপর বর্তায়। স্বামীর সমস্যা থাকলেও দুর্ভাগ্যটা যেন স্ত্রীর। আর মনঃকষ্টের এই বোঝার ওপর শাকের আঁটি হয়ে বসে পরিবার-প্রতিবেশী-আত্মীয়দের প্রশ্নবাণ এবং কটুমন্তব্য। সারাক্ষণ একই কথা, একই প্রশ্ন—বাচ্চা হয় না কেন? যেন এই মহিলার বাচ্চা হচ্ছে না বলে তাদের জীবন অচল হয়ে গেছে! এমনকি অনেক সময় এ থেকে বাদ যান না নিজের মা-বোন-শাশুড়িও।

আর এসব কারণে আপনি সবসময় অস্থির থাকেন। মানসিক দুশ্চিন্তার ফলে অনেক ছোট ব্যাপারকেও হয়তো বড় করে দেখেছেন, রি-একটিভ হয়েছেন। ফলে সহকর্মীদের দুর্ব্যবহারের কারণে চাকরি ছাড়ার যে কথা বললেন, তা আসলে আপনারই দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যা ছিল। কারণ কেউ দুর্ব্যবহার করল কি করল না—এটা নির্ভর করে, আপনি কীভাবে দেখছেন তার ওপরে। কাজেই প্রো-একটিভ থাকতে হবে। আর শান্তির জন্যে, স্থিরতার

জন্যে নিয়মিত মেডিটেশন করুন। তাহলে দেখবেন, কারো দুর্ব্যবহার আপনাকে স্পর্শ করছে না।

**প্রশ্ন :** আমার ছেলের বিয়ে হয়েছে পাঁচ বছর। কোনো সন্তানাদি হচ্ছে না তাদের। আল্লাহর ওপর এত বিশ্বাস যে, ওরা ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজন মনে করে না। তাই আল্লাহ যখন দেয় তখনই হবে, এই বিশ্বাসে বসে আছে। আমি ডাক্তার দেখাতে বলায় ওরা রাগ করেছে। কীভাবে মেডিটেশন করলে উপকার পাবে, আমার ছেলের ঘরে একটি সন্তান আসবে? আমার ছেলের জন্যে দোয়া করবেন, যেন একটা সন্তান ওদের কোল জুড়ে আসে।

**উত্তর :** দোয়া তো আপনার ছেলের জন্যে নয়, আপনার জন্যে করতে হবে, যেন আপনি এই নির্বুদ্ধিতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন। ছেলে বড় হয়েছে, পাঁচ বছর আগে বিয়ে করেছে। সেই ছেলের কেন সন্তান হচ্ছে না, কেন ডাক্তার দেখাচ্ছে না, এসব নিয়ে যদি এখনো আপনি টেনশন করেন, আপনি তো কখনো শান্তিতে থাকতে পারবেন না। ছেলের সন্তান নিয়ে ছেলেকে চিন্তা করতে দিন। আপনি আপনার আখেরাতের কথা ভাবুন। আর ছেলের পয়মন্ত সংসারের জন্যে দোয়া করতে থাকুন।

**প্রশ্ন :** অনেক চেষ্টা করেও আমার কোনো সন্তান হয় নি। আমার জীবনে সাফল্য কি আসবে না?

**উত্তর :** সাফল্যের সাথে সন্তান থাকা, না থাকার কোনো সম্পর্ক নেই। মাইকেল এইচ হার্ট তার *দ্য হানড্রেড* বইয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ যে ১০০ জন মনীষীর কথা বলেছেন, তাদের ২৯ জন বিয়েই করেন নি। আর ২৬ জনের কোনো সন্তান হয় নি। কিন্তু এই সন্তান না হওয়াটা তাদের সাফল্যের পথে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করে নি। বরং তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন এবং ইতিহাসের বাঁকবদল ঘটিয়েছেন।

আবার সন্তান হলেও অনেকের সাফল্যের জন্যে তা কোনো বাড়তি নিয়ামক হিসেবে কাজ করে নি। যেমন, এই ১০০ জনের অন্তত ৫০ জনের ক্ষেত্রেই তাদের সন্তানের পরের প্রজন্মের আর কোনো হদিস ইতিহাসে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ তাদের বংশধারা কালক্রমে হারিয়ে গেছে। সন্তান নিঃসন্দেহে আল্লাহর নেয়ামত। ভালো সন্তানের পিতা-মাতা হওয়া একটা আলাদা আনন্দ, আলাদা তৃপ্তি। সেইসাথে অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব—তাকে

আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। কিন্তু সন্তান না হলে 'অনেক চেষ্টা' করার প্রয়োজন নেই বা সন্তান নেই বলে দুঃখ করারও কিছু নেই। কারণ এর সাথে সাফল্য বা জীবনে সার্থকতার কোনো সম্পর্ক নেই।

**প্রশ্ন :** আমার বিয়ে হয়েছে নয় বছর। এখনো সন্তান হচ্ছে না। টেস্টটিউব বেবির জন্যে চেষ্টা করে দুবার নেগেটিভ ফল এসেছে। আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না যে, টেস্টটিউব চিকিৎসার জন্যে ব্যাংকক যাব, না সিঙ্গাপুরে যাব?

**উত্তর :** টেস্টটিউব বেবির জন্যে কোথায় যাবেন, এটা আপনাদের ব্যাপার। এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ হলো বাস্তব বিবেচনা, কোথায় চিকিৎসাব্যবস্থা ভালো ইত্যাদি। তবে সবসময় মনে রাখবেন, এটা সর্বশক্তিমান আল্লাহর ফয়সালা। তিনি আল কোরআনে স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'মহাকাশ ও পৃথিবীর একচ্ছত্র আধিপত্য আল্লাহর। তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা-ই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান দান করেন। যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন। যাকে ইচ্ছা পুত্র ও কন্যা উভয়ই দান করেন। যাকে ইচ্ছা তাকে সন্তানহীন করে রাখেন। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।' (সূরা শুরা : ৪৯-৫০)।

আসলে আল্লাহ যা করেন মঙ্গলের জন্যে করেন। সন্তান যদি সুসন্তান হয় তো খুব ভালো। আর খারাপ হলে শান্তি নষ্ট করার জন্যে একটা সন্তানই যথেষ্ট। যত শোকরগোজার থাকবেন, তত আপনি ভালো থাকবেন। প্রার্থনা করবেন, যা আপনার জন্যে মঙ্গলজনক, সেই সিদ্ধান্ত যেন নিতে পারেন।

**প্রশ্ন :** আমার মতো অনেকে এখনো মা হতে পারে নি। তাদের জন্যে বিশেষ মেডিটেশন এবং কোনো কোর্স কি চালু করা যায়?

**উত্তর :** প্রথমত, এর জন্যে প্রতিদিন মনছবি দেখবেন। দ্বিতীয়ত, আপনি বা আপনার স্বামীর কোনো শারীরিক অসুবিধা থাকলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নেবেন। তৃতীয়ত, নিয়মিত প্রার্থনা করবেন। আর সব শেষে বলব, যদি সব ধরনের চেষ্টার পরও মা হতে না পারেন, তবে মন থেকে বলবেন, 'শোকর আলহামদুলিল্লাহ' প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ। কারণ আসলে কু-সন্তানের চেয়ে সন্তান না হওয়া অনেক ভালো। সন্তান যদি সুসন্তান হয়, তাহলে সে আপনার জন্যে আশীর্বাদ।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে, আপনার জন্যে মা হওয়ার সহজ উপায় আছে। কোয়ান্টামমের বঞ্চিত কোনো শিশুকে আপনি নিজের সন্তান বলে মনে

করবেন। অর্থাৎ আপনার সাধ্যমতো যতটি পারেন ততটি শিশুর আত্মিক মা হবেন। নিজের সন্তান ওখানে থেকে পড়াশোনা করলে তার জন্যে যা যা করতেন কোয়ান্টামমের সেই শিশুদের জন্যেও তা-ই করবেন।

এমনও হয়েছে, এক মহিলা কোয়ান্টামমের একটি শিশুর আত্মিক মা হয়েছেন এবং পরে বাস্তবেও তিনি মা হয়েছেন। এখন সেই দম্পতি মনে করছেন, তাদের দুটি সন্তান। একজন তাদের সাথেই আছে, অন্যজন হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করছে। আসলে আল্লাহ তায়ালা যে কখন কী ওসিলায় প্রার্থনা কবুল করবেন তা একমাত্র তিনিই বলতে পারেন।

**প্রশ্ন :** আমার বিয়ের ১০ বছর পার হয়ে গেলেও আল্লাহ তায়ালা আমাকে কোনো সন্তান দান করেন নি। অনেকেই আমাকে বলেন, আমি এত ভালো মানুষ, অথচ আল্লাহ আমাকে এত বড় একটা শাস্তি দিচ্ছেন! গুরুজী, সন্তান না হওয়াটা কি কোনো শাস্তি?

**উত্তর :** আল্লাহ যদি সন্তান দেন, সেটা যেমন নেয়ামত; তেমনি যদি না দেন, সেটাও নেয়ামত। মনে রাখবেন, সন্তান মা-বাবার জন্যে আল্লাহর তরফ থেকে একটা পরীক্ষা—সন্তানকে সৎ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার পরীক্ষা। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন, 'তোমাদের ধনসম্পত্তি ও সন্তানসন্ততি তো তোমাদের জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ। আর তোমাদের জন্যে আল্লাহর কাছেই রয়েছে মহাপুরস্কার!' (সূরা তাগাবুন : ১৫)।

আল্লাহ তায়ালা সূরা মুমিনুনে (৫৫-৫৬) বলেছেন, 'ওরা কি মনে করে যে, ওদের যে (যোগ্যতা, মেধা, কর্মক্ষমতা) সম্পদ ও সন্তানসন্ততি দান করেছি, তা শুধু বৈষয়িক সাফল্য লাভে প্রতিযোগিতা করার জন্যে? এটাই সৎকর্ম? (এটাই ভালো থাকা? এতেই কল্যাণ?) না, তা নয়! ওরা আসলে বুঝতে পারছে না (এটাই ওদের একটা পরীক্ষা)!'

আল্লাহ তায়ালা যাদের এই পরীক্ষা নিতে চান, তাদেরকে সন্তান দেন আর যাদের এই পরীক্ষা নিতে চান না, তাদেরকে সন্তান দেন না। আর সন্তান না হওয়াটা যদি শাস্তিই হয়, তবে এ শাস্তি শুধু আপনি একা নন, আরো অনেক মহীয়সী নারীই পেয়েছেন। এখন শোকর আলহামদুলিল্লাহ বলুন—একটা পরীক্ষা থেকে আপনাকে রেহাই দেয়া হয়েছে। অনেক সময় এমন হয় যে, ভালো ছাত্র হলে পরীক্ষা নেয়া হয় নাম-কা-ওয়াস্তে।

অতএব সন্তান হলেও শোকর আলহামদুলিল্লাহ—তাকে ভালো মানুষ হিসেবে তৈরি করার দায়িত্ব আপনি পেয়েছেন। আর সন্তান না হলেও শোকর

আলহামদুলিল্লাহ—আল্লাহ তায়ালা এই পরীক্ষায় আপনাকে ফেলেন নি। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় শোকরগোজার থাকবেন।

**প্রশ্ন :** আমি তিনটি গুরুতর সমস্যায় ভুগছি। এক, আমি নিঃসন্তান। দুই, আমার মাথায় তীব্র অস্বস্তি হচ্ছে একবছর ধরে। তিন, কিছুদিন ধরে মনে হচ্ছে, কেউ যেন আমার সফল জীবনের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে কোনো ধরনের অপার্থিব অসাধু উপায়ে ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। এগুলো থেকে মুক্তি পেতে আমি কি এক বসাতেই কয়েকটা মেডিটেশন করতে পারব? অথবা দিনে কয়েক বার মেডিটেশন করতে পারব? যদি পারি, তাহলে কোন কোন মেডিটেশন করব? পরামর্শ দিলে কৃতার্থ হবো।

**উত্তর :** এখানে তিনটা প্রশ্ন। এক হচ্ছে, আপনি নিঃসন্তান। নিঃসন্দেহে আপনি মা হওয়ার চেষ্টা করেছেন। চেষ্টা করার পরে যদি সন্তান না আসে, তাহলে 'শোকর আলহামদুলিল্লাহ' বলাই সবচেয়ে উত্তম। কারণ এ-ক্ষেত্রে আপনার আর কিছু করার নেই। পৃথিবীতে বহু নিঃসন্তান মানুষ রয়েছেন। আপনি একা নন। বহু বিখ্যাত নারী-পুরুষ নিঃসন্তান ছিলেন। অতএব এটা নিয়ে আপনার হীনম্মন্যতায় ভোগার কোনো প্রয়োজন নেই।

আমাদের দেশের মহিলারা মা হতে না পারলে তার স্বামীর চেয়েও অনেক সময় বড় সমস্যার উৎস হয়ে দাঁড়ায় আত্মীয়স্বজন। এরা সমবেদনা জ্ঞাপন করতে গিয়ে মানসিক নির্যাতন করে। যেমন, রোগীরা অনেক ভালো থাকত, যদি তাদের আত্মীয়স্বজন দেখতে না আসত অথবা যদি আরেকটু মানবিক হতো। একেকজন আত্মীয় দেখতে আসে, সমবেদনার নাম করে সমস্ত নেতিবাচক কথা বলে যায়—'হায়! তোমার কী হবে! তুমি যদি এই সময় মারা যাও, বাচ্চাদের কী হবে!'

অথচ আমরা কোয়ান্টাম মেথড কোর্সেও বলি যে, রসুলুল্লাহর (স) স্পষ্ট হাদীস আছে—'যখন তুমি কোনো পীড়িতকে দেখতে যাও, তখন সান্ত্বনা দাও এবং বলো, তুমি সুস্থ ও দীর্ঘজীবী হবে' [আবু সাঈদ খুদরী (রা); *মেশকাত*]। আরো একটি হাদীস হচ্ছে, যখন তোমরা কোনো রোগীর কাছে যাবে, তখন ভালো কথা, ইতিবাচক কথা বলবে (নেতিবাচক কথা বলবে না)। কারণ তোমরা তখন যা বলো, ফেরেশতারা তার সাথেই 'আমিন' বলেন। [উম্মে সালামা (রা); *মুসলিম*, *মেশকাত*]

আর আমাদের আত্মীয়স্বজনেরা একেবারে উল্টো। কে কে এই রোগে মারা গিয়েছিল, কীভাবে মারা গিয়েছিল, তাদের কত কষ্ট হয়েছে—এসব

নেতিবাচক কথা তারা বলে। অনেক সময় এ ধরনের কথা ডাক্তারও বলেন। একবার আমাদের এক বন্ধু সিঙ্গাপুর থেকে ফোনে বললেন, মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালের ডাক্তার তাকে বলেছেন, তুমি হলে এই রোগে আক্রান্ত তৃতীয় জন। এর আগে দুজন এসেছিলেন, দুজনই মারা গেছেন। একথা শোনার পর রোগীর কি আর বাঁচার কোনো আশা থাকে? সেই বন্ধু বললেন, আগের দুজন তো মরেই গেছে। এবার আমার পালা।

তাকে বললাম, দেখুন, হায়াত-মউত তো আল্লাহর হাতে। আপনার আগে দুই জন কেন, দুই শ জন মারা গেলেও আপনি বেঁচে থাকতে পারেন। আবার আপনার আগে এ রোগে কেউ মারা না গেলেও আপনি মারা যেতে পারেন। আপনি এসব চিন্তা বাদ দিন। এটা ১৯৮৩ বা ১৯৮৪ সালের ঘটনা। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! তিনি এখনো বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন।

আশপাশের মানুষের কথায় কখনো প্রভাবিত হবেন না। চিন্তা করুন, মা আয়েশা (রা) নিঃসন্তান ছিলেন। মা খাদিজার (রা) পরে নবীজীর (স) সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী ছিলেন তিনি। তিনি কুমারী অবস্থায় নবীজীর (স) স্ত্রী হয়েছেন এবং নবীজীর (স) ওফাতের পরেও ৫০ বছর বেঁচে ছিলেন। তিনি তো কখনো হীনম্মন্যতায় ভোগেন নি। বরং প্রথম কাতারের পাঁচ জন মুহাদ্দিসের মধ্যে তিনি একজন। বহু হাদীস তিনি বর্ণনা করেছেন।

অতএব নিজেকে বঞ্চিত মনে করার কোনো কারণ নেই। সন্তান অবশ্যই আল্লাহর একটা নেয়ামত। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে আরো অনেক নেয়ামত দিয়েছেন। হয়তো কোনো বিশেষ কারণে সন্তান দেন নি। আপনার সন্তান কুসন্তান হতে পারত। আপনার শান্তি নষ্টের কারণ হতে পারত। মনে করুন যে, এসব থেকে বেঁচে গেছি।

দুই নম্বর, মাথায় গভীর একধরনের খারাপ লাগা—এটা হচ্ছে আপনার দুঃখবোধ থেকে। কিছুটা নিজের দুঃখ, বাকিটা আশপাশের মানুষদের কথা, মানসিক যন্ত্রণা। একজন শোকরগোজার মানুষ হওয়ার মাধ্যমে দুঃখটাকে মন থেকে বের করে দিন। দেখবেন যে, মাথায় কোনো যন্ত্রণা থাকবে না।

আর কিছুদিন ধরে যে আপনার মনে হচ্ছে, কেউ আপনার সফল জীবনের প্রতি ঈর্ষান্বিত, এটা আপনার মনের একটা ভয়—একধরনের ফোবিয়া। জীবনের সফলতার জন্যে শোকরগোজার থাকুন। একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটের সাইকিক বর্ম রয়েছে। জাদু-বান-টোনা-তাবিজ-কবচ করে কেউ আপনার কিছু করতে পারবে না। শুধু আপনি নিজে আপনার এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসুন। এজন্যে সবসময় ইতিবাচক পরিমণ্ডলে থাকুন, নিয়মিত মেডিটেশন করুন এবং সৎসঙ্ঘে একাত্ম থাকুন।

# সন্তান গ্রহণে অনীহা

**প্রশ্ন :** বিশ্বাস করি, সন্তান পৃথিবীতে আসার সময় তার রিজিক নিয়ে আসে। কিন্তু আমরা যারা বাবা-মা হতে চাই, আর্থিকভাবে অসচ্ছলতার কারণে অনেকেই সন্তান নিতে চাই না। মনে হয়, আর্থিক অসচ্ছলতা সন্তানের দায়িত্ব কর্তব্য পালনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। আপনার দৃষ্টিতে ব্যাপারটা কেমন, তা জানালে উপকৃত হবো।

**উত্তর :** প্রত্যেকটি মানুষ তার রিজিক নিয়ে আসে। আপনি না থাকলেও আপনার সন্তান তার রিজিক নিয়ে আসছে, সে কোথাও না কোথাও মানুষ হবে। আপনি দেখুন, নবীজীর (স) বাবা মারা গিয়েছিলেন, মা মারা গিয়েছিলেন, তবুও তার লালনপালন বাধাগ্রস্ত হয় নি। তিনি অমর হয়ে আছেন। ইতিহাস খুঁজলে এমন উদাহরণ আপনি আরো পাবেন।

সন্তানের ব্যাপারে আসলে আমাদের অধিকাংশ মা-বাবা মমতার চেয়েও আসক্তিতে ভুগি বেশি। সন্তানকে মনে করি নিজের সম্পত্তি। আমরা অধিকাংশ সময় প্রত্যাশা করি, বুড়ো হলে সন্তান আমাকে দেখবে। এটা একেবারে ভ্রান্ত ধারণা। সন্তান আপনাকে না-ও দেখতে পারে। আপনার দেখার ব্যবস্থা আল্লাহই করবেন। কারণ আল্লাহ আপনাকে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ আপনার রিজিকের ব্যবস্থা করেছেন। একইভাবে সন্তানের রিজিকের ব্যবস্থাও আল্লাহই করবেন।

অনেকে আবার বিয়ে করে না এ যুক্তিতে যে, বউকে খাওয়াবে কী! কিন্তু সত্য হলো, বউ তার রিজিক নিয়ে আসবে। তার যদি খাবার থাকে রিজিকে, তা আপনার মাধ্যমেই আসবে। আপনার উপার্জন বেড়ে যাবে। অতএব সবসময় মনে রাখবেন, প্রত্যেকটা মানুষ তার রিজিক নিয়েই পৃথিবীতে আসে এবং তার রিজিক যখন শেষ হয়ে যায়, তখন তাকে পৃথিবী থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন আপনি তাকে অনেক খাইয়েও রাখতে পারবেন না। অতএব আর্থিক অসচ্ছলতাকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করাবেন না।

**প্রশ্ন :** আপনি বলছেন, জনসংখ্যাই দেশের শক্তি। তবে আমার ভাইয়া বলে যে, সে কখনো সন্তান নেবে না। কারণ এতে জনসংখ্যা বাড়বে এবং মানুষের সুযোগ কমে যাবে। আমাদের পরিবারে কোনো নতুন মুখ আসার সংবাদ পেলেও সে বলে, কেন শুধু শুধু দেশে জনসংখ্যা বাড়াচ্ছে! তাকে কী করে বোঝাব যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

**উত্তর :** এরকম দু-চারজন মানুষ থাকবে, তাদের থাকতে দেন। তারা নিজের মতে চলুক। যারা বুঝবে তারা দায়িত্ব নিলেই হবে। একটা মজার ঘটনা বলি, মা-বাবা তাদের দুই ছেলেকে নিয়ে সাদাকায়নে এসেছেন। একজন প্রথম শ্রেণিতে পড়ে, আরেকজন তৃতীয় শ্রেণিতে। তারা সাদাকায়নের আলোচনায় সন্তান নেয়ার ব্যাপারে শুনেছে যে, 'চারের কম নয়...'। বাসায় গিয়ে তারা মা-বাবাকে বলছে, 'আমাদেরকে আরো ভাইবোন এনে দিতে তোমরা তো পারলে না। চিন্তা করো না। আমরা চেষ্টা করব।'

এটা শুনে বললাম যে, খুব ভালো। এত ছোটবেলায় তাদের এই চিন্তা যখন মাথায় ঢুকেছে, তখন বড় হলে আপনারা অন্তত আট জন বা এর চেয়েও বেশি নাতি-নাতনির মুখ দেখতে পারবেন। অতএব যে বোঝে, দায়িত্ব তাকেই নিতে হয়। যে বোঝে না, তাকে দায়িত্ব দিয়ে কোনো লাভ নেই।

**প্রশ্ন :** আমার বিয়ে হয়েছে তিন বছর চার মাস। সন্তান নিই নি। আমার স্বামীর কোনো আয় না থাকায় সন্তান নিতে সাহস পাচ্ছি না। আমরা দুজনই উত্তম রিজিকের জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। গুরুজী, করণীয় কী?

**উত্তর :** এটা একটা ভুল ধারণা। তিন বছর ধরে আপনারা তো খেয়ে পরে আছেন। যদি আয় ছাড়া দুজন চলতে পারেন, তাহলে চার জনও চলতে পারবেন। কারণ রিজিকের মালিক তো আপনি নন, রিজিকের মালিক আল্লাহ। সন্তানের রিজিক আপনার মাধ্যমে অথবা যে-কোনো মাধ্যমে চলে আসবে। এমন হতে পারে যে, আপনার আয় বেড়ে যাচ্ছে।

তাছাড়া আয়ের তো কোনো সীমা নেই। ধরুন একবার মিলিওনিয়ার সাদরে ইস্পাহানীর সাথে আমার কথাবার্তা হচ্ছে। আমি তখন সাংবাদিকতা করি। কথায় কথায় তিনি বললেন, আমি একজন দরিদ্র মিলিওনিয়র। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি দরিদ্র মিলিওনিয়র কীভাবে? বলে যে, মিলিওনিয়রদের মধ্যে আমি সবচেয়ে দরিদ্র। দেখেন দৃষ্টিভঙ্গিটা কী? সাদরে ইস্পাহানীও যদি দরিদ্র হয়, তো সে তুলনায় আপনি দরিদ্র বললে ঠিকই আছে। তবে এর সাথে সন্তানের রিজিকের কোনো সম্পর্ক নেই।

এর মধ্যে একজন চিঠি লিখেছেন যে, ডাক্তার বলেছে, শারীরিক সমস্যার কারণে ভদ্রমহিলার দ্রুত সন্তান নিয়ে নেয়া দরকার। কিন্তু তার স্বামী আয় কম বলে এখন সন্তান নিতে চান না। কারণ এই ইনকামে সন্তানকে খাওয়াবে কী?

এই ভ্রান্তধারণা আমাদের দেশে সৃষ্টি হলো বিশেষত ১৯৭০ থেকে। সেটা আমেরিকার তখনকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার সাহেবদের

বদৌলতে। তখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন নিক্সন। কিসিঞ্জার রিপোর্ট দিলেন যে, এই এই দেশের লোকসংখ্যা কমাতে হবে। কারণ এগুলোতে মূল্যবান খনিজ সম্পদ রয়েছে। লোকসংখ্যা বেড়ে গেলে তারা তাদের অধিকারের জন্যে আন্দোলন করতে পারে। যে সাতটা দেশকে তারা চিহ্নিত করেছিল, এর মধ্যে একটা হচ্ছে বাংলাদেশ। এজন্যে আমাদের এখানে সন্তান সংখ্যা কমানোর এত প্রচারণা। এখানে পরিবার পরিকল্পনা চালু করা হলো—দুইয়ের অধিক নয়, এক হলে ভালো হয়।

অতএব এসব ভ্রান্তধারণা দিয়ে পরিচালিত হবেন না। মনে রাখবেন, আল্লাহই রিকিজদাতা। পৃথিবীতে এত এত প্রাণ, প্রত্যেকের রিজিকের ব্যবস্থা তিনিই করেন। আপনার অনাগত সন্তানের রিজিকও তিনিই ব্যবস্থা করবেন। আপনার কাজ হচ্ছে সঠিক উপায়ে শুধু পরিশ্রম করা, মেহনত করা। খাওয়ানোর দায়িত্ব আল্লাহর; চেষ্টা করার দায়িত্ব আপনার।

## সন্তান ॥ বিবিধ

**প্রশ্ন :** আমার স্বামী আমার সাথে কোনো ধরনের পরামর্শ-সমঝোতা ছাড়াই সন্তান নেয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আমি সন্তান লালনের জন্যে শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত হই নি। এটা কি ঠিক হলো?

**উত্তর :** দাম্পত্য সম্পর্কে যে-কোনো সিদ্ধান্ত, বিশেষত সন্তান সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক পরামর্শ ও সমঝোতার ভিত্তিতে। কিন্তু সেটা না হলেও বিয়ে করার পরে কোনো নারীর-ই এটা বলার উপায় নেই যে, আমি সন্তান নেয়ার জন্যে প্রস্তুত হই নি। আপনি যতদিন পর্যন্ত প্রস্তুত থাকবেন না, বিয়ে করবেন না। যখন প্রস্তুত হবেন, বিয়ে করবেন। অর্থাৎ কখনো দোদুল্যমানতার প্রশ্রয় দেবেন না।

এখন আপনি যে দোদুল্যমানতায় ভুগছেন, এতে ভবিষ্যতে যে সন্তান আসবে তারও সমস্যা হবে। কারণ আপনার কাছে সে অনাকাঙ্ক্ষিত। তার ব্রেনে ঠিকই এই তথ্য যাবে যে, মা আমাকে ঠিক চাচ্ছে না। মায়ের কাছে আমি অনাকাঙ্ক্ষিত। এটা সে বুঝতে পারবে। আর এই শিশুরা খুব বেশি অস্থির হয়, অনেক সময় মনের দিক থেকে দুর্বল প্রকৃতির হয়।

অতএব এই মুহূর্ত থেকে আপনি দৃষ্টিভঙ্গিটা ঠিক করে নিন। নিজের মাইন্ডসেট শুধরে নিন। গর্ভধারণের মানসিক প্রস্তুতি হয়ে গেলে শারীরিক

প্রস্তুতি এমনিতেই হয়ে যাবে। আপনাকে প্রস্তুত হতে হবে না, প্রাকৃতিক নিয়মেই আপনি প্রস্তুত হয়ে যাবেন নয় মাসে।

ইতিমধ্যে যদি আপনি গর্ভধারণ করে থাকেন, আল্লাহকে ধন্যবাদ দিন যে, আল্লাহ সন্তান দিচ্ছেন। কত মানুষ সন্তান চাইতে থাকে, কিন্তু অনেক চেষ্টার পরও তাদের হয় না। তাই শোকরগোজার থাকুন। নিজের যত্ন নিন, খাওয়াদাওয়া ঠিকভাবে করুন এবং উৎফুল্ল থাকুন। এজন্যে নিয়মিত মেডিটেশন করুন। যে-রকম শিশু এলে খুশি হবেন সে-রকম সুন্দর ভালো বুদ্ধিমান শিশুর মনছবি করুন। আমরা আপনার জন্যে দোয়া করি।

**প্রশ্ন :** আমার দুটি মেয়ে। ছেলে নেই। আমি একটি ছেলে চাই। গুরুজী, আমার এভাবে ছেলে চাওয়াটা কি ভুল হচ্ছে?

**উত্তর :** ছেলে চাওয়াতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু দুটি মেয়ে থাকা তো খুব সৌভাগ্যের ব্যাপার। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন যে, আপনার দুটি মেয়ে আছে। এই জামানায় দেখি, মেয়েরাই মা-বাবার খোঁজ রাখে বেশি। আপনার এই মেয়ে দুটিকে লেখাপড়া এবং অন্য সব দিক দিয়ে যোগ্য মানুষ হিসেবে বড় করুন। তাহলে আপনি এবং জাহান্নামের মধ্যে এই দুই মেয়ে দেয়াল হিসেবে কাজ করবে।

একটি হাদীস আছে, 'যদি কেউ কন্যাসন্তানের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয় এবং তাদের আন্তরিকভাবে লালনপালন করে, মহাবিচার দিবসে জাহান্নামের আগুন ও তার মাঝখানে এই কন্যা দেয়াল হিসেবে দাঁড়াবে' [আয়েশা (রা); *বোখারী, মুসলিম; হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী : ৩৩৩*]। অতএব যত মেয়ে হবে তত আনন্দিত হবেন, তত আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবেন।

**প্রশ্ন :** কেউ যদি চার সন্তান নেয়ার ইচ্ছা পোষণ করে, তাহলে পারিবারিক পরিকল্পনা কেমন হবে? প্রতি বছর একটি করে সন্তান নেবে, নাকি দুই বছর গ্যাপ দিয়ে নেয়া ভালো?

**উত্তর :** এটা ব্যক্তির ফিজিক্যাল ফিটনেসের ওপর নির্ভর করে। আপনি ফিজিক্যালি যেভাবে ভালো বোধ করেন সেভাবে পারিবারিক পরিকল্পনা করবেন। আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাই যে, আপনি অন্তত চার সন্তানের কথা চিন্তা করেছেন। কারণ এখন আমাদের স্লোগান হচ্ছে—চারের কম নয়, সাত হলে ভালো হয়।

**প্রশ্ন :** পিতাহীন একটি পরিবারের যে-কোনো কাজে মায়ের জন্যে সন্তানদের মতামতের গুরুত্ব কতটুকু?

**উত্তর :** মা যদি সচেতন ও জ্ঞানী হন, তাহলে প্রতিটি ব্যাপারে মায়ের কথা শোনা সন্তানদের কর্তব্য। আর যদি সাধারণ ব্যাপারও মা না বোঝেন, তবে তাকে নিজের ছোট্ট মেয়ের মতো দেখতে হবে। পুরো বিষয়টাই নির্ভর করে মায়ের বুদ্ধিমত্তা এবং চেতনা অর্থাৎ জ্ঞানের ওপর।

**প্রশ্ন :** কেন জানি না আমার ভেতরে আমার ছেলেদের হারানোর ভয় থাকে সবসময়। আমার ছেলেটা হীনম্মন্যতায় ভোগে বেশি।

**উত্তর :** ছেলেদের হারানোর ভয়ে আপনি যদি ছেলেকে বের হতে না দেন, স্বাভাবিক কাজেও যদি আপনি তাকে বাধা দেন, সে-তো হীনম্মন্যতায় ভুগবেই। ছেলেকে ছেড়ে দিতে হবে। হাজার হাজার ছেলে বাইরে যাচ্ছে। তারা যদি ঘরে ফিরে আসতে পারে, আপনার ছেলে কেন আসবে না?

এটা হচ্ছে অমূলক ভয়। এই ভয় থেকে দূরে থাকতে হবে। মনছবি দেখবেন, সে যেখানে যাচ্ছে সেখান থেকে আবার ঠিকভাবে ফিরে আসছে। বেশি ভয় হলে সদকা হিসেবে নিয়মিত মাটির ব্যাংকে দান করুন।

**প্রশ্ন :** আমার পাঁচ বছরের সন্তান যখন কোনো ভুল আচরণ করে, তখন আমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করি। কিন্তু সেখানে উপস্থিত আমার মা সাথে সাথেই হয়তো বলেন, 'করেছে তো কী হয়েছে? ছোটবেলায় তুমিও তো অনেক অন্যায় করেছ'। ফলে সন্তানের কাছে আর আমার গুরুত্ব থাকে না। দিন দিন সে বেয়াদব হয়ে উঠছে। মাকে বোঝালে উল্টো চিৎকার-চেঁচামেচি করে। আমি মাকে বেশি বলতে পারি না। তাহলে আমার সন্তানও শিখবে মাকে অসম্মান করা। অর্থাৎ আমি পড়েছি উভয় সংকটে। সন্তান হিসেবে মায়ের সাথে রাগারাগি করতে পারছি না। আবার মা হিসেবেও আমার সন্তানের এই বখে যাওয়াকে মেনে নিতে পারছি না। আমার করণীয় কী হবে?

**উত্তর :** এটি সত্যিই সমস্যা। কোয়ান্টাম পরিবারের অনেক শিক্ষকও এ সমস্যায় পড়েন। তারা প্রো-একটিভ আচরণ করছেন, কোয়ান্টাম চেতনার আলোকে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। কিন্তু অন্য শিক্ষকেরা হয়তো করছেন তার উল্টো। ফলে শিক্ষার্থী বিভ্রান্ত—কার কথা তারা শুনবে!

আপনার সমস্যাও অনেকটা সে-রকম। অবশ্য আপনি এটা ভালো করেছেন যে, সন্তানের সামনে আপনার মাকে কিছু বলছেন না। তাহলে সন্তান তো শোধরাতই না, বরং সে-ও আপনার সাথে তর্ক বা বেয়াদবি করা শিখত। তাই আপাতত এ উপায়টাই বেছে নিতে পারেন, আপনার মায়ের উপস্থিতিতে সন্তানকে কিছু না বলা। আর যখন মাকে বলছেন, তখন যেন সেখানে সন্তান না থাকে। অর্থাৎ সন্তানের অনুপস্থিতিতে মাকে বাস্তবে বোঝান এবং মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে বুঝিয়ে বলুন। মায়ের প্রতি সম্মান রেখে মমতার ভাষায় বললে নিশ্চয়ই তিনি বিষয়টি বুঝবেন।

**প্রশ্ন :** সন্তানের সাথে তার বাবার সম্পর্কের অবনতি ঘটলে কী করা উচিত?

**উত্তর :** এ-ক্ষেত্রে আগে বাবাকে আলাদাভাবে বোঝাতে হবে যে, এই কারণে সন্তানের সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটছে এবং এই এই করলে তা উন্নত হতে পারে। আর সন্তানকে আলাদাভাবে বাবার সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের গুরুত্ব বোঝাতে হবে। সেইসাথে সম্পর্ক উন্নয়নে সন্তান যাতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে সেজন্যে তাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

**প্রশ্ন :** সন্তানকে যদি মা-বাবা আজেবাজে গালি দেন, তাহলে করণীয় কী?

**উত্তর :** অনেক সময় কোনো মা-বাবা রেগে গেলে সন্তানকে অশ্রাব্য গালিগালাজ করেন, যা কোনোভাবেই ঠিক নয়। কিন্তু মা-বাবা রেগে গেলে আপনি করবেনটা কী? প্রো-একটিভ থাকবেন, বিনয়ী হবেন এবং মা-বাবার জন্যে আপনি দোয়া করবেন।

সন্তান হিসেবে এ ধরনের পরিস্থিতিতে উত্তেজিত না হয়ে, রাগ না করে বরং তাদের জন্যে দোয়া করাই হবে গালিগালাজের সর্বোত্তম প্রতিকার। কারণ যত কিছুই হোক, তারা তো আপনার মা-বাবা। তারা যদি পৃথিবীতে না থাকেন, তাহলে মা/ বাবা ডাকার জন্যে কাউকে পাবেন না।

আবার তারা কেন এমনটা করছেন, তা-ও আপনার ভেবে দেখা প্রয়োজন অর্থাৎ আপনার কোনো ভুলের কারণে তারা এটা করছেন কিনা। এমনটা হলে অবশ্যই আপনার নিজেকে শুধরে নেয়া প্রয়োজন। তারা যা-ই বলুক এগুলোকে আমলে না নিয়ে প্রো-একটিভ থাকতে হবে।

## পারিবারিক সম্পর্ক ॥ স্বামী-স্ত্রী

**প্রশ্ন :** পারিবারিক জীবনে নিত্যদিন ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে। আমার স্ত্রী আমাকে বোঝে না। এ-ক্ষেত্রে করণীয় কী?

**উত্তর :** স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কে একটা সাধারণ অভিযোগ হলো, ও আমাকে বোঝে না। স্ত্রীর অভিযোগ—স্বামী তাকে বোঝে না। স্বামীর অভিযোগ—স্ত্রী তাকে বোঝে না। এই ভুল বোঝাবুঝিগুলো কিন্তু খুব ছোটখাটো বিষয় নিয়ে হয়। যেমন, হয়তো কোনো একদিন আপনি অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি বাসায় চলে এলেন স্ত্রীকে সারপ্রাইজ দেবেন বলে। স্ত্রীর জন্যে একটা গিফটও হয়তো নিয়ে এলেন। কিন্তু বাসায় এসেই দেখেন স্ত্রীর মুখ থমথমে। বোঝা যাচ্ছে প্রচণ্ড রেগে আছেন।

যখনই জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে, অমনি স্ত্রী বারুদের মতো জ্বলে উঠলেন। উচ্চস্বরে যত ক্ষোভের কথা বলতে লাগলেন। আপনি কিছুই বুঝতে পারছেন না, এমন করছে কেন? এর মধ্যেই তার জন্যে আনা উপহারটা বাড়িয়ে দিতেই ছুড়ে মেরে হয়তো বলল, লাগবে না তোমার গিফট। আপনিও রেগে গেলেন। এত শখ করে কেনা গিফট ছুড়ে মারল! কী নিষ্ঠুর স্ত্রীর স্বামীই না হতে হয়েছে আমাকে! ব্যস, লেগে গেল ঝগড়া।

অথচ ঘটনা কিন্তু খুব ছোট। স্বামীটি যদি একটু মাথা ঠান্ডা করে ভাবতেন, সকালবেলা যে স্ত্রীর মুড এত ভালো ছিল, বিকেলবেলা সে কেন এমন করছে! নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো কারণ আছে। এখানে কারণ হয়তো যা ছিল তা হলো, দুপুরে শাশুড়ির সাথে স্ত্রীর কথা কাটাকাটি হয়েছে, মনোমালিন্য হয়েছে। স্ত্রীর সেই রাগ গিয়ে পড়েছে স্বামীর ওপর। স্বামীটি পড়েছে ক্রসফায়ারে। ফায়ারটা ছিল শাশুড়ির দিকে। কিন্তু মাঝখানে স্বামী এসে পড়ায় সে মিসফায়ারড হয়ে গেছে।

অতএব পারিবারিক জটিলতায় বা সমস্যায় সবসময় আগে প্রেক্ষাপটটা বোঝার চেষ্টা করবেন। তাহলেই দেখবেন মুহূর্তের উত্তেজনায় ভুল না করে আপনি সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে পারছেন। পারিবারিক জীবনে সমস্যার ক্ষেত্রে প্রথমত আমাদের দেখতে হবে, সহজ সত্যটি কী? অর্থাৎ যেটিকে আপনি ফেনিয়ে তুলছেন, তার পেছনের কারণটি কী বা মূল ঘটনাটি কী? পারিবারিক জীবনে আমরা যে ভুলটা করি তা হলো, অনেক রকম ধারণার ওপর ভিত্তি করে কথা বলি। অন্যপক্ষকে কথা বলতে না দিয়ে হয়তো বলতে থাকি, 'তুমি নিশ্চয়ই এটা ভেবে এভাবে বলেছ'।

কিন্তু এভাবে না বলে সহজ সত্যটা শনাক্ত করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় গেলে দেখা যাবে, দৈনন্দিন পারিবারিক সমস্যার বেশিরভাগ এমনিতেই মিটে গেছে। সহজ সত্য শনাক্ত করলে দেখবেন, রাগ ক্ষোভ বা ঝগড়ার কারণই অনুপস্থিত। এর বদলে হাসিই পাবে আপনার। কারণ পারিবারিক ক্ষেত্রে ৯০ ভাগ রাগারাগি হয় তুচ্ছ সব কারণে, যা আমরা অনায়াসে এড়াতে পারি।

দ্বিতীয়ত, সহজ সত্য বোঝার পরে তা কৌশলে প্রকাশ করা। পারিবারিক জীবনে এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা মনে করি, সহজ সত্যটি একেবারে সরাসরি প্রকাশ করাই তো উত্তম। এখানে আবার কায়দাকৌশলের কী আছে? এখানেই আমরা ভুলটা করি। কারণ সহজ সত্যকে 'সহজ সত্য' হিসেবে গ্রহণ করতে পারে মাত্র শতকরা একভাগ লোক। আর শতকরা ৯৯ ভাগই সহজ সত্যকে মেনে নিতে পারে না।

পারিবারিক ঝগড়ায় হয়তো স্বামী স্ত্রীকে বা স্ত্রী স্বামীকে রাগের মাথায় বলে ফেলেন, 'তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছ' বা 'তোমার জন্যে এ ক্ষতিটা হয়েছে'। এভাবে বলার মাধ্যমে সরাসরি তাকে অভিযুক্ত করা হলো, তৈরি হলো 'তুমি-আমি'র দেয়াল। অথচ কথাটি এভাবেও বলা যেত যে, 'আমি কষ্ট পেয়েছি'। কারণ এটাই ছিল সহজ সত্য।

এভাবে বললে একদিকে যেমন সরাসরি অভিযুক্ত করা হলো না, 'তুমি-আমি'র দেয়াল হলো না; তেমনি অপরপক্ষের সমবেদনাও সৃষ্টি হলো আপনার জন্যে। কিন্তু সরাসরি অভিযুক্ত করলে সমবেদনার পরিবর্তে আসত ব্যাখ্যা। তিনি বোঝাতে চাইতেন, আমি ভুল করি নি, তুমিই করেছ। তখন কষ্টও পাবেন, আবার ভুলও স্বীকার করতে হবে। তাই সরাসরি অভিযুক্ত না করেও সহজ সত্য প্রকাশ করা যায়।

তৃতীয়ত, এই কষ্টকে দূর করা। এর দুটো উপায় রয়েছে। এক হলো, যে কষ্ট দিয়েছে তাকে জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া। কিন্তু পারিবারিক জীবনে এটি সবচেয়ে কঠিন কাজ। মা-বাবা, ভাইবোন, স্বামী-স্ত্রী, ছেলেমেয়ে—এদের মধ্যে যে-ই আপনাকে কষ্ট দিক না কেন, আপনি তাকে আপনার জীবন থেকে দূরে ঠেলে দিতে পারবেন না।

এ-ক্ষেত্রে দ্বিতীয় যে উপায় রয়েছে তা হলো, সম্পর্কের সেতু নির্মাণ করা। সম্পর্কের সেতুবন্ধন গড়তে হবে, দেয়াল নয়। এই সেতু নির্মাণ করার জন্যে প্রয়োজন হলো আপনার বিশ্বাস। আপনার যে জয় করার ক্ষমতা রয়েছে সে ক্ষমতায় বিশ্বাস যে, যে-কোনো পরিস্থিতিকে আমি জয় করতে পারি, যে-কোনো মানুষকে আমি আমার পক্ষে আনতে পারি। মা-বাবা, স্বামী-স্ত্রী বা সন্তান যে-ই হোক না কেন, আমি তাকে জয় করতে পারি।

এই বিশ্বাস যত আপনার মধ্যে প্রবল হবে, তত আপনি সেতু নির্মাণ করতে পারবেন। কারণ বিশ্বাসই এই সেতুর স্তম্ভ। কাজেই পারিবারিক ক্ষেত্রে যে-কোনো ভুল বোঝাবুঝি বা দূরত্বকে দূর করার জন্যে বিশ্বাস হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এর সাথে যোগ করতে হবে মমতা। অতএব বিশ্বাস করুন এবং সমমর্মী হোন। তাহলে স্বামী বা স্ত্রীকে বোঝানো সহজ হবে।

**প্রশ্ন :** আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার সমস্যা হলো বোঝাপড়ার অভাব। সে আমাকে বুঝতে পারে না বা বুঝতে চায় না। বেছে বেছে সে আমার অপছন্দের কাজগুলোই করে। এ নিয়ে কিছু বলতে গেলেও ঝগড়া বেঁধে যায়। ফলে আমি খুব মানসিক দ্বন্দ্বে আছি।

**উত্তর :** অন্যেরা আমাকে বুঝুক—এটাই আমরা সবসময় চাই। অন্যেরা আমাকে বোঝার আগে আমিই তাদের বুঝব—এই দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ মমতা, সমমর্মিতার দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা ধারণ করতে পারি না। আপনার স্ত্রীর প্রতি যদি সমমর্মী হতে পারতেন, যদি বুঝতে চাইতেন কেন তিনি সবসময় আপনার অপছন্দের কাজগুলো করেন, তাহলে এই দূরত্ব থাকত না। তার প্রতি আপনার নিঃশর্ত ভালবাসা ও দেয়ার মনোভাব থাকলে কখনোই এই দ্বন্দ্ব চলতে পারত না। কারণ নিঃস্বার্থ ভালবাসার শক্তিই এমন, যা অপরপক্ষের মধ্যে ভালো হওয়ার শক্তিকে জাগ্রত করে।

এটা তখনই সম্ভব যখন মানুষটিকে আপনি তার আচরণ থেকে আলাদা করতে পারবেন। তাই স্ত্রীকে মমতা ও ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখুন, বুঝতে চেষ্টা করুন। দেখবেন, এটা তাকে স্পর্শ করবেই। তখন এমন প্রতিদান পাবেন, যা আপনি কল্পনাও করেন নি। যখন দুই তরফ থেকেই মমতা-প্রেম নিঃশর্ত হয়, তখনকার যে আনন্দ তা কোনো চুক্তিনামা দিয়ে অর্জন করা সম্ভব নয়; ধমক, চাবুক বা তলোয়ার দিয়ে হাসিল করা সম্ভব নয়।

**প্রশ্ন :** সদ্য বিয়ে করেছি। আমার প্রশ্ন, একজন মানুষ কীভাবে পরিবারকে সুখী করতে পারে? স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক কেমন থাকা উচিত?

**উত্তর :** এভাবে বলতে পারি যে, স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যকার দাম্পত্য সম্পর্কের বাইরে একজন স্বামী যদি তার স্ত্রীর আচরণকে নিজের মেয়ের মতো করে বিবেচনা করতে পারে এবং একজন স্ত্রী যদি স্বামীর বৈশিষ্ট্যকে তার ছেলের মতো করে বিচার করতে পারে, তাহলে আর সমস্যা থাকে না। কারণ আমরা

মেয়ের অনেক দোষ মাফ করে দেই। কিন্তু একই দোষ স্ত্রী করলে মাফ করতে পারি না। মেয়েকে মাফ করতে পারলে স্ত্রীকে কেন মাফ করা যাবে না? ছেলেকে মাফ করতে পারলে কেন ছেলের বাবাকে মাফ করবেন না? এভাবে ভাবতে পারলে দেখবেন, আপনারা সত্যিকারের সুখী পরিবার।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সুখী পরিবারগুলোর ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো—পারস্পরিক মমতা ও গ্রহণযোগ্যতা, একে অন্যের প্রতি বিশ্বস্ততা ও দায়িত্ববোধ, ইতিবাচক আলাপ ও যোগাযোগ, একসাথে সময় কাটানো, মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতা এবং ধর্ম ও আত্মিক বিষয়গুলোর চর্চা। প্রতিটি বৈশিষ্ট্যই উৎসারিত হয় মানসিক প্রশান্তি থেকে। আর মানসিক প্রশান্তি বাড়াতে ধ্যানের বিকল্প নেই। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ পূর্ণবয়স্ক ৩,৫০০ মানুষের ওপর জরিপ চালিয়ে দেখেছে, মেডিটেশন অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা দূর করে। এনে দেয় প্রশান্তি। (ভেরি ওয়েল মাইন্ড ডট কম, ১০ জুন ২০২০; হেলথলাইন)

এজন্যেই গত ৩৩ বছর ধরে আমরা দেখছি, স্বামী-স্ত্রী উভয়েই মেডিটেশন চর্চা করলে সেই পরিবারগুলো অনেক বেশি সুখী হয়। একটি রিপোর্ট পড়লাম—যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ হ্যাম্পটনের আইরিন ও ডেভিড টম্পকিনসন। এ দম্পতি ৪৭ বছর ধরে সুখী দাম্পত্য জীবনযাপন করছেন এবং ৩২ বছর ধরে সুখী জীবনের সূত্র শিখিয়ে যাচ্ছেন অন্য দম্পতিদের। তারা বলেন, 'মেডিটেশন অতীতের ক্ষতগুলো সারিয়ে জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। আমরা একসাথে ধ্যানচর্চা করি। এই অভ্যাস আমাদের বিবাহিত জীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধ করেছে।' (সাইকোলজি টুডে, ৬ ডিসেম্বর ২০১৭)

অতএব পরিবারকে সুখী করতে হলে এ ব্যাপারে মনোযোগী হোন এবং নিয়মিত মেডিটেশন করুন।

**প্রশ্ন :** যত বড় ব্যবসায়ী/ কর্মকর্তা হোক না কেন পার্টনার বা বন্ধুদের সাথে জরুরি মিটিং ও কাজ শেষ করে একজন স্বামী/ বাবার বাসায় ফিরতে প্রতিদিন কমপক্ষে কয়টা বাজা উচিত?

**উত্তর :** এটা বলা খুব কঠিন। এটা কাজের ধরনের ওপর নির্ভর করে যে, কার ব্যস্ততা কতটুকু। সেটা হতে পারে কাজের প্রয়োজন—ব্যবসায়িক বা সাংগঠনিক প্রয়োজন। অর্থাৎ কাজের প্রয়োজনে বাইরে থাকা আর শুধু আড্ডা দেয়ার জন্যে বাইরে থাকা—এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তবে আড্ডা দেয়ার জন্যে অবশ্যই বাইরে থাকা উচিত নয়।

অনেক স্বামীই আছে ঘরে স্ত্রীকে সময় না দিয়ে বাইরে শুধু শুধুই আড্ডা দেয়। এরা আসলে মারাত্মক ভুল করে। এ ভুল পরবর্তীকালে এদের জীবনে অশান্তির ঝড় বয়ে আনে। কীভাবে? দেখুন, একটা বয়সে এই আড্ডা হয়তো আপনার ভালো লাগবে না। তখন আপনি পরিবারে ফিরতে চাইলেও দেখা যাবে যে, আপনি আর স্ত্রী ও সন্তানদের জীবনের অংশ হতে পারছেন না। কারণ দীর্ঘদিন আপনি তাদেরকে সময় দেন নি। তারা আপনার অনুপস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তারা তাদের মতো করে জীবন সাজিয়ে নিয়েছে। তখন আপনার উপস্থিতি তাদের কাছে বেমানান মনে হতে পারে। এটা শুধু স্বামী নয়, বরং পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের জন্যে প্রযোজ্য। অতএব এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

**প্রশ্ন :** আমার স্ত্রী আমার কথার বাধ্য নয়। আমার স্ত্রীর কাছে আমি শান্তি পাই নি। আমার কী করা উচিত?

**উত্তর :** স্ত্রী তো আপনার সার্ভেন্ট নয়, তিনি আপনার জীবনসঙ্গী। তাকে আপনার বাধ্য হতে হবে কেন? স্ত্রীর সাথে মমতা দিয়ে কথা বলবেন, যেন তিনি আনন্দের সাথে আপনার অনুরোধের কাজটা করেন। কারণ মমতাপূর্ণ কথা সবাই শোনে। কিন্তু আপনি যদি মনে করেন, আপনার কর্মচারীকে যেভাবে আদেশ দিয়ে কাজ করান সেভাবে স্ত্রীকে করাবেন, তাহলে ভুল করবেন। আর আজকাল তো ভালোভাবে না বললে কর্মচারীও কাজ করে না। সবসময় মনে রাখবেন, স্ত্রীর সম্মান আপনার সম্মান।

অতএব স্ত্রীর সাথে সেই সম্মান ও মনোযোগ দিয়ে কথা বলবেন, হৃদয় থেকে কথা বলবেন। তাহলে আপনি শান্তি পাবেন।

**প্রশ্ন :** সাত মাস আগে পারিবারিকভাবে আমার বিয়ে হয়। কিন্তু তখন থেকে আমার স্বামীকে মেনে নিতে পারছি না। অনেক চেষ্টা করেও সাত মাসে আমাদের মধ্যে কিছু হয় নি। আমার অনেক কষ্ট হলেও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সময় পার করি। আমার দ্বারা সে খুব কষ্ট পাচ্ছে। এভাবে মানুষটাকে কষ্ট দেয়া ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু আমি চেষ্টা করেও পারছি না। কী করব?

**উত্তর :** এটা কি এজন্যে যে, আপনার আগে কারো সাথে সম্পর্ক ছিল বা এমন কোনো অতীত ছিল, যে কারণে হয়তো আপনি স্বামীকে মেনে নিতে পারছেন না? আসলে এগুলো বিয়ের আগেই চিন্তা করা উচিত। বিয়ের পরে

আপনি যা করছেন এটা অপরাধ। আপনি আপনার স্বামীকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করছেন। তাকে কষ্ট দিচ্ছেন, আবার নিজেও কষ্ট পাচ্ছেন।

অতএব যত তাড়াতাড়ি অতীতকে ভুলে নতুনভাবে জীবন শুরু করতে পারেন তত আপনার জন্যে মঙ্গল। আর স্বামীর সাথে থাকবেন কিনা সেটা তো আপনার সিদ্ধান্ত। বোঝা যাচ্ছে যে, স্বামীর প্রতিও আপনার দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে ইতিমধ্যে। তা না হলে তাকে নিয়ে আপনি উদ্বেগ প্রকাশ করতেন না। অতএব বিয়ে যখন হয়ে গেছে, নতুন করে প্রেম শুরু করুন স্বামীর সাথে, তাকে তার মতো করে গ্রহণ করুন।

**প্রশ্ন :** বিয়ের ১০ বছর পার হলো। শুরু থেকে আমার স্ত্রী ভীষণ অশান্তিতে ভুগছে। কুশল জিজ্ঞেস করলেই বলে, তোমার কারণেই আমার সব অশান্তি। কিন্তু আমি চেষ্টা করেছি সকল কারণ দূর করতে, তাকে শান্তিতে রাখতে। এরপরও একই অবস্থা। এখন আমি কী করতে পারি?

**উত্তর :** আপনি তাকে জিজ্ঞেস করবেন না যে, সে কেমন আছে। সবসময় বলবেন, তুমি ভালো আছ। এমনকি তিনি রাগারাগি করলেও আপনি বলবেন, তুমি তো বেশ ভালো আছ। আসলে কারো কারো বহিঃপ্রকাশটাই এরকম, মনে হয় যেন সে খুব বিরক্ত বা ক্ষুব্ধ। আসলে হয়তো তা নয়। তা না হলে ১০ বছর তিনি সংসার করছেন কীভাবে?

আর স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেখা যায়, আপাত ঝগড়া-মারামারি হলেও দুজন দুজনের প্রতি ঠিকই মমতা সহানুভূতি ও ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ—যা তাদেরকে এ সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে। পাশাপাশি আপনি সুখী পরিবারের মনছবি দেখুন।

**প্রশ্ন :** সংসারে টাকা-পয়সাসহ সব বিষয়ে স্ত্রীর কর্তৃত্ব করা কি ঠিক, নাকি স্বামীর কর্তৃত্ব করা ঠিক?

**উত্তর :** যদি ঘরের বিষয় হয়, সাংসারিক ব্যাপার হয়, প্রত্যেক পুরুষের উচিত এই কর্তৃত্ব স্ত্রীর হাতে ছেড়ে দেয়া। তাতে আপনি অনেক চিন্তামুক্ত থাকবেন। আপনার পেশাগত উন্নতির দিকে মনোযোগ দিতে পারবেন। আজ বাজার কী হবে, রান্নায় তেল বেশি দেয়া হবে নাকি লবণ বেশি দেয়া হবে, এই চিন্তাও যদি আপনাকেই করতে হয়, এই কর্তৃত্বও যদি আপনি করতে চান, এর মানে হলো, খামোখা অশান্তি ডেকে নিয়ে আসা।

পরিবার মানে কী? দেয়া এবং নেয়া। আপনাকে কিছু বিষয়ে ছাড় দিতে হবে, কিছু বিষয়ে স্ত্রী ছাড় দেবেন। আর বুদ্ধিমান পুরুষ এসব বিষয়ে প্রথমেই ছাড় দিয়ে দেন। যেমন, স্ত্রীর শাড়ি কিনতে গিয়েও অনেক স্বামী বলেন, এটা নাও, ওটা নাও। কেন? স্ত্রীকে সিদ্ধান্ত নিতে দিন তিনি কোনটা কিনবেন। তিনি চাইলে আপনি মতামত দিতে পারেন, কিন্তু সিদ্ধান্ত তার। এ-ক্ষেত্রে স্ত্রীর খুশিই আপনার খুশি হওয়া উচিত।

সব ব্যাপারেই সবসময় একজন লিডার ঠিক করা উচিত। যেমন, প্রথমদিনই স্ত্রীকে বলে দিন, ঘরের যে-কোনো ব্যাপারে তুমি লিডার। আর বাইরের ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবেই তুমি যদি আমাকে লিডার হিসেবে পছন্দ করো, তবে দায়িত্ব নিতে রাজি আছি। অর্থাৎ প্রথমে আপনি তাকে অধিকার দিলে দ্বিতীয় অধিকার তিনি আপনাকে এমনিতেই দিয়ে দেবেন।

আর পারিবারিক জীবনে ঘরের দায়িত্ব যত স্ত্রীর হাতে দিতে পারবেন, তাকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত ও কাজ করতে দেবেন, তত আপনি সুখী হবেন। কারণ প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব এলাকা থাকা উচিত, যেখানে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবেন তিনি। তাহলে তার মানসিক তৃপ্তি থাকবে এবং আপনিও শান্তিতে থাকতে পারবেন।

আরেকটা বিষয় হলো, স্ত্রীকে কখনো দাসী বা কর্মচারী মনে করবেন না; সবসময় তাকে সহযোদ্ধা, সহযোগী ও বন্ধু মনে করবেন। তাহলে আপনার প্রতি তার যে অনুরাগ, সেটা আসবে ভেতর থেকে। স্ত্রী হিসেবে নিছক কর্তব্য পালন করা আর অনুরাগী হওয়া—দুটোর মধ্যে অনেক পার্থক্য।

**প্রশ্ন :** স্ত্রীর কাছে অনেক সময় টেকনিক্যাল কারণে মিথ্যা বলতে হয়। এটা কি ঠিক হচ্ছে? মিথ্যা না বললে তো অশান্তি হবে।

**উত্তর :** স্ত্রীকে মিথ্যা বলতে হয়, এমন কোনো টেকনিক্যাল কারণ থাকাই উচিত নয়। অর্থাৎ এমন কোনো কাজ করা উচিত নয়, যার জন্যে মিথ্যা বলতে হয়। এ-ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল বা জেনারেল নয়, মূল বিবেচ্য হওয়া উচিত—কারণটি ন্যায়, নাকি অন্যায়। যেমন অনেক স্ত্রী চায় না স্বামী নিজের মা-বাবাকে টাকাপয়সা দিক বা ঘন ঘন দেখতে যাক। সে-ক্ষেত্রে স্বামীটিকে কুশলী হতে হবে। কারণ মা-বাবাকে দেখা বা তাদের খোঁজখবর নেয়া তার কর্তব্য। কিন্তু স্ত্রী যেহেতু পছন্দ করে না, তাই তাকে জানালেও অশান্তি।

এ-ক্ষেত্রে স্ত্রীকে না জানিয়ে অফিসে যাওয়া-আসার পথে বা অন্য সুযোগে যদি আপনি আপনার কর্তব্য পালন করেন, তাতে কোনো বাধা নেই।

স্ত্রী তো সারাক্ষণ আপনাকে পাহারা দিচ্ছে না। তবে স্ত্রীর যদি গোয়েন্দাগিরি করে জেনে নেয়ার মানসিকতা থাকে, তাহলে দৃঢ়তার সাথে সত্য বলাটাই ভালো। কাজেই ন্যায়সঙ্গত কারণ, যেটা স্ত্রী জানলে অশান্তি হবে—এ আশঙ্কায় গোপন করা আর অন্যায় বা ভুল করে সেটা ঢাকার জন্যে মিথ্যাচার করা, এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে প্রথমটি করা যেতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয়টি কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়।

**প্রশ্ন :** আমার স্বামী নিজের মতামতই চূড়ান্ত মনে করে সবসময়। কিন্তু তার বেশিরভাগ সিদ্ধান্তই ভুল, এরকম মানুষের সাথে সংসার করার জন্যে কী করব? ১৮ বছর চলছে সংসারের।

**উত্তর :** ১৮ বছর পার করে ফেলেছেন যেভাবে, সেভাবে বাকি বছরগুলোও পার হয়ে যাবে। কারণ আপনার স্বামীকে আপনি ভালবাসেন। ভালবাসেন বলেই সে ভুল করুক বা ঠিক করুক, আপনার অন্য কোনো দিকে মন নেই বা আপনি সংসার করে যাচ্ছেন। এটা খুব ভালো।

অতএব যখনই কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপার হবে, আপনার মনে হবে স্বামী ভুল করতে পারেন, মেডিটেশনে তাকে কমান্ড সেন্টারে নিয়ে আসুন। মমতার সাথে বোঝান যে, এই ব্যাপারে কিন্তু তুমি এই সিদ্ধান্ত নেবে। দেখবেন, কাজ অনেক সহজ হয়ে গেছে।

**প্রশ্ন :** আমার স্বামী সব বিষয়ে খুব অল্পতে হতাশ হয়ে পড়েন, যা আমার মধ্যে প্রচণ্ড মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। আমিও মাঝে মাঝে ধৈর্যচ্যুত হয়ে পড়ি। কীভাবে এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারি?

**উত্তর :** একজন রাগী হলে আরেকজনকে ঠান্ডা হতে হয়। তেমনি তিনি যেহেতু অল্পতেই হতাশ হয়ে পড়েন, আপনি আশার পাহাড় হয়ে উঠুন, যেন আপনার স্বামীর আশ্রয়স্থল আপনি হতে পারেন। আপনার স্বামী হতাশ হয়ে পড়েন মানে আপনি ছাড়া তার হতাশার কথা শোনার কেউ নেই। তাই সবসময় আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখুন এবং স্বামীকেও সেভাবে উদ্বুদ্ধ করুন। সেইসাথে স্বামীর জন্যে দোয়া করুন। তাকে নিয়মিত হিলিং করুন।

**প্রশ্ন :** দুষ্ট প্রকৃতির স্বামীর সাথে কী ধরনের ব্যবহার করা উচিত? ওনাকে কীভাবে শায়েস্তা করা উচিত?

**উত্তর :** একজন স্বামী যতই দুষ্ট হোক বা দুরাচারী হোক, স্ত্রী কখনো তাকে শায়েস্তা করে শোধরাতে পারে না। তাকে শোধরাতে হবে ভালবাসা, মমতা এবং প্রেম দিয়ে। তবে আপনার কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে, আপনার স্বামীকে আপনি ভালবাসেন। তাই তাকে এটাই বুঝতে দিন যে, আপনি তাকে ভালবাসেন। তাহলেই দেখবেন, তাকে নিয়ে আপনার আর অভিযোগ নেই।

**প্রশ্ন :** চেষ্টা করেও স্ত্রীর সাথে সম্পর্কের উন্নতি করতে পারছি না। দীর্ঘ ২৪ বছরের বিবাহিত জীবন। বড় বড় দুই ছেলেমেয়ে। স্ত্রীর ভালবাসায় কোনো কমতি নেই। কিন্তু সম্পর্ক তেমন উষ্ণ নয়।

**উত্তর :** আপনি আজ থেকে নতুনভাবে মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে স্ত্রীকে নিয়ে আসুন এবং আপনার প্রথম পরিচয়ের দিনের অথবা বিয়ের সেই অনুভূতি নিয়ে তাকে দেখুন। সেই অনুভূতি বিকিরণ করুন। ক্রমাগত ৪০ দিন করে যান। দেখুন সম্পর্ক কত উন্নত হয় এবং কত ভালো হয়! কারণ আপনার দাম্পত্য জীবনের বয়স ২৪ বছর। তার মানে আগামী বছর আপনারা সিলভার জুবিলি পালন করবেন। আমরা চাই, আগামী বছর যখন সিলভার জুবিলি পালন করবেন, তখন যেন বলতে পারেন, আমরা অত্যন্ত সুখী এবং আগের সেই অবস্থায় আমরা ফিরে গেছি।

**প্রশ্ন :** স্ত্রীকে বন্ধু ভেবে অতীত সম্পর্কে কিছু তথ্য দেয়ায় কিছুটা সমস্যা অনুভব করছি। এ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় বলবেন দয়া করে।

**উত্তর :** তীর যেহেতু বেরিয়ে গেছে, এখন আর কিছু করার নেই। এখন স্ত্রীর কাছেই নিজেকে সমর্পণ করুন। অর্থাৎ মারো কাটো যা-ই করো, সবই এখন তোমার হাতে। আমার আর কিছু করার নেই। একটা জিনিস মনে রাখবেন, স্ত্রীকে বন্ধু মনে করে বলা আর বন্ধু হয়ে যাওয়ার পর বলা—এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। আপনি বন্ধু ভেবে বললেন, কিন্তু সে ভুল বুঝল। বন্ধু হয়ে যাওয়ার পর বললে সেটা ঠিক আছে।

**প্রশ্ন :** দিবানিশি স্ত্রী শুধু শুধু ভেগুর ভেগুর করে। ওষুধ কী? প্রতিকার চাই।

**উত্তর :** স্ত্রী যদি আপনার সাথে 'ভেগুর ভেগুর' না করে আরেকজনের সাথে করেন, সেটা কি আপনার ভালো লাগবে? আসলে অধিকাংশ স্বামী একটা

জিনিস বুঝতে চান না, একজন মানুষ যখন মা-বাবা, ভাইবোন এবং যে পরিবেশে জন্মের পর থেকে তার বেড়ে ওঠা, সেই পরিবেশ ছেড়ে সম্পূর্ণ নতুন একটা পরিবেশে আসেন, তখন তিনি কতটা মানসিক অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকেন! এ অনিশ্চিত পরিবেশে স্বামী নামের পুরুষটিকেই তিনি মনে করেন তার সব ভরসার স্থল, নিরাপদ আশ্রয়।

কাজেই তার ভালোলাগা, মন্দলাগা, আনন্দ-দুঃখ, আশা-হতাশা সবকিছুই তিনি স্বামীর সাথে শেয়ার করতে চাইবেন, এটাই স্বাভাবিক। এমনকি বিয়ের পর মেয়েরা মা-বাবার সাথেও অনেক কথাই আর খোলামেলাভাবে বলতে পারেন না। তাই এসব ক্ষেত্রে স্বামীর উচিত স্ত্রীর সব কথা মন দিয়ে শোনা। স্ত্রী যা বলবেন, আপনি বলবেন যে, হ্যাঁ। যদি বলেন, তুমি মরো না কেন? বলবেন—হ্যাঁ, মরে তো যেতেই চাই। শুধু তোমার কথা চিন্তা করেই মরতে পারছি না। কারণ আমি মরলে তো তুমি বিধবা হবে।

অর্থাৎ আপনি যত হ্যাঁ বলবেন, যত শুনবেন, তার কথা তত কমতে থাকবে। স্ত্রীর জন্যে কোনো ওষুধের প্রয়োজন নেই। আপনার দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক থাকলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কারণ আপনার অভিযোগের ভাষা দেখে মনে হচ্ছে স্ত্রীর প্রতি আপনার শ্রদ্ধাবোধ কম। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা, মমতা এবং সম্মানবোধ থাকলে সম্পর্কটা উভয় পক্ষের জন্যেই সুখকর হয়। অতএব আপনি আপনার স্ত্রীকে সম্মান এবং সমমর্মিতার সাথে গ্রহণ করুন। তার কথাগুলোকে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসেবে নিন। দেখবেন, ওর মধ্যেও একটা সুর আছে।

**প্রশ্ন :** স্ত্রী ক্ষমা না করলে স্বামী বেহেশতে যেতে পারবে না। আমি জানতে চাই, স্বামী ক্ষমা না করলে স্ত্রী কি বেহেশতে যেতে পারবে?

**উত্তর :** সবকিছু সিরিয়াসলি নিলে হয় না। জীবনটাকে অনেক সময় হালকাভাবে নিতে হয়। স্ত্রী আবেগপ্রবণ হতেই পারেন। তিনি সেই আবেগের প্রকাশ স্বামীর ওপরই করবেন। অন্য কারো ওপর আবেগের প্রকাশ করলে সেটা স্বামী হিসেবে আপনার জন্যে মোটেই সুখকর হবে না। আর স্বামী যদি আবেগপ্রবণ হয়ে যান, এটা স্বামী হিসেবে তার একটা ব্যর্থতা।

আপনি তো স্ত্রীকে ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়ে বিয়ে করেছেন। অতএব স্ত্রীর ওপর আপনার বিরক্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। বরং স্ত্রী আপনার ভরণপোষণে অসন্তুষ্ট থাকতে পারেন এবং আপনার ওপর বিরক্তও হতে পারেন। কিন্তু আপনি কেন বিরক্ত হবেন? নিজের স্ত্রীর বেহেশতে যাওয়া

আটকাবেন কেন? স্ত্রী যদি বলেনও যে, তোমার বেহেশতের সার্টিফিকেট আমি আটকে রাখব। আপনি অনায়াসে হেসে বলবেন যে, 'আমি তোমাকে ধরে থাকব। আমার সার্টিফিকেট আটকে রেখে তুমি যাবে কোথায়? আর তুমি যতই রাগ করো, আমি তোমাকে ভালো স্ত্রীর সার্টিফিকেট দিয়ে দেবো। কারণ তোমাকে ছাড়া আমি বেহেশতে যেতে চাই না।'

দেখা যাবে, তিনিই আবার আপনাকে সার্টিফিকেট দেয়ার জন্যে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করছেন। এই আবেগটুকু আছে বলেই সংসার টিকে আছে। নারী যদি পুরুষের মতো সবকিছু যুক্তি দিয়ে বিচার করত, আমার মনে হয় বেশিরভাগ সংসার টিকত না। সংসার টিকে থাকার পেছনে নারীর এই আবেগের ভূমিকা অনেক বেশি। নারীরা রাগের মাথায় যা বলেন, সব কথা সিরিয়াসলি নিতে হয় না।

অতএব বিষয়গুলো সবসময় সহজভাবে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। একটি ঘটনা অনেকেই জানেন। একবার হযরত ওমর (রা) তার স্ত্রীর সাথে রাগ করে কথা বলছেন। তার স্ত্রীও পাল্টা উত্তর দিলে তিনি রেগে গেলেন যে, স্বামীর সাথে তর্ক করছ! স্ত্রী বললেন, আপনার মেয়ে যে নবীজীর (স) সাথে ঝগড়া করে, তিনি তো কিছু বলেন না।

ওমর (রা) আরো রেগে গেলেন। নবীজীর (স) ঘরে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আমার মেয়ে নাকি আপনার সাথে বেয়াদবি করে? এদিকে বাবার রাগ দেখে হাফসা (রা) নবীজীর পেছনে গিয়ে লুকালেন। নবীজী (স) হেসে বললেন, এটা তো আমাদের স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার। এর মধ্যে আপনি কেন নাক গলাবেন?

অর্থাৎ নবীজী (স) কত ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছেন! তিনি নারীদের অধিকারকে সমুন্নত করেছেন। তিনি সবক্ষেত্রেই আমাদের আদর্শ। তাঁর মতো আমাদেরও সহনশীল হওয়া উচিত। কারণ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা শুধু আইনগত নয়, এর সাথে মমতা জড়িত হওয়া উচিত। এ-ক্ষেত্রে যত সমমর্মী হবেন, তত আপনি ভালো থাকবেন।

**প্রশ্ন :** পারিবারিক শান্তি না থাকলেও অনেক সময় বাধ্য হয়ে সংসার করতে হয়। প্রশান্তি কেমন করে আসবে?

**উত্তর :** সংসার মানেই হচ্ছে অ্যাডজাস্টমেন্ট। অ্যাডজাস্টমেন্ট আপনাকে করতেই হবে। পরিবারে সবসময়ই যে প্রশান্তি থাকবে তা নয়। যত অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন তত আপনার প্রশান্তি বাড়বে। যত আপনি দেয়ার

চেষ্টা করবেন, তত আপনার মানসিক তৃপ্তি বাড়বে এবং সেই পরিতৃপ্তি একসময় অন্যদের মধ্যেও সঞ্চারিত হবে।

**প্রশ্ন :** আপনি বলেছেন সংসার মানেই অ্যাডজাস্টমেন্ট, এই অ্যাডজাস্টমেন্ট কি শুধু একপক্ষ থেকেই হবে? আমার স্বামী কখনোই কোনো ব্যাপারে অ্যাডজাস্ট করতে চায় না। তার ধারণা, সে যা করে সব পারফেক্ট। আসলে তা কতটা অযৌক্তিক সেটা আমি বুঝতে পারি, কিন্তু সে বুঝতে পারে না। তার বোন আমাকে বলেছে, সে কারো কাছে নত হয় না। অন্যায়ও যদি করে, আমি সেটা ধরতে গেলে সে সেটা মেনে নিতে চায় না। আমি যদি কোনো মতামত দেই, সেটাও শুনতে চায় না। মেডিটেশনের কথা বললেও শুনতে চায় না। এ সমস্যাগুলোর সমাধান কী? আমি কী করব?

**উত্তর :** আপনাকে কুশলী হতে হবে। অযথা সংঘাতের দিকে যাবেন না। কথা বলতে হবে কৌশলে, সময়-সুযোগমতো। একই কথা একসময় শুনে কেউ 'না' বলতে পারেন। আবার সেই কথাই অন্য সময়ে শুনে তিনিই হয়তো 'হাঁ' বলবেন। আপনাকে এটা বুঝতে হবে, কখন বললে তাকে কথাটা মানাতে পারবেন। আপনি যদি এই কৌশল অবলম্বন করেন এবং প্রো-একটিভ থাকেন, তাহলে সে শুনতে বাধ্য। আজ না শুনলে কাল, কাল না শুনলে তিন দিন পরে শুনবে। তিন দিন পরে না হলে তিন মাস পরে শুনবেই।

আর 'মেডিটেশনের কথা বললেও শুনতে চায় না'—তার মানে মেডিটেশন আপনার মধ্যে হয়তো সেভাবে পরিবর্তন আনতে পারে নি। কারণ মেডিটেশনের কথা মুখে বলে প্রভাব বিস্তার করানো যায় না। বক্তা নিজে মেডিটেশন চর্চা করে কতটা প্রো-একটিভ থাকতে পারেন, কতটা সুস্থ প্রাণবন্ত থাকেন, অর্থাৎ মেডিটেশন চর্চার প্রভাব বক্তার ওপর কতটা পড়েছে, সেটার ওপর নির্ভর করে বক্তার কথা অপরপক্ষ কতটা শুনবে।

ছোট্ট উদাহরণ দেই। কোয়ান্টামের এক সদস্য আগে এত বদরাগী ছিলেন যে, বাসায় তিনি যদি তার পাঁচ বছর বয়সী ছেলের শুধু হাত ধরতেন, ছেলে ভয়ে পেশাব করে দিত। সেই মানুষটি কোর্স করে একদম বদলে গেলেন। একদিন তিনি তার ছোট মেয়েটিকে আদর করে কোলে তুলে নিয়েছেন, মেয়েটি তো চিরকালের বদরাগী বাবাকে দেখে অভ্যস্ত। সে ভয় পেয়ে মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করছে, মা, আব্বুর কী হয়েছে?

এমন পরিবর্তন দেখার পরও স্ত্রী বলেছিলেন, আমি আরো দুবছর দেখব। যদি দেখি সত্যিই তার পরিবর্তন হয়েছে, তাহলে আমিও কোর্স

করব। দুবছর পর স্ত্রী কোর্স করেছিলেন। তখন স্বামী সম্পর্কে তার শুকরিয়ার অন্ত ছিল না। স্ত্রী এখন কোয়ান্টামের প্রশংসা করেন, এমনকি সঙ্ঘের সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করেন।

অতএব নিয়মিত মেডিটেশন করুন, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আপনার মধ্যে আকর্ষণী ক্ষমতা তৈরি হবে। তখন যে-কাউকে আপনি প্রভাবিত করতে পারবেন, স্বামীকে তো বটেই। আমরা দেখেছি, যে স্ত্রী আগে কোর্স করেছেন, ৯০% ক্ষেত্রে তারা তাদের স্বামীকেও নিয়ে এসেছেন। কিন্তু মেডিটেশন কোর্স করেছেন এমন বহু স্বামী আছেন, যারা তাদের স্ত্রীদের কোর্সে আনতে পারেন নি। কারণ দৃশ্যত দুর্বল মনে হলেও প্রভাবিত করার ক্ষমতা নারীদের বেশি। আপনার মধ্যে সেই ক্ষমতাটা সৃষ্টি করতে হবে। যখন নিয়মিত মেডিটেশন করবেন, এর ফলে আপনার মধ্যকার পরিবর্তন দৃশ্যমান হলে আপনার স্বামীকে মেডিটেশনের কথা বলতে হবে না, তিনি নিজেই করবেন।

**প্রশ্ন :** স্বামীর আচরণে 'আমি কষ্ট পেয়েছি' বলে ফেললেই কি সেই কষ্ট ভুলতে পারব? তিনি তার আচরণ দিয়ে আমার কষ্ট ভোলাতে পারেন না।

**উত্তর :** স্বামীর আচরণে কষ্ট পেয়ে লাভ কী? তাকে নিয়েই তো আপনার সংসার। অতএব তিনি যেন বোঝেন আপনি কষ্ট পেয়েছেন; সেই ভাষায় তাকে বোঝান। আর আপনি কষ্টটা ভুলে যান। কারণ ছোট ছোট কষ্ট যদি মনে রাখেন, তাহলে এত কষ্টের বোঝা নিয়ে বড় কাজ করবেন কীভাবে?

স্বামীকে ক্ষমা করে দেবেন। নিজের ছেলেকে যদি ক্ষমা করতে পারেন, তাহলে স্বামীকে কেন ক্ষমা করতে পারবেন না? স্বামী-ও তো কারো ছেলে। মেয়েকে যদি ক্ষমা করতে পারেন, তাহলে স্ত্রীকে কেন ক্ষমা করতে পারবেন না? ক্ষোভ ভেতরে রেখে তো লাভ নেই। পারিবারিক ক্ষেত্রে যত ক্ষমা করা যায়, তত বেশি ভালো থাকবেন।

**প্রশ্ন :** আমার স্বামী আমাকে বিন্দুমাত্র বোঝার চেষ্টা করে না। তার এই আচরণের কারণে মনের সবটুকু প্রশান্তি হারাতে বসেছি। কী করা উচিত?

**উত্তর :** আপনি আপনার স্বামীকে বোঝার চেষ্টা করুন। কারণ আপনি তো আপনার স্বামীকে বদলাতে পারবেন না। কিন্তু আপনি নিজেকে বদলাতে পারবেন। কোয়ান্টামের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নিজেকে বদলাতে চেষ্টা করুন। আপনার পরিবর্তন হয়তো একসময় আপনার স্বামীকেও বদলে দেবে।

**প্রশ্ন :** আমি যেখানে যাই, যাদের সঙ্গে মিশি, সবাই আমাকে খুব পছন্দ করে এবং আমার ভালো ব্যবহারের কথা বলে। শ্বশুরবাড়িতেও আমি খুব প্রিয়। কিন্তু আমার স্বামী আমার সাথে সবসময় খারাপ ব্যবহার করে। অথচ আমাকে সে পছন্দ করেই বিয়ে করেছিল। সন্তানদের সাথেও আচরণ একই। এদিকে আমাকে সবাই অবিবাহিত মনে করে। আমার স্বামীর সমস্যাটা কী?

**উত্তর :** সমস্যাটা কিন্তু আপনার মধ্যে। এই যে সবাই আপনাকে অবিবাহিত মনে করে, তার মানে আপনার আচরণের জন্যেই এমনটা হচ্ছে। আর এতেই হয়তো আপনার স্বামীর মধ্যে আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে যে, কখন আবার কী হয়! স্বামীর কাছে যেভাবে অ্যাপ্রোচ করা দরকার, সেটা আপনি বুঝতে পারছেন না। স্বামীকে মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে নিয়ে আসুন। আপনার অবস্থান তাকে বোঝান। সেইসাথে নিজেকে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করুন স্বামী কেন আপনার সাথে খারাপ ব্যবহার করে, আপনার কোথায় ভুল হচ্ছে? আপনার গুণগুলোকে বিকশিত করুন। নিজেকে সময় দিন, যত্ন নিন। তাহলে দেখবেন, আপনি সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন।

**প্রশ্ন :** আমার স্বামীর রাগ খুব বেশি এবং খুব চাপা। যখন রাগ করে, তখন সে আমার সাথে দুই/ তিন দিনও কথা বলে না। আমি পরিবেশ হালকা করার জন্যে অনেক পদক্ষেপ নিই। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। সে যে কারণে রাগ করেছিল, সেই কাজটি আমি না করা পর্যন্ত তার রাগ কমবে না। যদিও কাজটি পুরোপুরি অযৌক্তিক। এ-ক্ষেত্রে কী করব?

**উত্তর :** বোঝা যাচ্ছে স্বামী কথা না বললে আপনি অস্বস্তিতে ভোগেন। এখন স্বামীকে বুঝতে হবে, স্ত্রীকে কীভাবে কোন সময় কোন কথা বলব। স্ত্রীকে বুঝতে হবে, স্বামীকে কীভাবে কোন সময়ে কোন কথাটা বলব। কোন সময় 'হ্যাঁ' বলব, কোন সময় 'না' বলব। এগুলো স্বামী-স্ত্রীর নিজস্ব ব্যাপার। তাই আপনার নিজেকেই ঠিক করতে হবে কৌশলটা কী হবে। আপনি দোয়া করুন এবং নিয়ত করে দান করুন, যেন স্বামীর রাগ কমে যায়।

**প্রশ্ন :** আমার স্বামী ঘরের সব ব্যাপারে আমার সাথে আলোচনা করে না। কিন্তু পারিবারিক কোনো কাজ করার আগে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে শেয়ার করে। আমার খুব কষ্ট হয়, যখন আমি আমার স্বামীর কোনো খবর তার মুখ থেকে না শুনে তার বন্ধু বা অন্য কোনো তৃতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে শুনি।

এ নিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করাতে সে বলেছে, অন্যের কাছ থেকে শুনলে অসুবিধা কী? সে খুব চাপা স্বভাবের। আমার করণীয় কী?

**উত্তর :** আপনি যা সমস্যা ভাবছেন, তা হয়তো আপনার স্বামীর কাছে সহজ স্বাভাবিক ঘটনা। তিনি এটাতে কোনো অসুবিধা দেখছেন না। আপনিও এটা স্বাভাবিকভাবে নিয়ে জীবনের অন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারেন। তাহলে আপনি শান্তিতে থাকবেন।

বাস্তবতা হচ্ছে, আপনি হয়তো এখনো আপনার স্বামীর সেই আস্থার অবস্থানে পৌঁছান নি, যেটা তার বন্ধু পেরেছে। অতএব কীভাবে আস্থা অর্জন করতে পারেন, সেদিকে মনোযোগী হোন। স্বামীর আস্থা অর্জন করতে পারলে আপনিও কাঙ্ক্ষিত গুরুত্ব পাবেন।

**প্রশ্ন :** ২০০৬ সাল থেকে যখন আমার স্বামীর ন্যূনতম আয় ছিল, তখন আমি সংসার চালিয়েছি দক্ষ হাতে। তখনো সঞ্চয় করেছি, এখনো করি। এখন তার আয় বেড়েছে। অথচ সে সংসারের খরচ আমার হাতে দিচ্ছে না। রাগ হচ্ছে না, কিন্তু খুব অসম্মানিত বোধ করছি। এমনকি সংসার ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছে। কী করব? এ-ক্ষেত্রে আমার শাশুড়ি ও ভাসুরের ভূমিকা রয়েছে।

**উত্তর :** আপনি অপেক্ষা করুন। অল্প আয়ে যিনি সংসার চালাতে পারেন, তিনি অত্যন্ত দক্ষ। সবর করুন এবং স্বামী শাশুড়ি ভাসুরকে মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে বোঝাতে থাকুন। আপনার যেহেতু নিয়ত ভালো, ইনশাআল্লাহ আপনি সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন।

মূল বিষয়টা হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গিটাকে পাল্টে ফেলা যে, আমি আমার স্বামীকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখব। সম্মানের সাথে কথা বলব। স্ত্রীকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখব। অর্থাৎ সমমর্মী হওয়াটা জরুরি।

**প্রশ্ন :** আমার শ্বশুরবাড়ির সবাই আমাকে অপছন্দ করে। আমার স্বামী আমার সাথে এত খারাপ ব্যবহার করে যে, এত কিছু ক্ষমা করে কোনো মনছবিই করতে পারি না। আমি মানসিকভাবে প্রায় অসুস্থ। কোনো পথই খুঁজে পাই না। আমার মুক্তির উপায় কী? জীবনের পথ খুঁজে পেতে চাই।

**উত্তর :** আপনি সম্ভবত প্রত্যেকটা ব্যাপারেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। যারা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে, তাদেরকে অন্যরা পছন্দ করে না। আপনার শ্বশুরবাড়ির

ক্ষেত্রেও এই একই বিষয় ঘটেছে। শ্বশুরবাড়ির সাথে সম্পর্কের অবনতি হলে স্বামীর সাথেও আপনার সম্পর্ক ভালো থাকার কোনো কারণ নেই।

এখানে সমস্যা হলো আপনার নেতিবাচকতা, আপনার স্পর্শকাতরতা, আপনার প্রতিক্রিয়াশীলতা। তাই কোনোভাবেই রি-এক্ট করবেন না। ইতিবাচক থাকুন। আত্মবিশ্বাসী হোন এবং অটোসাজেশন দিন যে, তারা যেমন আচরণই করুক, আমার যা করণীয় আমি সেটাই করব এবং তা সবচেয়ে ভালোভাবে করব।

দুই নম্বর হচ্ছে যে, যেহেতু আপনি আপনার স্বামীর সাথে এখনো আছেন, তার মানে হচ্ছে স্বামীর প্রতি আপনার ভালবাসা আছে। তাই ইতিবাচক প্রত্যয়ন করুন নিজের মধ্যে। তাহলে আপনি জয়ী হবেন। মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে নিয়মিত স্বামী এবং শ্বশুর-শাশুড়ি-ননদের সাথে যোগাযোগ করতে থাকুন। এদেরকে যে কত ভালবাসেন এই কথাটা বলতে থাকুন। ঝগড়া করবেন না। প্রো-একটিভ থাকুন। আপনার নেতিবাচকতাকে অতিক্রম করুন। ইনশাআল্লাহ আপনি জয় করতে পারবেন।

**প্রশ্ন :** বছরের পর বছর সংসারে কাজ করার পর স্বামীর কাছ থেকে ন্যূনতম প্রশংসা না পেলে সেই সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা আসা কি স্বাভাবিক নয়?

**উত্তর :** বিতৃষ্ণা আসা মানেই রি-একটিভ হয়ে পড়া। জীবনে জয়ী হতে হলে, সুখী হতে হলে সবসময় এক্ট করতে হয়। রি-এক্ট করা মানেই হেরে যাওয়া। আপনার কাজ বা আচরণ যেন কোনোভাবেই অন্যের প্রশংসা বা নিন্দায় প্রভাবিত না হয়। তাহলেই আপনি ভালো থাকবেন। এটি আপনার মানসিক ফিটনেসের একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড।

তাছাড়া মানুষ প্রত্যাশা করে তার কাছে, যে কদর বোঝে। বছরের পর বছর কাজ করেও ন্যূনতম প্রশংসা না পেলে এই প্রশংসা প্রত্যাশা করবেন কেন? ধরুন আপনি একটা সুন্দর ছবি আঁকলেন। ছবি যে বোঝে না, আপনি তার কাছ থেকে যদি ছবি সম্পর্কে মতামত চান, সে কি ভালো কিছু বলতে পারবে? শিল্পী কিন্তু মনের আনন্দে তার কাজ করে যান। আপনিও আপনার কাজগুলোকে ভালবেসে করুন। আনন্দ নিয়ে করুন। কারো প্রশংসা পাওয়ার জন্যে বসে থাকবেন না। আপনার কাজের মূল্যায়ন আল্লাহই করবেন।

**প্রশ্ন :** বিয়ের পর স্বামী বা স্ত্রীর ভাগ্য পরিবর্তন হয়, এটা কি সত্য? ভাগ্য বা রিজিক কিসের ওপর নির্ভর করে?

**উত্তর :** ভাগ্য বা রিজিক সবসময় আপনার কর্মের ওপর নির্ভর করে। বিয়ের পর স্বামী বা স্ত্রী যদি ঠিকমতো ভালো কাজ করেন, তাহলে ভাগ্য ভালোর দিকে পরিবর্তিত হতে পারে। আর যদি মন্দ কাজ করেন, তাহলে ভাগ্য তো মন্দের দিকেই যাবে।

এক ভদ্রলোক ভালো চাকরি করতেন। বিয়ের পরে স্ত্রীকে নিয়ে খুব সুখী দাম্পত্য জীবন তাদের। কিন্তু এতই স্ত্রী-আসক্ত হয়ে গেলেন যে, কাজের দিকে আর মনোযোগ নেই। অফিসে আসছেন দেরি করে; গিয়েও ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্ত্রীর সাথে ফোনে গল্প করছেন। আবার স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে যাবেন বলে অফিস থেকে আগে আগে বেরিয়ে যাচ্ছেন। নানান অজুহাতে অফিস কামাই করছেন দিনের পর দিন। স্ত্রী-ও স্বামীকে উৎসাহ দিচ্ছেন—আজকে বৃষ্টি হচ্ছে, অফিসে না গেলে হয় না; চলো আজ বেড়িয়ে আসি ইত্যাদি। একসময় ভদ্রলোকের চাকরিটা চলে গেল।

এই দম্পতির উদাহরণ থেকে বলা যায়, বিয়ের পরে ভাগ্য পরিবর্তিত হয় বৈকি। তবে তা বিয়ের জন্যে নয়, বিবাহ-পরবর্তী কর্মের জন্যে। কোনো কোনো স্ত্রী সবসময় চেষ্টা করেন স্বামীকে কীভাবে ঘরে রাখবেন, এমনকি তাদের পেশাগত কাজ, ব্যবসা বাদ দিয়ে হলেও। একইসাথে আশা করেন টাকাপয়সাও থাকবে। স্বামী ঘরেও থাকবে, টাকাপয়সাও আসবে—এ দুটো একসাথে সম্ভব নয়। কোনো স্ত্রীর উচিত নয়, তার স্বামীর পেশাগত সাফল্যের ক্ষেত্রে বা মেধা বিকাশের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ানো। যিনি দাঁড়াবেন, তিনি আসলে নিজেই বিপদ ডেকে আনবেন।

**প্রশ্ন :** গুরুজী, আমার স্ত্রী কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের কাজের সাথে সম্পৃক্ত এবং এখানে এসে ভালো ব্যবহার করেন। অন্যদের ভালো ভালো উপদেশও দেন। কিন্তু নিজের বাসায় আচরণ ও কাজ কোনোটাই ঠিক নাই। স্বামীর সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করেন, অপমান করেন। আপনার উপদেশ ও দোয়া চাই।

**উত্তর :** স্ত্রীর বিরুদ্ধে এরকম অভিযোগ করবেন না। কারণ আপনি তো তার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাকে সম্মানজনকভাবে রাখার ওয়াদা করে আপনার ঘরে এনেছেন। কেয়ামতের দিন স্ত্রীর এই সার্টিফিকেট খুব গুরুত্বপূর্ণ যে, স্বামী হিসেবে আপনি ভালো ছিলেন, নাকি মন্দ।

অতএব স্ত্রীকে জয় করতে হবে। তিনি দুর্ব্যবহার করলে আপনি মনে মনে সবর করবেন যে, দেখি তুমি কতদূর পারো! আল্লাহ তায়ালা তো মাঝে মাঝে পরীক্ষা নেন। তুমি আমার জন্যে পরীক্ষা। হয়তো স্ত্রী আপনার দৃষ্টি

আকর্ষণ করতে চান, যেন আপনি তার প্রতি মনোযোগী হোন। তার প্রতি আরো মনোযোগী হলেই দেখবেন, চেঁচামেচি কমে গেছে। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে কখনো যুক্তি দিয়ে পরামর্শ দেয়া যায় না।

নিজের স্বামী বা স্ত্রীকে কীভাবে ম্যানেজ করবেন এটা আপনাকেই বুঝতে হবে। অন্য কারো পক্ষে এটা বলা খুব কঠিন। কারণ প্রত্যেক মানুষই আলাদা। একেক জনের দাম্পত্য জীবনে একেক রকম ব্যাপার। অতএব এই বিষয়গুলোকে সবসময় ব্যক্তিগতভাবেই সমাধান করবেন। আপনার স্ত্রী বাইরে যে ভালো ব্যবহার করছেন, এটা তো ভালো। এটাকে উৎসাহিত করুন।

**প্রশ্ন :** বর্তমান স্বামী আমার আগের ঘরের সন্তানের সাথে খুব রাগ-হিংসা দেখায়। এসব দেখে সহ্য করতে না পেরে আমিও রাগ করি। কিন্তু আমি তো সন্তানও ছাড়তে পারছি না, স্বামীকেও না। মাঝখানে রাগের ফলে আমাদের সুন্দর সময়গুলো নষ্ট হচ্ছে। আমাদের করণীয় কী?

**উত্তর :** যদিও এমন হওয়া উচিত নয়, কিন্তু এটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা। অধিকাংশ নারী যেমন তার সতিনের ছেলেকে পছন্দ করতে পারে না, পুরুষের ক্ষেত্রেও তা-ই। কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও থাকতে পারে। ৯৯% ক্ষেত্রে বাস্তবতা হচ্ছে, কেউ তার স্ত্রী বা স্বামীর অন্য পক্ষের সন্তানদের পছন্দ করে না বা মেনে নিতে চায় না।

প্রথমত, এই বাস্তবতাকে আপনার মেনে নিতে হবে। এটাকে স্বাভাবিক অবস্থা ধরে নিয়ে এগোলে সমস্যা কম হবে। দ্বিতীয়ত, প্রো-একটিভ থাকতে হবে আপনাকে। কারণ আপনিও রেগে থাকলে আপনার স্বামীর রাগ-হিংসার পরিমাণ কমবে না, বরং বাড়তেই থাকবে। তাই মমতা আর ভালবাসা দিয়ে আপনাকে জয় করতে হবে।

রাগ করে বা হিংসার প্রতিক্রিয়ায় হিংসা ব্যক্ত করে কেউ কখনো কল্যাণ করতে পারে না। পারিবারিক জীবনে রাগ-ক্ষোভের পরিণাম ভয়াবহ। এই রাগ যে কী করতে পারে, সাম্প্রতিক একটি উদাহরণ দেই। ২৫ নভেম্বর ২০২৩-এর নিউজ হলো, জন্মদিনে দুবাই নিয়ে না যাওয়ায় স্ত্রীর ঘুষিতে স্বামীর মৃত্যু। ভারতের পুনের বাসিন্দা রেনুকার বয়স ৩৮ বছর। নিজের জন্মদিনকে স্মরণীয় করে রাখতে স্বামী নিখিল খান্নার কাছে দুবাই ঘুরতে যাওয়ার আবদার করেছিলেন তিনি।

স্বামীর সম্মতি না পেয়ে ঝগড়া শুরু হয়। এ-ছাড়া স্ত্রীর জন্মদিন এবং বিবাহবার্ষিকীতে তার স্বামী দামি উপহার দেন নি। এসব নিয়ে ঝগড়ার

একপর্যায়ে রেনুকা রেগে স্বামীকে ঘুষি দেন। ঘুষির আঘাত এতটাই শক্ত ছিল যে, নিখিলের নাক ও কয়েকটি দাঁত ভেঙে যায়! পরে প্রচুর রক্তক্ষরণে ব্যবসায়ী নিখিল জ্ঞান হারান এবং মারা যান। বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরটিতে আরো বলা হয়, তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। ছয় বছর আগে ভালবেসে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এই যুগল।

প্রেমের পর বিয়ে এবং ছয় বছরের বিবাহিত জীবন মুহূর্তেই শেষ। মেয়েটি তার স্বামীকে ভালো না বাসলে ছয় বছর তো সংসার করত না। কিন্তু বস্তুগত চাওয়া মানে সোশ্যাল মিডিয়া মানুষকে কী পরিমাণ অসহনশীল অমানুষ করে তুলছে, এই ঘটনাটা তার একটা নজির। জন্মদিনে বিদেশ ভ্রমণ বা দামি উপহার দিয়ে কী করবেন উনি? সাজিয়ে রাখবেন বা স্ট্যাটাস দেবেন যে, আমার স্বামী জন্মদিনে বা বিবাহবার্ষিকীতে এই এই উপহার দিয়েছেন। এখন তার জেল মামলা যা-ই হোক, তার জীবন তো শেষ। যদি তাদের সন্তান থাকে, তাদের জীবনও ধ্বংসের মুখে।

এই রাগ আসলে সবকিছুর সর্বনাশ করে। এজন্যে মহামানবরা রাগের নিন্দা করেছেন। তাই কেউ ভুল আচরণ করলেও তার সাথে সবসময় ভালো আচরণ করবেন। ভালো আচরণের ফল আপনি পাবেনই। আপনি যত সহনশীল হবেন এবং বাস্তবতাকে স্বীকার করে তা সমাধানের চেষ্টা করবেন, পরিস্থিতি আপনার জন্যে তত সহজ হবে।

অতএব আপনি রাগ না করে স্বামীর পছন্দ-অপছন্দকে বোঝার চেষ্টা করুন। সেইসাথে নিয়মিত মেডিটেশন করুন। মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে তাকে বোঝান যে, ‘প্রতিটি শিশুই আল্লাহর দান। কেউ ইচ্ছে করলেই বাবা কিংবা মা হতে পারে না। এই সন্তানও হচ্ছে আল্লাহর নেয়ামত। তার সাথে ভালো ব্যবহার করলে নিজের ঘরে যে সন্তান আসবে, সে-ও আল্লাহর রহমতে ভালো সন্তান হবে।’ যখন আপনার স্বামীর মধ্যে আলফা লেভেলে এই ভালো কথাগুলো যেতে থাকবে, আজ কাল বা পরশু—তিনি বুঝবেন।

**প্রশ্ন :** আমি আমার স্বামীকে ক্ষমা করে দিলাম। তাতে কি তার চরিত্র ভালো হয়ে যাবে? সে তার ভুলের জন্যে মোটেও অনুতপ্ত নয়।

**উত্তর :** আপনি ক্ষমা করে দিলেন মানে আপনি মুক্ত হয়ে গেলেন। ক্ষমা করলে আসলে নিজে শান্তিতে থাকা যায়। ক্ষমা না করলে নিজের অশান্তিটাই সবচেয়ে বেশি হয়। যে কারণে মহামানবরা সবসময় ক্ষমা করে দিতেন এবং দোয়া করতেন সবার জন্যে।

মনে রাখবেন, স্বামীর ভুলের জবাবদিহিতা স্বামীর। আপনি ক্ষমা করলে স্বামীর চরিত্র ভালো হয়ে যেতে পারে কিনা, সেটা আল্লাহ্ ভালো জানেন। তবে কারো ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্যে আপনি কায়মনোবাক্যে দোয়া করতে পারেন আল্লাহর কাছে। কারণ দোয়াতে অনেক কিছু বদলাতে পারে। আল্লাহ চাইলে সবই সম্ভব।

**প্রশ্ন :** পাঁচ বছরের দাম্পত্য জীবনে আমাদের জৈবিক চাহিদা পরিতৃপ্ত হয় নি। আমাদের সন্তানও হয় নি। এ অবস্থায় স্ত্রী আমাকে অন্যত্র বিয়ে করার কথা বলছে। কিন্তু তার সাথে বোঝাপড়া বা অন্য কোনো সমস্যা নাই। আমার কী করা উচিত? দয়া করে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবেন কি? দ্বিতীয় বিয়েই কি বিকল্প সমাধান, নাকি অন্য কোনো উপায় আছে?

**উত্তর :** জৈবিক চাহিদার তো কোনো শেষ নেই। এ চাহিদাকে যত বাড়াবেন, তত বাড়বে। কথায় আছে না—আহার নিদ্রা ভয়, যত বাড়াও তত হয়। জৈবিক চাহিদার পরিতৃপ্তি শোকরগোজারি ছাড়া সম্ভব নয়। আর আপনাদের মধ্যে বোঝাপড়া বা অন্য কোনো সমস্যা নেই এবং আপনার স্ত্রীর উদারতা বোঝা যায়, যেহেতু তিনি দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিয়ে আদৌ আপনাকে সমস্যা থেকে মুক্ত করবে নাকি আরো সমস্যা সৃষ্টি করবে, তা আগে ভালোভাবে ভেবে সিদ্ধান্ত নেবেন।

**প্রশ্ন :** বিয়ের কদিন আগে আমি অন্য একটি মেয়ের কাছে মেসেজ দিয়ে আমার স্ত্রীর বদনাম করেছি। এরপর আমার স্ত্রীর সাথে আমার বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের পরে সে মেসেজগুলো দেখে ফেলে। ফলে সে খুব কষ্ট পায়। আমি ক্ষমা চেয়েছি। কিন্তু সে ক্ষমা করে নি। প্রায়শই সে ক্ষোভের প্রকাশ ঘটায়। আমি এখন কী করতে পারি? আমার স্ত্রী খুবই ভালো মানুষ।

**উত্তর :** বোঝা যাচ্ছে যে, আপনি খুব সরল মানুষ। অন্য কেউ হলে এ সমস্ত মেসেজ বিয়ের আগেই মুছে ফেলত। আপনি সরল বলেই মেসেজগুলো আপনার স্ত্রী এত সহজে পেয়ে গেছেন। এখন আর কী করবেন? আপনার স্ত্রী যেহেতু ভালো মানুষ, আপনি আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইতে থাকলে তিনি অবশ্যই ক্ষমা করবেন। কিন্তু ক্ষমা চাইতে হবে অন্তর থেকে। ক্ষমাপ্রার্থনায় অটল থাকুন যে, তুমি কতদিন ক্ষমা না করে পারো দেখি। কারো কারো ক্ষেত্রে একটু সময় লাগে। সেই সময় পর্যন্ত লেগে থাকতে হবে।

স্ত্রীর কাছ থেকে ক্ষমা নেয়ার দায়িত্ব আপনার। কারণ আপনি কাজটা মোটেই ঠিক করেন নি। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, গীবত করলে বদনাম করলে পৃথিবীতেই কী পরিমাণ শাস্তি হয়! তাই আল্লাহর কাছ থেকেও আন্তরিকভাবে ক্ষমা চান। কখনো কারো বদনাম করবেন না আর। দোয়া করি, আপনাদের পারিবারিক জীবন সুখের হোক।

**প্রশ্ন :** আমি বাসায় ৪০ দিন একটানা মেডিটেশন করতে পারি নি স্বামীর অসুস্থতার কারণে। এখন আমার কী করণীয়?

**উত্তর :** এই যে স্বামীকে আপনি সেবা করেছেন, এটা অনেক বড় একটা কাজ। এজন্যে যদি একটানা মেডিটেশন না হয় তো ঠিক আছে। আবার শুরু করুন। গ্যাপ হলে আরো ৪০ দিন করুন। কারণ মেডিটেশন যত করবেন তত আপনি উপকৃত হবেন। যে-কোনো পরিস্থিতিতে সবসময় ইতিবাচক চিন্তা করবেন, ইতিবাচকভাবে সবকিছু গ্রহণ করবেন। তাহলে আপনার মানসিক প্রশান্তি কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। এটাই কিন্তু মেডিটেশনের শিক্ষা।

**প্রশ্ন :** বাইরের কর্মক্ষেত্র ছাড়া পারিবারিক কাজে স্বামীরা অনেকেই দক্ষ নয়। আমি সামাজিকতা রক্ষার ব্যাপারে বলছি। স্ত্রী হয়ে কোনো ভূমিকা কি আমি রাখতে পারি? আবার স্বামীর কথার অবাধ্য হবো—এই অপবাদ থেকে যাবে নিজের জীবনের ওপর, এ ব্যাপারে জানতে আগ্রহী।

**উত্তর :** পারিবারিক কাজে অনেক ক্ষেত্রে পুরুষরা দক্ষ নয়, এ ব্যাপারে আমি একমত। এ-ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনি ভূমিকা রাখতে পারেন। কিন্তু স্বামীর কথার অবাধ্য হয়ে কেন? স্বামীর সাথে পরামর্শ করেই সেটা করুন না! যেমন আমাদের পরিবারে যত সামাজিকতা আছে, আপনাদের মা-জী সে-সব রক্ষা করেন। স্বামীর অবাধ্য হয়ে নয়, বরং স্বামীকে রক্ষা করার জন্যেই তিনি তা করেন। উনি যদি এভাবে সামাজিকতা রক্ষা না করতেন, তাহলে আমার পক্ষে কাজ করাটা খুব কঠিন হতো। অতএব মনে রাখবেন, পারিবারিক বিষয়ে যে যেটাতে দক্ষ, সেই ব্যাপারে তাকে দায়িত্ব দিয়ে দেবেন।

**প্রশ্ন :** আমার হাজবেন্ডের বন্ধুপ্রীতি অনেক বেশি। সে পরিবারে সময় না দিয়ে বন্ধুদের সময় দেয়। তাকে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এনেছিলাম, কিন্তু দেড় দিন করার পর আর আসে নি। বলে যে, কথাগুলো খুব ভালো কিন্তু শোনার

ধৈর্য নাই। তার জন্যে লাগাতার হিলিংয়ে নাম দেয়া, এককালীন দান, মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে বোঝানো, কোরআন বিতরণ করছি। দেখা যায়, মাঝে ভালো থাকে, সাদাকায়নে আসে। আবার যে কে সেই। গুরুজী, আমি আর কী করতে পারি? রাগের ফলে মনে মনে তাকে গালি দেই। যদিও আমি বুঝি, এই গালি দেয়াটা ছাড়তে হবে।

**উত্তর :** আপনি ঠিক ধরেছেন। মনে মনে গালি দেয়াটা ছাড়তে হবে। আমরা আসলে পারিবারিক জীবনে সমস্যা সৃষ্টি করি এভাবে। যখন কোনো ব্যাপারে দ্বিমত হয়, তখন আমরা মনে মনে ফাইট করি। সে স্বামী হোক স্ত্রী হোক ছেলে হোক মেয়ে হোক, তার সাথে মনের রাজ্যে ফাইটিং চালাতে থাকি। যার ফলে বাস্তবেও ফাইটিং চলতে থাকে। এটা আমরা বুঝি না। মনে মনে তিক্ততাপূর্ণ ঝগড়া বন্ধ করতে হবে।

আপনি সবসময় ইতিবাচক থাকবেন। কারণ আপনার হাজবেন্ড মাঝে মাঝে তো ঠিক হয়ে যায়। কিছু মানুষ আছে ঠিক তো হয়ই না, কোনো গ্রামারেও পড়ে না। সেদিক থেকে তো আপনি অনেক ভাগ্যবান। তার একটা গ্রামার আছে। মাঝে মাঝে সাদাকায়নে আসে, তবুও তো আসে। বন্ধুদের সাথে সময় দেয়া ছাড়া তার অন্য কোনো বড় ভুল নেই।

অতএব স্বামীর ব্যাপারে আপনার মনে কোনো দেয়াল তৈরি করবেন না। মনে মনে গালি দেয়া মানে নেতিবাচকতার দেয়াল তুলে ফেলা। আরেকজনের স্বামী হলে কথা ছিল। নিজের স্বামীকে তো মন থেকে ভালবাসতে হবে। এ-ক্ষেত্রে ধৈর্য হারানোর সুযোগ নেই। সংসারে ধৈর্যটা খুব প্রয়োজন। লেগে থাকা এবং অপেক্ষা করাটা গুরুত্বপূর্ণ।

আপনি তাকে মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে নিয়মিত বোঝাতে থাকেন। আপনি যে তাকে কত ভালবাসেন এবং আপনাদের মধ্যে আনন্দের যে মুহূর্তগুলো সেগুলোকে ভাববেন। ভালো স্মৃতিগুলোকে সবসময় মনের মধ্যে জায়গা দেবেন। তার জন্যে দোয়া করবেন। আল্লাহ চাইলে আস্তে আস্তে তিনি পরিবারে সময় দেয়ার গুরুত্ব নিজে থেকে উপলব্ধি করবেন।

**প্রশ্ন :** আমি ১০ বছরের দাম্পত্য জীবনে তিন সন্তানের জননী। স্বামীর আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজন। আমি আমার টেইলরের কাজ প্রসারিত করতে চাই। কিন্তু স্বামী কাজটাকে ছোট মনে করে। সে চক্ষুলজ্জায় আমাকে কাজটা করতে দেয় না। সে নিজেও সফল হতে পারছে না, আমাকেও সফল হতে দিচ্ছে না। এ-ক্ষেত্রে আমার করণীয় কী?

**উত্তর :** করণীয় হচ্ছে, স্বামীর প্রতি সমবেদনা ও সমমর্মিতা রেখে তার সাথে একাত্ম হওয়া। যদি আর্থিকভাবে সে-রকম অসুবিধা হয়, একটা সময় তিনিই আপনাকে কাজ করতে দেবেন। এজন্যে ধৈর্য ধরুন, অপেক্ষা করুন। যদি আপনার লক্ষ্য ঠিক থাকে, আপনাকে কে আটকাবে? আপাতত আপনি নিয়মিত মনছবি করুন—আপনারা দুজন মিলে টেইলারি বা ফ্যাশন হাউজ চালাচ্ছেন সুন্দরভাবে এবং আপনাদের আর্থিক সমস্যা দূর হচ্ছে। স্বামী নিজেই আপনাকে সহযোগিতা করছে।

সবসময় মনে রাখবেন, আত্মবিকাশের অধিকার কেউ কাউকে দেয় না, তা আদায় করে নিতে হয়। আপনার অধিকার কীভাবে আদায় করবেন সেটা আপনাকে ঠিক করতে হবে। সাপ মারতে হবে, কিন্তু লাঠি যেন না ভাঙে। অর্থাৎ সবকিছু ঠিক রেখে সমঝোতার ভিত্তিতে আপনাকে আপনার কাজ করতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক মানে হচ্ছে সমঝোতা। এখানে কখনো ফাইটে যাবেন না। কৌশলে করবেন।

**প্রশ্ন :** আমার স্বামী তার দায়িত্ব-কর্তব্য ঠিকভাবে পালন করে। তবুও সমস্যা হলো, সে তার পুরনো প্রেমিকার সাথে যোগাযোগ করে। সেই মেয়েটির কাছে জানতে পারি, আমার স্বামী নাকি তাকে এখনো নিজের বউ মনে করে। এ-ক্ষেত্রে কীভাবে প্রো-একটিভ থাকা যায়? আমার করণীয় কী?

**উত্তর :** আপনার সাথে যদি স্বামীর পুরনো প্রেমিকার যোগাযোগ হয়, সে এমনটাই তো বলবে। তার তো রাগ আছে। আপনাকে উত্ত্যক্ত করার জন্যে যা বলা দরকার, সে তা-ই বলবে। কিন্তু আপনি তার কথা শুনে আরো বেশি প্রো-একটিভ থাকবেন। হাসবেন। হেসে বলবেন যে, তোমাকে মনে করে বউ আর বাস্তবে আমি ওর বউ। তোমাকে যদি ভালোই বাসত, তাহলে তো তোমাকেই বিয়ে করত।

অর্থাৎ আপনি কোনোভাবেই রি-একটিভ হবেন না। আর পারিবারিক জীবনে কেউ গোয়েন্দাগিরি করতে যাবেন না। সম্পর্কের জন্যে এটা খুব ক্ষতিকর। যারা পুরনো সমস্যা নিয়ে ঘাটাঘাটি করে তাদের চেয়ে অশান্তিতে কেউ থাকে না। দৃশ্যমানভাবে কোনোকিছু জেনে গেলে সেজন্যে আপনার স্বামীকে মেডিটেশনে মনের বাড়ির কমান্ড সেন্টারে এনে বোঝাবেন। ঘটনা যদি সত্যি হয়, তাহলে স্বামীর জন্যে দোয়া করবেন, যেন আল্লাহ তায়ালা তাকে সুবুদ্ধি দেন। তিনি তার এই ভুল থেকে যেন খুব দ্রুত তওবা করে বেরিয়ে আসতে পারেন।

**প্রশ্ন :** বিয়ের পর কীভাবে স্বামীর সম্মান পাওয়া যায় বা ওর আমি হওয়া যায়? ২৩ বছর পর এই প্রশ্ন করছি যখন আমি ওর হতে পারি নি।

**উত্তর :** ২৩ বছর পরেও এই প্রশ্ন! আসলে বিয়ের ব্যাপারে একটা অবাস্তব ধারণা হলো, আমি তার হয়ে যাব বা সে আমার হয়ে যাবে। এটা ভুল ধারণা। আমরা খুব পরিষ্কার বলেছি যে, বিয়ে হচ্ছে একটা প্রয়োজন। প্রয়োজনটাকে প্রয়োজনই মনে করতে হবে।

আর 'কারো যদি হতে হয়', তাহলে একমাত্র আল্লাহর হওয়ার চেষ্টা করবেন। আল্লাহর হয়ে যাওয়ার পরে কাউকে আর হতাশ হতে হয় না। কারণ কেউ আল্লাহর হতে চাইলে তাকে কখনো তিনি ফিরিয়ে দেন না। বরং তাঁর দিকে কেউ হাঁটলে আল্লাহ আরো দ্রুত গতিতে তার কাছে ধরা দেন। মানুষের কাছ থেকে সমর্পণটা আল্লাহ খুব পছন্দ করেন।

আমরা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে অহেতুক কাব্য ও গানের জগতে ভাবতে থাকি। বিয়ে তো বাস্তবতা। লাইলি-মজনু, রোমিও-জুলিয়েট এগুলো কাহিনী ও গল্প কিতাবেই পাওয়া যায়। বাস্তবে এরকম পাগল পাওয়া যায় না। বিয়ে মানে হচ্ছে গিভ এন্ড টেক রেসপনসিবিলিটি। এটা এমন সম্পর্ক যে, আমি এই পর্যন্ত ছাড় দেবো, তার থেকে আমি এই পর্যন্ত ছাড় প্রত্যাশা করব। এটুকুই যথেষ্ট। অতএব যখন ২৩ বছরে হতে পারেন নি, আর দরকারটা কী? আপনি আপনার মতো থাকেন, স্বামী তার মতো থাকুক। দুজনে মিলে ভালো থাকলেই হলো, সেজন্যে আমরা দোয়া করি।

**প্রশ্ন :** স্বামী বিপরীত মেরুর বাসিন্দা। আমি উত্তরে থাকলে সে দক্ষিণে আর আমি দক্ষিণে থাকলে সে উত্তরে থাকে। এটা অসহনীয়। স্বামী ও সন্তানকে নিয়ে মহা সংকটময় পরিস্থিতিতে আছি। খুবই যন্ত্রণাদায়কভাবে দিনযাপন করছি ১২ বছর ধরে। আমাকে বলুন, আমার করণীয় বর্জনীয় কী হতে পারে? আমি স্বামী সন্তান নিয়ে প্রশান্তিতে থাকতে চাই।

**উত্তর :** স্বামী দক্ষিণে থাকলে আপনি থাকেন উত্তরে, তাহলে সমাধান হবে কীভাবে? এস্ট্রলজারদের মধ্যে একটা জোকস প্রচলিত ছিল। যদি দেখা যায় যে, কোনো ক্লায়েন্টের খুব খারাপ অবস্থা যেতে পারে অনেক দিন ধরে, তখন তাকে বলা হয়—আগামী বছর খারাপ যাবে। তারপরের বছরও খারাপই দেখা যাচ্ছে। তারপর অবশ্য আর সমস্যা নেই। কারণ অবস্থা খারাপ হতে হতে একটা সময় সয়ে যাবে।

তো আপনি উত্তর-দক্ষিণ করে **১২** বছর যখন কাটাতে পেরেছেন এই স্বামীর সাথে, বাকি জীবনও কেটে যাবে। এখন আর এসব নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই। বোঝা যাচ্ছে যে, আপনি এখনো স্বামীকে ভালবাসেন। আপনি শান্তিতে দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন কাটাতে চান। এজন্যে স্বামী উত্তরে থাকলে আপনিও উত্তরে থাকার চেষ্টা করেন। স্বামী দক্ষিণে থাকলে আপনিও দক্ষিণে যাবেন। অর্থাৎ আপনাকে মনোযোগ দিতে হবে সমাধানের দিকে। সংকট নিয়ে পড়ে থাকলে কখনো সমাধান আসবে না।

**প্রশ্ন :** আমার স্বামী বদমেজাজী ও নেতিবাচক। কম কথা বলে। দূরত্ব রেখে চলে। আমি ভালবাসলেও সে আমাকে ভালবাসা দেখায় না। সে কখনো হাসে না। আমি বিশ্বাস করি, আমার স্বামী হাসলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তাকে হাসানোর উপায় কী? তার সাথে আমার সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না। কী করব?

**উত্তর :** সমস্যা কত বিচিত্র হতে পারে! স্বামীকে হাসানো, এটাও সমস্যা! স্বামী হাসলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, এ ধারণাটা কিন্তু ঠিক নয়। হাসতে হবে আপনাকে। অভিযোগ কমাতে হবে আপনার জীবনসঙ্গী সম্পর্কে। আপনার ভেতরে এত এত অভিযোগ থাকলে সম্পর্ক ভালো হবে কীভাবে? বরং দিনে দিনে দেয়াল আরো দীর্ঘ হবে।

অতএব স্বামীকে আপনি প্রাণ ভরে ভালবাসবেন। কারণ যথার্থ ভালবাসার স্বভাব হচ্ছে এটা মমতা বিকিরণ করে, মমতাটাকে ছড়িয়ে দেয়। যদি আপনার মাঝে স্বামীর প্রতি ভালবাসা থাকে, তাহলে এটা প্রকাশিত হবেই। প্রকাশিত না হলে বরং বুঝতে হবে যে, এটা ভালবাসা নয়। এটা একধরনের আত্মকেন্দ্রিকতা বা স্বার্থকেন্দ্রিকতা।

আপনি যা চান, তা আগে আপনাকে দিতে হবে। এই দিতে পারার একটা আলাদা শক্তি আছে। প্রাণভরা ভালবাসা দিলে দেখবেন, স্বামীর সাথে আপনার সম্পর্ক ভালো হয়ে যাবে। আস্তে আস্তে তিনিও আপনার সাথে সহজ হবেন, সহজে হাসতে পারবেন।

**প্রশ্ন :** আমার স্বামী ভালো। সবাই বলে, আমিও ভালো। তবুও আমাদের দুজনের মাঝে দূরত্ব অনেক। তিনি মুখ ফুটে কথা কম বলেন। আমার মনে হয়, এজন্যেই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হচ্ছে। এখন তিনি আমার কাছ থেকে দূরে থাকতে চান। কিন্তু আমি তাকে খুব ভালবাসি। কীভাবে সমাধান পাব? দয়া করে পরামর্শ দেবেন।

**উত্তর :** স্বয়ং স্রষ্টাই প্রতিটি মানুষকে আলাদা করে বানিয়েছেন। আপনার স্বামী একজন মানুষ, আপনি আরেকজন মানুষ। আপনারা জন্মেছেন আলাদা, মারাও যাবেন আলাদা। আপনাদের বয়স, সমাজ, সংস্কৃতি, পারিবারিক পরিবেশ, সবই তো আলাদা। অতএব দূরত্ব তো থাকবেই।

আমরা নাটক-সিনেমা দেখতে দেখতে মনে করি, বাস্তবের স্বামীরাও বোধহয় সে-রকমই হবে। সারাক্ষণ মুগ্ধ হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে। আমার কথা শুনবে। আমি ছাড়া আর কিছুই ভাববে না। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। আপনার স্বামী মুখ ফুটে কথা কম বলেন, সেটা একটা সমস্যা। কথা বেশি বললে বলবেন যে, বেশি কথা বলে, সবকিছু নিয়ে মন্তব্য করে। তখনো তো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।

এজন্যে বেশি ভালবাসাও ভালো নয়। এটি পাগলামিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কেউ কেউ হয়তো স্বামীর কান এতই ঝালাপালা করে দেয় যে, তার মধ্যে স্ত্রীর ব্যাপারে বিতৃষ্ণা তৈরি হয়ে যায়। তখন স্বামী বেচারা মুখ ফুটে শুধু বলতে পারে না যে, তিনি এখন একটু দূরে থাকতে চাচ্ছেন। হতে পারে আপনার প্রতি তার মনে সে-রকম কোনো বিতৃষ্ণা বা বিরক্তি তৈরি হয়েছে।

আবার এমনও হতে পারে যে, আপনি হয়তো আপনার স্বামীকে ঠিক আপনার মতো দেখতে চান। হয়তো চান, ব্যক্তিত্ব স্বভাব রুচি পছন্দ সবকিছুতেই তিনি হুবহু আপনার মতো হবেন। কিন্তু এটা বাস্তবানুগ নয়। যমজ দুই সন্তানও তো একইরকম হয় না। দুজন ভিন্ন পরিমণ্ডলের মানুষ কখনো একরকম হবে না, এটাই স্বাভাবিক।

মনে রাখবেন—ভালবাসা মানে সবকিছু আমার মতো করে পাওয়া নয়। আমরা এখানে ভুল করি। আমরা মনে করি, যাকে ভালবাসি তাকেও আমার মতো হতে হবে। আমি কমলা পছন্দ করি, তাকেও কমলা পছন্দ করতে হবে। কিন্তু সে কমলা পছন্দ না করে জাম পছন্দ করতে পারে। আপনার স্বামীর পছন্দ-অপছন্দ তো আপনাকে বুঝতে হবে।

ভালবাসা মানে যাকে ভালবাসি তার স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখা, তার বিরক্তির কারণ না হওয়া। ভালবাসা কখনো জোর করে আদায় করা যায় না। এই আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমারও আমাকে ভালবাসতে হবে—এটা হয় না। ভালবাসা স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার। যাকে ভালবাসি তাকে আনন্দ দেয়ার নাম ভালবাসা; তাকে ভালো রাখার নাম ভালবাসা। কীসে তার সুখ, কী করলে তার ভালো হবে—সেদিকে খেয়াল রাখার নাম হচ্ছে ভালবাসা।

# দাম্পত্য কলহ

**প্রশ্ন :** আমার মনে হয়, মানুষ হিসেবে আমি এবং আমার স্বামী দুজনেই ভালো। তারপরও আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে মাঝে মাঝেই ঝগড়া হয়। কিন্তু আমি এটা চাই না। আমার করণীয় কী?

**উত্তর :** একটি বিষয় মনে রাখবেন, আপনি যদি ঝগড়া করতে না চান, তাহলে স্বামী একা কখনো ঝগড়া করতে পারে না। ঝগড়া কখনো একপক্ষে হয় না। আপনার স্বামী বলুক না! তাকে বলতে দিন। কতক্ষণ উনি একা বলতে পারবেন? একটা সময় অবশ্যই তাকে থামতে হবে। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে ঝগড়া করে সময় এবং শান্তি নষ্ট করা তো কখনো উচিত নয়।

**প্রশ্ন :** আমার স্ত্রী কিছু বলার সাথে সাথেই আমি প্রায়ই তার সাথে ঝগড়ায় জড়িয়ে যাই। এ-ক্ষেত্রে কী করণীয়?

**উত্তর :** স্ত্রীর সাথে যে স্বামী ঝগড়া করে, তাকে কোনোভাবেই বুদ্ধিমান বলা যায় না। কারণ স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করে জেতার কোনো সম্ভাবনা নেই। ঝগড়ার তিনটি পর্যায় থাকে। প্রথম পর্যায়ে যুক্তির আদান-প্রদান। আপনি হয়তো যুক্তিতে জিতে গেলেন।

দ্বিতীয় পর্যায় হলো চিৎকারের। এ রাউন্ডেও আপনি জিতে যেতে পারেন, যদি গলায় জোর থাকে। আর মিনমিনে গলা হলে আপনি হেরে যাবেন।

ঝগড়ার ফাইনাল রাউন্ড কান্না। এ রাউন্ডে স্বামী হিসেবে আপনার জেতার সম্ভাবনা খুব কম। কারণ ছেলেরা আর যা-ই হোক মেয়েদের সঙ্গে কান্নায় পাল্লা দিতে পারে না। এমনকি কাঁদতে শুরু করলেও দেখবেন, প্রতিবেশীরা আপনার মানসিক সুস্থতা নিয়ে সন্দেহ করছে।

অতএব যে ঝগড়ায় কখনো জিততে পারবেন না, তাতে জড়ানোর দরকারটাই-বা কী? শুধু তা-ই নয়, যদি ঝগড়ায় যান এবং স্ত্রী যদি থার্ড রাউন্ডে কান্নাকাটি শুরু করে দেন, তখন তো আপনাকেই তোয়াজ করে কান্না থামাতে হবে। হয়তো উপহার কিনে দিয়ে মান ভাঙাতে হবে। অতএব স্ত্রীর সাথে ঝগড়ায় জড়িয়ে যাওয়ার মতো বোকামি করবেন না কোনো স্বামী।

**প্রশ্ন :** বিভিন্ন কারণে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া-মারামারি হয়। এ অবস্থায় সন্তানের কল্যাণার্থে আমাদের কি একত্রে থাকা উচিত হবে?

**উত্তর :** ইতোমধ্যেই সন্তানের অকল্যাণার্থে অনেক কিছুই আপনারা করে ফেলেছেন। এখন আপনারা সম্পর্ক ছেদ করলে যেমন সে দুর্ভোগে পড়বে; তেমনি আপনাদের মধ্যে যে ঝগড়া-মারামারির সম্পর্ক, তাতে একত্রে থাকলেও তার দুর্ভোগ কমবে না।

সন্তানের সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার জন্যে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং সহযোগিতার মনোভাব একটি অপরিহার্য শর্ত। যে পরিবারে তা নেই, সে পরিবারে ছেলেমেয়েরা শিকার হয় নানারকম মানসিক জটিলতার। কারণ মা-বাবার ঝগড়াঝাঁটির ঘটনাগুলো সন্তানের মধ্যে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তাকে অনিশ্চয়তার আশঙ্কায় ভোগায়। সন্তানের কল্যাণ চাইলে ঝগড়াঝাঁটি বন্ধ করে একত্রে থাকা উচিত।

**প্রশ্ন :** সন্তানের সামনে মা-বাবা নিজেদের মধ্যে মারামারি গালিগালাজ করলে সন্তানের কী করা উচিত?

**উত্তর :** এ-ক্ষেত্রে সন্তানের করণীয় একটাই—মা-বাবার জন্যে দোয়া করা। সন্তানের দিক থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু করার নাই। কারণ মা-বাবার যে-কোনো ঝগড়া, বিতর্কের মধ্যে বা সমস্যার মধ্যে সন্তানের যাওয়া উচিত নয়। এগুলো একান্তই তাদের ব্যক্তিগত বিষয়। তাদের জন্যে দোয়া করা এবং মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে তাদেরকে বোঝানো উচিত।

**প্রশ্ন :** স্বামীর সাথে আলাপ-আলোচনা ব্যতীত স্ত্রী তার ব্যবহার্য কোনো সম্পদ কাউকে দান করতে পারবে কি? এটা নিয়ে ঝগড়া করা কি ঠিক?

**উত্তর :** কার ব্যবহার্য এটা বিবেচ্য। যদি স্বামীর ব্যবহার্য হয়, তাহলে স্ত্রীর সেটা দান করার কোনো অধিকার নেই। আর যদি স্ত্রীর ব্যবহার্য হয়, তাহলে কোনো স্বামীর এটার ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা উচিত নয় যে, স্ত্রী কাকে কী দেবেন। ধরুন, আপনার স্ত্রীকে একটা শাড়ি কিনে দিয়েছেন। স্ত্রী খুশি হয়ে নিলেন এবং পরবর্তীকালে সেটা আরেকজনকে দিলেন। আপনার দৃষ্টিভঙ্গি হতে হবে, স্ত্রীকে যা দেয়ার তা আমি দিয়েছি, এখন সে এটা নিজে পরুক বা অন্য কাউকে দিক, আমার এটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই। এমনকি আমাকে তার জিজ্ঞেস করারও প্রয়োজন নেই।

এটা হবে স্বামীর জন্যে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। যে প্রশ্নটা করেছেন, সেটা সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নয়, বরং ক্ষুদ্র মানসিকতা। সবসময়

মনে রাখবেন, যা দেবেন স্বত্ব ত্যাগ করে দেবেন। স্বত্ব ত্যাগ করতে না পারলে দেবেন না। যদি মনে প্রশ্ন জাগে, আমি স্ত্রীকে দিচ্ছি, সে-তো এটা অন্যকে দিয়ে দিতে পারে, তাহলে দেবেনই না। কিন্তু যখন দেবেন, নিঃশর্তভাবে দেবেন—এটা তোমার, তুমি যা খুশি করো। স্ত্রী তার ব্যবহার্য একটি জিনিস আরেকজনকে দিলে আপনার তো আনন্দিত হওয়া উচিত যে, সে দাতা হয়েছে।

**প্রশ্ন :** ম্যারেজ ডে ভুলে গেলে স্ত্রী খুব রাগ করেন। কিন্তু তার মানে কি আমি স্ত্রীকে ভুলে যাই? ম্যারেজ ডে ভুলে যাওয়াটা কি স্বাভাবিক না? বিবাহের দিন মনে রাখা কি খুবই জরুরি? আমি জরুরি তথ্য তো মনে রাখি।

**উত্তর :** বিয়ে যদি অনেকগুলো করে থাকেন, তাহলে ম্যারেজ ডে ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক হতে পারে। কিন্তু একটি বিয়ে করলে তো বিয়ের তারিখ মনে রাখা উচিত। কারণ আপনাকে বুঝতে হবে যে, যাকে আপনি ভালবাসেন তিনি কীসে ভালো বোধ করেন। আপনাকে সচেতনভাবে তা করতেও হবে। ভালবাসা মানে তো শুধু আবেগকে মনে মনে রেখে দেয়া নয়; স্থানকালপাত্র বুঝে তা প্রকাশ করাও এর অংশ।

আপনি বুঝতে পারছেন যে, ম্যারেজ ডে আপনার স্ত্রীর একটা আবেগের জায়গা। যে দিনটিতে আপনি তার জীবনসঙ্গী হয়েছেন, সে দিনটি তার অনেক প্রিয়। এর মধ্য দিয়ে আপনাকে যে তিনি কত ভালবাসেন সেটাও ফুটে ওঠে। অতএব স্ত্রীর এই আবেগকে অনুভব করুন। আন্তরিকভাবে চাইলে বছরের এই একটি দিন মনে রাখা কঠিন কিছু নয়। এই দিনে তাকে উইশ করুন। সুযোগ থাকলে একটু বেশি সময় তাকে দিন। দেখবেন যে, ছোট্ট এই কাজটুকুর মধ্য দিয়ে স্ত্রীকে খুশি রাখতে পারছেন এবং আপনিও তার কাছ থেকে অনেক মানসিক সাপোর্ট পাচ্ছেন।

**প্রশ্ন :** আমার স্বামী আমার সাথে তেমন ভালো আচরণ করেন না। তিনি অন্য মহিলাদের সাথে যে-কোনো ব্যাপারে অনেক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। অনেক বোঝানোর পরও কাজ হয় নি। আমি কী করব?

**উত্তর :** প্রত্যেক নারীর একটা সহজাত গুণ হচ্ছে, তার স্বামী কীসে তার প্রতি আকৃষ্ট হবে, সেটা বুঝতে পারা। আপনি যেহেতু চাচ্ছেন আপনার স্বামী আপনার সাথে ভালো আচরণ করুক, মনোযোগী হোক, আপনাকে তো

বুঝতে হবে যে, কীভাবে সেটা আদায় করতে হবে! এ-ছাড়া সব ব্যাপারে আপনার সাথে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন, এত বেশি প্রত্যাশা থাকাটা আপনার সুখের পথে অন্তরায়! কারণ প্রত্যাশা যত বেশি হবে, না পাওয়ার বেদনা তত বাড়বে। তাই অন্যের কাছ থেকে পাওয়ার প্রত্যাশা কমানোই ভালো। তাহলে অনেক দুঃখ এমনিতেই কমে যাবে।

পৃথিবীতে আমরা অন্যদের সাথে কতটা সদাচারী ছিলাম, সেটার জবাব আল্লাহকে দিতে হবে। স্বামী বা স্ত্রী কেমন আচরণ করছে সেটার জবাব দিতে হবে ওই ব্যক্তিকে। অতএব স্বামী ভালো আচরণ না করলেও আপনি তার সাথে সবসময় ভালো আচরণ করুন। আপনার দায়িত্বগুলো সবচেয়ে ভালোভাবে পালন করুন।

**প্রশ্ন :** আমার স্বামী আমাকে কোনো কাজে স্বাধীনতা দিতে চায় না। এতে তার সাথে আমার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। কখনো কখনো আমার ব্রেন গামা লেভেলে উঠে যায়। বর্তমানে এই অবস্থা চলছে।

**উত্তর :** মনে রাখবেন, স্বাধীনতা কেউ কাউকে দিতে চায় না। স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়। এজন্যে কখনো যোগ্যতা, কখনো গুণ, কখনো কৌশল, কখনো প্রজ্ঞা, কখনো বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। গামা লেভেলে আজ পর্যন্ত কেউ স্বাধীনতা পায় নি; বরং আরো পরাধীন হয়েছে। কারণ গরম মাথায় ভালো কিছু অর্জন হয় না। নিয়মিত মেডিটেশন করুন। মাথা ঠান্ডা রাখুন। তাহলেই সুযোগ বুঝে আপনার পছন্দের কাজ করিয়ে নিতে পারবেন।

**প্রশ্ন :** স্ত্রী যদি স্বামীকে বলেন, 'তোমরা ভীষণ আনকালচারড'। এ কথার পর কীভাবে মেজাজ ঠিক রাখা যায়?

**উত্তর :** মেজাজ ঠিক রাখতে পারলেন না মানেই স্ত্রীর কথার স্বপক্ষে আপনি আরেকটা প্রমাণ উপস্থাপন করলেন। মনে রাখতে হবে যে, রেগে গেলে ক্ষতি সব আপনারই। এজন্যে আয়নায় 'রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন' স্টিকার লাগিয়ে রাখুন। তাহলে মেজাজ খারাপ করার সম্ভাবনা কমে যাবে।

**প্রশ্ন :** আমি ছাত্রী, গৃহিণী। আমার সমস্যা হলো, আমি নিয়মিত খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতে পারি না। সেজন্যে নাশতা বানানোর কাজে বেশি সাহায্য করতে পারি না। আমি জানি, ঘরের অন্যান্য কাজের মতো এটাও আমার

দায়িত্ব। চেষ্টা করি সময়মতো ওঠার। কিন্তু দুদিন উঠলে তৃতীয় দিন দেখা যায়, অসুস্থ অনুভব করি। কিন্তু আমার স্বামী এটা নিয়ে মন খারাপ করে এবং বেশি বেশি বলার কারণে মাঝে মাঝে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। সে যখন এই ব্যাপারটা বেশি গুরুত্ব দেয়, তখন আমার মন খুব খারাপ হয়। মনে হয়, শুধু সকালের কাজটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সারাদিন আর যা-ই করি না কেন তার কোনো মূল্য নেই? এমন নয় যে, ঘরে নাশতা বানানোর লোক নেই। গুরুজী, আমি চেষ্টা করছি নিজের এ অভ্যাসকে পরিবর্তন করতে। তবুও যদি চেষ্টার মূল্য না পাই, তখন কী করা উচিত?

**উত্তর :** স্বামী নামধারী এ ধরনের পুরুষেরা আসলে স্ত্রীকে মনে করে দাসী-বাঁদি। স্ত্রী একজন ছাত্রী। পড়াশোনা ও সংসারের কাজ শেষ করে সকালে তার উঠতে কখনো কখনো দেরি হতেই পারে। সারাদিন সংসারের কাজ, ক্লাস, পড়াশোনা সবকিছু সামলানো স্ত্রীর প্রতি স্বামী যদি এটুকু সমমর্মী হতে না পারে, তাহলে সে স্বামী হওয়ারই অযোগ্য।

ইসলামে দাম্পত্য জীবনে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা, সহযোগিতা, সহমর্মিতার তাগিদ দেয়া হয়েছে। ইসলাম বলে, স্বামী এবং স্ত্রী দুজন দুজনের পরিপূরক। স্ত্রী দাসী নয়, স্ত্রী হচ্ছে জীবনসঙ্গিনী। দুঃখ-কষ্ট-বেদনায় দুজন দুজনের সমব্যথী হবে, সহযোগী হবে—এটাই ইসলামের শিক্ষা।

একবার নবীদুহিতা ফাতিমা (রা) তার স্বামী আলীকে (রা) বলছিলেন, গৃহকর্মে সাহায্য করার জন্যে একজন দাসী পেলে খুব ভালো হতো। আলী (রা) বললেন, ফাতিমা, আমি তোমার কষ্ট বুঝতে পারছি। কিন্তু একজন দাসী রাখা এ মুহূর্তে আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তার চেয়ে বরং ঘরের কঠিন কাজগুলোতে প্রতিদিন আমি তোমাকে সাহায্য করব। এই বলে যাঁতায় গম পিষতে শুরু করলেন। এই হচ্ছে স্বামী, যে স্ত্রীর কষ্ট শেয়ার করে। এমনটাই তো হওয়া উচিত।

বিয়ে হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দৈহিক সম্পর্ক হয়, কর্তব্য পালনও হয়। কিন্তু বিয়ে হলেই ভালবাসা-মমতা পাওয়া যায় না। প্রেম-মমতা আপনি কখনো দাসীর কাছ থেকে পাবেন না। এটা পাবেন তার কাছ থেকে, যাকে আপনি সম্মান করতে পারেন, যার সাথে ব্যথা শেয়ার করতে পারেন।

এখন আপনি তো আপনার স্বামীর আচরণ বদলাতে পারবেন না। কিন্তু আপনি নিয়মিত মেডিটেশন চর্চার মধ্য দিয়ে আপনার বিরক্তি বা ক্ষোভ কমাতে পারেন এবং নিজের চিন্তার চ্যানেলটাকে ঘুরিয়ে দিতে পারেন। সংসারের এই কাজগুলোও তো ইবাদত।

তাই আপনি আপনার চেষ্টাটুকু অব্যাহত রাখুন। কিন্তু স্বামীর কাছ থেকে কখনো আপনার প্রচেষ্টার কোনো মূল্য পেতে চাইবেন না। কারণ যিনি সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেন না, তার কাছ থেকে সেটা পেতে চাইলে আপনি শুধু কষ্ট পেতে থাকবেন। তার চেয়ে ভালো আপনার কর্তব্য পালনে যদি আন্তরিক থাকেন, তাহলে ইহকালে এবং পরকালে আল্লাহ অবশ্যই আপনার কাজের ফল দেবেন। তিনি সর্বোত্তম বিচারক।

**প্রশ্ন :** আমার স্ত্রী প্রায়ই এশার নামাজ না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এ কারণে তার ওপর আমার রাগ হয়। নামাজ পড়ার জন্যে তাকে যে রাতে ডেকেছিলাম, তা সে মানতেই চায় না। আলসেমির জন্যে প্রায়ই এরকম হয়। উল্লেখ্য, বাচ্চাকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে সে নিজেই ঘুমিয়ে পড়ে। কী করণীয়?

**উত্তর :** করণীয় খুব সহজ। সন্তানকে আপনি ঘুম পাড়াবেন। আপনার স্ত্রী তখন নামাজ পড়বেন। আসলে বাস্তবতা বুঝতে হবে। ডাকার পরও পরদিন যখন কেউ বলে, তাকে ডাকা হয় নি, তখন সহজেই বোঝা যায় তিনি কত ক্লান্ত ছিলেন! তার ওপর রাগ না করে তিনি যেন নামাজ পড়তে পারেন, সে ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে। তখন দেখা যাবে, তিনিও নামাজ পড়তে পারছেন, আপনারও আর রাগ হচ্ছে না।

সাধারণভাবে আমরা সবসময় অন্যকে অভিযুক্ত করতে চাই। কিন্তু অপরপক্ষকে আমি কীভাবে সহযোগিতা করলে সে এই ভুল করা থেকে বিরত থাকতে পারে, সে চেষ্টা অধিকাংশ সময়ই করি না। অথচ সেটা করতে পারলে জীবনটা অনেক সুন্দর ও শান্তিময় হতে পারে।

**প্রশ্ন :** আমার স্বামী খুব ভালো মনের মানুষ। তবে অশান্তির কারণ হলো, সে কর্কশ ভাষায় আমাকে ও আমার বাচ্চাকে গালি দেয়। কী করব?

**উত্তর :** খুব ভালো মনের মানুষ হলে তিনি কীভাবে স্ত্রী-সন্তানকে কর্কশ ভাষায় গালি দেয়? যে মানুষ কর্কশ ভাষা ব্যবহার করে, সে কখনো ভালো মানুষ হতে পারে না। কখনো ধার্মিক হতে পারে না। কারণ সদাচরণই হচ্ছে প্রকৃত ধার্মিকের ভূষণ। আপনি আপনার স্বামীর জন্যে দোয়া করবেন।

**প্রশ্ন :** ঘরে প্রবেশের সময় আমার অনুরোধ সত্ত্বেও আমার স্বামী পাপোশে জুতা মোছেন না। এ-ক্ষেত্রে কী করণীয়?


৭—

**উত্তর :** আপনি কখনো বিরক্ত হবেন না। স্বামীকে অনুরোধ করেই যেতে থাকবেন। পাপোশ তো জুতো মোছার জন্যেই। যদি তা না করেন, তাহলে তো পাপোশের হক আদায় হলো না। পাপোশও প্রত্যাশা করে, কোনো জুতো তার ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় একটু ঘষবে। আয়নার হক হচ্ছে, পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় যে-কেউ তার দিকে তাকাবে। অর্থাৎ জিনিসটাকে তো ব্যবহার করতে হবে। স্ত্রীকে খুশি করার জন্যে হলেও স্বামীর এটা করা উচিত।

**প্রশ্ন :** আমার স্বামী একটি নতুন মোবাইল সেট কিনে দেখানোর সময় দাম জিজ্ঞেস করতেই প্রচণ্ড রেগে গেল। দাম জিজ্ঞেস করাটা কি অন্যায় হয়েছে?

**উত্তর :** দাম জিজ্ঞেস করাটা হয়তো অন্যায় হয় নি। কিন্তু যখন জিজ্ঞেস করেছেন, সেই সময়টা হয়তো ঠিক হয় নি। তিনি হয়তো খুব আনন্দিতচিত্তে দেখাচ্ছিলেন, খুব ভালো মুডে ছিলেন। তখন দামের কথা জিজ্ঞেস করে আপনি তার আনন্দের মধ্যে পানি ঢেলে দিয়েছেন।

আরেকটা কারণ হতে পারে যে, সম্ভবত মোবাইলের দামটা বেশ চড়া। ওই মুহূর্তে তিনি হয়তো আপনাকে দাম বলার সাহস পান নি। তাই রেগে গেছেন বা রেগে যাওয়ার ভান করেছেন। মনে রাখবেন, কথা বলারও সময় আছে। এমনকি স্বামীর সঙ্গে কথা বলার ক্ষেত্রেও সময় বিবেচনা গুরুত্বপূর্ণ।

**প্রশ্ন :** ৪০ বছর বিয়ে হয়েছে। অনেক চেষ্টা করেছি স্বামীর সাথে ভালো বোঝাপড়ার জন্যে, হলো না। আমাদের মধ্যে কলহ বেশি। কী করব?

**উত্তর :** ৪০ বছর যেহেতু বোঝাপড়া ছাড়াই কাটিয়ে দিতে পেরেছেন, তখন বোঝাপড়ার আর দরকার কী? আসলে স্বামীকে আপনি অনেক ভালবাসেন। আপনার স্বামীও আপনাকে ভালবাসে। তাই ৪০ বছর ধরে একসাথে আছেন। এখন থেকে চিন্তার চ্যানেল পাল্টে দিন। ইতিবাচক হোন। বিশ্বাস করুন যে, আমার স্বামী আমাকে ভালবাসে, আমিও তাকে ভালবাসি।

আপনাদের ক্ষেত্রে বেশি বোঝাপড়ার কোনো দরকার নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভালবাসাটাই যথেষ্ট। তাকে মেডিটেশনে মনের বাড়ির কমান্ড সেন্টারে এনে শুধু বলবেন, আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে বুঝি, তোমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আর মনে যখনই নেতিবাচক চিন্তা আসবে, বাতিল বাতিল বলবেন। আপনি নিয়মিত চর্চা করুন—দিনে দুবার। ইনশাআল্লাহ ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।

**প্রশ্ন :** স্ত্রীর সাথে ভুল বোঝাবুঝির কারণে সম্পর্ক নাজুক। প্রায় ভাঙনের কাছাকাছি। হিলিং করার সময় তার দেয়া আঘাত আর কষ্টগুলো বার বার উঠে আসে। ভালোভাবে মেডিটেশন হয় না। ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। কী করব?

**উত্তর :** ভুল বোঝাবুঝির যদি কোনো বাস্তব ভিত্তি না থাকে, তাহলে তা দূর করার দায়িত্ব স্বামী হিসেবে আপনার। কারণ একজন স্বামীর যে সুবিধা রয়েছে পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, স্ত্রীর সে সুবিধা নেই। এ কারণে এই ভুল বোঝাবুঝি আপনাকেই দূর করতে হবে।

এটা কিন্তু খুব মজার যে, যখনই কেউ সম্পর্ক সুন্দর করার জন্যে কাউকে মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে আনেন, তখন দেখা যায়—শুধু আঘাত আর কষ্টের স্মৃতিগুলো বার বার উঠে আসে। আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কে অসুবিধাটা কোথায় হয়? যখন কারো সাথে ঝগড়া হয়, তখন তার কথা চিন্তা করার সাথে সাথেই তার সাথে আমরা মনে মনে তর্ক শুরু করে দেই—তুমি আমাকে বুঝলে না। সারাজীবনের যত খারাপ ইতিহাস, সব একেবারে সিনেমার ফ্ল্যাশব্যাকের মতো তখন আসতে থাকে। তাই চিন্তার এই চ্যানেলটাকে বদলে দিতে হবে।

প্রশ্ন থেকে বোঝা যাচ্ছে, আপনি বিয়েটাকে টিকিয়ে রাখতে চান। তার মানে স্ত্রীর সাথে আপনার সুখের স্মৃতিও আছে। তা না হলে আপনি এই ভুল বোঝাবুঝি দূর করার ব্যাপারে কোনো চিন্তাই করতেন না। অতএব এরপরে যখন মেডিটেশনে বসবেন, স্ত্রীর সাথে আপনার সুখের যে স্মৃতিগুলো আছে, সেগুলো নিয়ে আসবেন। অবলোকন করবেন, এই স্মৃতি আপনার হৃদয়ে আনন্দের প্লাবন সৃষ্টি করছে, শান্তির প্লাবন সৃষ্টি করছে। বন্যার পানি যেভাবে আবর্জনাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, সেভাবে এই প্লাবন সব ভুল বোঝাবুঝিগুলোকেও ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে।

আগামী ৪০ দিন আপনি এটা নিয়মিত করুন। দিনে দুবার এই মেডিটেশনে আপনার সুখের স্মৃতিগুলো নিয়ে আসতে থাকলে তা আপনাদের সমস্ত ভুল বোঝাবুঝিকে একটু একটু করে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে। ইনশাআল্লাহ আপনাদের সম্পর্কের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে।

**প্রশ্ন :** আজ প্রায় ছয়-সাত মাসের বেশি আমার স্বামী আমার সাথে কথা বলছে না। তার কাছে আমি সারাক্ষণ মাফ চাচ্ছি। মেডিটেশনে বোঝাচ্ছি। হিলিংয়ে নাম দিচ্ছি। কিন্তু কোনোভাবেই তাকে স্বাভাবিক করতে পারছি না। এখন আমি কী করব? আমাদের জন্যে দোয়া করবেন।

**উত্তর :** সাধারণত স্ত্রীরা কথা বলে না। স্ত্রীদের মান ভাঙাতে হয়। আপনি তো উল্টোটা করছেন—স্বামীর মান ভাঙাচ্ছেন। ভাঙাতে থাকুন। ছয়-সাত মাস হয়েছে, তাতে কী? স্বামী তো সারাজীবনের। অতএব সময় নিন। যেহেতু আপনার সাথেই আছে। খাওয়াদাওয়া সবকিছু করছে, শুধু কথা বলছে না। না বলুক, আপনি আপনার কর্তব্য করে যান। আপনিও দুই/ একদিন কথা না বললে বরং তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। হয়তো শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করবে যে, তুমি এমন করছ কেন? বলবেন, তুমি যখন বোবা, আমিও বোবা হলাম—এমনকি অন্য কেউ এলেও আমরা কথা বলব না।

অর্থাৎ বিষয়টিকে হালকাভাবে দেখুন, এত সিরিয়াসলি দেখার কিছু নেই। আর মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে তাকে খুব ভালো করে বোঝান। আপনাদের আনন্দের স্মৃতিগুলোকে মনে করিয়ে দিন। আলফা লেভেলে তাকে বলুন, ভুল তো মানুষেরই হয়। আমারও ভুল হয়েছে। তুমি তো আমাকে শাস্তি দিয়ে ফেলেছ। আমার যা শাস্তি পাওয়ার তা পেয়ে গেছি। তাছাড়া আমাদের তো অনেক সুখের স্মৃতিও আছে।

সাধারণত যেটা হয় যে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া হলে সাথে সাথে এর আগে স্বামী কতবার কতরকম খারাপ কথা বলেছে, স্ত্রী কতবার খারাপ কথা বলেছে সব এক এক করে ফ্ল্যাশব্যাক হতে থাকে। তাই যে-কারো সাথে যে-কোনো সমস্যা হলে সবসময় তার সাথে আপনার ভালো স্মৃতিগুলো স্মরণ করবেন। এটা যত চর্চা করবেন, তত মন থেকে ক্ষোভগুলো কমতে থাকবে। মন থেকে ক্ষোভ ও নেতিবাচকতা দূর হয়ে গেলে সমাধানও বেরিয়ে আসবে।

**প্রশ্ন :** আগে আমার রান্না নিয়ে আমার স্বামী কোনো মন্তব্য করতেন না। গত দুমাস থেকে রান্না নিয়ে মন্তব্য করেন। রাগ করেন যে, রান্না ভালো হয় নি। মাঝে মাঝে সকালে নাশতা না করেই চলে যান। এতে তার প্রতি আমার মনে প্রচুর ক্ষোভ জমে। কারণ চাকরি, রান্না, তিন বছরের বাচ্চা দেখাশোনা—একা সব করাটা আমার জন্যে খুবই কঠিন। তারপরও এমন কথা শুনলে ভীষণ কষ্ট পাই। এখানে আমার কী করণীয়?

**উত্তর :** স্বামীর এই আচরণের নেপথ্য কোনো কারণ আছে কিনা দেখুন। হতে পারে তিনি কোনোকিছু নিয়ে বিরক্ত। আবার বাইরের খাবারের আসক্তিও অনেক সময় রুচির পরিবর্তন করে। কারণ যা-ই হোক, আপনি কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাবেন না। আপনি আপনার কাজ করে যান। রান্নার ব্যাপারে স্বামীকে অংশীদার করে নিন। তাকে বলুন, আমার রান্না ভালো হয় না এটা

যখন তুমি ধরতে পেরেছ, তাহলে তুমি আমাকে সাহায্য করো। চলো, একসাথে রান্না করি। প্রতিদিন সকালে উঠেই তাকে রান্নাঘরে ডেকে নেবেন। খুব বিনয়ের সাথে বলবেন যে, তুমি যদি সহযোগিতা না করো, তাহলে আমি ভালো রান্না কীভাবে করব!

আসলে তো ইসলামের বিধান অনুযায়ী আপনাকে রান্না করে খাওয়ানো অথবা রান্নার লোক রেখে খাওয়ানোর দায়িত্ব হচ্ছে আপনার স্বামীর। স্ত্রী যদি এভাবে দেখেন, তাহলে স্বামী কিন্তু বিপদে পড়ে যাবেন। অতএব স্ত্রী যা রান্না করেন, স্বামীর বলা উচিত শোকর আলহামদুলিল্লাহ! স্ত্রীর রান্নায় ভালো ছাড়া কখনো কোনো মন্দ কথা বলবেন না। রান্না ভালো বা খারাপ এই মন্তব্য থেকে একজন স্বামী যত দূরে থাকেন তত ভালো।

এ ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত তা ভারতের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালামের একটি ঘটনা থেকে বুঝতে পারি। তিনি তার একটি বইতে লিখেছেন, 'যখন আমি ছোট ছিলাম, আমার মা আমাদের জন্যে খাবার রান্না করতেন। এক রাতের ঘটনা। সারাদিন খাটুনির পর মা রান্না করলেন। আব্বার সামনে রাখলেন এক প্লেট সবজি আর অনেকখানি পুড়ে যাওয়া রুটি। রুটি পুড়ে গেছে সেটা নিয়ে আব্বা কী বলেন, তা দেখার জন্যে আমি অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু আব্বা চুপচাপ রুটি খেতে থাকলেন। আর আমার কাছে জানতে চাইলেন স্কুলে সারাদিন কী কী করেছি। আব্বাকে সেদিন কী বলেছিলাম এখন আর তা মনে নেই। তবে এটা মনে আছে যে, মা পোড়া রুটির জন্যে আব্বার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।

আব্বার জবাব আমি কখনো ভুলব না। তিনি মাকে বললেন, ওগো, আমি তো পোড়া রুটি খেতেই পছন্দ করি। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে আব্বাকে জিজ্ঞেস করলাম, আব্বা, আপনি কি সত্যিই পোড়া রুটি খেতে পছন্দ করেন? আব্বা বললেন, তোমার মা সারাদিন অনেক পরিশ্রম করেছেন। তিনি বেশ ক্লান্ত ছিলেন। তাছাড়া পোড়া রুটি কখনো মানুষকে কষ্ট দেয় না, কিন্তু কটুকথা মানুষকে কষ্ট দেয়।'

এই যে স্ত্রীকে কষ্ট দিয়ে খাবার না খেয়ে স্বামী উঠে যাচ্ছেন, এই স্বামী কিন্তু নিজের রিজিক কমিয়ে ফেলছেন। প্রসঙ্গক্রমে আরেকটি ঘটনা আমরা স্মরণ করতে পারি—এক ভদ্রমহিলা, মা-বাবার খুব আদরের। অনেক ভাইয়ের মধ্যে এক বোন হলে যেমন হয়, বেশ আহ্লাদী। খাবার পছন্দ না হলে প্রায়ই প্লেট ছুড়ে ফেলে দিতেন তিনি। পরবর্তী জীবনে এমন একটা সময় এলো, তিনি কিছু খেতে চাইলে সেই খাবার কোথাও পাওয়া যেত না। অথচ সেসময় তা না পাওয়ার কোনো কারণ নেই। হয়তো সন্ধ্যাবেলা তার

খুব ইচ্ছা করছে কাবাব খেতে। ঢাকা শহরে এত কাবাবের দোকান। কিন্তু তার সন্তানেরা তার জন্যে কাবাব খুঁজতে গিয়ে কাবাব পেত না। যেখানে যায় বলা হতো—কাবাব শেষ, কাবাব নেই।

অতএব খাবার নিয়ে কখনো এরকম করবেন না। শুধু স্বামী-স্ত্রী নয়, সবার জন্যে বলছি, কখনো খাবার রেখে উঠে যাবেন না। খাবারের ব্যাপারে কখনো না-শোকর হবেন না। খাবার যা-ই আসুক, যদি এটা পচা-বাসি না হয় এবং স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর না হয়, তাহলে 'শোকর আলহামদুলিল্লাহ' বলে খেয়ে নেবেন। আপনি বিস্মিত হবেন যে, আপনার রিজিক বাড়তে থাকবে। যা চান তা-ই চলে আসবে কোনো না কোনোভাবে।

**প্রশ্ন :** আমি আমার শ্বশুর-শাশুড়িকে খুব ভক্তি করি এবং ভালবাসি। স্বামীর সাথে আমি বিদেশে থাকি। সমস্যাটা হলো, দেশে এলে আমার স্বামী আমাকে সবসময় ওর মা-বাবার সাথে থাকতে বলে। এদিকে আমারও তো মা-বাবা, ভাইবোন আছে। আমারও ইচ্ছা করে এদের সাথে থাকতে। আমি তাই ভাগাভাগি করে থাকতে চাই। কিন্তু স্বামী তাতে নারাজ। এ নিয়ে ওর সাথে ঝগড়া হয়। আমার মন খারাপ হয়ে যায়। আমি কী করে আমার স্বামীকে বোঝাব? এতদিন পর দেশে এসে আমারও তো একটু বেড়াতে ভালো লাগে।

**উত্তর :** সবকিছুই ঠিক আছে। মা-বাবার সাথে থাকতে চাওয়াটা ভুল কিছু নয়। এরপর আপনি দেশে আসার ছয় মাস আগে থেকে আপনার স্বামীকে মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে বোঝাতে থাকবেন যে, দেশে গেলে আমাকে কয়েকদিনের জন্যে আমার বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দেবে। একইসাথে শ্বশুর-শাশুড়িকেও বোঝাতে থাকুন যে, আপনি আপনার বাবার বাড়িতেও কিছুদিন থাকতে চান।

অনুমতিটা স্বামীর কাছ থেকে না নিয়ে শ্বশুর-শাশুড়ির কাছ থেকে নেবেন। শাশুড়িকে আপনার বন্ধু বানিয়ে নিন। শাশুড়ির জন্যে গিফট নিয়ে আসুন। এসেই প্রথম তার চুলে তেল দেয়া শুরু করুন। তারপর শাশুড়িকে বলুন, আম্মা, আপনি অনুমতি দিলে আমি একটু মায়ের বাসায় যেতে চাই। দেখবেন, আপনার শাশুড়িই পাঠিয়ে দেবেন আপনাকে। এরপর স্বামীকে বলুন, আম্মা তো আমাকে যেতে বলেছে। আম্মার কথা না করি কীভাবে?

অর্থাৎ আপনাকে কৌশল বুঝতে হবে। আপনার স্বামীর সাথে কথা বলে লাভ হবে না। কারণ সে-তো তার মা-বাবার দিকটা চিন্তা করছে। বোঝা যাচ্ছে যে, মা-বাবার কাছে তার একটা জবাবদিহিতা আছে। এটা কিন্তু

আপনার জন্যে ভালো। স্বামীর যদি ভয় করার একটা জায়গা থাকে, ভবিষ্যতে স্বামীর কোনো বিষয় নিয়ে আপনি আপনার শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে যেতে পারবেন। অতএব আপনি শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে সম্পর্কটাকে আরো ভালো করুন এবং যাওয়ার অনুমতি নেবেন তাদের কাছ থেকে।

**প্রশ্ন :** আমাদের বিয়ে হয়েছে আজ সাত বছর। আমার জন্মদিন আমার স্বামী কখনোই মনে রাখেন না। আমি কী করব? তার বিশেষ দিনগুলোকে কিন্তু আমি ঠিকই মনে রাখি।

**উত্তর :** খুব ভালো। আপনি সকালবেলাই মনে করিয়ে দেবেন, ওগো, মনে আছে তো, আজকে আমার জন্মদিন। আসার সময় কিন্তু এটা ওটা নিয়ে আসবে। অর্থাৎ বিষয়টাকে সহজভাবে নেবেন। এরকমই তো দেখছেন সাত বছর। অভিমান করেছেন, কিন্তু কোনো লাভ হয় নি। তার চেয়ে তাকে মনে করিয়ে দেয়া সহজ। তাহলে আপনিও বেঁচে গেলেন অভিমান করা থেকে।

**প্রশ্ন :** আমি সারাদিন অনেক পরিশ্রম করে রাত ১১/১২টায় বাসায় ফিরি। খাওয়াদাওয়ার পর আমাকেই মশারি টাঙাতে হয়। আমার স্ত্রী একটু অলস। কোনোক্রমেই আমার স্ত্রীকে দিয়ে টাঙানো যায় না। সে বলে, রিমোট কন্ট্রোল মশারি আনলে তখন টাঙাব। মশারি টাঙাতে আমার প্রচণ্ড খারাপ লাগে, কিন্তু তেমন কিছু বলি না। এর প্রতিকার কী?

**উত্তর :** মূল বিষয়টা দৃষ্টিভঙ্গিতে। যখন মশারি টাঙাবেন, তখন মনে করুন, আমি কত ভালো একটা কাজ করছি! আমার স্ত্রীকে মশার আক্রমণ থেকে রক্ষা করছি এবং নিজেকেও। এটা তো সদকা। মশারি টাঙানো হচ্ছে আত্মরক্ষার জন্যে। আর আত্মরক্ষার কাজ পরিবারে পুরুষদেরই করা উচিত। কারণ একজন মহিলাকে আক্রান্ত অবস্থায় ফেলে রাখা পুরুষদের জন্যে কখনোই শোভন নয়।

তবে যদি সমান অধিকারের কথা বলেন এবং কোনো মহিলা যদি মনে করেন যে, আমিও পুরুষের চেয়ে কম নই, আমিও মশারি টাঙাতে পারি, তাহলে তাকেও মশারি টাঙাতে দেবেন। একজন বলছিলেন, মহিলা হওয়া খুব বিপদ। বাড়ির যত পাক-সাফ, ধোয়ামোছার কাজ—সব করতে হয়। তাকে বললাম, এটা তো সৌভাগ্যের ব্যাপার। কারণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা হচ্ছে ঈমানের অর্ধেক। আর একজন মহিলা এই পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার কাজে

নিয়োজিত থাকতে পারেন, তার শ্রম ব্যয় করতে পারেন। কত বড় কাজ এটা! কাজটা না করলে হয়তো গীবত বা অন্য কোনোভাবে সময় নষ্ট হয়ে যেত।

কাজেই আজ থেকে আপনার স্ত্রী চাইলেও বলবেন, না, মশারি আমি টাঙাব। তবে উনি করতে চাইলে ঝগড়ায় যাবেন না। ভাগ করে নেবেন—একদিন তুমি টাঙাবে, আরেকদিন আমি। কিন্তু নিজেকে এ পুণ্য থেকে বঞ্চিত করবেন না। প্রতিটি ভালো কাজ হচ্ছে পুণ্য। যত আপনি কাজ করতে চাইবেন, আল্লাহ তায়ালা তত আপনাকে কর্মক্ষম রাখবেন। যত আপনি আরামে থাকতে চাইবেন, কাজ ছাড়া থাকতে চাইবেন, আল্লাহ তায়ালা তত আপনার কাজ কমিয়ে দেবেন। আরো বেশি আরাম চাইলে ব্যারাম দিয়ে দেবেন, যেন আপনাকে আর কোনো কাজই করতে না হয়।

## স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে তৃতীয় পক্ষ

**প্রশ্ন :** আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অধিকাংশ বিষয়ে মতের মিল থাকলেও কিছু বিষয়ে অমিলও রয়েছে। তবে সম্পর্ক সবচেয়ে খারাপ হয় যখন আমার স্ত্রীর মা-বাবা, বোনেরা এসব ব্যাপারে নাক গলান। এটা আমার খুবই অপছন্দ।

**উত্তর :** স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে তৃতীয় কেউ নাক গলানো মানে এর চেয়ে ক্ষতিকর আর কিছু নেই। কারণ তৃতীয় কাউকে জড়ানো মানেই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মূল ভিত্তি অর্থাৎ পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত নড়বড়ে হওয়া। আর ভুল বোঝাবুঝির ক্ষেত্রে একজন স্বামী তার স্ত্রীকে বা স্ত্রী তার স্বামীকে যেভাবে বুঝতে পারেন বা সমস্যার মূলে যেতে পারেন, অন্য কারো পক্ষে সেভাবে সম্ভব নয়। ফলে ভুল বোঝাবুঝি কমে না, বরং জটিলতা বাড়ে।

একসাথে থাকতে গেলে মতের অমিল হতেই পারে। এগুলো যদি ছোটখাটো বিষয় নিয়ে হয়, তাহলে নমনীয় হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। যেমন আপনার স্ত্রী যদি বলেন, অমুক আসবাবটা এভাবে রাখতে হবে, তখন আপনার পছন্দ না হলেও আপনি তা মেনে নিন। কিন্তু বিরোধ যখন বড় কোনো বিষয় নিয়ে হয়—যেমন, আপনার স্ত্রী আপনাকে বলল কোনো একটা অন্যায় করতে বা ঘুষ খেতে, তখন তা আর মতপার্থক্য নয়, তা হলো চেতনাগত পার্থক্য। চেতনার ব্যাপারে ছাড় দেয়া যায় না, কিন্তু ছোটখাটো ব্যাপারে ছাড় দেয়াই উত্তম।

আর এসব ব্যাপারে কথা বলতে হলে সরাসরি কথা বলুন এবং তা হওয়া উচিত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, নেতিবাচক আবেগে মন তিক্ত হওয়ার আগেই।

অবশ্য বলাটা হতে হবে শান্ত ও সহজভাবে, মিষ্টতা ও প্রজ্ঞার সাথে এবং অবশ্যই স্থানকালপাত্র বিবেচনা করে। সরাসরি কথা বলাটা শুধু স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রেই নয়, যে-কোনো সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যখনই সরাসরি কথা বলা হয়, তখন অহেতুক জটিলতা সৃষ্টির আগেই সম্পর্ক ঠিক হয়ে যায়।

**প্রশ্ন :** চার দিন হলো স্ত্রী সামান্য কারণে রাগ করে বাবার বাড়ি চলে গেছে। সেখানে হয়তো স্বামীর বদনাম করায় শ্বশুর-শাশুড়িও এখন পর্যন্ত আমার কোনো খোঁজখবর নিচ্ছেন না। স্ত্রীর সাথেও কোনো যোগাযোগ নেই। আমাকে প্রায়ই এরূপ দুর্দশার বৃত্তে পড়তে হয়। মুক্তির উপায় কী?

**উত্তর :** প্রথমত, এসব ক্ষেত্রে স্ত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গি খুব পরিষ্কার থাকা উচিত। তা হলো, স্বামীর সাথে রাগ করে বাবার বাড়ি যাওয়া যাবে না। রাগ করা, অভিমান করা, বোঝাপড়া করা অর্থাৎ যা যা করা দরকার তা স্বামীর সাথে ঘরে থেকেই করতে হবে। বাবার বাড়িতে যাওয়া মানেই আপনি তাদেরকে এর সাথে জড়িত করছেন। যখন এটা করবেন, সমস্যা বাড়বে বৈ কমবে না। সামান্য কারণে স্বামীর নালিশ দিতে গেলে আপনার পরিবারের সদস্যদের কাছে স্বামীর সম্মান যেমন কমবে, আপনার সম্মানও কমবে।

আর স্বামী হিসেবে আপনাকে বলা যায়, এর জন্যে আপনি অনেকটা দায়ী। আপনি সামান্য কারণগুলো কেন সৃষ্টি করেন, যার জন্যে স্ত্রী চলে যান? ছোট ছোট কারণগুলোই তো পুঞ্জীভূত হয়ে একসময় বড় কারণ তৈরি করে। এখন শ্বশুর-শাশুড়ি জামাইয়ের খোঁজ নিচ্ছেন না বলে যে অভিযোগ করছেন, তা-ও একধরনের আহ্লাদিপনা এবং এটা অবিদ্যা। তারা কি বিপদে পড়ে গেছেন যে, জামাইকে সবসময় তোষামোদ করে চলতে হবে?

খোঁজ তো আপনারই নেয়া উচিত। কারণ তারা আপনার মুরব্বি, আপনি তাদের মুরব্বি নন। তাদের সাথে তো আপনার মান-অভিমানের কিছু নেই। আপনার উচিত ছিল চার দিন আগেই নিজে গিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে আসা। শ্বশুর-শাশুড়িকে বলা যে, স্ত্রী রাগ করে যতদিন খুশি আমার সাথে কথা না বলে থাকুক, যা খুশি করুক, কিন্তু যতদিন সে আমার স্ত্রী আছে, সেটা করতে হবে আমার ঘরে থেকে। আমার যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে, তাহলে আপনারা আমার বিচার করতে পারেন। কিন্তু এখন আপনাদের দায়িত্ব হচ্ছে আমার স্ত্রীকে আমার সাথে দিয়ে দেয়া।

স্বামী হিসেবে এটা আপনার জন্যে মোটেই সম্মানজনক নয় যে, আপনার 'স্ত্রী' থাকা অবস্থায় সে রাগ করে বাবার বাড়িতে আছে। দাম্পত্য জীবনে

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হতেই পারে। কিন্তু দুজন দুজনের কাছে ভুল স্বীকারে কখনো সংকোচ বোধ করা উচিত নয়। অতএব আপনার দায়িত্ব হচ্ছে, আজই গিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে আসা।

**প্রশ্ন :** আপনি অসংখ্য বার বলেছেন, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার মধ্যে কখনো তৃতীয় পক্ষকে না জড়াতে। এমনকি নিজের মাকেও না। কিন্তু আমার স্বামী ঝগড়া হলে বা পান থেকে চুন খসলেই আমার শ্বশুর-শাশুড়ি, আমার মা, সবাইকে ফোন করে জানায়। কথায় কথায় তিন চার মাস কথা বলা বন্ধ করে দেয়। আজ আট বছরের সংসারে এটা বার বার হয়ে আসছে। আমার কী করণীয়?

**উত্তর :** এত সবকিছুর পরেও যে আট বছর আপনি আছেন, এ থেকে বোঝা যায় যে, আপনি তাকে ভালবাসেন। কিন্তু আপনাদের মধ্যে ঝগড়া হলে আপনার স্বামী যে শ্বশুর-শাশুড়ি, আপনার মা, সবাইকে ফোন করে করে সব জানিয়ে দেন, এটা কখনোই উচিত নয়। এটা অবশ্যই ভুল। এই ভুল যেন তিনি শুধরে নিতে পারেন সেজন্যে পদক্ষেপ নিতে হবে। কারণ নিজের স্বামীর বদনাম করে তো কোনো লাভ নাই, বরং তিক্ততা বাড়বে।

অতএব মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে নিয়ে এসে স্বামীকে আপনার কষ্টটা আন্তরিক ভাষায় বোঝান। বলুন যে, ‘দেখ, আমি তোমাকে ভালবাসি, তুমি যে আমাকে ভালবাসো এটাও আমি বুঝি। আমার কোনো আচরণে তোমার রাগ হলে যা বলার আমাকে বলো। আমাদের সমস্যা আমরা সমাধান করব। এর মধ্যে তৃতীয় কাউকে জাড়াবে না। অন্যদেরকে কেন কষ্ট দেবে? অন্যদের কাছে কেন আমাদের সম্মান নষ্ট করবে?’

আর স্বামী যদি তিন চার মাস কথা বলা বন্ধ করে দেন, তো আপনিও মৌনতা পালন করবেন। অর্থাৎ কথা না বলাটাকে সহজভাবে নিন। তখন মেডিটেশনে আলফা লেভেলে মমতা দিয়ে তাকে বোঝাবেন এবং তার জন্যে দোয়া করবেন। ইনশাআল্লাহ সব ঠিক হয়ে যাবে।

## স্বামী/ স্ত্রীর ভুল ধরা

**প্রশ্ন :** আমার স্বামী সবসময় আমার নেগেটিভ দিকগুলো বলতে থাকেন। কিন্তু দুঃখ হয় এজন্যে যে, আমার তো কিছু পজিটিভ দিকও আছে। একটা মানুষের কি শুধুই দোষ থাকে? দোষ-গুণ মিলেই তো মানুষ। এখন আমার প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে পরিবর্তন করা যায়?

**উত্তর :** এতে দুঃখ পাবেন না। আপনি আপনার পজিটিভ দিকগুলো আরো উন্নত করুন। দেখবেন, একসময় তিনিই নেগেটিভ দিক বাদ দিয়ে পজিটিভ দিকগুলো নিয়ে কথা বলা শুরু করবেন। পাশাপাশি তার জন্যে দোয়া করুন যেন তার দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসে। কিন্তু এ নিয়ে কখনোই কোনো বিতর্কে জড়াবেন না বা তার এসব কথার উত্তর দিতে যাবেন না। এই বিতর্ক শুধু নিজেদের শান্তিটুকু কেড়ে নেয়, ভালো কিছু দেয় না।

**প্রশ্ন :** আমাকে এই পৃথিবীতে শুধু আমার স্বামীই বুলিং করে। সে আমার গায়ের রং, চেহারা, গড়ন, হাত-পা, হাঁটাচলা, পোশাক-স্টাইল সবকিছু নিয়ে তীব্র সমালোচনা করে, যা আমার ট্রমা ও মানসিক কষ্টের কারণ। এ থেকে কীভাবে মুক্ত থাকব? তাকে কীভাবে উপেক্ষা করব?

**উত্তর :** খুব সিম্পল। এত বুলিংয়ের পরেও আপনি টিকে আছেন। এখন এই পরিস্থিতিটাকেই উপভোগ করতে শিখুন। মনে করুন এটা বুলিং নয়, বরং এটা প্রশংসা। একেক জনের প্রশংসার ধরন একেক রকম হয়ে থাকে। যখনই আপনার গায়ের রঙের বদনাম করবে, চেহারা নিয়ে কিছু বলবে, আপনি হাসি দেবেন। ধরে নেবেন, একেকজন একেকভাবে ভালবাসা দেখায়। অনুভব করবেন যে, এটাই আপনার স্বামীর প্রশংসার ভাষা।

আমাদের এক বন্ধু ছিলেন। তার স্ত্রী তাকে খুব ভালবাসতেন। কিন্তু ভালবাসার প্রকাশ ছিল ভিন্ন। স্বামী আসতে দেরি করলে মহিলা টেনশনে ঘরে পায়চারি করতেন। যতক্ষণ না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত মহিলা বসবেও না। স্বামী যে-ই ঘরে ঢুকল, তার প্রথম বাক্যটা ছিল, 'তুই মরলি না কেন?' কিন্তু এটা তার মনের কথা ছিল না। এটা মুখের কথা। সেই বন্ধু প্রায়ই বলতেন যে, স্ত্রীর সাথে আর থাকবেন না। কিন্তু পালাতেও পারতেন না। জিজ্ঞেস করলে বলতেন যে, এমন খতরনাক! যেখানে যাই, খুঁজে বের করবে এবং বকা শুরু করবে। তাই তাকে ছেড়ে দেয়াও সম্ভব হচ্ছে না!

তো একেকজনের ভালবাসার প্রকাশ একেক রকম। সবাই একভাবে তা প্রকাশ করতে পারে না। এই প্রকাশের কিছুটা নিজেকে ধরে নিতে হয়, ব্যাখ্যা করে নিতে হয় আর সেই ব্যাখ্যাটা হতে হবে ইতিবাচক। আপনার স্বামী যখন আপনার সমালোচনা করছেন, তিনি কিন্তু আপনাকে ঠিকই পর্যবেক্ষণ করছেন, মনোযোগ দিচ্ছেন। অর্থাৎ তার ভাবনার জগতে আপনিই। কিন্তু তার নিজেরও হয়তো অতীতের কোনো ট্রমার কারণে তিনি আপনার প্রশংসা ঠিকমতো করতে পারছেন না।

আবার কেউ কেউ নিজের হীনম্মন্যতা থেকেও সবকিছুর সমালোচনা করে। মনে করে, অন্যকে খাটো করে সে তৃপ্তি পাবে। যদিও এতে তৃপ্তি তো আসেই না, বরং অতৃপ্তি বাড়ে। আপনার স্বামী যে কারণেই এমন করুন না কেন, আপনি তার প্রতি সমমর্মিতা অনুভব করুন—আহা! বেচারার মনটা আমার দিকেই পড়ে থাকে! অর্থাৎ যখন কোনোকিছুকে সরাসরি ফেস করা যায় না, তখন এটাকে পাশ কাটাতে হয়, এটাকে বাইপাস করে চলতে হয়। তাহলে আপনি নিজে ভালো থাকবেন, প্রশান্তিতে থাকবেন।

**প্রশ্ন :** আমার পার্টনারের দোষত্রুটির কথা যখন বলি, তখন ঝগড়া হয় এবং দূরত্ব সৃষ্টি হয়। কী করে এ সমস্যা এড়ানো যায়?

**উত্তর :** সহজ সমাধান হচ্ছে, দোষত্রুটি ধরতে যাবেন না। কারণ যখনই আপনি দোষ ধরিয়ে দিচ্ছেন, তখনই দেয়াল তৈরি হয়ে যাচ্ছে। তিনিও পাল্টা বলেন, আমার কী দোষ? কোনো মানুষই তার দোষত্রুটি স্বীকার করার মতো অবস্থায় সবসময় থাকে না। সেজন্যে আপনাকে কুশলী হতে হবে।

সরাসরি না বলেও কিন্তু ভুল ধরিয়ে দেয়া যায়। আপনি হয়তো বলতে পারেন, অমুকে এ কাজটা করেছিল, এটা কি ঠিক? তখন তিনি না-সূচক কিছু বললে আপনি বলবেন, আমাদেরও মনে হয় এরকম ভুলের ব্যাপারে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কাউকে বদলাতে চাইলে সবসময় প্রজ্ঞার সাথে, মিষ্টি ভাষায় বলতে হয়; কৌশলে কাজ করতে হয়।

**প্রশ্ন :** আমার স্বামী খুবই নির্বোধ। সবার সামনে আমার ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে মজা দেখে। অথচ আমি ওনার সব বদগুণ চেপে রাখি। কিছু বলুন প্লিজ।

**উত্তর :** এটা খুব ভালো করছেন যে, স্বামীর কোনো দোষ আপনি বাইরে প্রকাশ করেন না। কিন্তু কোনো স্ত্রীর এরকম মন্তব্য করা উচিত নয় যে, আমার স্বামী খুবই নির্বোধ। একইভাবে কোনো স্বামীরও স্ত্রী সম্পর্কে এরকম অসম্মানজনক মন্তব্য করা উচিত নয়।

আমরা সবসময় বলি, স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই দুজনকে শ্রদ্ধা করা উচিত। কখনোই কারো সম্পর্কে এমন কথা বলা উচিত নয়, যা অসম্মানজনক। এমনকি ভাবাও উচিত নয়। কারণ ভাবলেও মানসিকভাবে এর প্রভাব পড়ে। যেহেতু আপনি তার মধ্যে একটা ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে চাচ্ছেন, তাকে মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে বোঝান, দোয়া করুন।

**প্রশ্ন :** আমার ছেলেমেয়ে হবে কিনা? স্বামীর সাথে সংসার হবে কিনা? আমার স্বামী অনেক খারাপ লোক, দুষ্ট লোক...। সে আদৌ ভালো হবে কিনা? জীবনে সাফল্য অর্জন করতে পারব কিনা?

**উত্তর :** এত প্রশ্ন থাকলে তো হবে না। প্রশ্ন কমান। লক্ষ্য স্থির করুন যে, আমি জীবনে এই এই করব। স্বামীকে মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে তাকে মমতা দিয়ে বোঝান। তার জন্যে দোয়া করুন। যার সাথে সংসার করবেন, তার যদি বদনাম করেন, দোষ ধরেন, সংসার করবেন কীভাবে? স্বামী বা স্ত্রীর নিন্দা করাটা শোভন নয়। কারণ ঘরের কথা বাইরে বলে কোনো লাভ নেই। তাতে নিজের অশান্তি বাড়বে, অসম্মান বাড়বে।

সবসময় যত ক্ষমা করা যায়, যত সমঝোতা করা যায়, তত ভালো। সংসার মানে হচ্ছে সমমর্মিতা, সমঝোতা এবং পরস্পরের প্রতি সম্মান। সংসারে ভালো কিছু যত দিতে পারবেন, তত আপনি সুখী হবেন। কিন্তু যত পেতে চাইবেন, তত সমস্যা বাড়বে। যখন কিছুই পেতে চাইবেন না, তখন অল্প কিছু পেলেও সেটাকে অনেক মনে হবে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই যদি শুধু পেতে চান, তখন দুজন পরস্পরের কাছ থেকে দূরত্বে চলে যাবেন। অতএব সবসময় ইতিবাচক থাকবেন, দেয়ার মানসিকতা লালন করবেন।

আপনি জীবনে সাফল্য অর্জন করতে চান, খুব ভালো। সাফল্যের প্রথম সূত্র কী? শোকরগোজার হওয়া। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কৃতজ্ঞতা মানে হচ্ছে তৃপ্তি। তৃপ্তি মানে সুখ। সুখ মানে আনন্দ। সুখ সবসময় সুখকে আকর্ষণ করে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। সুখ কোথায় যাবে? সুখের ঘরে, যেখানে সুখ আছে সেখানে যাবে।

সুখকে আকর্ষণ করতে হলে তাই আগে আপনাকে মনে মনে সুখী হতে হবে। বলবেন যে, ভেতরে দুঃখ, সুখী হবো কীভাবে? সুখের অভিনয় করতে হবে। নিজেকে সুখী ভাবতে হবে। নিজেকে যখন সুখী ভাবতে শুরু করবেন, তখন দেখবেন যে, সুখের অনেক পয়েন্ট আপনার জীবনেও আছে। আপনার স্বামীর হয়তো অনেক দোষ। কিন্তু কিছু না কিছু গুণও তো আছে। সেদিকে তাকাতে হবে। দোষগুলোকে উপেক্ষা করতে হবে।

আমরা আসলে কী করি? আমরা সুখের পয়েন্টগুলোকে মনে রাখি না, দুঃখের পয়েন্টগুলোকে মনে রাখি। স্বামীর সাথে বা স্ত্রীর সাথে ঝগড়া হলে সাথে সাথে এর আগে স্বামী বা স্ত্রী কবে কী বলেছিল চেইন রি-একশনের মতো সব একের পর এক মাথায় আসতে থাকে। একেবারে বিয়ের দিন থেকে শুরু করে এবং বিয়ের আগে থেকেও যদি সম্পর্ক থাকে, সেই থেকে শুরু করে

যত ঘটনা সব অটোমেটিক মনে চলে আসে। মনে করিয়ে দিতে হয় না। কেন? কারণ দুঃখ দুঃখকে টানে, সুখ সুখকে টানে। আনন্দ আনন্দকে টানে, শত্রুতা শত্রুতাকে টানে। এটাই প্রকৃতির আইন।

সেজন্যে আগে নিজেকে সুখী ভাবুন, তারপর ভাবনাটাকে বিশ্বাস করুন, তারপর অর্জন করুন। এরপর বলতে পারবেন, সারা পৃথিবী আমার। অর্থাৎ সুখ বা দুঃখ, আনন্দ বা কান্নার মূল হচ্ছে এই ভাবনা। আপনার যদি কান্নার ভাবনা আসে, আপনি কিন্তু হাসতে পারবেন না। হাসতে হলে আপনার হাসির স্মৃতি মনে আনতে হবে, সুখের স্মৃতিতে বিচরণ করতে হবে।

এই যে আপনার এত নেতিবাচকতা, এত প্রশ্ন সবই কিন্তু হতাশা থেকে এসেছে। এই হতাশা কীভাবে আপনার মনের মধ্যে এলো, এটা বিশ্লেষণ করুন। মেডিটেশনে আলফা স্টেশনে গিয়ে হতাশাগুলো দূর করুন। নিজের মধ্যে বিশ্বাস প্রবল করুন। আপনার তো তা-ও স্বামী আছে, অনেকের তো বিয়েও হচ্ছে না। তারা হন্যে হয়ে সংসার করার জন্যে সঙ্গী খুঁজছে, কিন্তু পাচ্ছে না। সে তুলনায় আপনার তো স্বামী-সংসার আছে। শোকরগোজার হোন। ঠান্ডা মাথায় সংসারটাকে সুন্দর ও সুখী করার চিন্তা করুন।

**প্রশ্ন :** আমার স্বামী অলস ও কিছুটা দায়িত্বহীন। ওকে কীভাবে এ দুটো শত্রু থেকে বের করব? স্ত্রী হিসেবে আমার করণীয় কী?

**উত্তর :** স্বামী যদি দায়িত্বহীন হয়, তাহলে স্ত্রীকে দায়িত্বশীল হতে হবে। কারণ কাউকে না কাউকে তো দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। আপনি দায়িত্ব গ্রহণ করুন। আপনার স্বামী যখন আপনাকে বেশি বেশি দায়িত্ব নিতে দেখবেন, সম্ভাবনা হচ্ছে, তিনি অলস হিসেবে পরিচিত হওয়ার ভয়ে তখন নিজে থেকেই দায়িত্বশীল হয়ে উঠবেন।

সমস্যা হলো, এই দায়িত্বটা আমরা নিজেরা আগে নিতে পারি না। আমাদের তরুণ-তরুণীদের দেখলে মায়া হয়। তারা অনেকেই দায়িত্ব নিতে চায় না। বছরের পর বছর মোবাইলে বা ফেসবুকে চ্যাটিং করে। কিন্তু দায়িত্ব নিতে হবে ভেবে কোনো সিদ্ধান্ত নেয় না। 'কী জানি, বিয়ে করে সুখী হবো কি হবো না!' বিয়ে না করে যদি শুধু ঘুরঘুর করো, তাহলে তোমার অবস্থান আর পশুর অবস্থানে পার্থক্য কোথায় থাকল?

তাই দায়িত্ব নিতে হবে। নিজের পরিবারের দায়িত্ব নিতে হবে, স্ত্রীর দায়িত্ব নিতে হবে, স্বামীর দায়িত্ব নিতে হবে, মায়ের দায়িত্ব নিতে হবে এবং দেশের দায়িত্ব নিতে হবে। যে দায়িত্ব নিতে পারে, সে-ই আসলে বড় হয়,

সেই সফল হয়। একটি মেয়ে কেন দায়িত্ব নিতে পারবে না? অনেক মেয়ে নিজের মা-বাবার সাথে যোগাযোগ করবে, কিন্তু আজকাল টিভি সিরিয়ালের প্রভাবে স্বামীর মা-বাবাকে মনে করে শত্রু। একজন শাশুড়ির দায়িত্ব কেন নিতে পারবেন না? স্বামী কি মা ছাড়া পৃথিবীতে এসেছে? দায়িত্ব নিন। দেখুন, সবকিছু কত সহজ হয়ে যায়। যত দায়িত্ব নিতে পারবেন, তত আপনি সফল হবেন এবং প্রশান্তি পাবেন।

যে বাস্তবতা থেকে সরে দাঁড়ায়, সে কখনো শান্তি পায় না। প্রশান্তি পেতে হলে আপনাকে বাস্তবতার মধ্যে ডুব দিতে হবে এবং এমনভাবে ডুব দেবেন, যখন উঠবেন, গায়ে কোনো পানি থাকবে না। এটা হচ্ছে দায়িত্ব। আমরা যে কাজই করি, তা যেন দায়িত্বের সাথে করি। অতএব আপনি নিজের দায়িত্বগুলো ভালোভাবে পালন করুন আর স্বামীর জন্যে দোয়া করুন।

**প্রশ্ন :** আমার স্বামী খুবই বদরাগী ও অলস প্রকৃতির। শুধু রাগ প্রদর্শন করে সবার মাঝে প্রধান হয়ে থাকতে চায়। সে সবসময় আমাকে অবমূল্যায়ন করে। এজন্যে প্রতি পদে পদে অপমানিত হতে হয়েছে। আগে শুধু রাগ করে কথা শোনাতাম। এখন আপনার উপদেশ অনুসরণ করি। তাই বকে বকে ঠিক করার চেষ্টা করি না। কিন্তু এতে কি আমার স্বামীই জিতে গেল না?

**উত্তর :** আপনি প্রতি পদে পদে অপমানিত হয়েছেন, তবুও যেহেতু স্বামীকে ছাড়তে পারছেন না, তাই সবর করাটাই উত্তম। রাগ করে কথা শুনিয়ে পরিবর্তন আনা যাবে না, বরং আপনি হেরে যাবেন। এখন এই যে আপনি ঝগড়া করছেন না, বকে বকে ঠিক করার উদ্যোগ নিচ্ছেন না—এটিই সঠিক পন্থা। কারণ বকে বকে কাউকে ঠিক করা যায় না, বিশেষত স্বামীকে। বরং মমতা দিয়ে কুশলী হয়ে প্রো-একটিভ থেকে ঠিক করতে হয়।

## দাম্পত্য সম্পর্কে অবহেলা/ উদাসীনতা

**প্রশ্ন :** বাইরে সবার অবহেলা ও নেতিকথা গ্রাহ্য না করলেও আমার স্বামীর নেতিকথায় ভীষণ প্রভাবিত হই। কীভাবে ইতিবাচক থাকতে পারি?

**উত্তর :** আরেকজনের কথা আপনাকে কতটুকু প্রভাবিত করবে বা করবে না এটা নির্ভর করে আপনার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর, আপনার ভাবনার ওপর। একটা বাস্তব ঘটনা বলি—একজন বাজারে গেছে। একটা মোবাইল দেখে খুব পছন্দ

হয়েছে বলে সে মোবাইলটা অজ্ঞাতসারে নিজের পকেটে ঢুকিয়ে ফেলেছে। ঘটনাটা দেখে একটি ছোট শিশু দোকানদারকে বলে দিয়েছে। সাথে সাথে সবাই গিয়ে তাকে ঘেরাও করলে সে অবলীলায় স্বীকার করেছে। তখন সবাই প্রশ্ন করল, তুমি কীভাবে মোবাইল চুরি করলে? বলে যে, হঠাৎ আমার ওপর শয়তান ভর করেছিল। একথা শুনে উপস্থিত সবাই হেসে ফেলেছে, আর সে-ও মোবাইলটা ফেরত দিয়েছে।

এরকম আপনার স্বামী যখন নেতিবাচক কথা বলবেন, তখন আপনি মনে মনে বলবেন যে, আহারে! আমার স্বামী এত ভালো, কিন্তু এখন শয়তান তার ওপর ভর করেছে। তাই দোয়া করবেন যেন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। অর্থাৎ কখনো কারো নেতিবাচক কথায় প্রভাবিত হবেন না। এটাই মহামানবদের শিক্ষা।

আমরা যদি মানুষের নেতিবাচক কথা শুনতাম, তাহলে ৩২ বছর আগে পৃথিবী থেকে কোয়ান্টাম বিলুপ্ত হয়ে যেত। অতএব আমরা যে সূত্রগুলো প্রয়োগ করে এ পর্যায়ে এসেছি সেই সূত্রগুলোই আপনাদেরকে বলছি, যাতে আরো অনেক বড় পর্যায়ে আপনারা যেতে পারেন।

আপনি নিজে সবসময় ইতিবাচক থাকবেন। স্বামীর নেতিকথা নিয়ে কখনো মন খারাপ করবেন না। কারণ মন খারাপ করলে নেতিবাচক চিন্তাভাবনা মনে এলে সঙ্গীর সাথে একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এই দূরত্বটা পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে খুব ক্ষতিকর। কখনো দূরত্ব সৃষ্টি করবেন না। আপনারা একসাথে আছেন মানে স্বামীকে আপনি ভালবাসেন এবং স্বামীও আপনাকে ভালবাসে। অতএব ভালবাসার পরিমাণটাকে বাড়াবেন।

**প্রশ্ন :** স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক না রাখে, কথা বলতে গেলে খারাপ ব্যবহার করে, স্ত্রীকে অবহেলা করে, তখন কী করা যেতে পারে?

**উত্তর :** মেডিটেশনে বসে স্বামীকে কমান্ড সেন্টারে নিয়ে আসুন। তার সাথে আপনার সুখের যে মুহূর্তগুলো, সেই মুহূর্তগুলোকে স্মরণ করুন। অনুভব করুন। তারপরে তাকে বোঝান। এভাবে তাকে নিয়মিত বোঝাতে থাকুন মমতা দিয়ে। আপনি যেহেতু স্বামীকে ভালবাসেন, অবশ্যই তাকে প্রভাবিত করতে পারবেন।

**প্রশ্ন :** স্বামীর কাছ থেকে আমি আলাদা আছি। তাকে অনেক ভালবাসি। কিন্তু সে আমার কোনো দায়িত্ব নিতে চাচ্ছে না। আমার প্রতি উদাসীন। কী করব?

**উত্তর :** বিয়েটা শুধুই ভালবাসাবাসির কোনো ব্যাপার নয়। বাস্তব সত্য হচ্ছে এটা প্রয়োজনের ব্যাপার। আপনার দায়িত্ব সে নিতে চাচ্ছে না, তার মানে তো সে দায়িত্বশীল নয়। আপনি কীভাবে তার কাছে যাবেন?

ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে মানে হচ্ছে স্বামী দায়িত্ব নেবে। অর্থাৎ একজন পুরুষ প্রস্তাব করছে এবং একজন নারী যখন সম্মতি দিচ্ছে, তখন বিয়ে হচ্ছে। নারী যদি কোনো পর্যায়ে অসম্মত থাকে, তাহলে এই বিয়ে হয় না। আর পুরুষ বিয়ে করে দেনমোহর এবং নারীর ভরণপোষণের শর্তে। এখন স্বামী যদি উদাসীন হয় এবং আপনার দায়িত্ব নিতে না চায়, তাহলে তো তিনি শর্তভঙ্গ করছেন। এটা তাকে বুঝতে হবে।

আপনি তো জোর করে কারো ঘাড়ে চেপে বসতে পারেন না। তাহলে আপনার দায়িত্ব নিতে রাজি এমন কারো খোঁজ নিতে পারেন। অথবা এই স্বামীর উদাসীনতা সত্ত্বেও যদি তার সাথে সংসার করতে চান, তো আপনি স্বামীর দায়িত্ব নিয়ে নিন। বলুন—ঠিক আছে, তোমার কিছু করতে হবে না, যা করার আমি করব। অর্থাৎ প্রত্যেকটা বিষয়কে দেখতে হবে আপনার নিজস্ব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে, আপনি কী করতে পারেন। কীভাবে সমস্যার অংশ না হয়ে সমাধানের অংশ হতে পারেন, সেটা ভাবতে হবে।

**প্রশ্ন :** আমার স্বামী মনে করে, আমি তাকে খুব অবহেলা করি। আর আমি মনে করি, সে আমাকে কষ্ট দেয়। এই নিয়ে ভীষণ অশান্তি। করণীয় কী?

**উত্তর :** পুরো বিষয়টি একধরনের নেতিবাচকতা থেকে হচ্ছে। একদিকে আপনি মনে করেন, আপনার স্বামী আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে। অন্যদিকে তিনি মনে করেন, আপনি তাকে অবহেলা করেন। দুজনেরই এই নেতিবাচকতার ফলে বাস্তবেও সমস্যাগুলো হচ্ছে। যেমন, আপনার স্বামী মনে করেন, আপনি তাকে অবহেলা করেন। কিন্তু এটা কি তিনি কখনো আপনাকে বলেছেন? এই মনে করাটা তো আপনার ভুল ধারণাও হতে পারে।

আর শান্তি এবং অশান্তি বিষয়টা তো নিজের মধ্যে। আপনি এখন থেকে ভাবতে শুরু করুন, আপনার স্বামী আপনাকে পছন্দ করে। আপনাকে পছন্দ করলে যে আচরণগুলো তিনি করতেন, সেগুলোই কল্পনা করুন, মনছবি দেখুন। স্বামীর কল্যাণের জন্যে মন থেকে দোয়া করুন। একটা সময়ে দেখবেন, আপনার মনছবি অনুযায়ী বাস্তবেও তিনি সেই আচরণ করছেন, যা থেকে আপনি নিশ্চিত হবেন যে, তিনি আপনাকে ভালবাসেন। বাস্তবেও দেখবেন যে, স্বামীর ভুল ধারণা দূর হচ্ছে, আচরণ সুন্দর হচ্ছে।

**প্রশ্ন :** স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি কেয়ারিং হওয়া বা মমত্ববোধ থাকা জরুরি, এটুকু বুঝলাম। কিন্তু স্ত্রী যদি স্বামীকে কেয়ার করে আর স্বামী যদি স্ত্রীকে কেয়ার করার ব্যাপারে উদাসীনতা দেখায়, সে-ক্ষেত্রে স্ত্রীর করণীয় কী?

**উত্তর :** যতদিন স্ত্রী আছেন ততদিন স্বামীকে কেয়ার করেই যাবেন। স্ত্রী হিসেবে এটা আপনার করণীয়। আপনি আপনার কর্তব্য করে যান। আপনার যা দেয়ার দিয়ে যান। প্রতিদান কী পেলেন এটা নিয়ে কখনো চিন্তা করবেন না। তাহলে অপরপক্ষ থেকে কিছু না পেলেও আপনার শান্তিতে থাকার সম্ভাবনা থাকবে যে, আমি তো অন্তত দিতে পেরেছি। এই নিঃস্বার্থ দেয়ার ফলে আল্লাহর কাছ থেকে আপনার পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। কারণ আল্লাহ তায়ালা কারো ভালো কাজ নষ্ট করেন না।

আর যদি বলেন স্বামীর কাছ থেকে পাওয়ার চান্স কতটুকু, তাহলে বলতে হয় যে, যত্ন কেয়ার মমতা এগুলো চেয়ে পাওয়া যায় না। এটা আপনাকে বুঝতে হবে। এটা কেউ বলে দিতে পারবে না। এ ব্যাপারে প্রত্যেকের নিজস্ব কিছু কুশলতা কিছু প্রজ্ঞা প্রয়োগ করতে হয়। আমরা দোয়া করি।

**প্রশ্ন :** বিবাহিত জীবনে স্বামীর শ্রদ্ধা আর পারিবারিক কোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে গুরুত্ব পাব কীভাবে?

**উত্তর :** শুধু আকাশকুসুম কল্পনা নয়, স্বামীর শ্রদ্ধা আর গুরুত্ব পাওয়ার মতো গুণে নিজেকে গুণান্বিত করুন। মানবীয় গুণাবলি বিকশিত করুন এবং জ্ঞান বুদ্ধি প্রজ্ঞা অর্জন করুন। স্বামীর সাথে আপনি তো লড়াইয়ে যেতে পারবেন না। অতএব তাকে জয় করতে হবে বুদ্ধি দিয়েই। বুদ্ধির লড়াইয়ে সে যদি আপনাকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করে, তখন ওপরে হয়তো ভান করবে যে, আপনার কথার কোনো গুরুত্ব দেয় না—হয়তো সে কিছুতেই স্বীকার করতে চাইবে না এবং স্বীকার করতে চাওয়ার পুরুষের সংখ্যা অনেক কম। কিন্তু দেখবেন, আপনার পরামর্শ ছাড়া সে কোনো কাজই করছে না।

**প্রশ্ন :** স্বামী অসুস্থ হলে সেটা প্রতিকারের জন্যে অনেক কিছু করা হয়। কিন্তু স্ত্রী যখন অসুস্থ হয়, বিশেষত যখন মানসিকভাবে, তখন সেটাকে তারা সহজভাবে না দেখে এমন ব্যবহার করে, যেটা ঠিক নয়। এ-ছাড়াও এটাকে তারা অন্যভাবে প্রয়োগ করে স্ত্রীকে দমিয়ে রাখে, যেন সে ভালো হতে না পারে। এই অবহেলা প্রতিকারের উপায় কী?

**উত্তর :** স্ত্রী মানসিকভাবে অসুস্থ হলে তার চিকিৎসার জন্যে যা যা করা দরকার, তার সবই করতে হবে। এটাই মানবিকতার দাবি এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সুস্থ সম্পর্কের দাবি। যদি কেউ এটি না করেন, তা অবশ্যই অন্যায়।

**প্রশ্ন :** আমার স্বামী আমাকে ভালবাসেন। কিন্তু ভালবাসার কোনো প্রকাশ নেই। তিনি এখনো নিজেকে ব্যাচেলরের মতোই ভাবতে পছন্দ করেন। তার অবহেলা আমার ভালো লাগে না। শুধু ভালবাসাই কি জরুরি, প্রকাশটা নয়?

**উত্তর :** এখানে অভিমানী বা অভিযোগকারী না হয়ে আপনাকে কুশলী হতে হবে। আপনার স্বামী যেহেতু নিজেকে ব্যাচেলর ভাবতে পছন্দ করেন, আপনিও নিজেকে কুমারী ভাবুন। বিয়ের আগে যে-রকম আচরণ করতেন, তা করতে থাকুন। দেখবেন আপনার স্বামীর আগ্রহ ও আকর্ষণ বেড়ে গেছে এবং তিনি ভালবাসার প্রকাশ শুরু করেছেন।

অর্থাৎ প্রতিটি ঘটনার পেছনে কার্যকারণটা খুঁটিয়ে দেখতে হবে। তিনি প্রকাশ করছেন না, তার মানে তাকে দিয়ে প্রকাশ ঘটাতে হবে আপনাকেই। তখন কৌশল ঠিক করে ফেলতে হবে, কীভাবে তা করা যায়।

**প্রশ্ন :** আমার স্বামীকে নিয়ে আমি খুব চিন্তিত। বর্তমানে তার চাকরি নেই। তার সমস্যা হলো, সে সহজে আমার কথা শোনে না। আমাকে সবচেয়ে বেশি অবহেলা করে। আবার সে খুব অলসও। টিভি দেখতে খুব পছন্দ করে এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা টিভি দেখে পার করে দেয়। তবুও সে আমার স্বামী। আমি তার ভালো চাই। তার একটা ভালো চাকরি হোক, আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করি। দোয়া করবেন—আল্লাহ যেন তার হালাল রিজিকের ব্যবস্থা করে দেন।

**উত্তর :** আল্লাহ হালাল রিজিক কোথায় দেবেন? টিভির সামনে বসে কেউ যদি অলস সময় কাটায়, আল্লাহ কীভাবে হালাল রিজিকের ব্যবস্থা করবেন? আপনি আপনার স্বামীর জন্যে দোয়া করছেন ঠিক আছে, কিন্তু বর্তমান অবস্থার উত্তরণে আপনার স্বামীকে উদ্যোগী হতে হবে প্রথম। 'স্ত্রী ভাগ্যে ধন' বলে একটা কথা আছে। কিন্তু স্বামীকে তো ধনের অনুসন্ধান করতে হবে। স্ত্রীর দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করার নিয়ত করে উদ্যমী হতে হবে।

এজন্যে আপনার স্বামীকে প্রথমে আলস্য কাটিয়ে লক্ষ্য ঠিক করতে হবে যে, তিনি আসলে কী করতে চান। তারপর তাকে যে-কোনো একটা কাজ শুরু করে দিতে হবে। কাজ না করতে করতে তার যে দীর্ঘদিনের জড়তা, এটা

ভাঙতে হবে। প্রথমেই হয়তো তিনি তার মনের মতো কাজ পাবেন না, কিন্তু লেগে থাকলে নিশ্চয়ই পাবেন। আপনি নিয়মিত প্রার্থনা ও মেডিটেশনে তার জন্যে দোয়া করুন। তিনি কর্মোদ্যোগী হয়েছেন এবং আপনাকে অবহেলা না করে বরং অনেক বেশি ভালবাসছেন, এমন মনছবি দেখুন।

## স্ত্রীকে হাতখরচ দেয়া/ স্ত্রীর জন্যে ব্যয়

**প্রশ্ন :** স্বামী ভালো বেতনের চাকরি করেন। সৎভাবে জীবনযাপন করেন। বেতনের সব টাকাই পরিবারের জন্যে ব্যয় করেন। কিন্তু স্ত্রী স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট নন, সবসময় মনঃকষ্টে থাকেন। বিশেষত স্বামীর প্রতি কটাক্ষ করে স্ত্রী প্রায়ই বলেন, তার স্বামীর চেয়ে কম বেতনের লোকেরা তাদের স্ত্রীকে অনেক গয়না-শাড়ি, বাড়ি-গাড়ি দিয়েছেন, অথচ এহেন স্বামীর হাতে পড়ে তার বেহাল অবস্থা। অবশ্য অনৈতিকভাবে উপার্জনের তাগিদও দেন না। প্রশ্ন হলো, কী করলে স্ত্রীর মর্মবেদনা দূর হবে?

**উত্তর :** সৎ স্বামীর চেয়ে স্ত্রীর কাছে যদি শাড়ি-গয়না, বাড়ি-গাড়ি বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে সেই স্ত্রীর মর্মবেদনা কখনো দূর হবে না। তার জন্যে দোয়া করুন, যেন তিনি যা পেয়েছেন সেজন্যে শোকরগোজার থাকতে পারেন। তিনি যেন বুঝতে পারেন যে, পণ্যদাসত্বের মধ্যে সুখ নেই, কৃতজ্ঞচিত্ততার মধ্যেই প্রকৃত সুখ। মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে তাকে মমতা দিয়ে বোঝান। হয়তো তার মনোভাবে পরিবর্তন আসতেও পারে।

তবে স্বামী হিসেবে আপনি এটাও একবার বিবেচনা করে দেখুন, স্ত্রীর প্রতি আপনার মনোযোগের কোনো ঘাটতি হচ্ছে কিনা। কারণ স্ত্রী যেহেতু অনৈতিকভাবে উপার্জনের তাগিদ দিচ্ছেন না, তার মানে হয়তো তার মূল চাহিদা গাড়ি-বাড়ি নয়। আপনি তার প্রতি আরেকটু বেশি মন দিন, মাঝে মাঝে ছোটখাটো উপহার দিন। আবার এটাও করতে পারেন যে, আপনার বেতনের টাকাটা স্ত্রীর হাতে দিয়ে তাকে সংসারের খরচ সামলাতে দিন। এরপর তাকে বলুন, সব খরচ শেষে বাকিটা দিয়ে গয়না-শাড়ি, বাড়ি-গাড়ি করো। অর্থাৎ সংসারের খরচের সাথে স্ত্রীকে সম্পৃক্ত করুন।

**প্রশ্ন :** পোস্ট অফিসে আমার দুই লক্ষ টাকার সঞ্চয়পত্র আছে। সেখান থেকে প্রতি মাসে আমি দুই হাজার টাকা করে মুনাফা পাই। এটা সুদ বলে আমি পোস্ট অফিসে টাকা রাখতে ইচ্ছুক নই। আমি টাকাটা তুলে নেয়ার নিয়ত

করেছি। কিন্তু এই টাকাটাই আমার সম্বল। এতদিন ধরে মুনাফার এই টাকায় আমার প্রয়োজনীয় হাতখরচ চলছিল। আমার স্বামী আমাকে কোনো হাতখরচ দেয় না। এমনকি আমার জামা, জুতা, ব্যাগ, মোবাইলের খরচ, মাটির ব্যাংকে দান এবং ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রামে যাওয়া-আসা ইত্যাদি সব খরচ আমাকেই বহন করতে হয়। আমি স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ করছি না। তবে টাকাটা যেহেতু আমার একমাত্র সম্বল, তাই কোনো বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করতে চাই, যেন দুই লক্ষ টাকা থেকে আমি দুই কোটিতে নিয়ে যেতে পারি। এজন্যে কী করা উচিত?

**উত্তর :** স্বামী যদি হাতখরচ না দেন, তবে স্বামীর পকেটকে নিজের পার্স মনে করবেন সবসময়। স্বামীর টাকাই আপনার টাকা। তিনি টাকা দেন না বলে কেন আপনি হীনম্মন্যতায় ভুগবেন? এটা তো স্বামীর অন্যায়। কারণ তিনি বিয়ে করেছেন স্ত্রীকে সম্মানজনক ভরণপোষণ দেয়ার শর্তে। তার সামর্থ্যের মধ্যে স্ত্রীকে হাতখরচ দিতে হবে, সেটা যত অল্পই হোক।

আর আপনি নিজের টাকা কোনো বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করতে চান। কিন্তু এ ধরনের প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। কখন যে আপনার টাকা অন্যের হয়ে যাবে আপনি টেরই পাবেন না! এজন্যে বাস্তববাদী হবেন। অবস্থার প্রেক্ষিতে আপনাকে এগোতে হবে। ঘরে টাকা রাখা নিরাপদ নয়, কিন্তু টাকাটা তো কোথাও রাখতে হবে—ব্যাংকে অথবা পোস্ট অফিসে। আবার টাকা রাখবেন কিন্তু মুনাফা নেবেন না, সেটাও বোকামি। কারণ আপনার লাভের টাকা কোনো খারাপ কাজেও ব্যবহৃত হতে পারে। তাই টাকা যেখানে আছে সেখানেই থাকুক।

আরেকটি বিষয়—আপনি দুই লক্ষ টাকাকে উন্নীত করতে চান দুই কোটিতে। বিনাশ্রমে কম সময়ে অনেক লাভ করার এই মানসিকতাই মূলত মানুষকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে। তাই অভাববোধ এবং প্রয়োজনের মধ্যে পার্থক্য করতে শিখুন। ফোকটে পেতে চেয়ে প্রতারিত হবেন না।

**প্রশ্ন :** আমি দুবছর আগে একটি গ্রাফিক ডিজাইনের কোর্স করি। স্বামীর উৎসাহ আর অটোসাজেশন চর্চার মাধ্যমে সফলভাবে কোর্সটি সম্পন্ন করি। সবাই আমার কাজের প্রশংসা করত। কাজ করতে করতে রাত ভোর হয়ে যেত। ভাবলাম আমি সফল হবো। কিন্তু অনলাইনে দুবার প্রোফাইল দিয়ে কাজের জন্যে চেষ্টা করলাম। কাজ পেলাম না। সংসার সামলে রাত জেগে কাজ করে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। মন ভেঙে গেল। আমি কি তাহলে সারাজীবন

স্বামীর টাকায় চলব? আয় করতে পারব না? নানান প্রশ্ন মনে ঘুরপাক খায়। যদিও আমার স্বামী খুব ভালো মানুষ, কিন্তু সবসময় তার কাছ থেকে টাকা নিতে ভালো লাগে না। আমি কি ব্যক্তিজীবনে ব্যর্থই থেকে যাব?

**উত্তর :** প্রশ্নটার দুটো দিক আছে। একটা দিক হচ্ছে একজন নারী হিসেবে আপনি উপার্জন করতে চাচ্ছেন, আপনার মেধাকে কাজে লাগাতে চাচ্ছেন। এটা খুব ভালো। আরেকটা দিক হচ্ছে, 'আমি কি তাহলে সারাজীবন স্বামীর টাকায় চলব? সবসময় তার কাছ থেকে টাকা নিতে ভালো লাগে না। আমি কি ব্যক্তিজীবনে ব্যর্থই থেকে যাব?'

আসলে 'বিয়ে'র ব্যাপারে আমাদের ধারণাটা স্বচ্ছ থাকতে হবে। যেহেতু আপনি মুসলিম, ইসলামি শরিয়ত মতে বিয়ে মানে হচ্ছে, স্বামী সসম্মানে স্ত্রীর ভরণপোষণের ওয়াদা করে এবং দেনমোহর দেয়ার শর্তে স্ত্রীকে বিয়ে করার প্রস্তাব করছেন। আর স্ত্রী তা কবুল করছেন। কাজেই আইন অনুযায়ী আপনার ভরণপোষণের দায়িত্ব আপনার স্বামীর। অর্থাৎ আপনার স্বামীর দায়িত্ব হচ্ছে, আয় করা এবং আপনার ভরণপোষণের নিশ্চয়তা দেয়া।

সুতরাং স্বামীর কাছ থেকে টাকা নিতে সংকোচ করা বা হীনম্মন্যতায় ভোগার কিছু নেই। তাছাড়া আপনি খুব সৌভাগ্যবতী যে, আপনার স্বামী খুব ভালো মানুষ। অতএব আনন্দিতচিত্তে তার কাছ থেকে টাকা নেবেন এবং যখন যা প্রয়োজন নিঃসংকোচে বলবেন। কারণ আপনি সংসার সামলাচ্ছেন বলেই তিনি বাইরে কাজ করতে পারছেন।

এবার আসছি আপনার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশে। গ্রাফিক ডিজাইনের কোর্স করেছেন, অনলাইনে দুবার প্রোফাইল জমা দিয়েও ব্যর্থ হয়েছেন। তাই মন ভেঙে গেছে। এসব কোর্সে ভর্তি করানোর সময় কাজ পাওয়া যতটা সহজ বলে উপস্থাপন করা হয়, বাস্তবতা তেমনটা নয়। প্রতিযোগিতামূলক এই খাতে কাজ পেতে অনেক ঘাম ঝরাতে হয়। দুবার প্রোফাইল দিয়ে হয় নি, তাতে কী হয়েছে? পাঁচ বার দিন, ১০ বার, ৫০ বার—কাজ আপনি পাবেনই। এটার সাথে ব্যক্তিজীবনের ব্যর্থতার কোনো সম্পর্ক নেই।

অর্থাৎ জীবনকে সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। উপার্জন করতে পারা হচ্ছে একটি যোগ্যতা। আর ভালো স্ত্রী হওয়া বা ভালো স্বামী পাওয়া আরেকটি যোগ্যতা ও ভাগ্যের ব্যাপার। দুটো দুই জিনিস। অতএব দুটোকে একসাথে মেলাবেন না। এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই আমরা হতাশায় ভুগি। আর আপনি যখন হতাশ হবেন, তখন এই ভালো স্বামীটার জীবনও অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে। কারণ আপনার ভেতরে হতাশা থাকলে এর প্রভাব

আপনার আচরণে পড়বে। তখন এসব হতাশ আচরণকে কত তোয়াজ করবেন তিনি! কত আর আপনাকে সান্ত্বনা দেবেন! তাই জীবনকে সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখুন। সবকিছুকে একই মানদণ্ডে বিচার করবেন না।

আসলে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মনে করছেন যে, উপার্জন করাটাই সব। কিন্তু আপনার আয় করতে পারাটাই একমাত্র সার্থকতা নয়। সবদিকে ব্যালেন্স করাটা হচ্ছে সার্থকতা—আপনি একজন সফল মা, সফল স্ত্রী। তারপরে যদি আয় করতে পারেন এটা ভালো। আপনি যে-রকম আয় করাটাকে দায়িত্ব মনে করছেন, তেমনি স্বামীকে দেখা এবং পরিবারকে সফলভাবে পরিচালনা করাও আপনার দায়িত্ব।

আপনার এই অস্থিরতার কারণে তাদের জীবনে যেন অশান্তি না আসে। আশা করি, বিষয়টা বুঝতে পারছেন। আর আমরা দোয়া করি, আপনার স্বামী আপনার সব খরচ আনন্দিতচিত্তে দিয়ে দিক এবং উপার্জন করার জন্যে যে ধৈর্য দরকার সেটা আপনি অর্জন করুন।

**প্রশ্ন :** আমার এমনিতে কোনো অভাব নেই। কিন্তু কোয়ান্টামের প্রোগ্রামে আসতে যে খরচ, তা স্বামীর কাছে চাইতে সংকোচ হয়। তার কাছ থেকে টাকা নিতে চাই না। যে-কোনো একটা কাজ বা ব্যবসা করতে চাই। এ ব্যাপারে দিক-নির্দেশনা দেবেন।

**উত্তর :** এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আমি একমত নই। স্বামীর কাছ থেকে টাকা নিতে কেন সংকোচ করবেন? প্রথমত, আপনার কথা থেকেই বোঝা যাচ্ছে, আপনার স্বামীর আর্থিক স্বচ্ছলতা আছে। দ্বিতীয়ত, ধর্মে বিয়ের শর্তানুসারেই একজন স্বামী তার স্ত্রীর ভরণপোষণের যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের ওয়াদা করে তাকে ঘরে নিয়ে আসেন। এ দায়িত্ব এমনই যে, স্ত্রী যদি রান্না না জানেন বা রান্না না করেন, তাহলে রান্নার ব্যবস্থা করে স্ত্রীকে খাওয়াতে হবে স্বামীকে। স্ত্রীর এখানে কোনো দায়িত্ব নেই।

তৃতীয়ত, ধর্ম বাধ্য না করলেও সাধারণভাবে একজন নারী তার ঘরের জন্যে যে পরিশ্রম করেন, দায়িত্ব পালন করেন, তা স্বামীর বাইরের কাজের চেয়ে কোনো অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং কখনো কখনো কাজের সময়, ধরন বা খুঁটিনাটির কারণে এই কাজগুলো এমন যে, স্ত্রী ছাড়া কোনো বেতনভুক্ত কর্মীকে দিয়েও তা করানো সম্ভব নয়।

স্বামী আট ঘণ্টা অফিস করছেন। কিন্তু স্ত্রীর ডিউটি তো ২৪ ঘণ্টার! স্ত্রী ঘর সামলাচ্ছেন বলেই স্বামী বাইরে থেকে এসে গরম গরম খাবার পাচ্ছেন।

ঘরদোর ঝকঝকে তকতকে দেখছেন। সন্তানকে নিয়ে তাকে ভাবতে হচ্ছে না বা হলেও তা অনেক কম।

ঘরের কাজ তো আছেই, শুধু সন্তান লালনের যে কাজ মায়েরা করছেন এর জন্যেই তো মাকে রাষ্ট্র থেকে ভাতা দেয়া উচিত, যেন আর্থিক প্রয়োজনে মাকে বাইরে কাজ করতে না হয় এবং সন্তানের পরিপূর্ণ শারীরিক, মানসিক, আবেগীয় বিকাশে তিনি সহযোগিতা করতে পারেন। কারণ সন্তান লালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। যথাযথ লালন একটি জাতিকে যেমন মানবসম্পদ উপহার দিতে পারে, তেমনি অযত্ন-অবহেলা তাকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

অতএব ঘরের দায়িত্ব পালনকে সম্মানের মনে করবেন। আপনি বাইরে কাজ না করে ঘরে সময় দিচ্ছেন বলেই তা সম্ভব হচ্ছে। আর স্বামীর কাছে চাইতে কোনো সংকোচ করবেন না। কোয়ান্টামে আসার এ সামান্য কিছু টাকা জোগাড়ের জন্যে অন্য কাজ করারও কোনো প্রয়োজন নেই। স্বামীর উপার্জনে সবরকম প্রয়োজন মেটানোর অধিকার আপনার আছে। নিঃসংকোচে গিয়ে তার কাছে বলুন, আমি কোয়ান্টামে যাব ভালো কাজের জন্যে, নিজে ভালো থাকার জন্যে। তাই টাকা দাও। তারপর আনন্দিতচিত্তে প্রোগ্রাম করে যাবেন।

**প্রশ্ন :** আমি মাস্টার্স শেষ করে একটি স্কুলে চাকরি করতাম। সন্তান ছোট হওয়ার কারণে তা ছেড়ে দেই। এখন প্রশ্ন হলো, আমি আমার নিজের অর্থে দান করতে চাই। স্বামীর অর্থ দান করে তেমন তৃপ্তি পাই না। যদিও তিনি কখনো টাকা নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করেন না। আমার যখন যা প্রয়োজন তা দেন। কিন্তু দানটা আমার নিজের উপার্জিত টাকায় দিলে হয়তো আরো শান্তি পেতাম। এ-ক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কী?

**উত্তর :** সন্তান ছোট হওয়ায় তাকে বেশি মনোযোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ভালো করেছেন। সন্তান ছোট থাকতে মায়ের প্রয়োজন অনেক বেশি। আমার পরামর্শ খুব সহজ। স্বামীর কাছ থেকে যত পারেন নেবেন এবং দান করবেন। এ-ক্ষেত্রে স্বামীর পকেটকে নিজের পকেট মনে করবেন। কারণ উপযুক্ত খোরপোষ অর্থাৎ ভরণপোষণের জন্যে যা যা প্রয়োজন, সেগুলো পূরণ করার শর্তে তিনি আপনাকে বিয়ে করেছেন। এই যে দান করতে চাচ্ছেন, এটাও আপনার একটা প্রয়োজন। এটা আপনার চাহিদা।

আর স্বামীকে কৃতজ্ঞতা জানাবেন যে, আপনি যখন যা চান তখনই তিনি দেন। এটা দয়া নয়, এটা আপনার প্রাপ্য অধিকার। বরং তৃপ্ত হবেন যে, আমি

আমার স্বামীর টাকায় দান করছি। এই দানের সওয়াব নিজেরও হচ্ছে, স্বামীরও হচ্ছে। দান করে স্বামীর জন্যে দোয়া করবেন যেন তার আয়ে আল্লাহ আরো বেশি বরকত দেন। এ নিয়ে কখনো হীনম্মন্যতায় ভুগবেন না।

**প্রশ্ন :** আপনি রাগ দমন করতে শিখিয়েছেন। আমার স্বামী আমাকে মোটেও হাতখরচের টাকা দেয় না। আমার ছেলেরাই দেয়। আগে ঝগড়া করে আদায় করতাম। এখন এত শান্ত থাকি, ফলে উনি সুযোগ পেয়ে আমার জন্যে টাকা খরচ করেন না। এই টাকা ওনার আত্মীয়স্বজনকে দিয়ে দেন। আমি এমন ভদ্রভাবে থাকলে ওনার জয়ই সুনিশ্চিত, তাই না?

**উত্তর :** ভদ্রভাবে থাকুন, কিন্তু কুশলী হোন। স্বামীর কাছ থেকে টাকা আদায় করার কৌশলও যদি আমাকে বলে দিতে হয়! কৌশলটা বুঝতে পারলে এটা সবচেয়ে সহজ কাজ। ঝগড়া করে কোনো লাভ নেই। ঝগড়া করলে হয়তো টাকা দেবে, কিন্তু মনে মনে ক্ষুব্ধ হবে। কুশলী হলে টাকাও দেবে, আবার আপনার প্রশংসাও করবে যে, কত সৌভাগ্য আমার, এমন বউ পেয়েছি!

**প্রশ্ন :** আমি একটা চাকরি করি। আমার বেতন দিয়ে আমার পোশাক, কসমেটিকস, এমনকি সন্তানের পোশাকেও খরচ করি। আমার মা-বোন, শাশুড়ি এবং ননদের জন্যেও খরচ করি। কিন্তু আমার স্বামী আমার জামা কেনার জন্যে খরচ দেয় না। আজ ছয় মাস হয়ে গেল, সে আমাকে পোশাক কিনে দেয় নি। এমনকি চাইলেও দেয় না। এটা কি ঠিক? আমি তার স্ত্রী। আমার শখ পূরণ করাটাও তার কর্তব্য। আমি তাকে জোর করি না, কিন্তু মনে মনে তার ওপর প্রচুর ক্ষোভ জমতে থাকে। এমন অবস্থায় কী করা উচিত?

**উত্তর :** স্বামীকে মাফ করে দেবেন। বোঝা যাচ্ছে, এত সবকিছু পরও আপনি তাকে ভালবাসেন। তাই যত মাফ করে দিতে পারবেন, তত আপনি ভালো থাকবেন। আর স্বামীদের বলি, যে স্বামী সামর্থ্য থাকতে স্ত্রীকে দেন না, তার আয়ে বরকত কমে যায়। অতএব সামর্থ্য থাকলে অবশ্যই কিনে দেবেন। আর যদি না পারেন, যদি সামর্থ্যের অভাব হয়, স্ত্রীকে বুঝিয়ে বলবেন যে, আমি তো দিতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু এই এই কারণে তোমাকে কিনে দিতে পারছি না।

**প্রশ্ন :** স্ত্রীর বায়না অনেক। এসব কেনাকাটা নিয়ে মতের অমিল হলে প্রায়ই কথা কাটাকাটি হয়। সংসারে শান্তির জন্যে আমি কী করতে পারি?

**উত্তর :** এখানে আপনার জন্যে টিপস হলো, স্ত্রীকে সবসময় 'হ্যাঁ' বলুন। কারণ স্ত্রী হলেন আপনার জীবনের অংশীদার। আপনাকে সবচেয়ে আপনজন ভেবেই তিনি আবদার করেছেন। স্ত্রীকে সবসময় 'হ্যাঁ' বলার মানে হলো, যুক্তিসঙ্গত এবং সাধ্যের মধ্যে হলে অবশ্যই তা পূরণ করবেন। সাধ্যের মধ্যে না হলেও তৎক্ষণাৎ কিছু না বুঝিয়ে বরং 'হ্যাঁ' বলুন।

দুদিন পর সময়-সুযোগমতো তাকে যুক্তির কথা বলুন—তখন যা বলেছিলাম, আমি তা করতেও চাই, কিন্তু আমার এই এই অসুবিধার কারণে এখন করতে পারছি না। দেখবেন, তিনি আর উচ্চবাচ্য করছেন না। এতে কোনো প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া যেমন হচ্ছে না, তেমনি এই আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ দেখে তিনিও আপনার প্রতি সহমর্মী হবেন। তাই সংসারে শান্তির জন্যে স্ত্রীকে সবসময় 'হ্যাঁ' বলুন।

**প্রশ্ন :** আমার স্ত্রী উত্তরাধিকার সূত্রে বেশ মোটা অঙ্কের টাকা পেয়েছেন। আমি যদি টাকাগুলো আমার কাছেই রেখে দেই (বর্তমানে আমার কাছে আছে) এবং প্রতি বছর তিনি তার বাবার দেয়া জমির ফসল বিক্রির যে টাকা পান তা-ও আমি নিয়ে নিই, তাহলে কি কোনো সমস্যা আছে? টাকাগুলো তো আমাদের সংসারের জন্যেই খরচ করা হবে।

**উত্তর :** টাকা সংসারের জন্যে খরচ হোক বা না হোক—এটা আপনার স্ত্রীর টাকা। ইসলাম ধর্ম অনুসারে, সংসারের খরচ চালানোর টাকা স্ত্রীর কাছ থেকে নেয়ার কোনো বিধান নেই। বরং ইসলামি শরিয়ত অনুসারে, সংসার চালানো তো বটেই, স্ত্রীর যাবতীয় খরচ বহনের দায়িত্বও স্বামীর। এই দায়িত্ব পালন করার মধ্যেই আপনার কল্যাণ।

আপনার সংসার চালানোর জন্যে স্ত্রীর টাকা কেন নেবেন আপনি? স্ত্রী তো আপনাকে এই শর্তে বিয়ে করেন নি যে, আপনার সংসার তার বাবার টাকা দিয়ে চলবে। আপনি বরং দেনমোহর এবং তার সমস্ত খরচ ও সংসারের খরচ বহনের শর্তে তাকে বিয়ে করেছেন।

অতএব মনে রাখবেন, যে-কোনো পুরুষের জন্যে স্ত্রীর সম্পত্তিতে হাত দেয়াটা অশোভন। স্ত্রীর সম্পদ পুরোপুরি স্ত্রীর। সেই সম্পদ দিয়ে তিনি কী করবেন, এটা তার ব্যাপার। স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় সংসারে খরচ করতে চান, সেটা ঠিক আছে। কিন্তু আপনি তাকে টাকা দিতে বাধ্য করতে পারবেন না, ইমোশনালি কোনো চাপ বা কোনো কৌশলও অবলম্বন করতে পারবেন না। আপনার নিয়ত হবে নিজের উপার্জনের টাকায় চলা।

# প্রসঙ্গ ॥ কর্মজীবী স্ত্রী

**প্রশ্ন :** আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকরি করি। আমার স্বামী চায় না আমি চাকরিতে তার চেয়ে ভালো অবস্থানে থাকি। সে মুখে কিছু বলে না, কিন্তু তার হাবভাবে আমি বুঝতে পারি। এটা নিয়ে আমি মানসিকভাবে খুব অশান্তিতে আছি। আমার করণীয় কী, বুঝতে পারছি না।

**উত্তর :** এখানে সমস্যাটা আপনার, আপনার স্বামীর নয়। কারণ তিনি তো কিছু বলেন নি। আপনি হাবভাবে বুঝে নিয়েছেন। হাবভাবে বুঝবেন কেন? আপনার স্বামী কি কথা বলতে পারেন না? আপনি নিজেই একধরনের মানসিক জটিলতায় ভুগছেন যে, আমি যদি আমার স্বামীর চেয়ে বড় হয়ে যাই, তাহলে না জানি কী সমস্যা হয়!

আপনি স্বামীকে ভালবাসুন। তিনি যখন দেখবেন তার চেয়ে বড় কর্মকর্তা হওয়ার পরও আপনি তাকে ভালবাসছেন, আপনার আচরণে কোনো পার্থক্য হয় নি, আপনার স্বামী আপনাকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করবেন। কাজেই আগ বাড়িয়ে নেতিবাচক কিছু ভাববেন না, সমস্যাকে কল্পনায় আনবেন না। আগে আপনার ভাবনাটা ঠিক করুন। ভাবনা ইতিবাচক হলে বাস্তবতাও সুন্দর হবে।

**প্রশ্ন :** আমার স্ত্রী উচ্চশিক্ষিত, অধিক উপার্জনকারী ও বসতবাড়ির বরাদ্দপ্রাপ্ত। ফলে সে আমার প্রতি উদাসীন এবং অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী। এতে সংসারে অশান্তি লেগেই আছে। সমাধান কী?

**উত্তর :** আপনার ভাষ্যমতেই স্ত্রী তিন দিক থেকে আপনার ওপরে আছেন। কাজেই তার নেতৃত্ব মেনে নিন। একজন যদি এগিয়ে যায়, তার নেতৃত্ব মেনে নিতে দোষ কোথায়? পারিবারিক ক্ষেত্রে একজনের নেতৃত্ব মেনে নিতে হবে। এ-ক্ষেত্রে যিনি যোগ্য তাকেই এ দায়িত্ব দিতে হবে। এটি স্ত্রী হতে পারেন, স্বামীও হতে পারেন। এ নিয়ে সংসারে অশান্তি করার কিছু নেই।

**প্রশ্ন :** স্ত্রী চাকরিজীবী হলেও কি তার আর্থিক দায়দায়িত্ব স্বামীকে নিতে হবে?

**উত্তর :** এ ব্যাপারে ইসলামের বিধান খুব পরিষ্কার। স্ত্রীর ভরণপোষণের যাবতীয় দায়িত্ব নিয়ে স্বামী তাকে বিয়ে করে। ইসলামি শরিয়ত অনুসারে স্বামী সেই খরচ দিতে বাধ্য। স্ত্রীর উপার্জনে স্বামীর কোনো অধিকার নেই।

এটা সম্পূর্ণই স্ত্রীর সম্পদ। সংসার-খরচ নির্বাহে স্ত্রী তার অর্থ খরচ করতে বাধ্য নয়। আত্মমর্যাদাবোধ যদি থাকে, তাহলে স্বামী কখনো তার স্ত্রীকে উপার্জনের অর্থ দিতে বাধ্য করতে পারে না। তবে স্ত্রী স্বেচ্ছায় খরচ করতে চাইলে সেটা ভিন্ন কথা।

আমরা অনেকেই জানি না যে, ইসলাম একজন নারীকে এত অধিকার দিয়েছে! আজকাল শুনি, ছেলেরা নাকি বিয়ে করার জন্যে চাকরিজীবী মেয়েদের পছন্দ করে সংসারে আর্থিক সমৃদ্ধির প্রত্যাশায়। কিন্তু তারা হয়তো জানে না যে, ধর্মত এ দায়িত্ব স্ত্রীর নয়, স্বামীর।

**প্রশ্ন :** বর্তমান সময়ে অনেক সচ্ছল পরিবারের মেয়েরা চাকরি করছে। তারা কি স্বামী এবং সন্তানকে সময় দেয়া থেকে বঞ্চিত করছে না?

**উত্তর :** স্বাভাবিকভাবেই কর্মজীবী মহিলা স্বামী এবং সন্তানকে গৃহিণীর মতো সময় দিতে পারেন না বা দিলেও কম সময় দেন। এ-ক্ষেত্রে স্বামী এবং স্ত্রী যদি পরিবারে সময় দেয়ার ব্যাপারে পরস্পরকে সহযোগিতা করেন, তাহলে অন্য সদস্যদের ওপর এর প্রভাব কম পড়বে। তবে ক্যারিয়ার এবং সংসার দুটো একসাথে পরিপূর্ণভাবে করা কঠিন। একটিতে খুব ভালো করতে হলে আরেকটিতে স্বাভাবিকভাবেই তাকে কোনো না কোনো ছাড় দিতে হবে।

**প্রশ্ন :** আমি চাকরিজীবী। আমার স্বামী আমাকে বলেছেন, আমার বেতনের সব টাকা এখন থেকে অবশ্যই ওনার হাতে তুলে দিতে হবে এবং এজন্যে খুব চাপ সৃষ্টি করছেন। উনি আমাকে আরো বলেছেন, বেতনের টাকা সব ওনাকে না দিলে ওনার সাথে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। স্বামীদের এমন জোরদখলের ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী? এটা কি ইসলাম সমর্থন করে?

**উত্তর :** মোটেই সমর্থন করে না। আপনার স্বামী যদি এটা বলে থাকেন তিনি ইসলামি শরিয়তবিরোধী কথা বলছেন। আল্লাহ ও তাঁর রসুলের শিক্ষাবিরোধী কথা বলছেন তিনি। স্ত্রীর আয়ে স্বামীর কোনো অধিকার নেই। অতএব আপনি আপনার স্বামীর জন্যে দোয়া করুন, যেন তিনি তার ভুল বুঝতে পারেন এবং আপনাকে স্ত্রী হিসেবে যথাযথ সম্মান দিতে পারেন।

**প্রশ্ন :** একটি ছেলে বিয়ের পর যদি তার মা-বাবার ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে পারে, তাহলে একটি মেয়ে শুধু লোকে কী বলবে বা মেয়েরা বিয়ের

পরে অন্যের হয়ে যায়, এই মানসিকতার কারণে নিজের মা-বাবার দায়িত্ব নেবে না? এ-ক্ষেত্রে মেয়ের শ্বশুরবাড়ির মানসিকতা কেমন হওয়া উচিত?

**উত্তর :** আমরা যেটা বিশ্বাস করি সেটা হলো, বিয়ের আগে স্বামী-স্ত্রী দুজন আলাদা ছিলেন। দুজনের একজন একজন করে মা এবং বাবা ছিলেন। কিন্তু বিয়ের পর দুই মা, দুই বাবা। এখানে স্ত্রীর মা-বাবা আলাদা, স্বামীর মা-বাবা আলাদা—এটা হওয়া উচিত নয় এবং এটা মানবিকও নয়। তাই এই দায়িত্ব স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই যৌথভাবে নেয়া উচিত।

আমরা এরকম সমাজই প্রত্যাশা করি, যেখানে বিয়ের পর মেয়ের মা-বাবা যেন মেয়ের কাছে পর না হয়ে যায়। আজকাল পরিবার ছোট হতে হতে দেখা যায় যে, একটাই মেয়ে। মেয়েটির বিয়ের পর তার মা-বাবা যেন মনে করতে পারে, আমার মেয়ে তো আছে, সাথে একটা ছেলেও পেলাম। আর ছেলের মা-বাবা যেন মনে করতে পারে, আমার এতদিন ছেলে ছিল, আমি একটা মেয়ে পেলাম—এটাই সত্যিকার মানবিক পরিবারের রূপ।

**প্রশ্ন :** স্বামী উপার্জনক্ষম হলে নাকি মেয়েদের চাকরি করা উচিত নয়। একজন মেয়ের ক্যারিয়ারের জন্যে পরিবার থেকে দূরে যেতে হলে সে-ক্ষেত্রে মেয়েটির কোন বিষয়টি প্রাধান্য দেয়া উচিত?

**উত্তর :** এভাবে বলাটা কঠিন। এটা আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আপনি পরিবারকে প্রাধান্য দেবেন, না ক্যারিয়ারকে প্রাধান্য দেবেন। উপার্জনের জন্যে চাকরি করা একটা কথা আর ক্যারিয়ার গড়া আরেক কথা। চাকরি হলো জীবিকা বা অর্থ উপার্জনের একটা মাধ্যম মাত্র। কিন্তু ক্যারিয়ার হলো নির্দিষ্ট পেশায় নিজের পরিচয় সৃষ্টি করে প্রথম সারিতে পৌঁছানোর চেষ্টা। যদি ক্যারিয়ারিস্ট হন, তাহলে পরিবার এবং ক্যারিয়ার—দুটোর মধ্যে সমন্বয় করাটা মেয়েদের জন্যে কঠিন।

যদি ক্যারিয়ারকে প্রাধান্য দেন, কিন্তু পরিবারকে দেখাশোনা করার জন্যে ভালো ব্যবস্থা করতে না পারেন, তাহলে জীবনের একটা পর্যায়ে এসে আপনি কিন্তু খুব দুঃখিত হবেন। কারণ আমি এ ধরনের দুঃখী মহিলাদের দেখেছি, যারা অনেক উঁচু পদে চলে গেছেন, অনেক উপার্জন করেছেন, কিন্তু সন্তান মানুষ হয় নি। অর্থাৎ তার অবস্থানের তুলনায় সন্তান যা হওয়া উচিত ছিল, তার কিছুই হয় নি। তখন আফসোস করেছেন যে, সারাজীবন তাহলে কী করলাম? অতএব সিদ্ধান্তটা আপনার।

**প্রশ্ন :** আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনই চিকিৎসক। মেয়ের বয়স চার বছর। আমার বা মেয়ের—কারোরই কোনো ভরণপোষণ আমার স্বামী দেয় না। এমনকি মাসের পর মাস যোগাযোগও করে না। মেয়েকে দেখতে আসে না। ওর কথা হলো, পারিবারিক জীবন আর ক্যারিয়ার একসাথে হবে না। এদিকে মেয়েটা খুব জেদি এবং একগুঁয়ে হয়ে যাচ্ছে। আমি কী করব?

**উত্তর :** পারিবারিক জীবন আর ক্যারিয়ার একসাথে হবে না, এটা তো ভুল ধারণা। কিন্তু কেউ যদি মনে করে যে, পরিবার এবং ক্যারিয়ার একসাথে হবে না; ক্যারিয়ার যদি তার কাছে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে তার বিয়ে করাই উচিত নয়। বিয়ে করবেন, কিন্তু বৈবাহিক দায়িত্ব পালন করবেন না, এটা একটা বড় অপরাধ।

এখন যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, এ অবস্থায় আপনার স্বামীর সাথে সরাসরি কথা বলে যেভাবে সমাধান করা যায়, সে চেষ্টা করুন। কারণ এখন আপনি আরেকটা বিয়ে করলে একজন স্বামী পাবেন। আপনার স্বামীও আরেকটা বিয়ে করলে একজন স্ত্রী পাবে। কিন্তু আপনাদের যে সন্তান, তার জন্যে তো মা এবং বাবা দুজনকেই দরকার।

অতএব আপনার স্বামীর সাথে আলোচনায় বসুন এবং খোলামেলাভাবে কথা বলুন, কারো মাধ্যম ছাড়াই। তাকে পুরো বিষয়টি বোঝান। এর আগে ৪০ দিন নিয়মিত মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে তাকে বলুন, মেয়ের সুস্থ সুন্দর ভবিষ্যতের জন্যে তার মনোযোগ ও সহযোগিতা প্রয়োজন। আমরা আপনাদের জন্যে দোয়া করি।

## স্ত্রীকে শারীরিক-মানসিক নির্যাতন

**প্রশ্ন :** কিছু বোঝার আগেই আমার স্বামী আমার ওপর প্রচণ্ড রেগে যায় এবং অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে। কখনো কখনো বাজেভাবে শারীরিক নির্যাতনও করে, যা আমাকে মৃত্যুর মুখোমুখি নিয়ে যায়। সে কখনো মন খুলে কথা বলে না, তবে শুনতে চায়। এই অবস্থায় আমি কী করব? উল্লেখ্য, সে ব্রোকেন ফ্যামিলির সন্তান।

**উত্তর :** এ ব্যাপারে অন্য কেউ আপনাকে পরামর্শ দিতে পারবে না। আপনি যদি মনে করেন, তার সাথে সংসার করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়, সেটা

একরকম। কারণ স্বামীর নির্যাতন আপনি কতটুকু সহ্য করবেন এবং তার মানসিক সমস্যা কতটা মেনে নেবেন বা মানবেন না, সেটা আপনার ব্যক্তিগত বিষয়। এরকম নির্যাতন সহ্য করে এই স্বামীর সাথে আপনি যদি থাকতে না চান, তাহলে পারিবারিকভাবে বসে আপনারা ডিভোর্সের সিদ্ধান্ত নেবেন।

সেটা অবশ্যই নেয়া উচিত আপনাদের সন্তান হওয়ার আগে। এর মধ্যে সন্তান হয়ে থাকলে তার ভবিষ্যতের কথা বিবেচনায় রেখে পরিবারের সাথে আলাপ করে আপনার করণীয় নির্ধারণ করতে পারেন। কারণ মা-বাবার বিচ্ছেদ সন্তানের জন্যে খুব ক্ষতিকর। আপনার স্বামীই এর প্রমাণ।

আপনি যদি বিচ্ছেদ না চান, তাহলে যতটা ধৈর্যধারণ করা যায় এবং ইতিবাচক থাকা যায় তত ভালো। এখন তো শুনতে চাওয়ার মানুষের বড় অভাব। স্বামী যখন ভালো শ্রোতা, স্ত্রী হিসেবে আপনি মন খুলে কথা বলবেন। তবে আপনাকে সবসময় মনে রাখতে হবে যে, আপনার স্বামী ব্রোকেন ফ্যামিলির সন্তান। তার মধ্যে অনিশ্চয়তাবোধ এবং আরো কিছু মানসিক সমস্যা থাকাটাই স্বাভাবিক।

এটা মেনে নিয়ে আপনি যদি তার সাথে সংসার করতে চান, তাহলে তার কাছ থেকে কোনোরকম প্রত্যাশা রাখা যাবে না। একজন মানসিক রোগীকে যেভাবে সামলে চলতে হয়, সেভাবে আপনার স্বামীকে ট্রিট করবেন। তাকে বার বার ক্ষমা করে দিন। মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে স্বামীকে ইতিবাচক কমান্ড দিন এবং দোয়া করুন, যাতে আপনাদের সমস্যাগুলো দূর হয়ে যায় এবং পারস্পরিক সমমর্মিতা বেড়ে যায়।

**প্রশ্ন :** আজ ৩২ বছর ধরে সংসার করছি। সামান্যতম কারণেও স্বামীর হাতে পিটুনি খেতে হয়েছে। এখনো হয়। শুধু সমাজে অপমানিত হওয়ার ভয়ে নীরবে মুখ বুজে সহ্য করছি।

**উত্তর :** নারীর প্রতি এই অন্যায় ও ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিই হলো পারিবারিক জীবনের সবচেয়ে বড় অবিদ্যা, যার অনিবার্য ফলাফল অশান্তি। পুরুষ এবং নারীকে ঘিরে যে পরিবার গড়ে ওঠে, সেখানে পুরুষ পরিবারের প্রধান হলেও পরিবারের প্রাণ কিন্তু নারীই। কারণ পরিবার টিকে থাকে নারীকে ঘিরেই। কিন্তু শুরুতেই গলদ।

অর্থাৎ পরিবারের সবচেয়ে বিরক্তিকর এবং কষ্টকর কাজগুলো দিনের পর দিন করে গেলেও যে-কোনো অপমানের বোঝা নিতে হয় নারীকে। স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে হয় প্রায়ই। কিন্তু পরিবারের একজন যদি অন্যজনের

ওপর জুলুম করেন, সেখানে কখনো শান্তি থাকতে পারে না। কারণ পরিবার এমন জায়গা, সারাদিন কাজের পর বন্ধুদের সাথে আড্ডা, ক্লাব-পার্টি—এ সবকিছুর পরও তথাকথিত আধুনিক মানুষকে যেখানে ফিরতে হবে।

আপনার জীবনের যে করুণ কাহিনী বললেন, ৩২ বছরের সংসারে অপমানের কথা বললেন, এটা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। কিন্তু যদি আপনি নিজের পরিচয় সৃষ্টি করতে পারতেন, আপনার যে শিকড় অর্থাৎ পিতামাতার সংসারে আপনার একটা শক্ত ভিত্তি থাকত, তাহলে এই পরিস্থিতি এড়িয়ে যেতে পারতেন। আমাদের সমাজে মেয়েরা সবসময়ই আত্মপরিচয় সংকটে ভোগে। বিয়ের আগ পর্যন্ত বাবার অভিভাবকত্ব, বিয়ের পর স্বামীর এবং স্বামী মারা গেলে ছেলের অভিভাবকত্ব অর্থাৎ সবসময়ই একজন নারী যেন অন্য কারো অধীনস্থ হয়েই বাঁচে।

স্বামীর সংসারই মেয়েটির সব, বিয়ের পর তাকে পিতৃপরিচয় ভুলে যেতে হবে ইত্যাদি সবই অবিদ্যা। বিয়ের মাধ্যমে দুজন নারী-পুরুষ পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। নিজস্ব পরিচয় বিসর্জনের প্রশ্ন সেখানে অবান্তর। নিজের পরিচয় সৃষ্টি করে তা ধরে রাখতে পারলে কাউকেই অপমানিত হতে হয় না। তবে এই বয়সে নিজের পরিচয় সৃষ্টি করাটা বেশ চ্যালেঞ্জিং। তাই আপনি সবর করুন এবং দোয়া করুন। সঙ্ঘে একাত্ম থাকুন। আমরা দোয়া করি যেন পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে চলে আসে।

**প্রশ্ন :** পারিবারিক দুঃখ-কষ্টের কারণ কী? বউ পেটানোর ক্ষেত্রে ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য নেই?

**উত্তর :** পারিবারিক জীবনে যত দুঃখ কষ্ট বেদনা আর্তনাদ এর পেছনে রয়েছে অসম্মান। এটা শুরু হচ্ছে নারীকে হেয় করার, অসম্মান করার চেষ্টা থেকে। এ নিয়ে তো একটা অতিপ্রচলিত ছড়াও আছে গ্রামবাংলায়। সেটা হলো, *মেয়ের নাম ফেলি, পরে নিলেও গেলি, যমে নিলেও গেলি*। যেটার মূল বক্তব্য, মেয়ে পরের। এই ধারণাটাই নারী নির্যাতনের বড় কারণ। বিয়ে হলেও তুই গেলি আর যমে নিলেও গেলি।

ছেলের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি কী? *হবে পুত, ডাকবে বাপ, তবেই যাবে মনস্তাপ*। পুত মানে ছেলে যেমনই হোক, সে বাপ ডাকলেই মনের কষ্ট দূর হবে। আবার বলা হয়, *বিয়ের প্রথম রাতে বধিবে বিড়াল*। কত অবমাননা নারীর প্রতি! আরো কত ছড়া! *আদা জব্দ শিলে বউ জব্দ কিলে*। (শিল মানে পাটাপুতা)। এটা এখানে ছড়া, কিন্তু এটা তো আমেরিকানদের ঐতিহ্য।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'আমার বাবা তার বউ পেটাতে ওস্তাদ ছিল।' তার মানে হচ্ছে, তার মাকে পেটানো হয়েছে, অথচ এই নিয়ে তার কোনো সমবেদনা নেই। বরং তার বাবা যে বউ পেটাতে ওস্তাদ ছিল এজন্যে সে গর্বিত। ওখানে বউ পেটানো একটা সাধারণ ঘটনা।

আমরা মনে করি, কেবল আমাদের দেশে নারীকে অসম্মান করা হয়। আমেরিকাতে প্রতিবছর ৪৭ লক্ষ ৭৪ হাজার নারী স্বামী বা বয়ফ্রেন্ড কর্তৃক নির্মম প্রহারের শিকার হচ্ছে। প্রহারের ৬০% ঘটনা পুলিশকে জানানোই হয় না। আর এটা পুলিশের রিপোর্ট।

ব্রিটেনের সংবাদপত্র *দ্য গার্ডিয়ান*-এর রিপোর্টে (১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫) ন্যাশনাল অডিট অফিস (NAO) বলেছে, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা এখন মহামারির মতো এবং এটি দিন দিন খারাপ হচ্ছে।

মাদক ও ডিজিটাল টক্সিনের আগ্রাসনের ফলে বাংলাদেশেও নারীর প্রতি সহিংসতা বেড়ে গেছে বহুগুণ। অবশ্য সবসময় যে শুধু নারী প্রহৃত হয় তা নয়, পুরুষও মাঝে মাঝে হয়। সংখ্যায় কম। আমি তখন এস্ট্রলজার। এক ক্লায়েন্ট এসে বললেন, তার জীবন বিপন্ন। কারণ স্ত্রী তাকে ধরে পেটায়। তার স্ত্রীও আমার ক্লায়েন্ট, যদিও স্বামী তা জানেন না। বললাম, জীবন যখন এত বিপন্ন, থানাতে ডায়েরি করে আসুন। বললেন যে, গিয়েছিলাম কিন্তু পুলিশ রিপোর্ট নেয় নি। পুলিশ বলে যে, স্ত্রীর প্রহারে স্বামীর জীবন বিপন্ন, এই রিপোর্ট লেখাও আমাদের জন্যে অসম্মানজনক।

এ-ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হলো, ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে যে ঘরেই বউ পেটানো হোক, সে ঘরে কখনো শান্তি থাকতে পারে না। পরিবারের সদস্য, বিশেষত সন্তানদের সুস্থ মানসিক বিকাশও সম্ভব নয় সেখানে। অতএব এই জাহেলিয়াত এই অমানবিকতা থেকে আমরা যত বেরিয়ে আসতে পারব তত আমাদের মঙ্গল।

**প্রশ্ন :** আমার স্বামীর রূঢ় ব্যবহার আমাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে। এটা কেন হচ্ছে? ও-তো আগে এমন ছিল না।

**উত্তর :** সবসময় অবস্থা একরকম থাকে না। আপনি বিপর্যয়ের দিকে না গিয়ে মানসিক অবস্থাকে আরো প্রশান্ত করুন। এজন্যে বেশি বেশি তওবা ইস্তিগফার করুন, ক্ষমা চান প্রভুর কাছে। 'আস্তাগফিরুল্লাহ' জিকির করতে থাকলে আল্লাহ সবকিছু সহজ করে দেন।

মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে গিয়ে স্বামীকে বোঝান—তুমি তো আগে এমন ছিলে না। সেইসাথে স্বামীর সাথে আপনার ভালো সম্পর্কের দিনগুলো, ভালো মুহূর্তগুলোকে স্মরণ করুন। তাতে আশা করা যায় যে, আপনি এখনকার মানসিক বিপর্যস্ত অবস্থাটা কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

**প্রশ্ন :** আমার ছোট বোনের স্বামী বিয়ের পর থেকেই যৌতুকের জন্যে বোনের ওপর মানসিক নির্যাতন শুরু করে। একসময় শারীরিক নির্যাতনও শুরু করে। নয় বছরের বিবাহিত জীবনে তাদের সাত বছরের একটি ছেলে ও নয় মাসের একটি মেয়ে রয়েছে। মেয়েটির জন্মের পর মারধর আরো বেড়ে গেছে। মেধাবী, শিক্ষিত ও স্বামীর চেয়ে বেশি বেতনে চাকরি করা সত্ত্বেও আমার বোন সমাজের ভয়ে ডিভোর্স নিতে চায় না। সে স্বভাবে খুবই চাপা এবং মানসিকতায় সেকেলে। ওর স্বামীর এত সব অত্যাচারের কথা আমরা জেনেছি মাত্র সেদিন। সব জেনেশুনেও ওকে কি ওর মতোই চলতে দেয়া উচিত?

**উত্তর :** এ-ক্ষেত্রে আপনাদের সিদ্ধান্ত দেয়ার সুযোগ তেমন নেই। কারণ যে অত্যাচারের কথা শুনে আপনারা ক্ষুব্ধ হচ্ছেন, তা যদি আপনার বোনকে সেভাবে ক্ষুব্ধ করত, তাহলে আপনার বোন নিজেই অনেক আগে ডিভোর্সের সিদ্ধান্ত নিতেন। কারণ তার নিজের উপার্জনের ক্ষমতা আছে, স্বামী ছাড়াও একা চলার আর্থিক ভিত্তি আছে। কিন্তু তারপরও দীর্ঘ নয় বছর ধরে তিনি সংসার করছেন। এর একটাই কারণ হতে পারে—এত কিছুর পরও হয়তো স্বামীর জন্যে রয়েছে তার একধরনের টান। অতএব তিনি কী করবেন—এটা তার ওপর ছেড়ে দিন।

**প্রশ্ন :** আমার স্বামীর সাথে সম্পর্কের মধ্যে সুখকর কিছু খুঁজে পেলাম না। বিয়ে হয়েছে ৩২ বছর। প্রথম বছরেই মার খেয়েছি। পেয়েছি শাশুড়ি দেবর ননদের যাতনা। ওরাই বিচার দেয়, আমাকে মার খাওয়ায়। আমার ছেলেরা বোবা দৃষ্টিতে আমাকে মার খেতে দেখে আর ভাবে, পৃথিবীটা কী নিষ্ঠুর! যদি ওরা বাধা দিতে আসে, তবে ওদেরও মারে।

**উত্তর :** ৩২ বছর পরে তো এ কথাটা সত্যি হওয়া উচিত নয়। আপনার ছেলেমেয়ের বয়স এখন নিশ্চয়ই ২৫-২৭ বছর। এ বয়সী কোনো ছেলে বা মেয়ে কেন বোবা দৃষ্টিতে তার মাকে মার খেতে দেখবে? তাদেরকে সেভাবে লালন করা উচিত ছিল যে, তারা আপনার প্রতি সমব্যথী হবে এবং আপনি

মার খাওয়ার সময় তারা আপনাদের মাঝখানে এসে বলবে যে, আম্মুকে মারার আগে আমাদেরকে মারো।

আসলে আপনি আপনার অধিকার সম্পর্কে সোচ্চার হতে না পারার মূল কারণ হলো, আপনার আত্মপরিচয়হীনতা, নিজস্ব অর্থনৈতিক ভিত্তি না থাকা। এ-ক্ষেত্রে আপনি কোনো পদক্ষেপ নিতে পারতেন কিনা, আপনার কৌশলের কোনো অভাব আছে কিনা তা খতিয়ে দেখুন। সেইসাথে মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে পরিবারের সদস্যদেরকে নিয়মিত বোঝান এবং দোয়া করুন। আল্লাহর রহমত ও সাহায্য কামনা করুন।

**প্রশ্ন :** স্বামীর সাথে সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না। অনেক বকাবকি করে। এত কষ্ট মেনে নিতে পারছি না। আমি কী করতে পারি?

**উত্তর :** প্রত্যেকটা জীবনেই কষ্ট আছে। দুনিয়ায় কষ্ট ছাড়া কোনো জীবন নেই। একেক জনের কষ্ট একেক জায়গায়, একেক রকম। বিবাহিত জীবনে আনন্দ যে-রকম আছে, কষ্টও আছে। আপনি বুদ্ধিমান হলে আনন্দের পরিমাণ বাড়াবেন, আনন্দের দিকে মনোযোগ বেশি দেবেন।

কষ্টের চেয়ে বড় বোঝা, ভারী বোঝা আর কিছু হয় না। আপনি বোকার মতো কেন ভারী বোঝা নেবেন? অন্যদিকে আনন্দ কখনো বোঝা হয় না। আনন্দ এত হালকা যে, আপনার ভেতরটাকেও হালকা করে দেয়। তাই আনন্দটা গ্রহণ করবেন, কষ্টটা বর্জন করবেন। স্বামী বকাবকি করছে, করুক। আপনি গায়ে না মাখলেই হলো, তাতে প্রভাবিত না হলেই হলো।

আপনার সামনে দুটো উপায় আছে। এক হচ্ছে সম্পর্ক ছিন্ন করা। সম্পর্ক যদি ছিন্ন করতে চান সেটা আলাদা ব্যাপার। সম্পর্ক যদি ছিন্ন করতে না চান, তাহলে যা-কিছু আপনার জন্যে কষ্টকর সেটার কিছুই নেবেন না। শুধু আনন্দটুকু নেবেন। কারণ কিছু আনন্দ যদি না থাকত, তো পাঁচ বছর হোক, ১০ বছর হোক, ২০ বছর হোক এতদিন পর্যন্ত তো আপনি তার সাথে সংসার করতে পারতেন না।

আমাদের সমস্যা হয় যখন আমরা ধৈর্য হারিয়ে ফেলি। কেউ খুব তাড়াতাড়ি, কেউ কিছুটা পরে হারাই। কিন্তু পারিবারিক জীবনটাই এমন যে, যে সম্পর্ক ছিন্ন করা যায় না সেখানে ধৈর্য হারানোর কোনো সুযোগ নাই। আবার যদি মনে হয় সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে, তাহলে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ঝুলিয়ে রাখাটা ঠিক নয়। অবশ্য সম্পর্ক ছিন্ন করতে হলে পরিবারের সাথে আলাপ করেই সিদ্ধান্ত নেবেন।

**প্রশ্ন :** আমার স্বামী আমাকে ভালবাসে। কিন্তু মাঝে মাঝে ঝগড়া হলে রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। কয়েকবার আমাকে থাপ্পড়ও মেরেছে। তারপর অনেকবার মাফ চেয়েছে। এটা আমি ভুলতে পারি না। কী করব?

**উত্তর :** একজন পুরুষের কোনো অবস্থাতেই নারীর গায়ে হাত তোলা উচিত নয়। শুধু স্ত্রী কেন, কারো গায়ে হাত তোলা উচিত নয়। নবীজী (স) এটাকে নিষিদ্ধ করেছেন। নবীজীর (স) কিন্তু একাধিক স্ত্রী ছিলেন। কারো গায়ে কোনোদিন তিনি হাত তোলেন নি। হাত তোলা দূরের কথা, দুর্ব্যবহার পর্যন্ত করেন নি, কখনো রাগও দেখান নি। তিনি বলেছেন, বিশ্বাসীদের মধ্যে সে-ই শ্রেষ্ঠ, যে চরিত্রবান ও সদাচারী। তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম পুরুষ, যে স্ত্রীর সাথে সুন্দর আচরণ করে। [আবু হুরায়রা (রা); *তিরমিজী; হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী : ৯১৩*]

তবে আপনার বক্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে, আপনি আপনার স্বামীকে ভালবাসেন। যেহেতু তিনিও আপনাকে ভালবাসেন, তাই সমাধানে গুরুত্ব দিন। তিনি যেন রাগটা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেন এজন্যে তাকে মেডিটেশন করতে উদ্বুদ্ধ করবেন। তার জন্যে আপনি দোয়া করবেন।

**প্রশ্ন :** যে স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি কোনো দায়িত্ব পালন করেন না, তার সাথে কি সংসার করা উচিত? যে স্বামী সব জায়গায় তার স্ত্রীকে মানসিক রোগী বলেন এবং শাশুড়িও তা-ই বলেন, তাদের সাথে কি থাকা উচিত?

**উত্তর :** আসলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা দায়িত্ব এবং কর্তব্যের। যে স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব পালন করে না, সেই স্ত্রীকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, সে স্বামীর সাথে থাকবে কি থাকবে না। অন্য কারো পক্ষে এটা বলা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। কারণ বাইরের কেউ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা বুঝবে না যে—কোনটা তৃপ্তিদায়ক, কোনটা অতৃপ্তিকর; কোনটা দায়িত্বহীন, কোনটা দায়িত্বপূর্ণ। প্রয়োজনে পারিবারিকভাবে আলাপ-আলোচনা করতে পারেন। কিন্তু বাইরের কেউ এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারেন না। আমরা দোয়া করি যেন পারিবারিক সমস্যা দূর হয়ে যায়, সংসার যেন ভালো থাকে। কিন্তু সংসার ভাঙার পরামর্শ দেয়ার কোনো সুযোগ নেই।

**প্রশ্ন :** স্বামী রাতে বাসায় ফিরে স্ত্রীর সাথে কারণ ছাড়াই ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। স্ত্রী কোনো কথার উত্তর দিলে ঝগড়া আরো বেশি করে। তাই স্ত্রী উত্তর না দিয়ে

চুপচাপ থাকে। এতেও স্বামী উত্তেজিত হয়। প্রায় দুবছর ধরে এটা চলে আসছে। স্বামী যখন চুপচাপ থাকে, স্ত্রী ভুলগুলো ধরিয়ে দিলে সে শুধু স্যরি বলে। কিন্তু রাগ এলেই আবার ঝগড়া। এ-ক্ষেত্রে করণীয় কী?

**উত্তর :** দোয়া করার চেয়ে বেশি কিছু করার নেই আপনার। আপনি স্বামী-স্ত্রীর ঝামেলার মধ্যে কেন যাচ্ছেন? মনে রাখবেন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা শুধু যুক্তির নয়—সম্পর্কটা দায়িত্ব নেয়ার, সম্পর্কটা আবেগের। আবেগের ক্ষেত্রে, রাগের ক্ষেত্রে যদি কারো ভারসাম্য না থাকে, তো অন্য কারো কিছু করার থাকে না।

স্বামী বা স্ত্রীর যদি মানসিক সমস্যা থাকে, তাহলে অপরপক্ষের কষ্ট থাকবেই। কারণ সে যখন মানসিকভাবে অসুস্থ হবে, তখন সে যুক্তিসঙ্গত আচরণ করতে পারবে না। অতএব আপনি তাদের জন্যে দোয়া করুন এবং দুজনকে মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে নিয়মিত বোঝান।

**প্রশ্ন :** গুরুজী, আমার চোখে সমস্যা। ঠোঁটে ও জিহ্বায় সমস্যা। দাঁতে সমস্যা, পেটে ব্যথা ও গ্যাস হয়। মেরুদণ্ডের শেষ অংশে ব্যথা ও হাঁটুতে ব্যথা। আমার স্বামী ঠিকমতো আমার কাছে আসে না। টাকাপয়সাও দিতে চাচ্ছে না। আমার কোনো সমস্যা হলে সেগুলোকে কোনো সমস্যাই মনে করে না। আমি আমার স্বামীকে কাছে পেতে চাচ্ছি। গুরুজী, আমার দাম্পত্য জীবন অনেক কষ্টের। আমাকে যদি কিছু বলেন।

**উত্তর :** আপনি টেনশন বেশি করছেন। আপনার অসুস্থতাগুলো সেই টেনশনেরই ফসল। আবার অসুস্থতার কথা সারাক্ষণ বলার কারণেই হয়তো আপনার স্বামীকেও আপনি পাচ্ছেন না। কারণ নির্মম হলেও সত্য হচ্ছে, অসুস্থ মানুষ কিন্তু বোঝা। নিজের জন্যে, স্বামীর জন্যে এবং পরিবারের জন্যেও বোঝা। খুব প্রিয় মানুষটিও যখন অসুস্থ হয়, প্রথম কিছুদিন মমতা থাকে, সহানুভূতি থাকে। কিন্তু অসুখ যখন দীর্ঘায়িত হয়, বেশিক্ষণ তার জন্যে সমবেদনা পোষণ করা যায় না। কথায় আছে—*নিত্য মরাকে কেউ দেখতে আসে না*। এর ব্যতিক্রম হয়তো আছে, কিন্তু ব্যতিক্রম ব্যতিক্রমই।

আপনার স্বামী যখন আসে, আপনি হয়তো তাকে সারাক্ষণ ব্যথার কথা বলেন, তার সামনে কোঁকাতে থাকেন। খুব কম স্বামীই আছেন, যারা দিনের পর দিন এরকম অসুস্থ স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা বোধ করবেন। তাই আপনাকে সুস্থ হতে হবে আগে। এই ব্যথাগুলো আপনার মনের অস্থিরতারই প্রকাশ। নিয়মিত মেডিটেশন করবেন।

মেডিটেশন মানে শুধু বসে কতক্ষণ অডিও শোনা নয়; বরং নিজেকে সত্যিকার অর্থে শিথিল করা, রিল্যাক্স করা। আপনি অন্তত তিন বার কোয়ান্টাম মেথড কোর্স রিপিট করুন। কারণ আপনার মনের জট এখনো খোলে নি। মনের জটটাকে খুলতে হবে, শিকড়সহ উপড়ে ফেলতে হবে।

নবীজী (স) বলেছেন, '...ক্বালব বা মনের দূষণ শরীরকে দূষিত ও অসুস্থ করে তোলে আর ক্বালব বা মন দূষণমুক্ত হলে শরীর দূষণমুক্ত ও সুস্থ হয়' [নোমান ইবনে বশীর (রা); *বোখারী, মুসলিম; হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী :* ৫৬৭]। অর্থাৎ মনে যখন নেতিবাচকতা জট পাকিয়ে যায়, মন যখন কলুষিত হয়ে যায়, তখনই রোগব্যাধি, ব্যথা-বেদনা সৃষ্টি হয়। এই জটটা যখন খুলে যাবে, আপনি সুস্থ বোধ করবেন। যখন শারীরিকভাবে সুস্থ বোধ করবেন, তখন নিজে বুঝবেন—স্বামীর মন পাওয়ার জন্যে কী করতে হবে, কাউকে বলে দিতে হবে না।

আপনি আগামী ৬০ দিন একবেলা শিথিলায়ন, একবেলা সুখী জীবনের মেডিটেশন করুন। আর দিনে শতবার 'সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন' অটোসাজেশনটি চর্চা করুন। যখনই মনে পড়বে, তখনই বলুন। অনুভব করুন যে, আমি সুস্থ, আমি সুস্থ। আমরা আপনার জন্যে দোয়া করি।

**প্রশ্ন :** ১৫ বছর ধরে সংসার করছি। স্বামীর একটু ভালবাসা পাওয়ার আশায় কতদিন ডুকরে ডুকরে কেঁদেছি! কিন্তু সে চলছে তার নিজের মতো। যেন অটোসাজেশন দিয়ে রেখেছে—আমাকে বিশ্বাস করবে না, মর্যাদা দেবে না। মনে হয়, সে আছে এই দুনিয়ায় আর আমি পড়ে আছি দূর সাইবেরিয়ায়। এত কষ্ট আর সহ্য হয় না। কিছু পরামর্শ দেবেন গুরুজী।

**উত্তর :** আপনি তো কবি হলে খুব ভালো কবিতা লিখতেন, সে আছে এই দুনিয়ায়, আপনি পড়ে আছেন দূর সাইবেরিয়ায়। সমস্যাটা আসলে আপনার স্বামীর নয়, সমস্যাটা মূলত আপনার দৃষ্টিভঙ্গিতে, আপনার ভাবনার জগতে। আপনি তাকে যেভাবে চাচ্ছেন, সেভাবে পাচ্ছেন না। আপনিই হয়তো অটোসাজেশনের মতো বার বার ভাবছেন যে, আমার স্বামী আমাকে মর্যাদা দেবে না। তাই পরিবর্তন আনতে হবে প্রথমে আপনার ভাবনায়।

আপনাকে প্রথমে দৃষ্টিভঙ্গিটা বদলাতে হবে। স্বামীর সাথে থাকার কোনো অবস্থাই যদি না থাকত, তাহলে ১৫ বছর ধরে আপনি তার সাথে আছেন কীভাবে? বলবেন যে, বাধ্য হয়ে আছি। যদি বাধ্য হয়েই থাকতে হয়, তাহলে এই থাকাটাকে আনন্দদায়ক করে ফেলুন না!

এখন থেকে মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে স্বামীকে নিয়ে আসবেন। স্বামী বাস্তবে যে-রকম আচরণই করুক, আপনি তার কাছ থেকে যে আচরণ পেতে চান, যে কথাগুলো শুনতে চান, মেডিটেশনে বার বার স্বামীর মুখ দিয়ে সেই কথাগুলোই বলাবেন। আপনি স্বামীর কাছ থেকে যে আচরণ প্রত্যাশা করেন, যেভাবে সম্মান দিলে আপনি খুশি হবেন সেটাই কল্পনা করবেন। ভাববেন—আমার স্বামী আমাকে ভালবাসে, আমাকে মর্যাদা দিচ্ছে, আমাকে সম্মান করছে। আগামী ছয় মাস দুবেলা এই চর্চাটা চালিয়ে যান। ইনশাআল্লাহ পরিস্থিতি বদলে যাবে।

আপনার এখনকার অবস্থাটা কী? স্বামীর কথা যখনই ভাবছেন, আপনার মধ্যে নেতিবাচক চিন্তা চলে আসছে। এটা শুধু স্বামী কেন, যে-কারো ব্যাপারে এরকম হতে পারে। অনেকের ধারণা যে, আমার বস আমাকে পছন্দ করে না। বস অমুককে পছন্দ করে, অমুককে কাজ দেয়, অমুককে মর্যাদা দেয়। আমাকে গুরুত্ব দেয় না, আমাকে মর্যাদা দেয় না। সমস্যাটা কিন্তু বসের না, যে এমনটা ভাবছে—সমস্যা তার।

আপনি যে-কারো সম্পর্কে—সে বন্ধু হতে পারে, সন্তান হতে পারে, মা-বাবা হতে পারে, ব্যবসায়িক পার্টনার হতে পারে—যখনই মনে করছেন যে, আমাকে দেখতে পারছে না বা তার সাথে আমার অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে না, বুঝবেন যে সমস্যাটা আপনার। কারণ আপনি তখন তার ব্যাপারে নেতিবাচক চিন্তাগুলোই করছেন। যেমন ধরুন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যখন ঝগড়া হয়, তখন ১৫ বছরের সংসারে কী কী খারাপ কাজ উনি করেছেন, কত কষ্ট আপনাকে দিয়েছেন, সেগুলোই মনে পড়তে থাকে। নিজেদের ভালো স্মৃতিগুলো তখন আর মনে আসে না।

চিন্তার এই চ্যানেলটা বদলে দিন। যখনই তার সম্পর্কে চিন্তা আসছে, সাথে সাথে ভালো চিন্তা করুন। তিনি কোন দিন আপনার সাথে একটু ভালো ব্যবহার করেছেন, সেই চিন্তা করুন। অমুক দিন একটু ভালো ব্যবহার করেছিল, অমুক দিন পুরো না হাসলেও একটু মুচকি হেসেছিল, সেটা চিন্তা করুন। অর্থাৎ ভালো ভালো চিন্তা করুন। তাহলে কী হবে? এই যে আপনি তার সাথে ঝগড়া করছেন না, তার সম্পর্কে ভালো চিন্তা করছেন—এই ভালো ভাবনাটা তাকে প্রভাবিত করবে। তার মনকে আপনার দিকে আকর্ষণ করবে। পরিবারে, কর্মজীবনে, শিক্ষাজীবনে—সব ক্ষেত্রেই এটা সত্যি।

**প্রশ্ন :** আমাকে যদি কেউ অপমান করে আর আমি যদি মুখ বুঝে তা সহ্য করি, মানুষ তখন সুযোগ পেয়ে যায়। অপমান করার মাত্রাও বেড়ে যায়।

আমার স্বামী খুব শান্ত ভদ্র। উনি কোনোদিন ন্যায়ের পক্ষ নিয়ে প্রতিবাদ করতে পারেন নি। তার সহধর্মিণী হওয়ার সুবাদে আমাকে অনেক ঝামেলা ও মানসিক নির্যাতনের মুখোমুখি হতে হয়েছে। এমনকি ছেলেমেয়েরাও আমাকে অবলীলায় খারাপ কথা বলে। কারণ তারা জানে, যত অন্যায় কথাই বলুক ওদের বাবা মাথা উঁচু করে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারবে না। আমার মা বলতেন—মানুষ শক্তের ভক্ত নরমের যম। কিন্তু আপনি বলেন, প্রো-একটিভ থাকতে। গুরুজী, আপনি এগুলোর কী ব্যাখ্যা দেবেন?

**উত্তর :** আপনার ছেলেমেয়ে আপনাকে গালিগালাজ করবে আর আপনার স্বামীকে আসতে হবে ছেলেমেয়ের হাত থেকে আপনাকে বাঁচানোর জন্যে! তাহলে বুঝতে হবে, প্যারেন্টিংয়ে কোনো অপূর্ণতা রয়েছে। ছেলেমেয়ে কেন মাকে খারাপ কথা বলবে? দুটো কারণ হতে পারে। এক হচ্ছে, ছেলেমেয়ে কাদের সাথে মিশেছে, আপনি সেদিকে ঠিকমতো নজর দেন নি।

দুই হচ্ছে, ছেলেমেয়েকে আপনি একসময় বকাবকি করেছেন, তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছেন। যখন ছোট ছিল, তখন তারা বকাবকি গালিগালাজ এসব শুনে বড় হয়েছে। এখন তাদের গলার স্বর বড় হয়েছে, ফলে তারা আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করছে। একটা সময়ের পরে তো আসলে ছেলেমেয়েকে বকা যায় না, তাদেরকে বোঝাতে হয়। কারণ তখন যদি আপনি তাকে বকা দেন বা মারেন, সে-তো হাতটা ধরে ফেলবে, যদি তাকে আদব শিক্ষা দিয়ে না থাকেন। এটা খুব নির্মম সত্য।

আপনার সন্তান এখন গালিগালাজ করছে, কারণ সে নৈতিক শিক্ষা পায় নি। সন্তানকে আদব শিক্ষা না দিলে সে-তো এমন করবেই। মা-বাবাকে বকা দিলে দোষটা সন্তানের নয়, বরং দোষটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্যারেন্টিংয়ের। ৯৫% ক্ষেত্রে মা-বাবা সন্তানের সাথে শৈশব থেকে যে-রকম আচরণ করেন, সন্তান বড় হয়ে সে-রকম আচরণই করবে। সন্তানকে যদি না মারেন, সন্তান কখনো সেভাবে বেয়াদবি করবে না। অবশ্য শতকরা পাঁচ ভাগ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হতে পারে যে, সঠিক শিক্ষা দেয়ার পরও সন্তান সেই শিক্ষা নিতে পারে নি বা গ্রহণ করে নি। আবার সন্তান ছোটবেলায় আপনার মা-বাবা ও শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে আপনাকে যেমন আচরণ করতে দেখেছে, বড় হয়ে সে আপনার সাথে সে-রকম আচরণই করবে।

আসলে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা আর অন্যায়ের প্রতিকার করা এক বিষয় না। মুখ বুজে গালিগালাজ সহ্য করতে তো আমরা বলি নি। কোয়ান্টামে আমরা সবসময় বলি—অন্যায়ের প্রতিবাদ নয়, প্রতিকার করতে হবে।

একজন অন্যায় করল, আপনি রাস্তায় গিয়ে ভাঙচুর করলেন—এটা নির্বোধের আচরণ ছাড়া কিছু না। অহিংসা ও বিনয় দিয়ে জয় করতে হবে, নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আপনি সবল হলে তো এমনিতেই কেউ বকাবকি করতে আসবে না। বকাবকি করছে মানেই হলো আপনি অন্তর্গত শক্তিতে শক্তিমান হন নি অথবা সে আপনার শক্তিকে কদর করে না বা বোঝে না।

তাই গালিগালাজ বা জুলুম যত করে করুক, আপনি প্রো-একটিভ থাকুন। প্রো-একটিভ মানে আরেকজনের জুলুম আপনি নীরবে সহ্য করবেন তা নয়। জুলুম, অপমান বা এসব নকল নোট না নেয়াটা হচ্ছে প্রো-একটিভ থাকা। গালি দেয়া তো অসভ্য মানুষের কাজ। ওটাতে জড়ানো যাবে না। আপনাকে বাঁচিয়ে চলতে হবে। যেমন ধরুন, একজন ময়লা ফেলছে। আপনি কি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন, নাকি সরে যাবেন? একজন লাঠি নিয়ে আপনাকে পেটাতে আসছে। যদি আপনার হাতটা শক্ত থাকে, তো তার হাতটা ধরে ফেলবেন। আর শক্তি না থাকলে, বুদ্ধি প্রয়োগ করে তাকে এড়িয়ে যেতে হবে। আহাম্মকের মতো মার খেলে চলবে না।

একজন হয়তো অহেতুক ঝগড়া বাঁধাতে চাইছে। ঝগড়ার আর্ট হচ্ছে, সে প্রথমে আপনার গায়ে ধাক্কা দেবে। যখনই দেখছেন তার সাথে শক্তিতে পারবেন না, তাকে উল্টো বলবেন—ভাই/ আপা, আপনি ব্যথা পান নি তো? অর্থাৎ আপনি তাকে উত্তেজিত হওয়ার সুযোগ দিলেন না। ফলে আপনি মার খাওয়া থেকে বেঁচে গেলেন। আর যদি শক্তি থাকে, শুধু তাকাবেন। কিছুই বলতে হবে না। সে সরে যাবে। আপনাকে বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। আল্লাহ এই ব্রেনটা দিয়েছেন দ্বন্দ্ব-সংঘাত এড়ানোর জন্যে।

কখনো হিংসা, সংঘাত, গালিগালাজ—এগুলোর মধ্যে জড়াবেন না। এগুলো হচ্ছে নেতিবাচকতা, যা অকল্যাণ ছাড়া কোনো কল্যাণ আনে না। নেতিবাচকতা দিয়ে কারো মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনা যায় না। নেতিবাচক কথা বলে ছেলেমেয়েকেও শোধরানো যায় না। যদি শোধরাতে হয়, তাহলে ইতিবাচকতা দিয়ে, মমতার ভাষা দিয়ে বোঝাতে হবে। এজন্যে ছেলেমেয়ের সাথে কী আচরণ করতে হবে—এটা প্রত্যেক মা-বাবাকে আয়ত্ত করতে হবে। তাহলে দেখবেন, বাইরে অন্যদের সাথে তারা যেমন আচরণই করুক না কেন, আপনার সামনে অবশ্যই বিনয়ী থাকবে। সেই ব্যক্তিত্ব আপনার মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে।

**প্রশ্ন :** আমার বিয়ের একবছর পূর্ণ হতে চলল, কিন্তু আল্লাহ আমাদের জীবনে টাকাপয়সার স্বাধীনতা দেন নি। স্বামী আমাকে বলে, তার বউভাগ্য ভালো

নয়। জীবনে নতুন কেউ এলে নাকি ভাগ্য পরিবর্তন হয়। কিন্তু তার কিছুই হলো না। এখন আমি কী করব?

**উত্তর :** আপনার স্বামী খুব বুদ্ধিমান। তার সামর্থ্যহীনতার কথা আপনার ওপর দিয়ে চালিয়ে দেয়। এ-ক্ষেত্রে স্বামীর সাথে ঝগড়া করার কোনো দরকার নেই। তিনি বলেছেন, তার বউভাগ্য ভালো নয়। আপনি বলবেন, আমার ভাগ্য খুব ভালো। ভাগ্য খুব ভালো না হলে কি তোমার মতো স্বামী পাই? অর্থাৎ সবসময় প্রো-একটিভ থাকবেন। একবছর তো বেশি সময় না। আপনি নিয়মিত মেডিটেশন করবেন এবং প্রার্থনা করবেন, যেন আল্লাহ তায়ালা আপনার রিজিকে বরকত দেন।

**প্রশ্ন :** আমার স্বামী তার মা-বাবাকে অসম্ভব ভক্তি ও সম্মান করে। মাঝে মাঝে মনে হয়, ওনাদের সামনে সে যেন ক্লাস ফাইভ/ সিক্সের শিশু। এর কোনো মানে হয়? আপনি কী বলবেন?

**উত্তর :** মা-বাবার সামনে আসলে তো সবাই শিশুই। এই শিশু থাকাটা বরং খুব ভালো। মা-বাবাকে ভক্তি ও সম্মান করা, তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করা খুব গুরুত্বপূর্ণ, এটা অবশ্য পালনীয়। আপনার প্রশ্নের ধরন দেখে মনে হচ্ছে যে, আপনি এতে বিরক্ত। আপনার তো এতে আনন্দিত হওয়া উচিত। আপনিও তাদের সামনে ক্লাস ফোরের শিশু হয়ে যান। আপনিও তাদের খোঁজখবর নিন। তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করুন। যে-কোনো ভালো কাজে যাওয়ার আগে তাদের দোয়া নিন। এতে আপনাদের পারিবারিক প্রশান্তি আরো বাড়বে।

**প্রশ্ন :** গুরুজী, আপনার কাছে জানতে চাই কেউ যদি স্ত্রীর গায়ে হাত তোলে, তাহলে সেই স্ত্রীর কী করা উচিত? বাড়ির গৃহকর্মীর গায়ে হাত তুললে সংসারের শান্তি নষ্ট হয়, তা স্বামী খুব মানে এবং এটা কখনো করে না। তাহলে স্ত্রীর গায়ে হাত তুললে কি শান্তি আসবে? সে জোর করেই আমার ওপর সবকিছু চাপিয়ে দিতে চায়, এটা কি ঠিক?

**উত্তর :** যে পুরুষই স্ত্রীর গায়ে হাত তুলল, নবীজীর (স) দৃষ্টিতে সে সবচেয়ে অপছন্দনীয় কাজটি করল। সারাজীবনে নবীজী (স) তাঁর কোনো স্ত্রীর গায়ে হাত তুলেছেন এমন একটি ঘটনাও নেই। কোনো একটি ঘটনাও যদি

ভুলক্রমে ঘটে যেত, তো পুরুষদের অনেকেই হয়তো এটাকে সুন্নত হিসেবে গ্রহণ করে আমল শুরু করত।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, স্ত্রীর গায়ে হাত তুললে কি শান্তি আসবে? যে ঘরে স্ত্রী কষ্টে থাকেন, সে ঘরে শান্তি আসবে কীভাবে? আপনার স্বামী যাতে কোনোকিছু চাপিয়ে দিতে না পারে সেজন্যে আপনার ভেতরের শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। যদি অন্তর্গত শক্তির জাগরণ ঘটাতে পারেন, তাহলে আপনার ব্যক্তিত্বই এমন হবে যে, আপনার স্বামী যদি তেড়ে এসে হাতও তোলে, তার হাত এমনিতেই নেমে যাবে।

আর আপনি তো স্বামীকে ভালবাসেন। তাই স্বামীকে মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে বোঝান যে, তোমার এই আচরণটা আমাকে কষ্ট দেয়, তুমি আমার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। আর আপনি তার ভালো ব্যবহারগুলোকে সবসময় স্মরণ করবেন, ইতিবাচক থাকবেন।

## নারী অধিকার

**প্রশ্ন :** চরিত্রগত সবদিক ঠিক থাকলেও মেয়েরা এই সমাজে স্বাধীনভাবে চলতে পারে না। এ-ক্ষেত্রে তাদের কী করণীয়? আমাদের এ সমাজে কি ভালো কোনো পরিবর্তন আসবে না?

**উত্তর :** যখন একজন দুজন করে সমাজের সবার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হবে এবং আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি হবে, তখনই তারা সত্যিকারের স্বাধীনতা, নিরাপত্তা নিয়ে চলতে পারবে। এ অবস্থা না আসা পর্যন্ত প্রত্যেককে সতর্কতার সাথে সময় ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে চলতে হবে।

আমরা যদি যথাযথভাবে নবীজীর (স) আদর্শ অনুসরণ করতে পারি, সদাচারী ভালো মানুষ হয়ে উঠতে পারি, তাহলে সমাজে পরিবর্তন অবশ্যই আসবে। প্রত্যেকটা পরিবার যদি সুন্দর হয়, মানুষ যদি ভালো হয়, তাহলে সমাজও ভালো হবে, নিরাপদ হবে। সমাজকে কীভাবে সংস্কার করতে হয়, কীভাবে প্রত্যেকটি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হয়, সেই মডেল তো নবীজী (স) আমাদেরকে দেখিয়ে গেছেন।

যেমন ধরুন, নবীজী (স) একবার আদী ইবনে হাতেমকে (রা) বলেছিলেন, 'হে আদী! তুমি দীর্ঘজীবী হলে অবশ্যই দেখতে পাবে একজন নারী হীরা (ইরাক) থেকে যাত্রা করে উটের হাওদায় বসে একাকী দীর্ঘপথ অতিক্রমের পর মক্কায় গিয়ে কাবাঘর তাওয়াফ করছে।' আদী বলেন, আমি

পরবর্তী সময়ে উটের হাওদায় বসে নারীদেরকে একাকী হীরা থেকে মক্কায় গিয়ে কাবাঘর তাওয়াফ করতে দেখেছি। [আদী ইবনে হাতেম (রা); *বোখারী; হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী : ৯৬৫*]

অথচ সেই সময়কার বাস্তবতা কী ছিল? ১৪০০ বছর আগে জাহেলিয়াতের যুগে নারীর তো কোনো সম্মান ছিল না, যেখানে কন্যাশিশুকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো। নারী ছিল শুধুই ভোগ্যপণ্য। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে নবীজী (স) যেভাবে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন, যেভাবে পুরো সমাজের কাঠামো পাল্টে ফেললেন, বিস্মিত হতে হয়। প্রথমত, তিনি দিয়েছেন শিক্ষার অধিকার। একজন মানুষের সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে জ্ঞান, শিক্ষা। নবীজী (স) বলেছেন, জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক বিশ্বাসী নরনারীর জন্যে ফরজ। [আনাস ইবনে মালেক (রা); *নাসাঈ, মেশকাত; হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী : ১০৯*]

দ্বিতীয়ত, বিয়ের ব্যাপারে নারী অধিকার। বিয়ের ব্যাপারে নারীর ইচ্ছার কোনো মূল্য ছিল না, তার কোনো স্বাধীনতা ছিল না। নবীজী (স) প্রথম স্বাধীনতা দিলেন যে, কোনো নারীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দেয়া যাবে না। স্ত্রীর ওপর যেমন স্বামীর অধিকার রয়েছে, তেমনি স্বামীর ওপরও স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে তিনি সচেতনতা সৃষ্টি করেছেন।

একজন আনসার সাহাবী খামছা বিনতে খিদানের (রা) বিয়ে হয়েছিল আগে। তিনি নবীজীর কাছে এসে জানালেন যে, তার বাবা তাকে বিয়ে দিয়েছেন এবং এই বিয়েতে তার মত ছিল না। নবীজী সাথে সাথে সেই বিয়েকে বাতিল ঘোষণা করলেন। নারীর অনুমতি নেয়ার এ নিয়ম তিনি নিজের মেয়ে ফাতেমার সাথে হযরত আলীর বিয়েতেও অনুসরণ করেছেন।

তৃতীয়ত, বিবাহবিচ্ছেদের ব্যাপারে নারীর মত প্রকাশের অধিকার। একটি হাদীস থেকে আমরা জানি, [বারীরা ও মুগীস দুজনের বিয়ে হয় ক্রীতদাস থাকা অবস্থায়। আয়েশা (রা) বারীরাকে মুক্ত করে দেন। বারীরা স্বাধীন হলেন, কিন্তু মুগীস তখনো ক্রীতদাস। তখন বারীরা সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি ক্রীতদাস স্বামীর সাথে ঘর করবেন না। কিন্তু মুগীস বারীরার জন্যে পাগল। ঘটনাটি নবীজী (স) পর্যন্ত গড়াল।] নবীজী (স) বারীরাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, তুমি পুনরায় মুগীসকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করো। বারীরা বললেন, হে আল্লাহর রসুল! এটা কি আপনার নির্দেশ? নবীজী (স) বললেন, না, এটা আমার সুপারিশ। বারীরা বললেন, তাহলে আমার জীবনে মুগীসের কোনো প্রয়োজন নেই। [আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), *বোখারী; হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী : ৯৬৪*]

খেয়াল করবেন, নবীজী (স) তখন রাষ্ট্রপ্রধান, সেনাপ্রধান, ধর্মীয় প্রধান, বিচার প্রধান। সব ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি সাধারণ এক নারীকে মত প্রকাশের কতটা অধিকার দিয়েছেন! নবীজীর (স) সাহাবীরাও তাঁকে অনুসরণ করেছেন। একবার ওমর (রা) মিম্বর থেকে খোতবা দিয়েছেন যে, দেনমোহর ৪০০ দিরহামের চেয়ে বেশি হলে তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করা হবে। তখন মসজিদেই এক বৃদ্ধা খলিফাকে বলে উঠলেন, 'কোরআনে এ সংক্রান্ত কোনো আয়াত নেই। তাই আপনি দেনমোহরের সীমা নির্ধারণ করে দিতে পারেন না। আল্লাহ বলেন (সূরা নিসা : ২০), 'নারীকে যা দিয়েছ, তার কিছুই ফিরিয়ে নেবে না'। ওমর (রা) তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, 'হে আল্লাহ! আমায় ক্ষমা করো। এই বৃদ্ধাও কোরআনের ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশি জানেন।'

একজন মহিলা কতটা স্বাধীনতা পেলে বা নিজেকে কতটা নিরাপদ মনে করলে রাষ্ট্রপ্রধানের সামনে এভাবে কথা বলতে পারেন! এই অধিকার নারীকে দিয়ে গেছেন আল্লাহর রসুল (স)।

হযরত ওমরের (রা) সময়কার আরেকটা ঘটনা বলি। তালাকের নিয়ম হচ্ছে, তিন ধাপে দিতে হবে। প্রথম তালাক দেয়ার পর ৩০ দিন, দ্বিতীয় বারের পর ৩০ দিন এবং তৃতীয় বারের পরে ৩০ দিন অপেক্ষা করতে হবে। এই ৯০ দিন সময় হচ্ছে নারীর প্রাপ্য। এক স্বামী রাগের মাথায় তার স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক দিয়ে দিয়েছে। ঘটনাটা খলিফা ওমর পর্যন্ত গেলে তিনি বললেন, 'তালাক তো হয়ে গেছে। কিন্তু তোমার প্রাপ্য যে ৯০ দিন তা থেকে তোমাকে বঞ্চিত করায় পুরুষকে ১০০ বেত মারা হবে।' অর্থাৎ অপরাধ নিশ্চিত হওয়ার পরে শাস্তি সবসময় দৃষ্টান্তমূলক হতে হবে। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি সমাজে অপরাধ কমায়।

চতুর্থত, দেনমোহরের অধিকার। স্বামীকে অবশ্যই দেনমোহর আদায় করতে হবে। এটা ফরজ/ অবশ্যকর্তব্য।

পঞ্চমত, উপার্জন এবং আত্মপরিচয় সৃষ্টি বা পেশার অধিকার। নারীর উপার্জনে কিন্তু স্বামীর কোনো অধিকার নেই। কিন্তু স্বামীর উপার্জনের ওপর স্ত্রীর পূর্ণ অধিকার আছে।

আগে কোনো মহিলা পিতার উত্তরাধিকার হিসেবে কিছু পেত না। কিন্তু নবীজী (স) প্রথম উত্তরাধিকারের অধিকার দেন নারীকে। এ-ছাড়া যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার অধিকারও তিনি দিয়েছেন নারীকে।

আরেকটা বড় সম্মান নারীকে দিয়েছেন—কুমারী নাম বা পিতৃপরিচয় সংরক্ষণের অধিকার। আর মায়ের অধিকার তো সবচেয়ে বেশি দিয়েছেন তিনি; বলেছেন, মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত। নবীজী (স) এই

কথাটা তো ব্যাপক অর্থে বলেছেন। ইসলাম যে নারীকে কত অধিকার দিয়েছে, কত সম্মান দিয়েছে, এটা আমরা অধিকাংশ মানুষ জানিই না। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে আমাদের *হাদীস পাঠ* বইটি পড়বেন। ইতিহাসে নারীকে এর চেয়ে বেশি সম্মান আর কেউ দিতে পারে নি।

নারীর অধিকার নিয়ে আমরা প্রথম ওয়ার্কশপ করি ১৯৯৬ সালে। আমরা সেই সমাজের প্রত্যাশা নিয়ে কাজ করি, যেখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সম্মানিত থাকবে এবং রাত যত গভীর হোক, প্রয়োজনে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারবে নিরাপদে। এজন্যে প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আর এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করার জন্যেই *নিত্যদিন শত হাদীস*, *হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী* পড়বেন। কোরআনের ফলিত রূপ হচ্ছে হাদীস, নবীজীর (স) জীবন। জীবনদৃষ্টির পরিবর্তন আমাদের অন্তরকে শুদ্ধ করবে। আর একটা শুদ্ধাচারী সমাজেই সম্ভব নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ।

**প্রশ্ন :** হিন্দু পরিবারে বাপের সম্পত্তি মেয়েরা কিছুই পায় না। অসহায় অবস্থায় হিন্দু মেয়েকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে হয়। বাপের বাড়ি পরের বাড়ি কেন? কেন অন্য ধর্মাবলম্বীদের মতো আমাদের জন্যে আইনের ব্যবস্থা নেই?

**উত্তর :** বাবার বাড়ি যেমন ছেলের বাড়ি, তেমন মেয়েরও বাড়ি। বিয়ের পরে মেয়ে পর হয়ে যাবে, এটা একটা ভুল ধারণা। এটা একটা অবিদ্যা এবং কুসংস্কার। এটা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। আর এই অবিদ্যা কুসংস্কার মুক্ত করার জন্যেই আমাদের কোয়ান্টাম দৃষ্টিভঙ্গি। আমরা সেই দৃষ্টিভঙ্গিই জাগ্রত করার চেষ্টা করছি। কারণ আইন করে আসলে অধিকার আদায় হয় না। আইন নারীদের পক্ষে হওয়ার পরও কতজন তার অধিকার পেয়েছেন? আপনজনের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নিয়ে অধিকার আদায় করাটা কি আমাদের কাম্য?

বাবার বাড়ি, বাবার পরিচয় সবসময়ই থাকবে। বিয়ের আগে যেমন থাকে, বিয়ের পরেও থাকবে। এটা তো একজন নারীর মূল শিকড়, এই সম্পর্কটা সারাজীবনের। নবীজী (স) কিন্তু সেই অধিকার ১৪০০ বছর আগে মহিলাদের দিয়ে গেছেন। যে কারণে তার স্ত্রীদের নামের সাথে স্বামীর নাম-পদবি যুক্ত হয় নি।

অর্থাৎ তারা তাদের কুমারী নামেই আমৃত্যু পরিচিত ছিলেন। দেখুন, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) বলা হয়, আয়েশা মুহাম্মদ বলা হয় না। কেন?

কারণ নবীজী (স) এই পরিচয়কে সম্মান করতেন। তিনি তাঁর উম্মতদেরকে এভাবে সম্মান করতে শিখিয়েছেন। আমাদেরও উচিত এটাকে সম্মান করা।

আপনি যেহেতু সনাতন পরিবার থেকে এসেছেন, আপনার অধিকারের কথা আপনাকেই বলতে হবে। সনাতন ধর্মে অনেক কিছুই সংস্কার হয়েছে। যেমন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে বিধবা বিবাহ। ন্যায্য অধিকারের পক্ষে জনমত গড়ে উঠলে অনেক কিছুই সংস্কার হতে পারে।

**প্রশ্ন :** ইসলামে সম্পদের অংশীদারিত্বে নারীর অধিকার নিয়ে আপনার মতামত জানাবেন। কারণ এখানে একজন পুরুষ যা পান তার অর্ধেকটা পান একজন নারী। এই বৈষম্য কেন?

**উত্তর :** এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন। আমরা যদি কোরআনের বিধান দেখি, তাহলে দেখব, নারীকে কিছু ব্যাপারে অধিকার দেয়া হয়েছে, পুরুষকে কিছু ব্যাপারে অধিকার দেয়া হয়েছে। নারীকে অনেক ব্যাপারে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, আবার পুরুষকেও অনেক ব্যাপারে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

নারীর প্রতি এখানে কোনো বৈষম্য করা হয় নি। একজন পুরুষ যখন নারীকে বিয়ে করে, তখন ইসলামী রীতি অনুযায়ী পুরুষকে দেনমোহর আদায় করতে হয়। এটা ফরজ। কিন্তু নারীর জন্যে এরকম কোনো নিয়ম নেই। দেনমোহরের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ খুব সুস্পষ্ট—দেনমোহর যা ধার্য করবেন তা আদায় করতে হবে স্বামীকে। এটা মুখে মুখে হলে হবে না, অনাদায়ী হলে হবে না। দেনমোহর আদায় করতেই হবে।

আবার স্ত্রীর যদি নিজস্ব উপার্জন থাকে, সম্পদ থাকে সেখানে স্বামীর কোনো অধিকার নেই। এটা একান্তই স্ত্রীর সম্পদ। অর্থাৎ স্ত্রীর যত কিছুই থাকুক, তবুও তাকে সসম্মানে ভরণপোষণের দায়িত্ব কিন্তু স্বামীর। এই ভরণপোষণ মানে হলো সবরকম ভরণপোষণ।

অন্যদিকে স্ত্রীর যা-কিছু উপার্জন বা সম্পদ রয়েছে, তার কানাকড়িও স্বামী চাইতে পারবেন না আইনগতভাবে। স্ত্রী নিজের আনন্দে দিলে সেটা আলাদা কথা। না দিলে স্বামীর কোনো অধিকার নেই তা চাওয়ার। বরং স্ত্রী যদি রান্না করতে না পারে, ভরণপোষণের দায়িত্ব যেহেতু আপনি নিয়েছেন, হয় আপনি লোক রাখবেন, লোক রাখতে না পারলে নিজে করে খাওয়াবেন। কারণ তার ভরণপোষণ ও তার যত্ন নেয়ার সব দায়িত্ব আপনি নিয়েছেন।

সূরা নিসার ৩৪ নং আয়াত হলো, 'নারীর যত্ন নেয়ার পুরো দায়িত্ব পুরুষের। আল্লাহ পুরুষকে যে অতিরিক্ত অনুগ্রহ সম্পদ ও আর্থিক সামর্থ্য

দিয়েছেন তা দিয়ে সে নারীর পুরো যত্ন নেবে।' নবীজী (স) সবসময় এই যত্ন নেয়ার কাজটাই করেছেন তার ব্যক্তিজীবনে, পারিবারিক জীবনে এবং সামাজিক জীবনে। কোরআন যা বলেছে সেটা পালন করার ব্যাপারে তিনি সবসময় খুব সচেতন ছিলেন এবং কোরআন অনুসরণ করে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন আমাদের জন্যে। আমরাও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে যখন পরিবর্তন করতে পারব, তখন আমাদের সমাজে নারী-পুরুষ সমান মর্যাদায় থাকবে। আমরা যদি নবীজীর (স) আদর্শ অনুসরণ করি, তাহলে অধিকার আদায়ের জন্যে নারী বা পুরুষ কোনো পক্ষকেই আন্দোলন করতে হবে না।

বলবেন যে, বাবার সম্পত্তিতে ছেলের এবং মেয়ের অধিকার এরকম কেন? মা-বাবাকে দেখার দায়িত্ব ছেলের, এ দায়িত্ব মেয়েকে দেয়া হয় নি। দায়িত্ব দিলে দায়িত্ব পালনের জন্যে কিছু অতিরিক্ত সুবিধা আর অধিকারও তো তাকে দিতে হবে। অর্থাৎ এ-ক্ষেত্রে দায়িত্ব অনুসারে একেকদিকে একেকজনকে অধিকার বেশি দেয়া হয়েছে, একেকদিকে অধিকার কম দেয়া হয়েছে। ভারসাম্য রক্ষার জন্যেই এটা করা হয়েছে।

তারপরও অভিভাবক যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে তাদের জীবদ্দশায় মেয়েকে সম্পত্তির যে-কোনো অংশ দিতে পারেন। এখানে কারো কিছু বলার নেই। তিনি যাকে খুশি, যেভাবে ইচ্ছা দান করে দিতে পারেন। যদি কাউকে তিনি কিছু না দিয়ে মারা যান, তখন উত্তরাধিকার আইন অনুসারে এ সম্পত্তি বহু ভাগে ভাগ হয়ে যায়। ইসলামে বৈষম্য নেই, বরং ইসলাম বাবার সম্পত্তিতে মেয়ের অধিকার সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

**প্রশ্ন :** নারীদের প্রতি সম্মান, বিয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এবং ডিভোর্সের ব্যাপারেও নারীদের অগ্রাধিকার। সবকিছু মিলিয়ে মনে হয় পুরুষের চেয়ে নারীরাই ঊর্ধ্বে। আসলেই কি তাই?

**উত্তর :** এখানে ঊর্ধ্বের বা নিম্নের কিছু নেই। নারী এবং পুরুষ পরস্পর পরস্পরের পোশাক—পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। প্রত্যেকটা ব্যাপারে পুরুষের যে-রকম অধিকার রয়েছে, নারীরও একই রকম অধিকার রয়েছে। যখন বিয়ে হবে—একজন প্রস্তাব দেবে, একজন গ্রহণ করবে। হয় নারীকে প্রস্তাব দিতে হবে অথবা নারী প্রস্তাব গ্রহণ করবে। হয় পুরুষকে প্রস্তাব দিতে হবে বা পুরুষ প্রস্তাব গ্রহণ করবে। ব্যাপারটা খুব সহজ।

আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি যে, তিনি আমাদেরকে এমন এক নবীর উম্মত করেছেন, যিনি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষকে সম্মানিত

করেছেন। আল্লাহ তায়ালা নারীদেরকে যতটা অধিকার দিয়েছেন এবং নবীজী (স) সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজে যেভাবে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, নারীদেরকে সে অধিকার ও সম্মান বহু আধুনিক সমাজও দিতে পারে নি। আমাদের সমাজে নারী অধিকার একটি বহুল আলোচিত বিষয় হলেও নারী নির্যাতন এখনও একটি কালো দাগ।

**প্রশ্ন :** আপনি বলেছেন, একটা মেয়েকে নিজের পরিচয় সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু সব পুরুষই চায়, স্ত্রী স্বামীর নাম-পরিচয়ে চলুক। খুব কমই তার স্ত্রীর স্বকীয়তার প্রতি অভিনন্দন জানায়। এ ব্যাপারে কী করণীয়?

**উত্তর :** শুধু পুরুষ কেন, অনেক নারীও আরেক নারীর প্রতি ইতিবাচক থাকতে পারে না, অভিনন্দন জানাতে চায় না। মনে রাখতে হবে, অধিকার কেউ কাউকে দেয় না। স্বকীয়তা জোর করে আনা যায় না, স্বকীয়তাকে বিকশিত করতে হয়। আপনি নিজের গুণকে বিকশিত করুন। রি-একটিভ না হয়ে সবরের সাথে কাজ করতে থাকুন। তাহলে আপনাকে কেউ চাপা দিয়ে আটকে রাখতে পারবে না। আগুনকে কেউ ছাইচাপা দিয়ে রাখতে পারে না। সময় এবং সুযোগই এমনভাবে আসবে যে, আপনি বিকশিত হবেনই। তখন ভালো না লাগলেও আপনাকে অভিনন্দন জানাবে তারা।

## স্বামী/ স্ত্রীকে সন্দেহ

**প্রশ্ন :** ঠিক হচ্ছে না বুঝতে পেরেও আমি ইদানীং আমার স্বামীকে বেশি সন্দেহ করছি। কী করা উচিত?

**উত্তর :** সন্দেহ কিন্তু একটা রোগ। এটা মনের রোগ। খুব ভালো যে, আপনার নিজের মনেই একটা অনুশোচনা সৃষ্টি হয়েছে—স্বামীকে এত সন্দেহ করা ঠিক হচ্ছে না। এখন নিয়মিত অটোসাজেশন দেবেন, ‘আমার স্বামীর মতো এত ভালো স্বামী পৃথিবীতে আর নেই’। আসলে তো তা-ই, আপনার স্বামীকে যদি সবচেয়ে ভালো মানুষ হিসেবে ভাবতে না পারেন, আপনি কখনো সুখী হতে পারবেন না। সব পুরুষেরই এমনটা ভাবা উচিত যে, সব মহিলাই ভালো, কিন্তু আমার স্ত্রীর তুলনা নেই। প্রত্যেক স্ত্রীরও এমনটা ভাবা উচিত যে, আমার স্বামী হচ্ছে পৃথিবীতে সবচেয়ে ভালো স্বামী।

আমি আপনার কষ্টটা বুঝতে পারি। সন্দেহের চেয়ে কষ্টের আর কী হতে পারে! এ যন্ত্রণায় নিশ্চয়ই আপনার রাতের ঘুমও হারাম হয়ে যায়। অতএব মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে স্বামীকে এনে বলুন, আমি তোমাকে অনেক ভালবাসি। সেইসাথে স্বামীর যে গুণগুলো আছে সে গুণগুলোকে আপনি মনে মনে অবলোকন করুন। সবসময় ভাববেন, আমার স্বামী কত ভালো! আমার প্রতি কত যত্নশীল! এ ভাবনার চর্চাটা নিয়মিত করুন।

**প্রশ্ন :** ছাত্রজীবনে কলেজ পর্যন্ত আমরা ছেলেমেয়ে একসাথে পড়েছি। আমার বিয়ে হয়েছে ১৮ বছর এবং স্বামীর প্রতি আমি ১০০% বিশ্বস্ত। কিন্তু আমার কোনো ছেলেবন্ধুর সাথে হঠাৎ দেখা হলে এবং কথা হলে আমার স্বামী আমাকে সন্দেহ করেন, আমার সঙ্গে অদ্ভুত আচরণ করেন। এতে আমার মনে খুব কষ্ট লাগে। মেডিটেশনে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করি। কিন্তু বাস্তবে এ নিয়ে কখনো কথা বলি নি। কারো সাথে দেখা হয়ে গেলে তাকে তো আর এড়িয়ে যাওয়া যায় না। একথা স্বামীকে কীভাবে বোঝাব?

**উত্তর :** অনেক পুরুষ বা মহিলা আছেন, সন্দেহবাতিক হওয়াটা তাদের রোগের পর্যায়ে চলে গেছে। তারা স্ত্রীকে বা স্বামীকে নিজের সম্পত্তি মনে করেন এবং অন্য কারো সঙ্গে কথা বলাটাকে সন্দেহের চোখে দেখেন। এটা একধরনের মানসিক সমস্যা। আপনার স্বামীর ক্ষেত্রে তেমনটি হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে। তবে এ-ক্ষেত্রে আপনাকে সচেতন হতে হবে।

যার সাথে মাঝে মাঝে দেখা হয়, তার সাথে দেখা না হলেও তো চলে। কিন্তু ঘরে অশান্তি করে আপনি সুখী হতে পারবেন না। তাই সম্ভব হলে এ সম্পর্কগুলোকে পুরোপুরি এড়িয়ে চলুন। কখনো সহপাঠীদের সাথে দেখা হয়ে গেলে স্বামীর সামনেই তাদের সাথে সহজভাবে কথা বলুন, স্বামীর সঙ্গে তাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিন।

আপনি আপনার স্বামীর প্রতি ১০০% বিশ্বস্ত হলেও তিনি এ ব্যাপারে ১০০% নিশ্চিত নন বলেই তার এই সন্দেহ। স্বামীকে কমান্ড সেন্টারে এনে বোঝান এবং আপনি নিজের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে সুযোগমতো বাস্তবে সরাসরি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করুন। দেখবেন, সবকিছু ঠিক হয়ে গেছে।

**প্রশ্ন :** স্ত্রীর ব্যাপারে অবিশ্বাস তৈরি হয়েছে। এটা নিয়ে তাকে এখনো কিছু বলি নি। কিন্তু আমার প্রতিমুহূর্তের শান্তি নষ্ট হচ্ছে। অথচ আমি বুঝতে পারছি না, এর সমাধান কী হতে পারে?

**উত্তর :** যে-কোনো কারণে আপনি আপনার স্ত্রীকে যদি শতভাগ বিশ্বাস না করেন, তাহলে পরিণতিটা কী হবে? ০.০১ ভাগ অবিশ্বাসই আপনার জীবনের শান্তি নষ্ট করার জন্যে যথেষ্ট। অতএব নিজের শান্তির জন্যেই আপনি যখন বিশ্বাস করবেন, শতভাগ বিশ্বাস করবেন। মনে কখনো কোনো সংশয় রাখবেন না। বিশ্বাস করার আগে চিন্তা করবেন, আমি তাকে বিশ্বাস করতে পারি কিনা। বিয়ে করার আগে চিন্তা করবেন, যাকে স্ত্রী করে ঘরে আনব, তাকে বিশ্বাস করতে পারব কিনা। যদি মনে হয় বিশ্বাস করতে পারবেন না, তাহলে তাকে বিয়ে করবেন না।

কিন্তু বিয়ে করার পরে—বিয়ে তো করলাম, এখন আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করব কি করব না—এমন যদি হয়; আপনার সংসার আর জাহান্নামের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না। কারণ আপনার অবিশ্বাস তার মধ্যেও সঞ্চারিত হবে—আমার স্বামী তো আমাকে বিশ্বাস করে না। তারও হয়তো কোথাও কিছু একটা আছে। অবিশ্বাস শুরু হবে অন্যপক্ষেও। বিয়ে যেহেতু করে ফেলেছেন, তাই সন্দেহ করার মতো কোনো প্রত্যক্ষ কারণ না থাকলে পুরোপুরি বিশ্বাস করার চেষ্টা করুন। কানকথায় প্রভাবিত হবেন না। আপনার যদি সন্দেহবাতিক থাকে, তবে কাউন্সিলরের পরামর্শ নিন।

**প্রশ্ন :** আমি ইসলাম-মনস্ক। সেভাবেই চলাফেরা করি। কিন্তু আমার স্বামী সাধারণ ব্যাপার নিয়ে আমাকে সন্দেহ করেন। কখনোই আপত্তিকর কিছু করব না, এ ব্যাপারে আমার বিশ্বাস আছে। কিন্তু স্বামী যখন সন্দেহ করেন, আমার ভীষণ রাগ হয়। তখন ঝগড়া করি। দয়া করে আমার স্বামীর উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলেন, তাহলে তিনি শুনবেন।

**উত্তর :** ঝগড়া করেই আপনি আপনার স্বামীর সন্দেহকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছেন। আপনি যদি শুধু বলতেন, এতদিন পরেও তুমি আমাকে বুঝলে না, এটাই আমার দুঃখ। এখন থেকে যখনই সন্দেহ করবে, আপনি একথা বলবেন। আপনি যেহেতু আপত্তিকর কিছু করছেন না, তাই আপনার মধ্যেও কোনো সংশয় থাকা ঠিক নয়। আপনার এ কথাতেই কাজ হবে আশা করি। তবে আপনি আপনার জায়গা থেকে সৎ কিনা, সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

**প্রশ্ন :** আমার স্ত্রীর বিয়ের আগের খারাপ সম্পর্কের কথা অনেক চাপাচাপির পর স্বীকার করেছে। তাকে কি ক্ষমা করা উচিত, নাকি অন্য ব্যবস্থা নেয়া উচিত? আল্লাহ জানেন, আমি বিয়ের আগে কোনোকিছু করি নি।

**উত্তর :** আপনি এখানে বোকামি করেছেন। বিয়ের আগে কী হয়েছে না হয়েছে, এটা জানার জন্যে স্ত্রীকে এভাবে চাপাচাপি করার প্রয়োজন ছিল না। আপনি কারো কাছ থেকে শুনেছেন বা জেনেছেন—আপনার সন্দেহ হয়েছে। এরপর যদি এটা নিয়ে আর অগ্রসর না হতেন, আপনি শান্তিতে থাকতেন। যা শুনেছেন এটা তো ঠিক না-ও হতে পারে। কিন্তু আগে যেটা সন্দেহ ছিল, এখন সেটা নিশ্চিত হলেন এবং আপনার অশান্তি আরো বেড়ে গেল। সুখী হওয়ার সুযোগকে আপনি নিজের হাতেই সীমিত করে ফেললেন।

যা-ই হোক, বোঝা যাচ্ছে যে, অন্যান্য দিক থেকে আপনার কোনো সমস্যা নেই। থাকলে আপনি বলতেন। এখন ক্ষমা করে দেয়াই আপনার জন্যে উত্তম। মানুষকে ক্ষমা করলে আল্লাহও আপনাকে ক্ষমা করবেন।

অনেক সময় আমরা কিন্তু বোকামি করি। বেশি ফ্রি হতে গিয়ে বিয়ের আগে এমন সব গোপন বিষয় খুঁচিয়ে তুলি, যা শুধু শুধু জটিলতা সৃষ্টি করে। কারণ বিয়ের পর যদি একজন স্বামী এবং একজন স্ত্রী পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার মানসিকতা রাখতে পারে, তাহলে বিয়ের আগে কী কী হয়েছে, এসব নিয়ে কারোই মাথা ঘামানো উচিত নয়। এমনকি এগুলো পরস্পরকে বলারও কিছু নেই। কারণ অতীতে ফিরে যাওয়া যায় না, যেতে হয় ভবিষ্যতে।

**প্রশ্ন :** আমার স্বামী আমার ক্ষেত্রে খুব স্বার্থপর এবং সন্দেহপ্রবণ। আমার আত্মীয়স্বজনের ব্যাপারে এবং আমার সব কাজে তার নানা আপত্তি। এজন্যে সে সবসময় আমাকে তার বাড়ি থেকে চলে যেতে বলে। আমার কী করণীয়? মনে অনেক কষ্ট। কী করলে ভালো থাকব?

**উত্তর :** তাকে মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে নিয়ে এসে খুব ভালোভাবে বোঝান, তুমি আমার একমাত্র স্বামী, তুমি কত ভালো! বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হলেও আমি তোমাকে নিয়েই যাব। অর্থাৎ সবসময় ইতিবাচক থাকবেন। বিষয়গুলোকে স্পোর্টিংলি নেবেন। দেখবেন যে, আপনি আপনার স্বামীকে প্রভাবিত করতে পেরেছেন।

আর স্বার্থপর, সন্দেহপ্রবণ—তাকে নিয়ে এই চিন্তাগুলো পুরোপুরি বাদ দেবেন। সবসময় বলবেন, আমার স্বামী আমাকে খুব ভালবাসে। আমি কত সুখে আছি! কত ভালো আছি! সবাই বলে, তুমি আমাকে কত ভালবাস! তুমি যখন বেরিয়ে যেতে বলো, তখন আমার মনে হয় যে, তুমি আমাকে পরীক্ষা করছ, ভালবাসা থেকে বলছ। অর্থাৎ আপনি একজন স্ত্রী হিসেবে স্বামীকে ইতিবাচকভাবে সব কথা বলবেন—বাস্তবেও, মেডিটেশনেও।

**প্রশ্ন :** অনেকে বলেন, মেয়েদেরকে নাকি কখনো বিশ্বাস করতে নেই। তাহলে সুখী পরিবার কীভাবে নির্মিত হবে? জীবনের সবদিক দিয়ে সুখী হওয়ার জন্যে স্ত্রীর ওপর কীভাবে বিশ্বাস রাখা উচিত ব্যাখ্যা করলে উপকৃত হবো।

**উত্তর :** বিশ্বাস করার আগে চিন্তাভাবনা করবেন, খোঁজখবর নেবেন এবং পর্যবেক্ষণ করবেন। কিন্তু যখন আপনি কাউকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলেন, পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছাড়া আপনার কোনো বিকল্প নেই। তাই স্ত্রীকে পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে হবে। যা-কিছু সংশয়, খোঁজখবর যা নেয়ার, যাচাই-বাছাই যা করার স্ত্রী হওয়ার আগ পর্যন্ত। স্ত্রী হওয়ার পরে খোঁজখবর নিয়ে অথবা সন্দেহ করে আর কোনো লাভ নেই। কারণ বিয়ের পর এই বিশ্বাসটাই হচ্ছে সম্পর্কের মূল এবং এটা করতে পারলেই আপনি সুখী হবেন।

**প্রশ্ন :** আমার স্বামী খুব ভালো মানুষ। কিন্তু বিয়ের পর থেকে আমার ব্যাপারে খুব বেশি পজেসিভ। আমার সব কাজে বাধা দিতে চায়। যেমন, পড়াশোনা করা যাবে না। চাকরি করা যাবে না। কারো সাথে কথা বলা যাবে না। এমনকি কোনদিকে তাকালাম এসবও খেয়াল করে। এ অবস্থায় কীভাবে প্রো-একটিভ থাকা যায়?

**উত্তর :** পজেসিভনেস বা স্ত্রীর ব্যাপারে স্বামীর মাত্রাতিরিক্ত অধিকারবোধ—এটাকে কোনো কোনো স্ত্রী যেমন অপছন্দ করেন, তেমনি অনেক স্ত্রী পছন্দও করেন। এটাকেই তারা স্বামীর ভালবাসার প্রকাশ বলে মনে করেন। স্বামীর একটু মনোযোগের অভাব হলে তাদের খেদের কোনো শেষ থাকে না।

আপনার ক্ষেত্রে এই পজেসিভনেস-এর কারণ হতে পারে, আপনি হয়তো খুব সুন্দরী। তাই আপনার স্বামী সারাক্ষণ অনিশ্চয়তায় ভোগেন যে, কী জানি কখন আপনি তাকে ছেড়ে আবার কোনদিকে চলে যান! পড়াশোনা করতে গিয়ে অন্য কারো সাথে প্রেম হয় কিনা। চাকরি করতে গেলে অফিসের বস বা সহকর্মীর সাথে ভাব হয় কিনা। অর্থাৎ তিনি হয়তো আপনার ব্যাপারে খুব সেনসিটিভ, যার প্রকাশ ঘটছে এই বাড়াবাড়িগুলোর মধ্য দিয়ে।

সাধারণত বিয়ের পর বেশিদিন এ অবস্থা থাকে না। তাই ধৈর্য ধরুন। এখন আপনার করণীয় হলো—যেহেতু আপনি আপনার স্বামীকে খুব ভালো মানুষ মনে করেন, তার মানে তার প্রতি আপনার শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা রয়েছে। কাজেই আপনার প্রতি তার এই আচরণকে সহজভাবে নিন। ধরে নিন, এটাই তার ভালবাসার প্রকাশ। তাহলে তিনি নিশ্চিত হবেন যে, না, ঠিক

আছে; আমার স্ত্রী আমারই আছে। একবার আস্থা অর্জন করে ফেলার পর দেখবেন, আর কোনো সমস্যা হচ্ছে না।

আবার এটা আপনার স্বামীর ব্যক্তিত্বের কারণেও হতে পারে। তিনি হয়তো কিছুটা পিতৃসুলভ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেন আপনাকে। বাবারা যে-রকম মেয়ের ভুলত্রুটি, ভালো-মন্দকে খেয়াল করে, আপনার স্বামীও হয়তো তা-ই করছেন। কারণ যেটাই হোক, আপনি স্বামীর আচরণে প্রতিক্রিয়া দেখাবেন না। বরং স্বামীর আচরণ বদলানোর জন্যে আপনাকেই কাজ করে যেতে হবে। আপনি প্রো-একটিভ থাকলে এবং তার প্রতি বিরক্তিহীন মনোযোগ ও ভালবাসা অব্যাহত রাখলেই তা সম্ভব।

## পরিবার কোয়ান্টাম চেতনায় উদ্বুদ্ধ না হলে

**প্রশ্ন :** আমার স্ত্রীকে অনেক চেষ্টা করেও কোয়ান্টামে আনতে পারছি না, যেন কোয়ান্টামে আনা যায় সেজন্যে আপনার পরামর্শ চাই।

**উত্তর :** স্ত্রীকে কোয়ান্টামে আনতে হলে, কোয়ান্টামে এসে আপনার কী উপকার হলো, এটা স্ত্রীর সামনে খুব পরিষ্কার হতে হবে। আপনার মধ্যে যদি পরিবর্তন আসে, স্ত্রী অবশ্যই আসবে।

আপনি নামাজ পড়লেন, কিন্তু অন্যায় করা থেকে বিরত থাকলেন না, অন্যের ওপর জুলুম করলেন। এরকম হলে আরেকজন তো আপনার দ্বারা নামাজে উদ্বুদ্ধ হবে না। কোয়ান্টামেও বিষয়টি একই রকম। আপনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করলেন, কিন্তু আপনার জীবনাচারে কোনো পরিবর্তন এলো না। তাহলে আপনার কথায় তিনি কেন কোর্সে আসবেন?

কোর্স করার পরে আপনার জীবনদৃষ্টিতে যদি পরিবর্তন আসে, তখন আপনার পরিবার প্রভাবিত হবে। আপনার পরিবর্তন কতটুকু হচ্ছে, এটা আপনার স্ত্রী এবং আপনার পরিবারের চেয়ে অন্য কেউ ভালো বলতে পারবে না। কারণ আপনার আসল রূপটা প্রকাশ পায় পরিবারে। স্ত্রী যদি সার্টিফিকেট দেয় যে, আপনি ভালো মানুষ, আপনি আসলেই ভালো মানুষ। অতএব আপনার স্ত্রী এখনো যে কোর্স করছে না, এর কারণ হয়তো কোয়ান্টামে এসে আপনার জীবনে তেমন কোনো পরিবর্তন আসে নি।

কোয়ান্টাম চেতনার আলোকে নিজের মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে আসুন। নিজের মধ্যে যখন পরিবর্তন আনবেন, তখন চারপাশের মানুষ সেই পরিবর্তন দেখে কোয়ান্টামের প্রতি আগ্রহী হবে। আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি,

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তন এসেছে বলেই চারপাশের মানুষ কোয়ান্টামের প্রতি এত আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এই পরিবর্তনকেই আমরা জোরদার করতে চাই, বেগবান করতে চাই, সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে চাই।

**প্রশ্ন :** মনে অনেক কষ্ট। আমার মনের কষ্টের কারণে আমি আমার স্বামী এবং মাকে ক্ষমা করতে পারি না। তারা সারাক্ষণই কোয়ান্টামের বিরুদ্ধে অনেক আজেবাজে কথা বলে। এ-ক্ষেত্রে আমার করণীয় কী?

**উত্তর :** যত আজেবাজে কথা বলবে তত 'শোকর আলহামদুলিল্লাহ' বলবেন। তাহলে বকাবকি বন্ধ হয়ে যাবে। যদি জানতে চায়, শোকর আলহামদুলিল্লাহ কেন বলছ? বলবেন, যত গালিগালাজ করবে তত আমাদের সবার গুনাহ মাফ হতে থাকবে। স্বামীকে চা বানিয়ে খাওয়ান, মাকে কিছু পিঠা বানিয়ে খাওয়ান আর উৎসাহিত করুন যে, খাও এবং আরো বকো।

অর্থাৎ অন্যদের বকাবকি শুনে আপনি যেন নিষ্প্রভ হয়ে না পড়েন, বরং বকাবকি যেন আপনাকে সবসময় উজ্জীবিত করে। মনে করবেন, আমাকে গুরুত্ব দিচ্ছে বলেই বকছে। তাই উপভোগ করবেন এসব পরিস্থিতি।

একটা বিষয় সত্যি যে, শুরু থেকেই কোয়ান্টাম এসব পরিস্থিতিকে সহজভাবে নিয়েছে এবং উপভোগ করেছে বলেই এ পর্যন্ত আসতে পেরেছে। প্রত্যেক বকার উত্তরে যদি আমরাও বকাবকি করতাম, তাহলে যেখানে ছিলাম সেখানেই থাকতাম। আল্লাহর রহমতে আজ আমরা যে কাজগুলো করছি, এত ধরনের কল্যাণমূলক কাজ হয়তো করতে পারতাম না।

অতএব বকাবকি কিংবা এ ধরনের কোনো কথা বা আচরণ যেন আপনাকে উত্তেজিত না করে, অপমানিত না করে। আরেকজন দুর্ব্যবহার করেছে, ওটা তার সমস্যা। সে অনুশোচনা করবে, আপনি কেন অপমানিত বোধ করবেন? কেন দুঃখ পাবেন? আপনি তো গালি দেন নি।

এসব ঘটনা সবসময় সহজভাবে নেবেন, যেন এটা আপনাকে স্পর্শ না করে। কারণ ছোটখাটো বিষয় নিয়ে যদি আপনি লেগে থাকেন, বড় কাজ করবেন কখন? শরীরে কোনো ময়লা এসে লাগলে সেটা থেকে যত তাড়াতাড়ি মুক্ত হতে পারেন, তত ভালো। সেই ময়লা যেন আপনাকে স্পর্শ না করে। এসব থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় হলো, মন খারাপ হতে চাইলেই 'শোকর আলহামদুলিল্লাহ' বলা এবং তার জন্যে দোয়া করা। আর নিয়মিত মেডিটেশন করা, যাতে মনে কোনো আবর্জনা জমে না যায়।

**প্রশ্ন :** আমাদের দাম্পত্য জীবন ১৩ বছরের। আমার স্ত্রীর সাথে কদাচিৎ মনোমালিন্য হয়। সে খুব চুপচাপ, খুব বেশি আত্মকেন্দ্রিক। অনেকটা এ কারণেই কোর্স করিয়েছি। কিন্তু তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসে নি। একদিনের জন্যেও মেডিটেশন করে নি। অবশ্য কোয়ান্টামের প্রকাশনাগুলো পড়ে এবং কোয়ান্টামকে পছন্দ করে, কিন্তু সম্পৃক্ত হতে চায় না। আর একটি বিষয় প্রায়ই আমাকে বোঝাতে চায়, সে যেমন করে আমাকে ভালবাসে তেমন করে কারো স্ত্রী তার স্বামীকে ভালবাসে না। অথচ আমার পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, যদি তা-ই হয়, তবে আমার যৌক্তিক পছন্দ-অপছন্দগুলো তার বুঝে চলা উচিত। কিন্তু তার বেলায় তা দেখি না। তাছাড়া আমি তার ওপর রাগ করে দু-একদিন চুপচাপ থাকলে সে কিছুদিন ঠিক থাকে। আবার আমি স্বাভাবিক হলে সে আগের মতো হয়ে যায়। এ-ক্ষেত্রে 'রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন' সূত্রটি কাজ করে না। বরং উল্টোটি কাজ করে কেন?

**উত্তর :** স্ত্রী কোয়ান্টামকে পছন্দ করেন, কোয়ান্টামের প্রকাশনাগুলো পড়েন, আপাতত এটাই বা কম কী? তাকে এসব ব্যাপারে জোর করবেন না। আর ওনার এই চুপচাপ থাকা, নিজের মতো থাকা—এটাকে ওনার ব্যক্তিত্ব বলে মেনে নিন। কেউ কেউ এরকম হতেই পারে। মানুষের মধ্যে এই বৈচিত্র্য থাকবেই। সেজন্যেই আমরা মানুষ। তা না হলে তো সব রোবট হয়ে যেত। বাগানে শত ধরনের ফুল থাকে বলেই কিন্তু বাগান এত সুন্দর।

আপনার স্ত্রী যথার্থই বলেছেন, তিনি যেমন করে আপনাকে ভালবাসেন এরকম করে পৃথিবীর আর কেউ বাসবে না। কারণ তার মতো করে পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালা দ্বিতীয় কাউকে বানান নি। অতএব একজনের স্ত্রীর সাথে তো আরেকজনের স্ত্রীর ভালবাসার পার্থক্য হবেই।

আপনার পর্যবেক্ষণ হলো, আপনার যৌক্তিক পছন্দ-অপছন্দগুলো তিনি বুঝে চলেন না। এটা হতে পারে, এ ব্যাপারে তিনি হয়তো উদাসীন। কিন্তু আপনি যখন রাগ করছেন, তখন স্ত্রী কিছু সময়ের জন্যে একটু সিরিয়াস হচ্ছেন। কিছুদিন পর আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছেন। তার মানে এটা কিন্তু মন থেকে করা নয়। আপনার রাগ ভাঙানোর জন্যে, দেখানোর জন্যে করা। ভালবাসা থেকে না করলে এর মধ্যে তো কোনো আনন্দ নাই। রাগ না করেও যেদিন দেখবেন তিনি আপনার পছন্দ-অপছন্দকে গুরুত্ব দিচ্ছেন, সেদিন বুঝবেন, আপনি জিতে গেছেন।

একজন কর্মচারীকে যখন আপনি আদেশ করেন, তখন ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক কর্মচারী নির্দেশ পালন করে। আবার যখন রাগ করছেন, সে

খুব কাজ করছে—চাকরি যাওয়ার ভয়ে, আপনাকে ভালবেসে নয়। ভালবাসাটা আলাদা জিনিস। সেটা কোনোকিছু চায় না। ভালবাসা শুধু দিতেই চায়। আপনি যদি আপনার স্ত্রীকে ভালবাসেন, আপনি কখনো তার কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করবেন না। আপনি দিয়েই যাবেন। স্ত্রী দিলেন কি দিলেন না, এটা তার ব্যাপার। তাহলে দেখবেন, আপনি স্ত্রীকে প্রভাবিত করতে পেরেছেন। আপনার স্ত্রী যখন দেখবেন, আপনি তার পছন্দকে গুরুত্ব দিচ্ছেন, তখন তিনিও আপনার পছন্দকে গুরুত্ব দেয়া শুরু করবেন।

মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে তাকে নিয়ে আসুন। তাকে কত ভালবাসেন, এটা বোঝান। তারপরে বোঝান যে, এই যুক্তিসঙ্গত কাজগুলো যদি তুমি করতে, এই আচরণ যদি তুমি করতে, আমার খুব ভালো লাগত। সেইসাথে অনুভব করতে থাকুন, তিনি সেভাবেই সব করছেন। তাহলে অন্তর্জগৎ থেকে তার মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হবে, আপনিও তাকে বোঝাতে পারবেন।

**প্রশ্ন :** আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আমি একাই কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট। এখন আমি একা প্রো-একটিভ হয়ে কি পারিবারিক সম্প্রীতি বজায় রাখা সম্ভব? অথচ তার নেতিবাচক আচরণ সহ্য করা আমার জন্যে কষ্টকর।

**উত্তর :** আপনি স্বামীকে কোর্সের ব্যাপারে উৎসাহিত করবেন। এ ব্যাপারে আমরা দেখেছি যে, স্ত্রীরা খুবই সফল। ৯৯% ক্ষেত্রে স্ত্রীরা স্বামীকে কোর্সের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছেন। আসলে নারীরা স্বভাবজাতভাবে নরম। আর শক্তের চেয়ে নরমই প্রভাবিত করতে পারে বেশি। যেমন, পানি যে-কোনো জায়গা দিয়ে অনায়াসে চলে যেতে পারে। কিন্তু পাথর শক্ত হলেও তা পারে না; বরং ঘষা খেতে খেতে ক্ষয়ে যায়।

স্বামীদের ক্ষেত্রেও স্ত্রীকে উদ্বুদ্ধ করা সহজ। ভালো কাজে স্বামীর কাছ থেকে উৎসাহ পেলে স্ত্রীরা সহজেই সাড়া দেন। দাম্পত্য জীবন তো অল্প কদিনের জন্যে নয়। ৫/১০ বছর দেখুন। যদি প্রো-একটিভ থাকতে পারেন, আপনিই জয়ী হবেন। আমাদের সমস্যার সমাধান হয় না কেন? কারণ আমরা রাতারাতি পরিবর্তন চাই। তা না পেলে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেই। এই হালটা ছেড়ে দেবেন না, বিশেষত আপনজনের ব্যাপারে।

**প্রশ্ন :** আমার স্বামীকে মেডিটেশনের উপকারিতা কীভাবে বোঝাব? তিনি কোয়ান্টামের নাম শুনতে চান না। তা সত্ত্বেও আমি মেডিটেশন করছি। এতে কি আমি অপরাধ করছি?

**উত্তর :** এটা কেন আপনার মনে হলো? কোয়ান্টাম কি খারাপ কিছু? কোয়ান্টাম বলে—নিজের কল্যাণ করো, মানুষের কল্যাণ করো। ধর্ম যে নৈতিকতা ও কল্যাণের কথা বলে, কোয়ান্টাম সে কথাগুলোই বলে। আপনি মেডিটেশন কেন করছেন? নিজের প্রশান্তির জন্যে, নিজের কল্যাণ ও পরিবারের কল্যাণের জন্যে। কোয়ান্টাম চর্চা করে আপনি যদি সুস্থ থাকতে পারেন, পরিবারের মঙ্গল করতে পারেন, তাহলে তো এটা সওয়াবের কাজ।

আপনার স্বামী যেহেতু কোয়ান্টামের নাম শুনতে চান না—তাকে বিটা লেভেলে বোঝানোর দরকার নেই। স্বামীর সাথে কখনো বিতর্কে যাবেন না। মেডিটেশনে মনের বাড়ির কমান্ড সেন্টারে তাকে এনে বোঝাতে থাকুন যে, আমি তো এরকম সত্যের সন্ধান পেয়েছি। তুমিও আসো, তুমি অনেক উপকৃত হবে। স্ত্রী হিসেবে স্বামীর জন্যে দোয়া করুন। কারণ স্বামীকে সৎপথে আনার চেষ্টা করা আপনার জন্যে অবশ্য কর্তব্য।

আপনি নিয়মিত মেডিটেশন করুন। মেডিটেশন করার পর থেকে তার প্রতি আপনি আরো বেশি যত্নবান—এটা যেন আপনার স্বামী বুঝতে পারে এমন আচরণ করুন। বাস্তবে স্বামীকে শুধু ভালো বলুন। তার ভালো গুণগুলো তুলে ধরুন যে, তোমার মধ্যে এই এই ভালো গুণ আছে। সবসময় স্বামীকে তার প্রাপ্য সম্মান পুরোপুরি দেবেন। একবছর এ চর্চাটা করুন। দেখবেন, স্বামী আপনার আচরণে মুগ্ধ। অর্থাৎ বিতর্ক নয়, আপনার গুণ এবং ইতিবাচকতা দিয়ে স্বামীকে জয় করতে হবে।

**প্রশ্ন :** আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করেছি। কোর্স করার পর আমি প্রতিদিন মেডিটেশন করছি এবং কোয়ান্টামকে পুরোপুরি বিশ্বাস করছি। কিন্তু আমার স্ত্রী বিশ্বাস করছে না। কোয়ান্টামের কথাগুলো মানতে চায় না। তাকে বোঝাতে চাইলে রেগে যাচ্ছে। আমার কী করা উচিত?

**উত্তর :** স্ত্রীকে কখনো বোঝাতে যাবেন না। কারণ স্ত্রীর সাথে সম্পর্কটা বোঝানোর নয়। এই সম্পর্কটা হচ্ছে মমতার, ভালবাসার, প্রেমের। এই প্রেম যদি স্ত্রীকে প্রভাবিত করতে না পারে, তাহলে যত যুক্তি দিয়েই বোঝাতে যান না কেন, আপনি ব্যর্থ হবেন। বরং নিজের জীবনে কোয়ান্টামের শিক্ষা প্রয়োগের চেষ্টা করুন। যেমনটি আপনি বলছেন যে, প্রতিদিন মেডিটেশন করছেন, কোয়ান্টামকে পুরোপুরি বিশ্বাস করছেন।

এখন এই মেডিটেশন ও বিশ্বাসের প্রমাণ নিজের আচরণে দিতে হবে। যেমন, আপনি কি পুরোপুরি প্রো-একটিভ, বিনয়ী ও সদাচারী হতে পেরেছেন?

স্ত্রী রেগে গেলে আপনি কি সহজ থাকতে পারেন? তিনি চিৎকার করলে আপনি কি শান্ত থাকতে পারেন? যদি পারেন, তাহলে বুঝতে হবে, আপনি কোয়ান্টামকে বিশ্বাস করছেন।

অর্থাৎ এমনভাবে নিজেকে বদলে ফেলতে হবে যেন আপনাকে দেখেই সবাই মনে করে 'কোয়ান্টাম'। তাহলে আপনাকে দেখে চারপাশের মানুষ প্রভাবিত হবে। সবার শেষে প্রভাবিত হবে আপনার স্ত্রী। তিনি তখন ভাববেন, আচ্ছা, এত যখন সবাই বলছে, তাহলে দেখি তো!

তাছাড়া আপনি হয়তো কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের তৃতীয় দিন শেখা সূত্রটি অনুসরণ করছেন না। অর্থাৎ আপনি ঘর থেকে বের হওয়ার আগে এবং ঘরে ফিরে স্ত্রীকে 'আমি তোমাকে ভালবাসি' বলছেন না। যদি বলতেন তাহলে স্ত্রী নিজে তো আসতেনই, সাথে বান্ধবীদের নিয়ে আসতেন।

আর স্ত্রীর সাথে কখনো ঝগড়ায় যাবেন না, তর্কে যাবেন না। কারণ আমরা কোর্সেই বলি, স্ত্রীর সাথে বিতর্কে গিয়ে আপনি কোনোদিন জিততে পারবেন না। বিতর্কের ব্যাপারে নবীজীর (স) হাদীস খুব পরিষ্কার। বিতর্ক থেকে তিনি সবসময় বিরত থাকতে বলেছেন। তিনি বলেন, 'যখন কেউ ভুল বিষয়ে বিতর্ক করতে চায়, তখন সঠিক অবস্থানে থেকেও যে বিতর্ক এড়িয়ে যায় তার জন্যে আল্লাহ তায়ালা বেহেশতের প্রান্তে একটি ঘর বানিয়ে দেবেন। যে ব্যক্তি মিথ্যা পরিত্যাগ করে, এমনকি রসিকতা করেও মিথ্যা বলে না, তার জন্যে তিনি বেহেশতের মাঝখানে একটি ঘর বানিয়ে দেবেন। আর যে ব্যক্তি নিজেকে পরিশুদ্ধ করার জন্যে চেষ্টা করে, ভালো মানুষ হওয়ার জন্যে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে, তার জন্যে তিনি বেহেশতের শীর্ষে ঘর বানিয়ে দেবেন' [আবু উমামা (রা); *আবু দাউদ/ ৪৮০০*]।

অতএব সবসময় বিতর্ক এড়িয়ে যাবেন। বুদ্ধিমান মানুষ কখনো বিতর্কে লিপ্ত হয় না। আর স্ত্রীর সাথে বিতর্কে জড়ায় একমাত্র নির্বোধ।

**প্রশ্ন :** আমার স্বামী আমাকে অনেক ভালবাসে। কিন্তু আমার একটা কথাও শোনে না। কোয়ান্টামেও আসতে চায় না, শিক্ষাগুলোও মানতে চায় না। তার সাথে আমার কোনো ঝগড়া হয় না, কিন্তু অনর্থক চিৎকার-চেঁচামেচি করে। আমি যদি বলি হাদীসে আছে—যারা ভালো তারা স্ত্রীদের সাথে অনর্থক রাগারাগি করে না। স্ত্রীর সাথে রাগারাগি করলে আল্লাহ স্বামীর বেহেশতে যাওয়া আটকে দেবে। তখন সে বলে, বউয়ের সার্টিফিকেটে যদি বেহেশতে যেতে হয়, তাহলে ওই বেহেশতের দরকার নাই। এসব শুনলে আমার কষ্ট হয়। আমি কী করব?

**উত্তর :** সব কথা সবসময় বলতে হয় না। আপনি যদি স্বামীকে বলেন, আমার সার্টিফিকেট ছাড়া তুমি বেহেশতে যেতে পারবে না, তাহলে তো ওরকম জবাবই আসার সম্ভাবনা তৈরি হবে। সব কথা মুখে বলতে যাবেন না।

আপনি যেমনটা বললেন, আপনার স্বামী আপনাকে অনেক ভালবাসে, সে-ক্ষেত্রে স্বামীকে ছাড়া তো আপনিই বেহেশতে যেতে পারবেন না। আর যদি মনে হয়, আপনার সার্টিফিকেট না পেলে স্বামী বেহেশতে যেতে পারবেন না, আপনি তো এমনিই বলবেন যে, আল্লাহ যতগুলো সার্টিফিকেট লাগে পাঠাও, আমি সই করে দিচ্ছি।

তাই যখনই মেডিটেশনে বসে মনের বাড়ির কমান্ড সেন্টারে যাবেন, অন্তর থেকে তার জন্যে প্রার্থনা করবেন। যেহেতু স্বামী আপনাকে ভালবাসে এবং আপনিও তাকে ভালবাসেন, তাই আলফা লেভেলে কমান্ড সেন্টারে নিয়ে গিয়ে তাকে মমতা দিয়ে বোঝাতে থাকুন; তাকে মাথায় ভালো করে বরফ দিয়ে দেবেন আর অবলোকন করবেন যে, তার মাথা ঠান্ডা হয়ে গেছে।

আপনার স্বামী যদি রাগারাগি করে, আপনার চেহারার দিকে তাকিয়ে তিনি যেন রাগ করতেই ভুলে যান যে, এই মানুষটার ওপর আমি রাগ করছি! অর্থাৎ আপনাকে বুঝতে হবে, মমতা দিয়ে যা করা যায়, তা কখনো যুক্তি দিয়ে করা যায় না। মমতার সামনে মানুষ অত্যন্ত দুর্বল। আর কথা বলার তো সময় আছে, কৌশল আছে।

যে কারণে রসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, 'অন্যের বুদ্ধি-বিবেচনা বা চেতনার স্তর বুঝে কথা বলো' [আলী ইবনে আবু তালিব (রা); *বোখারী; হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী : ১৮০*]। অর্থাৎ কার সাথে কোন কথা বলতে হবে, এটা বুঝে কথা বলবেন। তাহলেই দেখবেন যে, আর সমস্যা হচ্ছে না।

**প্রশ্ন :** আমার স্বামী কোয়ান্টামে আসা পছন্দ করে, কিন্তু ঘন ঘন আসা পছন্দ করে না। এখানে না এলে আমার ভালো লাগে না। কী করতে পারি?

**উত্তর :** আপনার স্বামীকে কোয়ান্টামে আসতে উদ্বুদ্ধ করুন এবং তাকে সাথে নিয়েই বার বার আসুন। যখন তিনি কোয়ান্টামকে কাছ থেকে দেখবেন, তখন তার স্ত্রী যে ভালো একটা সঙ্ঘে আছে এ ব্যাপারে আশ্বস্ত হবেন।

**প্রশ্ন :** আমার ছেলে ও স্বামী দুজনই কোয়ান্টাম কোর্স করেছে। একজন নিয়মিত মেডিটেশন করে, আরেকজন নিয়মিত করে না। আমি ওদের জন্যে কী করতে পারি? আমাদের বাসার কোয়ান্টাম প্রি-সেলে আমার ছেলে আগে

অনেক সহযোগিতা করত। এখন বলে—আমি যাব না; কোয়ান্টামে নিজের টাকা খরচ করে অন্যের উপকারে কাজ করে কী লাভ? সে আমার কথা শুনতেও চায় না। আমি তাকে কী বলব?

**উত্তর :** স্বামী বা ছেলে যে-ই হোক, কারো ওপর কোনো কাজ আসলে চাপিয়ে দিয়ে হয় না। কাজের ব্যাপারে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হয় যে, মানুষের কল্যাণে কাজ করলে নিজের কল্যাণ হয় সবচেয়ে বেশি। তাই কোয়ান্টামে এসব সেবামূলক কাজ সে করছে সেটাতে তার উপকারই বেশি এবং কাজগুলো তাকেই দক্ষ করে তুলছে, তার মানসিক এবং সামাজিক ফিটনেস বাড়াচ্ছে। কোয়ান্টামে কাজ করে একজন মানুষ মূলত তার চলার পথটাকে আরো সহজ করে, সুন্দর করে। এটাই বোঝাতে হবে ধীরে ধীরে।

ছেলে কাজ করতে চায় না, না করুক কিছুদিন। তাকে এজন্যে চাপ দেয়ার দরকার নেই। মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে তাকে বোঝাবেন, বাস্তবে কিছু বলতে যাবেন না। কারণ মা-ছেলের সম্পর্ক। বাস্তবে তাকে বলতে গেলে সে ধরে নেবে, এই জায়গাটা হচ্ছে আপনাকে খ্যাপানোর একটা জায়গা; সে তত 'না' বলবে। তাই তাকে কাজের সুযোগ করে দেবেন, কিন্তু কাজ করতে বলবেন না। কাজ করার উপকারিতার কথা তাকে আলফা লেভেলে বোঝাতে শুরু করুন। আগে তার প্রতি আপনার বিরক্তিটাকে মন থেকে দূর করে দিন। দেখবেন, সে আবার কাজ করছে।

আমরা নিজেরা যদি কারো ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা রাখি, যে-কারো ব্যাপারেই হোক, সে কিন্তু এই নেতিবাচকতার দেয়াল ভেঙে আমাদের কাছে আসতে পারবে না। তাই আমরা সবসময় অন্যের ব্যাপারে ইতিবাচক ধারণা রাখব যে, সে ঠিক হয়ে যাবে। রসুলুল্লাহর (স) সবচেয়ে বড় গুণ ছিল, তিনি সবার ব্যাপারে ইতিবাচক ছিলেন এবং এ কারণেই এক এক করে সবাই তার বিশ্বাসের ছায়াতলে আসতে পেরেছে। অতএব কারো ব্যাপারেই নেতিবাচক ধারণা পোষণ করবেন না।

**প্রশ্ন :** আমার স্ত্রীকে আমি বললে মেডিটেশন করে, নিজে আগ্রহী হয়ে করে না। কীভাবে তাকে মেডিটেশনে আগ্রহী করব?

**উত্তর :** আপনি অনেক ভাগ্যবান। কারণ আপনি বললে তো তিনি মেডিটেশন করেন। অনেকে আছে যারা স্ত্রীর কারণে নিজের ঘরে নিজেই মেডিটেশন করতে পারে না। এমনকি সজ্ঞে আসতেও বাধার সম্মুখীন হয়। তবে এটাও

ঠিক যে, সৎকর্মে তাদেরকে কেউ দমিয়েও রাখতে পারে না। দীর্ঘসময় লুকিয়ে লুকিয়ে (!) তারা ঠিকই মেডিটেশন করে এবং সজ্ঞেও একাত্ম থাকে।

আপনি কী করবেন? সবর ও নিষ্ঠার সাথে আপনার কাজগুলো করে যাবেন। সাদাকায়নে তাকে সাথে নিয়ে আসবেন এবং মেডিটেশন তাকে নিয়ে একসাথে করবেন। অর্থাৎ প্রত্যেকটা ভালো কাজে স্ত্রীকে অংশীদার বানিয়ে নেবেন। সুন্দর করে মমতা দিয়ে তাকে বলবেন, তোমাকে ছাড়া আমার ভালো লাগে না। সব ভালো কাজ তুমিসহ করতে চাই।

স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে তোমাকে সবসময় পাশে পেতে চাই, তাহলে কোন স্ত্রী প্রত্যাখ্যান করবে? দেখা যাবে যে, আপনার মনোযোগ পাওয়ার জন্যে হলেও তিনি পাশে থাকছেন। কিছুদিন পর আশা করা যায় যে, এটা তার অভ্যাসে পরিণত হবে। একটা সময় আসবে তিনি ভেতর থেকে অনুভব করবেন মেডিটেশনের উপকার ও কল্যাণ। কখন যে উপলব্ধির মুহূর্ত আসবে কেউ জানে না। সেই উপলব্ধি যখন আসবে তাকে আর বলতে হবে না, তিনি তখন নিজেই সব করবেন।

**প্রশ্ন :** শ্বশুরবাড়ির কেউ কোয়ান্টাম পছন্দ করে না। আমি প্রোগ্রামে আসতে চাইলে শাশুড়ি বাধা দেন, রাগ করেন। অথচ নিয়মিত কোয়ান্টামে এলে আমি শারীরিক-মানসিকভাবে অনেক ভালো থাকি। কী করতে পারি?

**উত্তর :** প্রথমত, শাশুড়ির সাথে কোনোরকম বিতর্ক কিংবা দ্বন্দ্বে জড়াবেন না। দ্বন্দ্বে জড়ায় বোকারা। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে আমরা বলি—যে সম্পর্ক ছিন্ন করা যায় না, সেই সম্পর্কের মাঝে কখনো দেয়াল তুলবেন না। দ্বিতীয়ত, বাধা দেয়াটাকে স্থায়ী বাস্তবতা মনে করবেন না।

আপনি সবর করুন এবং আপনার প্রো-একটিভ আচরণ দিয়ে শাশুড়িকে জয় করতে চেষ্টা করুন। আন্তরিকভাবে তার যত্ন নিন। মমতা দিয়ে তার সেবা করুন। মমতার ভাষা সবাই বোঝে। ধীরে ধীরে শাশুড়ির মনে আপনার জন্যে স্থান তৈরি হবে। তখন আপনি কিছু বোঝালে তিনি ঠিকই বুঝতে চাইবেন। কারণ মানুষ যাকে পছন্দ করে তার অনেক কিছুই সহজে মেনে নেয়। কিন্তু যদি পছন্দ না হয়, ভালো কথাও বুঝতে চায় না।

তাছাড়া সব কথা সবসময় বলাও যায় না। একজন হয়তো খুব রেগে আছে। এমন সময় যদি তাকে বলেন 'রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন'—তার মেজাজ আরো খারাপ হয়ে যাবে। কারণ তখন তো কথাটা বোঝার মতো অবস্থা তার নেই।

শাশুড়ি যে বাধা দিচ্ছেন, এজন্যে আপনার মনে যেন বিরক্তি না আসে। কারণ তার আচরণে প্রভাবিত হয়ে আপনার মনে যদি রাগ-ক্ষোভ জমে, তাহলে তাকে কখনোই প্রভাবিত করতে পারবেন না। বরং আপনার শান্তি নষ্ট হবে। মনের আবর্জনা থেকে অসুস্থতার সম্ভাবনা তৈরি হবে।

অতএব আপনি যে শাশুড়িকে শ্রদ্ধা করেন, এটা তাকে বুঝতে দিন। শাশুড়ির সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা অব্যাহত রাখুন। অস্থির হবেন না। কারণ এটা সারাজীবনের ব্যাপার। কোয়ান্টামে এসে যে আপনি উপকৃত হচ্ছেন, আপনার আচরণে তা প্রকাশ পেতে দিন। আপনার ভালো থাকার মাত্রা বাড়ছে—এটা তার মনের অবস্থা বুঝে সময়-সুযোগমতো বলুন। মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারেও বোঝাতে থাকুন।

দেখবেন, একসময় শাশুড়ি নিজেও কোয়ান্টামের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবেন। অতএব সময় নিন। ধৈর্যের সাথে আপনার করণীয় করে যান। আজ কাল বা পরশু, আপনার ইতিবাচক প্রচেষ্টার জয় হবেই।

**প্রশ্ন :** মা-বাবা সন্তানের প্রাতিষ্ঠানিক খরচ অনায়াসে বহন করেন, কিন্তু সন্তান যখন হক্কুল ইবাদের জন্যে টাকা চায়, তখন তারা এড়িয়ে যান। সে-ক্ষেত্রে সন্তানের কী করণীয়? এটা কি মা-বাবার অবিদ্যা নয়?

**উত্তর :** টাকা চাইলাম, মা-বাবা দিলেন না, অবিদ্যা হয়ে গেল? এ চিন্তাটা সঠিক নয়। আপনার ইবাদত/ উপাসনা কি আপনার মা-বাবা করে দিলে হবে? আপনার নামাজ তো আপনাকেই পড়তে হবে। আপনার রোজা আপনাকেই করতে হবে এবং এর উপকারও আপনার। তেমনি আপনার দান আপনাকেই করতে হবে।

অতএব মা-বাবার টাকায় দান করার পরিবর্তে বরং নিজে উপার্জন করে অথবা পকেটমানি থেকে সঞ্চয় করে হক্কুল ইবাদ করুন। এটা সবচেয়ে ভালো, কারণ এতে আপনি স্বাবলম্বী হবেন। আয় না থাকলে ব্যয় কমিয়ে হলেও দান করুন। শুধু অর্থ কেন, নিজের মেধা, শ্রম এবং সময় আপনি সঙ্ঘে দান করতে পারেন। যত দান করবেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার সবকিছুতেই একটা বরকত চলে আসবে।

আর হক্কুল ইবাদের ব্যাপারে মা-বাবাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, তারাও যেন নিয়মিত দান করতে পারেন। কারণ দানের বরকতে তারা ভালো থাকবেন, তাদের পাপমোচন হবে, পরিবারে শান্তি থাকবে। তাই তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবেন এবং দোয়া করবেন যেন তারা সঙ্ঘবদ্ধ দানের সাথে থাকতে পারেন।

**প্রশ্ন :** আমি বাসায় মেডিটেশন করলে আমার স্ত্রী রাগ করে। কোয়ান্টামের প্রোগ্রামে এলেও রাগ করে। আমার করণীয় কী?

**উত্তর :** যত বার রাগ করবে তত বার রাগ ভাঙাবেন। আপনার করণীয় হলো, কখনোই রি-এক্ট না করা। আপনারা জানেন—একবার নবীজী (স) কাবা শরীফে নামাজ পড়ছিলেন। সেজদারত অবস্থায় তাঁর পিঠে উটের পচা নাড়িভূঁড়ি ফেলেছে কয়েকজন সত্য অস্বীকারকারী। ওজন এত বেশি যে, তিনি সেজদা থেকে মাথা তুলতে পারছেন না। মা ফাতেমা কাঁদতে কাঁদতে সেসব আবর্জনা সরালেন।

এত নির্যাতনের পরও নবীজী (স) কি আল্লাহকে সেজদা দেয়া বন্ধ করেছেন? অথবা তাদের ওপর কি রাগ করেছেন বা অভিশাপ দিয়েছেন? তাদেরকে পথ দেখানোর কাজ কি বন্ধ করেছেন? কোনোটাই করেন নি। তিনি বার বার ক্ষমা করেছেন এবং তাঁর কাজটুকু আন্তরিকভাবে করে গেছেন।

অতএব আমাদেরকেও নবীজীর (স) উম্মত হিসেবে এভাবে সর্বাবস্থায় প্রো-একটিভ থাকাটা শিখতে হবে। কারো আচরণে কখনো বিরক্ত হবেন না, রাগ করবেন না। রাগ করলে আপনি হেরে যাবেন। বরং উপভোগ করবেন আনন্দ করবেন, হাসবেন। আর স্ত্রীর সামনেই দোয়া করবেন যে, 'হে আল্লাহ! আমাকে সৎকর্মে বাধা দেয়ার জন্যে আমার স্ত্রীকে শাস্তি দিও না। তাকে মাফ করে দিও।' যতবার বাধা দেবে ততবার এই কথা বলবেন।

ভালো কিছু করতে গেলে কখনো বাধার মুখে থেমে যাবেন না। প্রো-একটিভ থেকে হাসিমুখে আপনার কাজটুকু করে যাবেন। মেডিটেশনও নিয়মিত করবেন। কোয়ান্টামে একাত্ম থাকবেন। তাহলে আপনি নিজে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং স্ত্রীকেও আপনার প্রো-একটিভ আচরণ দিয়ে ধীরে ধীরে জয় করতে পারবেন।

## পারিবারিক দুর্ভোগ ॥ কারণ যখন ঋণ

**প্রশ্ন :** আমি এবার এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছি। আমার বাবা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। মূলধন নেই বলে তিনি এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা করছেন। কিছুদিন ধরে দেখছি, ঋণশোধ করা নিয়ে ঝামেলা ও টেনশনের ফলে আমাদের পরিবারে অশান্তি বেড়েছে। আগের সেই সুখ হারিয়ে গেছে। এই ঋণ অভিশাপ হয়ে পড়েছে আমাদের ঘরে। এখন আমি কী করতে পারি?

**উত্তর :** ঋণ মানুষকে সবসময় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে রাখে। ঋণশোধ না করে মারা গেলে পরকালের শাস্তি তো আছেই, ইহকালেও শান্তি থাকে না। পাওনাদারের টাকা পরিশোধের চাপে ব্যক্তির ঘুম যেমন হারাম হয়ে যায়, তেমনি পারিবারিক সুখ এবং সম্মানও কমে যায়। কারণ ঋণের সাথে সুদ জড়িত এবং এই সুদের হার অনেক বেশি হয়ে থাকে। আয়ের সাথে সুদ জড়িয়ে গেলে তাতে কোনো বরকত থাকে না। ভালোভাবে হিসাব করলে বুঝতে পারবেন, আপনার বাবা যা লাভ করেন তার সিংহভাগ চলে যায় সুদের পেছনে। অথচ আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন। আর নবীজী (স) ঋণ থেকে পানাহ চেয়ে সবসময় দোয়া করতেন।

সনাতন হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রিষ্টান ধর্মেও ঋণকে একটি জঘন্য পাপাচার রূপে অভিহিত করা হয়েছে এবং ঋণ যে মানুষের জীবনকে দুর্দশাগ্রস্ত করে তোলে, সেটা বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত খ্রিষ্টান যাজক বা সন্তরা ঋণকে নিকৃষ্ট পাপাচার হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বাইবেলে ঋণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ঋণ মানুষকে কী পরিমাণ দুরাবস্থায় নিয়ে যায় সেটাও খ্রিষ্টান সেইন্টরা সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছেন। এই ঋণ এবং দাসত্ব হলো সমার্থক শব্দ—এটা খ্রিষ্টান সেইন্টদের বক্তব্য।

খাতকের অর্থাৎ ঋণী ব্যক্তির অবর্ণনীয় অবস্থা বোঝাতে গিয়ে ৩৬৫ খ্রিষ্টাব্দে সেইন্ট বাসিল লিখেছেন, ‘প্রতিটি দিন এবং রাত খাতকের জন্যে এক দুঃসহ যন্ত্রণা। তার জীবন হয়ে যায় নিদ্রাহীন। সে সবসময় অনিশ্চয়তায় ভুগতে থাকে। যখন মানুষের সামনে যায়, সে লাঞ্ছিত হয়। যখন সে ঘরে থাকে, তখন সে চৌকির নিচে লুকিয়ে থাকে। দরজায় প্রত্যেকটি অপ্রত্যাশিত নক বা ঠকঠকানিতে সে চমকে ওঠে যে, এই বুঝি পাওনাদার এলো। রাতে তার ঘুম ভেঙে যায় দুঃস্বপ্নে যে, পাওনাদার বোধহয় তার বালিশের পাশেই এসে দাঁড়িয়েছে।’

সেইন্ট অ্যাম্ব্রোস ৩৮০ খ্রিষ্টাব্দে বলেছেন যে, ঋণগ্রস্ত পিতারা তাদের সন্তানদেরকে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছে আর ঋণী ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে আত্মহত্যা করছে। এই কারণে তিনি তার লেখনীতে বলেছেন, সুদি ব্যবসা ডাকাতি, এমনকি খুনের সাথে তুলনীয়। অর্থাৎ সুদের বা ঋণের ব্যবসা যারা করেন, তা খুন বা ডাকাতির চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

আমরা সবসময় বলেছি যে, ঋণ একটি অভিশাপ—হোক তা ব্যক্তিজীবনে বা জাতির জীবনে। ঋণ সর্বযুগেই ব্যবহৃত হয়েছে একজন মানুষকে দাস বানিয়ে রাখার ফাঁদ হিসেবে। ঋণ মানুষের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেয়। ধ্বংস করে তার নৈতিক চরিত্র ও দৃঢ়তাকে। পাঁচ হাজার বছরের

ইতিহাসে দেখা যায়, প্রতিটি জাতি পতনের আগে ঋণ জর্জরিত ছিল। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, যে পরিবারে একবার ঋণ ঢোকে, সে পরিবারের সুখ-শান্তি নষ্ট হয়ে যায়।

আমেরিকান অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক স্টিভ এইচ. হ্যাঙ্কে দুঃখী দেশের একটি তালিকা করেছেন, যার নাম হ্যাঙ্কে'স অ্যানুয়াল মিজারি ইনডেক্স (HAMI)। জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত অর্থনীতির এই অধ্যাপক ২০২২ সালে যে মিজারি ইনডেক্স করেছেন, তাতে পৃথিবীর ১৫৭টি দেশের হিসাব নেয়া হয়েছে। এই মিজারি ইনডেক্সের ইন্টারেস্টিং দিক হচ্ছে, দুঃখী মানুষের দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান অনেক পেছনে। অর্থাৎ আমরা সুখী। এই তালিকায় বেলজিয়াম কানাডা আয়ারল্যান্ড স্পেন ইতালি এবং সুইডেনের চেয়েও সুখী দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত পাকিস্তান মিয়ানমার শ্রীলঙ্কা নেপাল, এদের চেয়েও আমরা সুখী। অর্থাৎ এই দেশগুলো আমাদের চেয়ে দুঃখী।

হ্যাঙ্কের রিপোর্ট অনুযায়ী, সুখী মানুষের তালিকায় ওপরের দিকে আছে সুইজারল্যান্ড। এর বড় কারণ হলো, সুইজারল্যান্ড ডেট ব্রেক বা ঋণ বিরতি দিয়েছে। মানে তারা ঋণ দিচ্ছে না, কাউকে ঋণ করতে বা ক্রেডিট কার্ডে কিনতে উৎসাহিত করছে না। গত দুই দশকে তাদের ঋণ করার প্রবণতা নিম্নমুখী। ফলে তাদের ঋণ নেয়ার পরিমাণ ক্রমাগত কমে যাচ্ছে এবং তারা সুখী মানুষের দেশের তালিকায় সামনের কাতারে চলে আসছে। অন্যদিকে গত দশকে ইউরোপ ও আমেরিকার ঋণ করার পরিমাণ ঊর্ধ্বমুখী। ফলে আমেরিকা সুখী মানুষের তালিকায় সামনে আসতে পারছে না।

অতএব ঋণ করার ব্যাপারে সবসময় সচেতন থাকতে হবে। আপনি যেহেতু জানলেন, এখন আপনার দায়িত্ব হচ্ছে আপনার বাবাকে সচেতন করে তোলা। তাকে উদ্বুদ্ধ করুন ব্যবসায় কোনো ঋণ না রাখতে। প্রয়োজনে তিনি আরো ছোট পরিসরে ব্যবসা শুরু করতে পারেন, যাতে লাভটা পুরোপুরি নিজের থাকে। এজন্যে বাবাকে ব্যবসায় মনোযোগী হতে উৎসাহ দিন এবং তার ঋণমুক্তির জন্যে আপনি দোয়া করুন।

**প্রশ্ন :** আমার স্ত্রীর পরিবারে অনেকের গাড়ি আছে। তাদের কাছে আমাদের স্ট্যাটাস বাড়ানোর জন্যে সে আমাকে চাপ দিচ্ছে ব্যাংক লোনে গাড়ি কিনতে। তার মতে, প্রতিমাসে কিস্তি দিলে একসময় ঋণশোধ হয়ে যাবে। আমার কথা হলো, নিজের টাকায় কেনার সামর্থ্য হলে আমি অবশ্যই কিনে দেবো। কিন্তু ঋণ করে কিনব না। কিস্তির ঝামেলাটা সে বুঝতেই পারছে না। এটা নিয়ে

আমাদের মধ্যে মনোমালিন্য হচ্ছে। সে কয়েকবার গালিগালাজও করেছে আমাকে। তবুও আমি চুপ করে হজম করছি। নিজেকে শান্ত রাখার জন্যে মনে মনে বলি, এখন তো স্ত্রী গালি দিচ্ছে, সময়মতো কিস্তি পরিশোধ করতে না পারলে তো গালি অপমান মামলা সবই জুটবে। তার চেয়ে এই গালিই ভালো। আমার করণীয় কী? আমি কি ঋণ নিয়ে স্ত্রীকে গাড়ি কিনে দেবো, নাকি ধৈর্য ধরব?

**উত্তর :** পরিবারে ঋণ এবং সুদ ঢুকলে কী স্ট্যাটাস বাড়বে? বরং জীবনের সুখ ও বরকত দুটোই নষ্ট হবে। তাই আপনি সঠিক কাজটিই করছেন। যা কিনতে হয় উপার্জন করে কিনবেন, ঋণ করে নয়। ঋণ করে ভোগ্যপণ্য কেনাটা আত্মমর্যাদাবোধের চরম অবমাননা। এতে করে আপনি কনজ্যুমার থেকে ঋণদাসে রূপান্তরিত হবেন। পুঁজিবাদের নিয়মই হচ্ছে এটা। তখন সুদ দিতে গিয়ে গুণতে হবে অতিরিক্ত অনেকগুলো টাকা। দিতে না পারলে গালি অপমান মামলা সবই জুটবে। এই পণ্যঋণ একজন মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় আজাব।

ব্রিটেনের বৃহত্তম সামাজিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল সেন্টার ফর সোশ্যাল রিসার্চের সমীক্ষা অনুযায়ী, ইংল্যান্ডে প্রতি বছর এক লাখেরও বেশি মানুষ ঋণের ধকল সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার চেষ্টা করে।

আমেরিকায় বিবাহবিচ্ছেদের অন্যতম প্রধান কারণ ঋণ। ঋণকে মার্কিন সমাজবিজ্ঞানীরা তাই বলছেন, সম্পর্কের ঘাতক। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিশ্বের অন্যতম প্রধান ব্যবসা ও অর্থনীতি বিষয়ক সংবাদমাধ্যম সিএনবিসির গবেষণা প্রতিবেদনে (৬ নভেম্বর ২০২৫) দেখা গেছে, ৫৪% মানুষ মনে করেন, বিবাহবিচ্ছেদের একটি বড় কারণ হলো সঙ্গীর ঋণ।

আমেরিকান ব্যাংক্রাপ্টসি ইনস্টিটিউটের মতে, ঋণের কারণে ব্যক্তি তার পরিবার, আত্মীয়স্বজন কিংবা বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকেও মুখ লুকিয়ে চলে। ফলে তারা পরিবারের সদস্যসহ আপন মানুষগুলোর কাছ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাদের দাম্পত্য জীবনে দেখা দিতে পারে হতাশা, বিষণ্নতা ও মানসিক চাপ। এই চাপে সম্পর্কে ঘটতে পারে বিচ্ছেদও। অর্থাৎ ঋণ শুধু অর্থনৈতিক সমস্যা নয়, ঋণ মানুষের সম্পর্কে ফাটল ধরানোর পেছনে একটি বড় কারণ। ঋণের কারণে দাম্পত্য কলহ থেকে শুরু করে ডিভোর্স পর্যন্ত হতে পারে।

নরওয়ের প্রখ্যাত নাট্যকার হেনরিক ইবসেন-এর লেখা নাটক আ ডলস হাউস বা পুতুলের সংসার। এটি বিশ্বসাহিত্যের সবচেয়ে আলোচিত ও মঞ্চস্থ নাটকগুলোর একটি। নারীর স্বাধীন সত্তার গুরুত্বকে সার্থকভাবে তুলে ধরার

জন্যে বিখ্যাত হলেও নাটকটির মূল বিষয় ছিল পণ্যাসক্তি এবং ঋণ। এর মূল চরিত্র নোরা কিন্তু ঋণ করেছিল কোনো মৌলিক প্রয়োজনে নয়, বরং মানুষকে দামি উপহার দিয়ে নিজের স্ট্যাটাস বাড়াতে কিংবা বিদেশ ভ্রমণের মতো বিলাসী চাহিদা মেটাতে। একপর্যায়ে সে ঋণশোধের চাপ, স্বামীর মানসিক নির্যাতন ও সম্মানহানির ভয়ে বিপর্যস্ত হয়ে আত্মহত্যা করার কথাও ভাবে। শেষ পর্যন্ত তিলতিল করে গড়া সংসার ফেলে চলে যেতে হলো তাকে। নাট্যকার ইবসেন তাই বলেছেন, ঋণ যে পরিবারে ঢোকে, সে পরিবারের সুখ এবং শান্তি সবই বিনষ্ট হয়ে যায়।

আরেকটি দিক হলো, ঋণ যারা দেয়, তারা মূলত তাদের লাভের জন্যেই দেয়। আপনার স্ত্রী যেমন লোন নিয়ে গাড়ি কিনতে বলছেন, তেমনি ঋণদাতারাও গাড়ির চাবিটা আপনার সামনে ঝুলিয়ে রাখবে। পারলে তৎক্ষণাৎ জামাই আদরে গাড়ির চাবিটা আপনাকে দিয়ে দেবে তারা। কারণ ঋণ দিতে পারাটা তাদের জন্যে লাভজনক। কিন্তু গ্রহীতার ভোগান্তি তো শুরু হয় কিস্তি দিতে গিয়ে এবং কোনো কারণে ঋণশোধ করতে না পারলে।

ক্রেডিট কার্ড কোম্পানিগুলোর মূল লক্ষ্যই হচ্ছে, বিলাসী পণ্যসামগ্রী বাকিতে কিনতে অভ্যস্ত করা। কারণ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যগুলোর জন্যে কাউকে ঋণের দ্বারস্থ হতে হয় না। ঋণ সবসময় দেয়া হয় বিলাসী ভোগ্যপণ্য (স্মার্ট টিভি, স্মার্টফোন, হোম থিয়েটার, এসি, স্মার্ট ডোর সিকিউরিটি সিস্টেম, গেমিং ল্যাপটপ, ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি) কেনার জন্যে, যাতে সামর্থ্য না থাকলেও ক্রেডিট কার্ডে তা বাকিতে কেনা যায় এবং কিস্তি শোধ করতে মূল দামের কয়েকগুণ বেশি টাকা দিতে হয়।

সুদ-সর্বস্ব ঋণ এবং কিস্তির এই চক্র সবসময় মানুষের সর্বনাশ করে। কারণ ঋণের চক্রটাই এমন যে, তা কখনো শেষ হতে চায় না। মহাজনী ঋণ হোক বা ক্ষুদ্রঋণ, বন্ধকী ঋণ হোক বা ফ্ল্যাট-গাড়ির ঋণ—কোনো ঋণেই 'আসল' সহজে শোধ হতে চায় না; শুধু সুদ গুণে যেতে হয় দীর্ঘদিন ধরে।

কীভাবে? ধরুন, ১ জানুয়ারি আপনি ৫০ হাজার টাকা দামের একটা ওয়াশিং মেশিন কিনলেন, ক্রেডিট কার্ডে পেমেন্ট করলেন। ক্রেডিট কার্ডের নিয়ম হচ্ছে, গ্রেস পিরিয়ডের মধ্যে পুরো টাকা শোধ করে দিলে কোনো সুদ নেই। গ্রেস পিরিয়ড ১৫–৪৫ দিন ব্যাংকভেদে ভিন্ন হয়। ধরা যাক, গ্রেস পিরিয়ড ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত। এই পিরিয়ডে এক টাকা বাকি থাকলেও ৩১ জানুয়ারি থেকে প্রতিদিনের সুদ হিসাব হবে।

মানুষের একটা সাধারণ স্বভাব হচ্ছে, না চাইলে আমরা পাওনা টাকা পরিশোধ করতে চাই না। এখানে ক্রেডিট কার্ডের মহাজনরা তো আসল টাকা

চাইবেও না, বরং ওরা চায় শুধু সুদ। বলবে যে, টেনশনের কিছু নেই। গ্রেস পিরিয়ডে পুরো টাকা পরিশোধের চাপ নেই। আপনি মিনিমাম এমাউন্ট পে-এবল বা মিনিমাম ডিউ পলিসিতে ধীরে ধীরে দাম পরিশোধ করবেন। মাসে ৫% দিলেই হবে। কোনো স্ট্রেস নেই আপনার! কিন্তু নিখুঁতভাবে হিসাব করলে বুঝবেন এই মিনিমাম পে-এবল অ্যামাউন্ট/ ডিউ পলিসিতে আপনার কাছ থেকে কমসে কম দ্বিগুণ টাকা তারা আদায় করে নেবে!

কীভাবে? তারা বলবে, প্রথম মাসে ৫০ হাজার টাকার ৫% (মিনিমাম), মাত্র ২,৫০০ টাকা জমা দিতে হবে। আপনি ভাবছেন ৫০,০০০/২,৫০০ = ২০ মাসে টাকা শোধ করে ফেলব। এই ২০ মাস তো আমি পুরোদমে ওয়াশিং মেশিনটা ব্যবহার করব। এটা মোটেই এত সরল হিসাব নয়! বাংলাদেশে ক্রেডিট কার্ডে সুদের হার প্রতিষ্ঠান ভেদে সাধারণত বছরে ১৮%-২৭% পর্যন্ত হয় (APR= Annual Percentage Rate)। আমরা হিসাবের সুবিধার জন্যে ২৪% ধরি! এই সুদ আবার প্রয়োগ হয় দৈনিক হিসাবে! ২৪% বার্ষিক সুদ ধরে হিসাব করলে দৈনিক ০.০৬৫% সুদ! গ্রেস পিরিয়ড মিস করলে পণ্য ক্রয়ের দিন থেকেই সুদ ধরা হবে।

অর্থাৎ প্রথমেই ২,৫০০ টাকা থেকে ওই মাসের সুদ কেটে নেবে (৫০,০০০ x ০.০৬৫% x ৩০) = ৯৭৫ টাকা। এই সুদের ওপর সরকারি ট্যাক্স (১৫%) আলাদাভাবে যোগ হবে। ব্যাংকের আরো যা যা চার্জ আছে, বিভিন্ন ব্যাংকের পলিসি অনুযায়ী সেগুলোও কিন্তু এটার মধ্যে থাকবে। আমরা হিসাবের সুবিধার জন্যে শুধু সরকারি ট্যাক্স ধরি। (৯৭৫ + ৯৭৫ x ১৫%) = ১,১২১.২৫ টাকা সুদ কেটে নিলে আসল শোধ হবে (২,৫০০–১,১২১.২৫) = ১৩৭৮.৭৫ টাকা মাত্র।

পরের মাসে (৫০,০০০–১৩৭৮.৭৫) = ৪৮,৬২১.২৫ টাকার ওপর আবার মিনিমাম ৫% কাটবে ২,৪৩১.০৬৩ টাকা। যার মধ্যে ১৫% ভ্যাটসহ সুদ{(৪৮,৬২১.২৫ x ০.০৬৫% x ৩০) = ৯৪৮.১১ + ৯৪৮.১১ x ১৫%} = ১০৯০.৩৩ টাকা।

দ্বিতীয় মাসে আসল কাটবে (২৪৩১.০৬৩–১০৯০.৩৩) = ১,৩৪০.৭৩ টাকা। এভাবে সুদ দিতে দিতে মূল টাকা শোধ করতে আপনার লেগে যাবে ৮/১০ বছর। আর সুদ-সহ এসময় আপনাকে শোধ করতে হবে আসল মূল্যের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ টাকা!

আরো একটা ফাঁদ হচ্ছে কিস্তি বা EMI। লেখা থাকবে ০% EMI, পরিশোধ করুন ৬/১২ মাসের কিস্তিতে। যেগুলোতে ১২%-১৫% EMI লেখা থাকে, সেগুলোতে আপনি তো বুঝবেন যে, প্রতি কিস্তিতে একটা নির্দিষ্ট

পার্সেন্ট সুদ নেবে। যেগুলোতে বলা হয় ০% EMI, সেটা কিন্তু একটা ফাঁদ। কারণ প্রতি কিস্তিতে ব্যাংকের প্রসেসিং ফি আছে, সেই ফি-এর ওপর আবার ট্যাক্স আছে। হিসাব করলে দেখা যাবে ০% EMI-তে নিলে ক্যাশ দিয়ে নেয়ার চেয়ে কয়েক হাজার টাকা বেশি যাচ্ছে। এগুলো আপনি প্রতি কিস্তিতে ভাগে ভাগে দিচ্ছেন। কিন্তু দোকানদার আপনাকে বলবে, ক্যাশে নিলে ডিসকাউন্ট দিয়ে এত টাকা! কার্ড পেমেন্টে এত টাকা! এই ডিসকাউন্ট আসলে ওই সুদটুকুই!

তো কী করবেন? আগে উপার্জন করবেন। পুরো টাকা জমিয়ে তারপর কিনবেন। কিস্তি বা ক্রেডিটে কিনবেন না। মহাজনদের ফাঁদে পা দেবেন না! নিজের জন্যে বা স্ত্রী/ সন্তানের কোনো ইচ্ছাপূরণের জন্যেও কখনো ঋণ করবেন না। কারণ আপনার ঋণের জবাব আপনাকেই দিতে হবে।

রত্নাকর দস্যুর ঘটনা তো জানেন—তিনি ডাকাত থেকে বাল্মীকি হলেন কীভাবে? যখন ঋষি তাকে বললেন, তুমি যে ডাকাতি করছ, তোমার পরিবার কি তোমার এই পাপের ভাগী হবে? রত্নাকর বলে যে, কেন হবে না? আমি তাদের ভরণপোষণের জন্যে এটা করছি। ঋষি বললেন, যাও, তাদেরকে জিজ্ঞেস করে এসো। এর পরের ঘটনা হলো—তাকে বিস্মিত করে দিয়ে তার পরিবার বলল, আমরা কেন তোমার পাপের ভাগী হবো? তোমার পাপ তোমার। আমাদের ভরণপোষণ করা তো তোমার কর্তব্য। তুমি কীভাবে কর্তব্য পালন করবে সেটা তোমার বিষয়।

অর্থাৎ কেউ আপনার পাপের বোঝা বহন করবে না। কোরআনে আল্লাহ বলেন, '(মহাবিচার দিবসে) কেউ কারো পাপের বোঝা বইবে না। কারো পাপের বোঝা ভারী হলে, সেই বোঝা বহন করার জন্যে কাউকে ডাকলেও সে এগিয়ে আসবে না, এমনকি কোনো নিকটাত্মীয়ও না।' (সূরা ফাতির : ১৮)

অতএব উপার্জন না করে সুদী ঋণের পাপে জড়াবেন না, পরিবারে অশান্তি ডেকে আনবেন না। যে জীবনে ঋণ এবং কিস্তি ঢুকবে, সেই জীবন নষ্ট হয়ে যায়, যেমন করে ঘুণ একটা কাঠকে নষ্ট করে ফেলে। তবে এটাও খেয়াল রাখবেন যে, স্ত্রীকে কখনো রাগের মাথায় 'না' বলতে হয় না।

আমরা কোয়ান্টাম মেথড কোর্সেও বলি যে, স্ত্রীকে সবসময় 'হাঁ' বলবেন। কারণ সম্পর্কটা আবেগের। ঋণের বা কিস্তির ফাঁদটা কোথায় সেটা পরে কোনো সুন্দর মুহূর্তে বোঝাবেন। মেডিটেশনে মনের বাড়ির কমান্ড সেন্টারে স্ত্রীকে এনে মিষ্টি ভাষায় কথাগুলো বলবেন। তাকে বোঝাবেন আর আপনি ধৈর্যের সাথে ঋণ না করার সিদ্ধান্তে অটল থাকবেন। তাহলে আপনি বেঁচে যাবেন ঋণের গজব থেকে।

**প্রশ্ন :** গুরুজী, আপনি তো ঋণ না করতে উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু আমার স্বামী তার ব্যবসার প্রয়োজনের কথা বলে আমাকে ঋণ করতে বাধ্য করে। যদিও সুদ দেয়ার ভয়ে আমি কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ করি না, কিন্তু সংসার টিকিয়ে রাখার জন্যে আমার আত্মীয়দের কাছ থেকে ঋণ করতে হয়। সেই টাকা শোধ করার দায়িত্বও আমারই। কারণ সেটা শোধ করার ব্যাপারে আমার স্বামীর কোনো গরজ নেই। আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ। তাই ঝগড়া না করে সংসারের টাকা থেকে একটু একটু করে জমিয়ে ঋণশোধ করি। কিন্তু বিষয়টা নিয়ে আমার মনে খুব কষ্ট। কী করব?

**উত্তর :** আমরা আপনার প্রতি সমব্যথী, কারণ আপনি পরিস্থিতির শিকার হয়ে ঋণ নিতে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু আপনি যে ঋণের ব্যাপারে নিজে সচেতন, এটা শুকরিয়ার বিষয়। আপনি সচেতন বলেই অন্তত কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে সুদের বিনিময়ে ঋণ করেন নি। ফলে বড় বিপদ থেকে বেঁচে গেছেন। আত্মীয়দের কাছ থেকে যে ঋণ বা ধার কর্জ করছেন, এতে সুদ দিতে হচ্ছে না। এই ধারের বিনিময়ে তাদেরকে আপনার কোনো লাভ দিতে হচ্ছে না; শুধু আসল টাকা শোধ করে দিলেই হচ্ছে। এখানেই ঋণ এবং ধার করার পার্থক্য।

আপনি আত্মীয় বা পরিচিতদের কাছ থেকে ধার না নিয়ে যদি কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ করতেন, তাহলে সুদ দিতে দিতেই অবস্থা খারাপ হয়ে যেত। ঋণ ও সুদ—এ দুটো যুক্ত হলে কারো জীবনে আর সুখ ধরা দেয় না। কারণ তখন মাথায় কাজ করে শুধু সুদের টাকা ম্যানেজ করার টেনশন। এমনকি ঋণের সুদ দিতে না পারার পরিণতি আত্মহত্যা পর্যন্তও গড়ায়!

২১ জুন ২০২৩ এর পত্রিকার রিপোর্ট হচ্ছে, কুমিল্লায় বিভিন্ন এনজিও থেকে নেয়া 'ঋণের কিস্তি দিতে না পেরে' নারীর আত্মহত্যা। তার স্বামী জানান, ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধির জন্যে কয়েকটি এনজিও থেকে যে ঋণ তারা করেছে, তার কিস্তি আসত সপ্তাহে ৩০ হাজার টাকা!

এর চার মাস পর ২০ অক্টোবরের আরেকটি রিপোর্ট হচ্ছে, মাদারীপুরে কিস্তি পরিশোধের চাপে হালিমা বেগম নামে এক নারী বিষপানে আত্মহত্যা করেছেন। তিনি একটি বেসরকারি এনজিও থেকে ৬০ হাজার টাকা ঋণ নেন। প্রতি সপ্তাহে তাদেরকে ১৫০০ টাকা করে কিস্তি দেয়ার কথা। ২৮ নম্বর কিস্তির টাকা দিতে না পারায় অকথ্য ভাষায় অপমান করে এনজিওর কর্মীরা। সবার সামনে এমন অপমান সইতে না পেরে বিষপান করেন হালিমা। স্থানীয় এক ব্যক্তি বলেন, 'এনজিও কর্মকর্তারা প্রথমে মিষ্টি কথা বলে ঋণ দেয়। কিন্তু কিস্তির টাকা আদায়ের জন্যে বাজেভাবে চাপ দেয়।'

চিন্তা করেন, ৬০ হাজার টাকার ঋণ নিয়ে ১৫০০ টাকা করে ২৮ তম কিস্তি, অর্থাৎ ৪০ হাজার টাকার ওপরে শোধ করার পরও তাকে এভাবে অপমানিত হতে হচ্ছে।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. আইনুল ইসলাম বলেন, 'পত্রিকায় হয়তো দুই-একটি ঘটনা প্রকাশ হয়। কিন্তু ঋণের চাপে আত্মহত্যার ঘটনা আরো অনেক ঘটছে। ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থার সংস্কার ও মহাজনি ঋণের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনা না গেলে পরিস্থিতির উন্নতি হবে না।' তিনি আরো বলেন, 'একাধিক এনজিও থেকে তারা ঋণ নেয়। একটা প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে সেটা খরচ করে তারপর আরেকটা থেকে ঋণ নিয়ে তা শোধের চেষ্টা করে। একসময় ভিটেমাটি বিক্রি করেও শোধ হয় না। আর যারা ঋণ দেয়, তারা তো মাফ করার জন্যে ঋণ দেয় না।'

অতএব কখনো কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ করবেন না। এটা আমরা সবসময় বলি যে, চক্রবৃদ্ধি সুদের পাল্লায় পড়ে শান্তিটা নষ্ট করবেন না। আপাতত আপনি যা করছেন এটা ভালো—স্বামীর সাথে ঝগড়া না করে সংসারের টাকা জমিয়ে ধারের টাকা শোধ করছেন। এজন্যে আপনাকে অভিনন্দন। জীবনে এভাবে প্রো-একটিভ থাকা এবং কুশলী হওয়াটা সুখী হওয়ার জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

এখন মনে কষ্ট না রেখে স্বামীর জন্যে আপনি দোয়া করুন, যেন তার শুভবুদ্ধি জাগ্রত হয়। সেইসাথে মেডিটেশনে মনের বাড়ির কমান্ড সেন্টারে স্বামীকে এনে ঋণের কুফল সম্পর্কে বলুন। তাকে দরদ দিয়ে বোঝান—ব্যবসা করতে হলে অল্প পুঁজি দিয়ে শুরু করা উচিত, ঋণ করে নয়। মনোযোগ, চেষ্টা ও পরিশ্রম করলে ব্যবসায় সাফল্য আসবেই ইনশাআল্লাহ।

মনে রাখবেন, ঋণমুক্ত থাকার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিষয় হলো নিয়ত। এই নিয়তটাকে ঠিক করতে হবে যে, জীবনে কোনো ঋণ ও সুদ থাকবে না। প্রথমে কিছুটা কঠিন মনে হলেও দেখবেন, ভালো নিয়ত এবং হালাল উপার্জনের সদিচ্ছা থাকলে তাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত পাবেন।

**প্রশ্ন :** আমি হোমিও ডাক্তার। আমার স্বামী তার জীবনের বেশিরভাগ উপার্জন, এমনকি আমার উপার্জনও তার ভাইবোনদের পেছনে ব্যয় করেছেন। তিনি ২১ লক্ষ টাকার মতো ঋণ করেছেন ওদের জন্যে। কিন্তু এখন ওরা তার সাথে চরম বেঈমানি করছে। ওরা আমার স্বামীকে হুমকি দিচ্ছে। বলছে, পৈত্রিক সম্পত্তিও তাকে দেয়া যাবে না। এমতাবস্থায় আমাদের কী করণীয়? দয়া করে পরামর্শ দেবেন এবং দোয়া করবেন।

**উত্তর :** প্রথমত, আপনার স্বামী যা করেছেন এটা অতীত। উনি যদি সৎ নিয়তে ভাইবোনদের কাছ থেকে প্রতিদানের প্রত্যাশা ছাড়া এটা করে থাকেন, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই এটার প্রতিদান দেবেন।

দ্বিতীয়ত, কারো উপকার করে কখনো আফসোস করবেন না। আপনার মধ্যে আফসোস রয়ে গেছে যে, এত করলাম, এখন তারা আমার বিপক্ষে চলে গেছে! এভাবে মনে কোনো ক্ষোভ রাখবেন না; বরং মন থেকে তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। কারণ আপনি উপকার করেছেন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে এবং আল্লাহ অবশ্যই আপনাকে দেখবেন।

তৃতীয়ত, আমরা সবসময় ঋণ করার বিপক্ষে। ঋণ করা যে ক্ষতিকর এটা হয়তো আপনার স্বামী জানতেন না। ২১ লক্ষ টাকা ঋণ করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। নবীজী (স) যে জিনিসগুলো থেকে পানাহ চেয়েছেন তার মধ্যে একটা হচ্ছে এই ঋণ। হাঁ, কখনো কখনো ঋণ প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু আমরা অধিকাংশই যে ঋণ করি এটা হচ্ছে ফুটানির জন্যে। ঋণ করে ইলেক্ট্রনিক জিনিস কিনি, স্মার্টফোন কিনি। এভাবে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়িয়ে ফেলি। জীবন বাঁচানোর জন্যে ঋণ হতে পারে। কিন্তু বর্তমানে ফুটানির জন্যে ঋণ করার প্রবণতা বেড়েছে।

গরিবদের ক্ষেত্রে ঋণ করাটা একধরনের ফ্যাশন হয়ে গেছে। একজন হয়তো এক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ করল। সেই ঋণ যখন ফেরত দেয়ার সময় হয়, দিতে না পেরে সে আরেক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ করে আগের ঋণ পরিশোধ করে। এভাবে সে ঋণ শুধু রিশিডিউলিং করতে থাকে। আমাদের সমাজ-জীবনে সবচেয়ে বড় অভিশাপের একটি হচ্ছে এই ঋণ, যা পারিবারিক অর্থনৈতিক ভিত্তি নষ্ট করে দিচ্ছে ক্যান্সারের মতো।

আমরা আপনাদের জন্যে দোয়া করি। যদি আপনারা আপনাদের উপার্জন ভাইবোনদের কল্যাণে ব্যয় করে থাকেন, তাহলে সেটা ভুলে যান। ক্ষমা করে দিন। কারণ যা দিয়েছেন এটা ফেরত আসবে না কখনো। তাই সেটা নিয়ে আফসোস না করে ভবিষ্যতের চিন্তা করুন। আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন। দৃষ্টিভঙ্গি সবসময় এরকম হওয়া উচিত—যার জন্যেই করেন, উপকার করে কখনো তার কাছ থেকে কোনোকিছু প্রত্যাশা করবেন না।

প্রত্যাশা করা কিন্তু দান নয়। প্রত্যাশা করা হচ্ছে একটা বিনিয়োগ। বিনিয়োগে লাভ-ক্ষতি দুটোই হতে পারে। অন্যদিকে দানে কোনো ক্ষতি নেই; বরং লাভ আছে। কারণ দেয়ার মালিক আল্লাহ। আল্লাহর কাছে চান যে, তুমি রিজিকদাতা, তুমি আমাদের রিজিকের উত্তম ব্যবস্থা করো। দেখবেন, আল্লাহ আপনাদের রিজিক প্রশস্ত করে দিয়েছেন, পথ বের করে দিয়েছেন।

**প্রশ্ন :** আমার এক গৃহকর্মীর স্বামী কৃষিকাজ করেন। তার অনেক ঋণ। প্রতি মাসে ১২ থেকে ১৬ হাজার টাকা কিস্তি দিতে হয়। সেজন্যে স্ত্রী তার ছোট সন্তান গ্রামে রেখে ঢাকায় কাজ করছে। তার উপার্জনের বেশিরভাগই কিস্তির পেছনে যায়। এই দুষ্টচক্র থেকে তারা বের হতে পারছে না। সম্প্রতি তাদের প্রতিবেশী কৃষক আত্মহত্যা করেছেন ঋণের চাপে। এরপর আমাকে মেয়েটি বলল, তাদেরও তো এমন পরিণতি হতে পারে। আয় কমে গেলে কিস্তি দেবে কীভাবে? আমার মনে হচ্ছে, কিস্তির চক্র থেকে বের না হলে তাদের জীবনে বরকত আসবে না, পারিবারিক সুখ-শান্তিও আসবে না। একবার আমার নিজের যাকাত থেকে ঋণশোধের জন্যে টাকা দিয়ে বললাম যেন নতুন করে আর ঋণ না করে। কিন্তু দুবছর পর দেখা গেল তারা আবারো ঋণগ্রস্ত। গুরুজী, দয়া করে আপনি ঋণ সম্পর্কে আরো বলুন। বিস্তারিত বলুন, যাতে মানুষ কিস্তির চক্রে না জড়ায়, কেউ যেন শোষিত ঋণদাসে পরিণত না হয়। আর কোনো পরিবার যেন ধ্বংস না হয় ঋণের অভিশাপে।

**উত্তর :** একজন ভালো মানুষই অন্যের কষ্ট দেখে অন্তরে বেদনা অনুভব করে এবং তা দূর করার চেষ্টা করে। মানুষ যেন ঋণের ফাঁদে পড়ে শোষিত/ বঞ্চিত না হয়, তাই আপনার এই যে আকুলতা, এজন্যে অভিনন্দন। কিন্তু যে-কোনো ক্ষতিকর বিষয় নিয়ে বোঝানো বা সতর্ক করা পর্যন্তই আপনার দায়িত্ব; সতর্ক হওয়া না হওয়াটা মানুষটির হাতে। কারণ নিজে সতর্ক না হলে, নিজে চেষ্টা না করলে তাকে আপনি যতই সাহায্য করেন না কেন, তার ভাগ্য কখনো বদলাবে না, শোষণ থেকে তাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

ঋণ যে আমাদের সমাজ ও সভ্যতার জন্যে কত বড় অভিশাপ তা নিয়ে ২০১১ সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত হয় Debt : The First 5000 Years নামে একটি অসাধারণ বই। ঋণের পাঁচ হাজার বছরের দীর্ঘ ইতিহাস ও বিবর্তন নিয়ে বিস্তর গবেষণার আলোকে এ বইটি লিখেছেন খ্যাতনামা মার্কিন নৃবিজ্ঞানী প্রফেসর ডেভিড গ্রেবার।

সেই সুমেরিয় সভ্যতা থেকে শুরু করে চৈনিক সভ্যতা, হিন্দু সভ্যতা, মুসলিম সভ্যতায় ঋণের ইতিহাস তুলে ধরে ডেভিড গ্রেবার প্রমাণ করেছেন ঋণ কত ধ্বংসাত্মক! অতীতের মহাজনী ব্যবসা এবং এখনকার সময়ের ঋণের মধ্যে কোনো তফাত নেই। আগের যে মহাজনী ব্যবসা কালক্রমে সেটাই এখনকার সুদী ঋণ ব্যবস্থা।

ঋণ মানুষকে কীভাবে আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত করছে এবং আইএমএফ-সহ সকল ঋণদাতার উদ্দেশ্য কী, সেটা ডেভিড গ্রেবার তার

বইয়ে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। ধনী দেশগুলো দরিদ্র দেশগুলোকে কীভাবে ঋণের জালে ফেলে শোষণ করছে সেটা নিয়ে এ বইয়ে আছে একটি কার্টুন, যেখানে ঋণগ্রস্ত বৃদ্ধ কঙ্কালসার আফ্রিকা ধনী হৃষ্টপুষ্ট ঋণদাতা ফ্রান্সকে চামচ দিয়ে তুলে খাওয়াচ্ছে। নিজে খেতে পাচ্ছে না বলে হাড্ডিসার অবস্থা, কিন্তু বাধ্য হয়ে খাওয়াতে হচ্ছে ফ্রান্সকে। কেবল ব্যক্তিই নয়, ঋণের শিকার রাষ্ট্রগুলোও, যার সাম্প্রতিকতম উদাহরণ হলো শ্রীলংকা।

ইংরেজরা যুদ্ধ করে বাংলা দখল করেছে, কিন্তু যুদ্ধ করতে গিয়ে তাদের যে ঋণ, সেটাও চাপিয়েছিল বাংলার ওপরে। ১৭৫৭ সালের পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যে ঋণ ছিল তার দায়ভার বর্তে বাংলায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে ইংরেজরা পলাশি যুদ্ধ করেছে। যুদ্ধের পরে কয়েক বছরের মধ্যেই কোম্পানি দিল্লির সম্রাটের কাছ থেকে বাংলার দেওয়ানি লাভ করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মহিশুরের সাথে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলা দখল এবং লুটপাট তো করলই; তারপরে যুদ্ধের যে খরচ তা-ও চাপিয়ে দিলো বাংলার সরকারের ওপর। সেই ১৭৫৭ সালের ঋণ ভারত-পাকিস্তান এখনো শোধ করে যাচ্ছে! আফ্রিকান দেশগুলোরও একই অবস্থা। তারা স্বাধীন হয়েছে বটে, কিন্তু সেই কলোনিয়াল সরকার যে ঋণ করেছে সেই ঋণ থেকে এখনো বের হতে পারে নি। এ সংক্রান্ত দালিলিক প্রমাণ উল্লিখিত হয়েছে বইটিতে।

ডেভিড গ্রেবার এ বইয়ে একটি জনপ্রিয় আমেরিকান প্রবাদ উল্লেখ করেছেন যে, If you owe a bank a hundred dollars, the bank owns you; if you owe a bank a hundred million dollars, you own the bank! অর্থাৎ তুমি যদি ব্যাংকের কাছ থেকে একশ ডলার ঋণ নাও, তাহলে তোমার মালিক হয়ে যাবে ব্যাংক। আর যদি তুমি ব্যাংক থেকে একশ মিলিয়ন ডলার ঋণ নিতে পারো, তাহলে তুমিই ব্যাংকের মালিক হয়ে যাবে! তার বক্তব্যের সারকথা হচ্ছে, ঋণ আপনাকে হয় দাস বানাবে, না হয় দুর্বৃত্ত কিংবা প্রতারক বানাবে।

বইটিতে লেখক নাসাঈ শরিফের একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন—'আমি নবীজীকে (স) দোয়া করতে শুনেছি যে, 'আমি আল্লাহর কাছে কুফর এবং ঋণ থেকে পানাহ চাচ্ছি'। তখন একজন সাহাবী প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি কি ঋণ এবং কুফরকে সমান পাপ মনে করছেন? নবীজী (স) উত্তর দিলেন, হাঁ!'

এ-ছাড়া বেদ এবং বাইবেল থেকেও ঋণ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন গ্রেবার। তিনি বইটির উপসংহার টেনেছেন একটি প্রশ্ন দিয়ে যে, 'ঋণ আসলে কী? ঋণ হচ্ছে শুধু একটি বিকৃত প্রতিশ্রুতি।'

ঋণগ্রস্ত দরিদ্র মানুষের দুর্ভোগের কোনো শেষ নেই। এখন আবার ঋণের কারণে বেড়েছে আত্মহত্যা প্রবণতা। ২০২৫ সালের ১৫ আগস্টের মর্মান্তিক একটা রিপোর্ট হলো, ঋণের চাপে স্ত্রী ও ছোট্ট দুই সন্তানকে হত্যার পর আত্মহত্যা করেছেন রাজশাহীর পবা উপজেলার কৃষক মিনারুল। কৃষিকাজ করে সেই দেনার টাকা শোধ করা সম্ভব হচ্ছিল না। মিনারুলের বাবা দেড় লাখ টাকায় জমি বিক্রি করে কিছু ঋণ পরিশোধ করলেও বাকি দেনা শোধ হয় নি। ফলে চারটা প্রাণ ঝরে গেল। চিরকুটে লেখা ছিল, 'ঋণের দায়ে আর খাওয়ার অভাবে আমরা মরে গেলাম।'

সেখানকার ইউপি চেয়ারম্যান বলেন, 'একই পরিবারের চার জন নিহত হওয়ার পর আমি নিজ এলাকায় তদন্ত করে দেখেছি, অনেক দরিদ্র পরিবার একাধিক এনজিও এবং সমিতি থেকে ঋণ নিয়েছে। ব্যবসার কথা বলে ঋণ নেয়, কিন্তু সেই টাকা তারা খাবার কিনতেই খরচ করে ফেলে। যারা ঋণ দেয়, তারাও খোঁজ নেয় না যে, ঋণের টাকায় কী করছে। তাদের টার্গেট থাকে মূলত উচ্চহারে সুদ আদায়; তারা শুধু সুদের লাভটুকু খোঁজে। দরিদ্র মানুষগুলো এক এনজিওর টাকা নিয়ে আরেক এনজিওর ঋণ পরিশোধ করে। একসময় ঋণ বেড়ে গেলে বিপদে পড়ে।'

তিনি আরো বলেন, 'হিসাব করে দেখেছি, এনজিওগুলো ১৪ শতাংশ বললেও এরকম ঋণের সুদহার দাঁড়ায় ৩০ শতাংশ। ঋণ নেয়ার এক সপ্তাহ পর থেকেই কিস্তি শোধ শুরু হয়, তা প্রতি সপ্তাহে দিতে হয়। ফলে ঋণের টাকা বিনিয়োগ করে আয়ের আগেই কিস্তি শোধ শুরু করতে হয়। তখন তারা একাধিক এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে জড়িয়ে পড়ে ঋণের জালে।'

পত্রিকার আরেকটি খবর—১৮ আগস্ট ২০২৫ রাজশাহীর মোহনপুরে আকবর হোসেন নামের এক কৃষক ঋণের চাপে নিজের পানের বরজে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। আকবর (৫০) উচ্চ সুদে ঋণ নিয়েছিলেন ১৩টি এনজিও থেকে, অন্যদিকে পান চাষ করে কাঙ্ক্ষিত দাম না পেয়ে লোকসান গুনছিলেন। ফলে ঋণের টাকা শোধ করতে পারছিলেন না। কিন্তু প্রতিদিন কিস্তির জন্যে এনজিওর লোকেরা চাপ দিত। ওই এলাকার ঋণের কিস্তি আদায়কারীদের একজন বলেন, 'প্রতি সপ্তাহে আমরা কিস্তি আদায় করি। আর সুদ নিই ১৪ শতাংশ। কিস্তি আদায় করতে না পারায় আমরা তাদের বাড়িতে গিয়ে বসে থাকি। কখনো হুমকি দেই।'

২০২৫ সালের আরো কয়েকটি রিপোর্ট হলো :

৩ আগস্ট মাগুরায় ঋণশোধ করতে না পেরে আত্মহত্যা করেন কৃষক রিপন শেখ। ২ জুন নাটোরের লালপুরে ঋণের চাপে স্বামী-স্ত্রী আত্মহত্যা

করেন। ২১ এপ্রিল সিরাজগঞ্জে ঋণশোধে ব্যর্থ হয়ে বিষপানে কৃষকের আত্মহত্যা। সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে হাসেন ওরফে পলান নামে এক কৃষক আত্মহত্যা করেন ১৯ এপ্রিল রাতে।

এগুলো ছাড়াও ঋণগ্রস্ত মানুষের দুর্দশা ও বঞ্চনার বহু ঘটনা আছে আমাদের দেশে, এমনকি আমাদের পাশের দেশগুলোতেও। ভারতের মহারাষ্ট্রে ২০২৫ সালের প্রথম তিন মাসেই ঋণের চাপে ৭৬৭ জন কৃষকের আত্মহত্যার তথ্য সামনে এসেছে!

এই শোষণ এবং দুর্দশা থেকে বাঁচার জন্যে সবচেয়ে জরুরি হলো ঋণ না করার মাইন্ডসেট। এখন আপনার গৃহকর্মীকে ঋণের ক্ষতিটা বোঝাতে পারতে হবে। তা না হলে আপনি যদি নিজের টাকায় তাদের ঋণগুলো শোধ করেও দেন, এটা আপনার দিক থেকে দান হবে বটে, কিন্তু তাদের কোনো লাভ হবে না তেমন। তারা আবারো ঋণের জালে আটকা পড়বে।

এজন্যে প্রথমে তাদের মাইন্ডসেট বদলাতে হবে। নিজের যা আছে তা দিয়েই চলতে হবে। ব্যবসাও শুরু করতে হবে শূন্য থেকে। তাহলে লাভটা নিজের কাছে থাকবে। নয়তো কষ্টে উপার্জিত টাকাগুলো চলে যাবে সুদখোরদের পকেটে। দিনে দিনে ঋণগ্রহীতা হতে থাকবে আরো নিঃস্ব। তখন অবস্থা হবে মুন্সী প্রেমচাঁদের 'একমুঠো গম' গল্পের নায়ক কৃষক শংকরের মতো, যাকে মাত্র সোয়াসের গম ঋণ নেয়ার দায়ে আমৃত্যু দাসত্ব বরণ করতে হলো। কারণ সেই ঋণের বাড়তি সুদ দিতে গিয়ে হতদরিদ্র শংকর হয়ে গেল সর্বস্বান্ত। শ্রম দেয়া ছাড়া তখন তার আর কোনো উপায় রইল না। পরিশ্রম করবে সে, তার ফল ভোগ করবে মহাজন। এমনকি শংকরের মৃত্যুর পর ঋণের সুদ পরিশোধের জন্যে তার ছেলেকে বেগার খাটতে বাধ্য করল মহাজন। বাবার এ দায় থেকে কোন জনমে মুক্তি মিলবে বা আদৌ মুক্ত হতে পারবে কিনা, তা ভগবান জানেন! এটাই সেই গল্পের সারকথা।

শেক্সপিয়ারের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' নাটকে সুদখোর শাইলকের চরিত্র দেখলেও সুদখোরদের প্রকৃতি বোঝা যায়। সুদখোর, ঋণদাতারা পোশাকে বা চেহারায় ভিন্ন হলেও যুগে যুগে এরা একই প্রকৃতির। আর তা হচ্ছে, খাতকের কাছ থেকে সবকিছু নিংড়ে নেয়া। পুঁজিবাদী শোষণের মূল মাধ্যম হচ্ছে এই ঋণ, যার পোশাকি রূপ—ক্রেডিট কার্ড এবং কনজ্যুমারিজম বা পণ্যদাসত্ব। হাইপার-ক্যাপিটালিজমকে তাই পোপ ফ্রান্সিস উল্লেখ করেছেন 'শয়তানের বিষ্ঠা' হিসেবে। সূরা বাকারায় আল্লাহ সুদখোরদেরকে 'শয়তানের স্পর্শে সহজাত বিচারবুদ্ধি লোপ পাওয়া ব্যক্তির মতো' বলে ঘোষণা করেছেন। অতএব এদের সংস্পর্শে কেউ যাবেন না, ঋণী হবেন না।

**প্রশ্ন :** আপনি বলেছেন, ঋণমুক্ত সচ্ছল জীবন আমার মৌলিক অধিকার। কিন্তু কী করে ঋণমুক্ত হবো? আমার আয় পাঁচ টাকা আর সংসারে আমার প্রয়োজন ১০ টাকা। আল্লাহ কোনো না কোনোভাবে মাস কাটিয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু ঋণের কিস্তি তো শেষই হচ্ছে না, অশান্তিও ছাড়ছে না। কেন আপনি ঋণ করতে নিষেধ করেন তা টের পাচ্ছি। কীভাবে ঋণমুক্ত হবো, যদি বলে দিতেন!

**উত্তর :** ঋণমুক্ত হওয়ার জন্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ হলো আপনার নিয়ত। আপনাকে আপনার ব্যয়টা সীমার মধ্যে আনতে হবে। ব্যয় এবং অপচয় কমাতে হবে। নিজের কাছে দৃঢ় থাকবেন যে, আল্লাহ আমাকে যেটুকু উপার্জন দিয়েছেন, তাতেই আমি চলব। তাহলে দেখবেন, ঋণ না নিয়েও আপনি ঠিকই চলতে পারছেন। আপনার চলার ব্যবস্থা আল্লাহ করে দেবেন।

সমস্যা হলো, বেশিরভাগ মানুষ তাদের আয় না বাড়িয়ে ব্যয় বাড়িয়ে ফেলে। আয় না বাড়িয়ে ব্যয় বাড়ানোর ফন্দিটাই শোষকদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। নানান বিজ্ঞাপন ও পণ্যের জৌলুস দেখিয়ে তারা আপনার ব্যয় বাড়িয়ে দেবে। এমনকি ঋণ করে হলেও আপনি ব্যয় করবেন; তারপর শুধু কিস্তি দিতে থাকবেন। এটা কিন্তু শোষকদের ফাঁদ। এই ফাঁদটা না বোঝার ফলে সমাজে ঋণ ছড়িয়ে পড়ছে ক্যান্সারের মতো।

আমাদের দেশে যে ঋণ আগ্রাসন চলছে, এ ব্যাপারে আমরা শুরু থেকেই সচেতন করে যাচ্ছি। কারণ পশ্চিমা ও পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদ আমাদের সামগ্রিক অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দিতে আমাদেরকে ঋণদাসে পরিণত করার সুপরিকল্পিত চক্রান্ত নিয়ে মাঠে নেমেছে, যার অন্যতম অনুষঙ্গ হলো ঋণ, ক্রেডিট কার্ড। অর্থাৎ আপনি যেন উপার্জন করার আগেই ব্যয় করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন এবং একসময় নিজের শান্তি, সম্মান, নৈতিকতা ও মনোদৈহিক সুস্থতা হারিয়ে বসেন। কারণ ঋণগ্রস্ত জীবন দাসত্বের জীবন।

আপনার যত পছন্দের জিনিস হোক, সেটার সাথে যখন সুদ জড়িয়ে যাবে, তখন আপনার সর্বনাশ হবে। আপনার শান্তি বিনষ্ট হবে। আপনি অভিশপ্ত হবেন। কারণ ঋণদাতা সংস্থাগুলোর ব্যবসাই হচ্ছে কিস্তির ফাঁদে ফেলে গ্রাহকদের কাছ থেকে মাসের পর মাস অতিরিক্ত টাকা আদায় করা।

আমাদের দেশে কিন্তু ৪০ বছর আগেও এই কিস্তি ছিল না। এখন চারপাশে কারো ক্রেডিট কার্ডের কিস্তি, কারো ফ্ল্যাটের জন্যে, কারো গাড়ির কিস্তি। এমনকি মোবাইল ফোন, ফ্রিজ, টিভি, ওয়াশিং মেশিনও মানুষ কিস্তিতে কিনছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কেনাকাটাগুলো প্রয়োজন পূরণের জন্যে নয়, করা হচ্ছে জৌলুস বাড়ানোর জন্যে।

প্রয়োজন কতটুকু সেটা বুঝতে হবে। যখনই আপনি কোনো ভোগ্যপণ্য কিস্তিতে কিনছেন, তখনই নিজের ওপর গজব নিয়ে আসছেন। আপনার জীবনে শান্তি বলে কিছু থাকবে না। কারণ একদিকে ঋণের দুশ্চিন্তা, আরেকদিকে চক্রবৃদ্ধি সুদে আপনি জড়িয়ে পড়ছেন। এখন তো ব্যাংকগুলো বিয়ের জন্যেও ঋণ দিচ্ছে। যারা ঋণ করে বিয়ে করেছে, ঋণশোধের চিন্তায় তাদের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে, কেউ কেউ সর্বস্বান্ত হয়েছে—এরকম অনেক উদাহরণ আছে। তাই ঋণ করে কখনো ফুটানি করতে যাবেন না।

আমাদের এক সদস্য চিঠিতে জানিয়েছেন ঋণের গজবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা; তার লেখাটা পড়ছি—'আমার এক প্রতিবেশী ভদ্রমহিলা কাপড়ের ব্যবসা করেন। পাইকারি মার্কেট থেকে কাপড় কিনে এনে খুচরা বিক্রি করেন। ভালোই লাভ হচ্ছিল। একসময় তিনি ব্যবসা বড় করতে চাইলেন। এর জন্যে প্রয়োজন আরো মূলধন ও লোকবল। তাই তিনি প্রথমে কিস্তিতে ঋণ নিলেন। একজন কর্মচারী নিয়োগ দিলেন। একসময় সেই কর্মচারী কাপড় বিক্রির সব টাকা খরচ করে ফেলল। এদিকে কিস্তির লোকেরা নিয়মিত আসতে শুরু করল। এই কিস্তি শোধের জন্যে তিনি আরো একটি প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিলেন। ধীরে ধীরে তিনি কিস্তির চক্রে ঢুকে গেলেন।

একপর্যায়ে পরিচিতদের কাছ থেকেও সুদে টাকা নিতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যেই অনেক টাকা ঋণ হয়ে গেল তার। যারা তাকে সুদে ঋণ দিয়েছিল, সেই পাওনাদাররা এসে একবার ঘরের ফ্রিজ থেকে কোরবানির মাংস পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছে। ঘরের দৈনন্দিন বাজারও তারা নিয়ে যায় সুদ আদায় করতে না পেরে। একবার তিনি স্বর্ণের অলংকার বন্ধক রেখে একজনের কাছ থেকে টাকা নিলেন। জানা গেল, সেই স্বর্ণালংকার হারিয়ে গেছে। পাওনাদারকে আজ না কাল, কাল না পরশু, এভাবে অনর্গল মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। প্রায়ই বাবার বাড়িতে গিয়ে লুকিয়ে থাকেন আর মাঝে মাঝে বলেন, আত্মহত্যা করবেন। না দেখলে বিশ্বাস করতাম না ঋণের অভিশাপ এমনই ভয়াবহ!'

সেপ্টেম্বর ২০২৩-এর গণমাধ্যমের একটা খবর হচ্ছে, ঋণের জ্বালা সইতে না পেরে সিরাজুল ইসলাম নামে ঝিনাইদহে এক ব্যবসায়ী আত্মহত্যা করেন। সুদের যন্ত্রণা তার হৃদয় কতটা ক্ষতবিক্ষত করেছে, তা ফুটে উঠেছে তার লিখে যাওয়া শেষ চিরকুটে—'সুদখোরদের অত্যাচারে বাঁচতে পারলাম না। আমার জায়গাজমি, বাড়ি সব বিক্রি করে দিয়েছি। যে টাকা নিয়েছি, তার আট-দশ গুণ টাকা দিয়েও রেহাই দিলো না তারা। কেউ কেস করেছে, কেউ অপদস্থ করছে। আর সহ্য করতে পারছি না।'

অতএব কোনোভাবেই ঋণ নয়। নবীজীর (স) কাছে ঋণ করাটা এতই অপছন্দনীয় ছিল যে, ঋণগ্রস্ত কেউ মারা গেলে তার জানাজাও পড়াতেন না তিনি। তিনি সবসময় প্রার্থনা করতেন—'হে আল্লাহ! আমি ঋণ ও কুফরী থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি'। (আউযুবিল্লাহি মিনাল কুফরী ওয়াদ্দাইন)। [আবু সাঈদ খুদরী (রা), *নাসাঈ; হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী :* ৫২৬] অর্থাৎ সত্য অস্বীকার করে কাফের হওয়া আর ঋণগ্রস্ত হওয়াকে নবীজী (স) একইরকম পাপ বলে গণ্য করেছেন।

তাই আগে উপার্জন করবেন, তারপর আয় অনুসারে ব্যয় করবেন। ব্যাংক ঋণ বা সুদযুক্ত সব ধরনের ঋণ, ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার, ক্রেডিট কার্ডের কো-হোল্ডার ও গ্যারান্টার হওয়া থেকে নিজে পুরোপুরি বিরত থাকুন। এ ব্যাপারে পরিচিতদেরও নিরুৎসাহিত করুন। তবে ইতোমধ্যে যারা ঋণগ্রস্ত তারা নিয়ত ঠিক রাখবেন যে, আমাকে ঋণমুক্ত হতেই হবে। তাহলে আল্লাহ আপনার জন্যে ঋণমুক্ত হওয়াটাকে সহজ করে দেবেন। কারণ আল্লাহ তাকেই সাহায্য করেন, যে নিজের জীবন বদলের জন্যে নিজে উদ্যোগী হয়।

**প্রশ্ন :** গুরুজী, আপনার কাছে একটি দোয়াই চাচ্ছি। তা হলো, আমার স্বামীর ঋণমুক্তি। এই ভয়ানক শাস্তি আর সহ্য করতে পারছি না। কয়েকমাস ধরে পাওনাদারকে সুদ এবং কিছু মূল টাকাও দেয়ার কথা, যা দিতে পারছে না আমার স্বামী। একজনকে তিন লক্ষ টাকা দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু টাকাটার কোনো ব্যবস্থা হয় নি। সেই পাওনাদার খুব বেয়াদব। পাওনাদারদের তাগাদায় খুবই অস্থির এবং লজ্জিত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি। কী করব?

**উত্তর :** আপনি দেনাদার হয়ে পাওনাদারের আচরণ নিয়ে কথা বলার মতো অবস্থানে নেই। বরং পাওনাদারের জন্যে দোয়া করুন। আর ঋণ করার আগে চিন্তা করবেন সবসময়। কারণ একবার কেউ ঋণের গজবের মধ্যে পড়ে গেলে এখান থেকে বেরিয়ে আসা খুব কঠিন।

আমরা দোয়া করি। কিন্তু আপনাদেরকে বিশুদ্ধ নিয়তে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে ঋণমুক্তির জন্যে এবং নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, কখনোই কোনো অবস্থাতেই যেন ঋণ না করেন।

**প্রশ্ন :** আমার এক মামা টিউবওয়েলের ব্যবসা করতেন। কোটি কোটি টাকার মালিক হলেন। প্রতি বছর তার মা-বাবার মৃত্যুবার্ষিকীতে ৩৫–৪০টি গরু জবাই করে যত আত্মীয় ও প্রতিবেশী আছে, সবাইকে নিয়ে ভোজ অনুষ্ঠান

করতেন। ছোটবেলায় মায়ের সাথে আমরাও যেতাম সেখানে। মামার বিলাসবহুল জীবনযাপন দেখলে যে-কেউ ঈর্ষান্বিত হতো। সমাজের উচ্চপদস্থদের সাথে তার সম্পর্ক। তাই আত্মীয়রাও তার পরিচয় দিতে গর্ববোধ করত। কিন্তু তার এই রাজসিক জীবনের পেছনে ছিল কোটি টাকার ব্যাংক ঋণ। একসময় ঋণশোধ করতে না পারায় তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে শুরু করল ব্যাংক। তার যাবতীয় সম্পত্তি জব্দ করা হলো। এরপর তিনি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে থাকেন। ঋণের চাপ ও অপদস্থ হওয়ার ভয়ে হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হয় তার। তার নিজের কুলখানিতে কয়েকজন কাছের মানুষ ছাড়া তেমন কেউ ছিল না। আত্মীয়স্বজনের সেই সমাগম এখন আর নেই। তার পরিচয় দিতেও সবাই লজ্জাবোধ করছে। কেউ তাদের খোঁজ নেয় না। তার স্ত্রী মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। ঋণ কীভাবে ব্যক্তিকে এবং তার পরিবারকে সর্বস্বান্ত করে দেয়, তা ভালোভাবে বুঝলাম। ঋণগ্রস্ততার এই উদাহরণ থেকে যেন শিক্ষা নিতে পারি; দোয়া করবেন এবং আরো পরামর্শ দেবেন প্লিজ।

**উত্তর :** শুধু আপনার মামা নয়, বহু ঋণগ্রস্ত মানুষের জীবনে এটাই বাস্তবতা। পপসম্রাট মাইকেল জ্যাকসনের জীবনের বাস্তবতাও এমনই। ঋণ, সুদ ও কিস্তি থাকলে অশান্তি ও স্ট্রেস বাড়বে, তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। সে অসুস্থ হয়ে পড়বে। ঋণের অভিশাপ নিয়ে এরকম অনেক চিঠি পাই আমি। একজন তো একটা কার্টুন তৈরি করে দিয়েছেন, যেখানে এক লোক ব্যাংক লোনের শেষ কিস্তি দিতে এসেছে। তার গায়ে কাপড়চোপড় কিছুই নেই। অবশ্য ব্যাংকওয়ালারা দয়া করে তাকে নেংটি পরিয়ে দিয়েছে। এতে খুব নির্মম সত্য উঠে এসেছে। এর সাথে তিনি তার অভিজ্ঞতা লিখেছেন—

‘আমি লোন নিয়েছি ২০০৯ সালে। বেশ কয়েক বছর ধরে অনিয়মিত কিস্তি দিতে থাকি। কিছু কিস্তি বাদ পড়েছে। কিছুদিন আগে হঠাৎ ব্যাংকের আইন শাখা হতে আমার কাছে উকিল নোটিশ আসে যে, যদি আমি একমাসের মধ্যে সম্পূর্ণ সুদের টাকা পরিশোধ না করি, তবে আমার বিরুদ্ধে মামলা হবে। খুব টেনশনের মধ্যে দান দোয়া হিলিং বেশি বেশি করলাম। কিছু লস দিয়ে ফ্ল্যাট বিক্রি করে দিলাম। গুরুজী, আমি যদি আপনার কথায় নিজেকে ঋণমুক্ত না করতাম, তাহলে আমার অবস্থাও ওই ছবির মতো হতো। আমি যত টাকা লোন নিয়েছিলাম কিস্তি দেয়ার পরও আমাকে আসল টাকা থেকেও অনেক বেশি টাকা দিতে হয়েছে। এই অভিশপ্ত বিপদ থেকে মুক্তি দেয়ার জন্যে শুকরিয়া আদায় করছি। আমি এখন একটি সুস্থ জীবন ফিরে পেয়েছি। বহুদিন পর মানসিক শান্তি নিয়ে ঘুমাচ্ছি।’

আরো কয়েকটা চিঠির অংশবিশেষ পড়ে শোনাচ্ছি—

'মহিলা ভাত বিক্রি করেন। বিভিন্ন কারণে দুই লাখ টাকা ঋণ নিয়েছেন। এখন মাসে সুদ দিতে হয় ২০ হাজার টাকা। ফলে তার প্রশান্তি শেষ।'

'গৃহকর্মী তার মেয়ের বিয়ের জন্যে সুদে ৮০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন। কাজ করে তার আয় হয় ১০/১১ হাজার টাকা। কিস্তি দিতে হয় মাসে ৭ হাজার টাকা। এজন্যে তিনি সবসময়ই অসুস্থ থাকেন। '

'একজন ঋণ নিয়েছিলেন ১০ হাজার টাকা। কিন্তু কিস্তি পরিশোধ করেন নি। তার এখন দেনা পরিণত হয়েছে দুই লক্ষ টাকায়।'

'দুই বছর আগে আমার এক আত্মীয় উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ঢাকার বাড়িটার অর্ধেক অংশ বিক্রি করেছেন। এখন বাকি অংশটুকুও বিক্রি করতে যাচ্ছেন ঋণের কারণে। তার ব্যবসা খুব ভালো চলছিল। একসময় আত্মতুষ্টির ফলে তিনি তার ব্যবসায় অমনোযোগী হয়ে গেলেন এবং জুয়া খেলায় মেতে থাকলেন। ক্যাশ না থাকলে ঋণ নিয়ে জুয়া খেলতেন। ব্যবসায় লোকসান হলো। ঋণ বাড়তে থাকল। পাওনাদার টাকার জন্যে চাপ দিলে আরো ঋণ নিয়ে কিছু টাকা শোধ করলেন। এভাবে মাত্র একবছরের ব্যবধানে তার ঋণ প্রায় ৭০ লক্ষ টাকায় গিয়ে দাঁড়াল। তাকে মেরে ফেলার হুমকি দিতে থাকল পাওনাদার। প্রতিদিন বহু পাওনাদার টাকার জন্যে চেঁচামেচি করত আর অভিশাপ দিত। পরিস্থিতি এমন হলো, তিনি ঘরে থাকতে পারতেন না। তার স্ত্রী সন্তান অপমান সইতে না পেরে চলে গেছে অন্য কোথাও। বাধ্য হয়ে তিনি পুরো বাড়িটাই বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কী নির্মম পরিস্থিতি তা সামনে না থাকলে বোঝা কঠিন!'

এজন্যে ব্যক্তিগত হোক কিংবা জাতিগত, ঋণের ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। না হলে কারো প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। যে পরিবারে বা সমাজে ঋণ ঢুকবে, সেটা ধ্বংস হবেই। আমেরিকার অবস্থা দেখেন, পিটার জি পিটারসন ফাউন্ডেশনের ২৩ অক্টোবর ২০২৫ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, আমেরিকার জাতীয় ঋণ হচ্ছে ৩৮ ট্রিলিয়ন ডলার। পরিবার প্রতি ঋণ—দুই লক্ষ ৮৭ হাজার ডলার। মাথাপিছু ঋণ—এক লক্ষ ১১ হাজার ডলার। প্রতি মিনিটে আমেরিকার জাতীয় ঋণ বাড়ছে ৪.৮ মিলিয়ন ডলার। মার্কিন সরকার প্রতিদিন শুধু ঋণের সুদ হিসেবে শোধ করে ৩ বিলিয়ন ডলার। এভাবেই এরা একটা ঋণী, দেউলিয়া জাতিতে পরিণত হয়েছে।

আমরা সেই সমাজের স্বপ্ন দেখি এবং সেই স্বর্গভূমির জন্যে দোয়া করি, যেখানে কোনো ব্যক্তি বা সরকারের কোনো ঋণ থাকবে না। এখনো বিদেশি সাহায্যের নামে দেশে যে ঋণ আসে তা হচ্ছে গলার কাঁটা, যেটা শোধ হয়

না। শুধু সুদ দিয়ে যেতে হয়। অতএব ভালো থাকতে হলে স্বাবলম্বী হতে হবে। এই ভাবনাটাকেই আমরা ছড়িয়ে দিতে চাই। ঋণমুক্ত থাকার ব্যাপারে নিজেকে ভেতর থেকে উদ্বুদ্ধ করতে 'ঋণ ও অপচয় অবলোকন' মেডিটেশনটি করবেন। অপচয়কারী বা ঋণী না হয়ে বরং দাতা হওয়ার চেষ্টা করবেন। যা আছে সেখান থেকেই দিতে শুরু করবেন। তাহলে আপনি নিজে সুখী হবেন, পরিবারও সুন্দর থাকবে।

**প্রশ্ন :** কদিন আগে ব্যাংক থেকে আমাকে খুব মিষ্টি ভাষায় ক্রেডিট কার্ড নেয়ার জন্যে বলল। যদিও এ বিষয়ে কম জানি, কিন্তু আপনি তো বলেন, ক্রেডিট কার্ড হচ্ছে অভিশপ্ত কার্ড। তাই আমি বলেছি, এটা নিব না। সমস্যা হলো, আমার স্বামীকে ক্রেডিট কার্ড বাদ দিতে বললে সে মানে তো না, উল্টো রাগ করে। ক্রেডিট কার্ড সম্পর্কে বিস্তারিত বলবেন প্লিজ।

**উত্তর :** গত ৩৩ বছর ধরে ঋণ করার দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করার ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করে আসছে কোয়ান্টাম। কারণ ঋণ হচ্ছে দাসত্বের ফাঁদ। আর ক্রেডিট কার্ড হচ্ছে, যে ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়া হয় সেই ব্যাংকের দাসত্বের সার্টিফিকেট। ক্রেডিট কার্ডকে আমরা বলি কার্সড কার্ড বা অভিশপ্ত কার্ড, কাবুলি কার্ড। এ যুগে সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের সুচতুর ফাঁদ হলো ক্রেডিট কার্ড, যা বাকিতে কেনার অভ্যাস করিয়ে মানুষকে দীর্ঘমেয়াদে ঋণগ্রস্ত করে তোলারই একটি পরিকল্পিত প্রক্রিয়া। কীভাবে?

২০১৫ সালে বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ (বিসিজি) প্রকাশিত প্রতিবেদন হচ্ছে, Bangladesh : The surging consumer market nobody saw coming. যার মূল বিষয় ছিল, বাংলাদেশে কীভাবে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার অর্থাৎ বাকিতে কেনার অভ্যাসকে জনপ্রিয় করা যায়! এ প্রতিবেদনে তারা বাংলাদেশি ভোক্তাদের আচরণ, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা করে তাদের অভিমত প্রকাশ করেছে।

বোস্টন গ্রুপ (বিসিজি) ২০১৫ সালে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, ১০ বছর পর মানে ২০২৫ সালে ঢাকার মধ্যবিত্ত ও বিত্তবান জনগোষ্ঠীর আকার হবে বর্তমানের দ্বিগুণ। রাজশাহী ও বরিশালে তিন গুণ। খুলনায় হবে ছয় গুণ। তাদের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়ার তুলনায় বাংলাদেশে আশাবাদী মানুষের সংখ্যা বেশি। বাংলাদেশ নিয়ে তাদের মাথাব্যথা হচ্ছে, নিজের আর্থিক সমৃদ্ধির ব্যাপারে আশাবাদী হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ বাংলাদেশি অঢেল খরচ ও ঋণশোধের ব্যাপারে সচেতন।

এদেশে মধ্যবিত্ত ও বিত্তবান ক্রেতা-ভোক্তাদের মধ্যে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে মাত্র ৬% আর এদের মধ্যে গৃহঋণ নিয়েছে মাত্র ৩%। বাংলাদেশিরা ব্যাংকের বদলে বন্ধু বা নিকটাত্মীয়ের কাছ থেকে ধার নিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। ঋণের ব্যাপারে এদেশে নেতিবাচক ধারণা প্রচলিত থাকায় ক্রেডিট কার্ড জনপ্রিয় হচ্ছে না। তাই তাদের পরামর্শ হচ্ছে, ক্রেডিট কার্ডকে বাংলাদেশে জনপ্রিয় করতে হবে। এটা তারা কেন চাচ্ছে? কারণ এটা না হলে দাসত্বের শৃঙ্খল বাঙালির গলায় পরানো যাবে না।

এখন থেকে ১০০ বছর আগে আমাদের সাধারণ মানুষ ছিল মহাজনী ঋণে আবদ্ধ। কিন্তু শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ঋণ সালিশি বোর্ড করে এই ঋণ মাফ করে দেন। ফলে আমরা ঋণবিমুখ জাতিতে পরিণত হই। এখানে ঋণ না করার সংস্কৃতি তৈরি হলো। এদেশে ৩০/৪০ বছর আগেও দোকানে স্টিকার লাগানো থাকত, ‘বাকি চাহিয়া লজ্জা দেবেন না’। দুই ব্যবসায়ীর ছবিও টাঙানো থাকত, যেখানে একজন হ্যাংলাপাতলা। বাকিতে বিক্রি করে তার সিন্দুক খালি। আরেকজন নাদুসনুদুস, তার সিন্দুক ভর্তি টাকা। কারণ তিনি বাকিতে বিক্রি করেন না।

এ অবস্থায় আমেরিকানরা উঠে-পড়ে লেগেছে যে, কীভাবে আমাদেরকে ঋণ করে ঘি খাওয়ার দলে নেয়া যায়। ২০১৫ সালে বিসিজির পরামর্শের পর এদেশে পণ্যঋণ এবং ক্রেডিট কার্ডের প্রচারণা অনেক বেড়ে যায়। অবস্থা এমন হয়েছে যে, কোরবানির মাংস রাখার জন্যে ফ্রিজ পর্যন্ত বাকিতে কেনার প্রচারণা চালাচ্ছে ব্যবসায়ীরা! এখন তো সুপারশপে নগদে কেনাটাই যেন লজ্জার ব্যাপার। এমনকি মাঝারি মুদি দোকানেও ক্রেডিট কার্ড পাঞ্চ করার ব্যবস্থা আছে। ক্রেতা-বিক্রেতা বাকিতে কিনতে বা বিক্রি করতে আর লজ্জা বোধ করে না। বরং সমাজের একটি শ্রেণির মানসিকতায় পরিবর্তন এতটাই যে, তারা বাকিতে কিনতে পারাকে স্ট্যাটাস সিম্বল মনে করছে। অথচ এটা মোটেও স্ট্যাটাস সিম্বল নয়, বরং অক্ষমতারই প্রকাশ। বাকিতে কিনলে এটাই প্রকাশ পায় যে, আপনি নগদে কিনতে সক্ষম নন।

এবার দেখা যাক, ক্রেডিট কার্ডের শুরুর সময়টা কেমন ছিল? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কনজ্যুমারিজমের বিকাশ ঘটল। পণ্যের উৎপাদন বেড়ে গেল। নগদ অর্থে পণ্য কিনলে সাধারণভাবেই ক্রেতা বাছবিচার করে হিসাব করে খরচ করে। বেনিয়ারা দেখল, বাকিতে কিনতে উদ্বুদ্ধ করা গেলে সে ভাববে, এখন তো টাকা দিতে হচ্ছে না। পরে দিয়ে দেবো! এই চিন্তার ফলে সে তার সামর্থ্যের বাইরেও কিনবে, অপ্রয়োজনীয় পণ্যের পেছনে টাকা খরচ করবে। এভাবেই পঞ্চাশের দশকে আমেরিকাতে ক্রেডিট কার্ড চালু হয়।

ক্রেডিট কার্ডের উদ্যোক্তা কোম্পানিগুলো ২০ থেকে ২৫ বছর অনেক লস করে। আস্তে আস্তে মানুষের বাকিতে কেনার প্রবণতা প্রবল হতে থাকে। এটাতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এই অভ্যস্ততার ফলে কী হলো? ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারী দেশগুলোর কী অবস্থা? সত্তরের দশকের পরের ৫০ বছর, অর্থাৎ এই শতাব্দীতে এসে আমেরিকানরা আকণ্ঠ নিমজ্জিত হলো এই দেনায়।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবসা ও অর্থনীতি বিষয়ক সংবাদমাধ্যম *সিএনবিসি*-র ৪ মে ২০২০ সালের রিপোর্ট অনুসারে, ৪০ শতাংশ আমেরিকানের বাকিতে কিনতে কিনতে এমন অবস্থা হয়েছে যে, মিনিমাম এমাউন্ট পে-এবল-এর চেয়ে বেশি তারা শোধ করতে পারে না। প্রতি ক্রেডিট কার্ডের পেছনে তাদের প্রায় গড় ৬,২০০ ডলার ঋণ, যা কয়েক বছর আগেও চার হাজার ডলার ছিল। এত ঋণ হওয়ার কারণ হচ্ছে গাড়ির লোন, বাড়ির মর্টগেজ ও স্টুডেন্ট'স লোন। যা উপার্জন করে তা দিয়ে কিস্তি দিতে দিতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নগদে কেনার পয়সা আর থাকে না। সেটাও তাদের কিনতে হয় বাকিতে।

এর আগে ২০১৬ সালে ওলফ স্ট্রিট একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে, 'This is How Consumers Turn into Debt Slaves.' যেখানে বলা হয়, আয় না বাড়লেও লক্ষ লক্ষ আমেরিকান কীভাবে শিক্ষাঋণ, গাড়ির ঋণ আর ক্রেডিট কার্ডের ঋণের জালে আবদ্ধ হয়ে ঋণদাসে পরিণত হয়েছে। তাদের ঋণের পরিমাণ হলো ৩.৭১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার! তার পরিণতি—২০১৭ সালের যুক্তরাষ্ট্রের সেন্সাস ব্যুরোর ন্যাশনাল পোভার্টি ডাটা অনুযায়ী, আমেরিকার ৩ কোটি ৯৭ লক্ষ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করছে। সেখানে ১৫ মিলিয়ন বা প্রতি ৫টি শিশুর ১টি শিশু এমন দরিদ্র পরিবারে বাস করে, যেখানে জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা নেই!

যুক্তরাজ্যের অবস্থা দেখেন, বিশ্বজুড়ে বৃটেনের উপনিবেশ এত বিস্তৃত ছিল যে, বলা হতো 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য ডোবে না'। মানে ভূখণ্ড এত ব্যাপক! সেই বৃটেনের ১২ শতাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে। কারণ হচ্ছে ক্রেডিট কার্ড। সেন্টার ফর সোশ্যাল রিসার্চের রিপোর্ট অনুযায়ী, ইংল্যান্ডে প্রতি বছর এক লাখেরও বেশি মানুষ ঋণের ধকল সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার চেষ্টা করে।

এটাই বাস্তবতা। ঋণ, কিস্তি ও ক্রেডিট কার্ড বর্তমানে এভাবেই পরিণত হয়েছে মরণফাঁদে। বিশ্বজুড়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। এজন্যে বাকিতে কেনার অভ্যাসটাকে বদলাতে হবে। ক্রেডিট কার্ডের পরিণতি নিয়ে আমাদের এক সদস্য একটি চিঠি লিখেছেন; আমি পড়ে শোনাচ্ছি—

‘আমার এক আত্মীয়, তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী। চাকরিরত অবস্থায় দেশের স্বনামধন্য একটি ব্যাংক তাকে প্রলুব্ধ করে একটি ক্রেডিট কার্ড ধরিয়ে দেয়, যা দিয়ে দুই বারে তিনি ৮০ হাজার টাকা উত্তোলন করেন। এরপর সেই ব্যাংকের সাথে বহু বছর ধরে লেনদেন চলতে থাকে। কিন্তু সেই ৮০ হাজার টাকা শোধ করার ব্যাপারে ব্যাংকের পক্ষ থেকে কোনো তাগাদা নেই। তাই তিনিও নির্বিকার।

এর মধ্যে তিনি আরেকটি ভুল করেছেন—অবসর গ্রহণের পর কিছু প্রতারকের মিষ্টি কথায় প্রভাবিত হয়ে পেনশনের সমস্ত টাকা তুলে দিয়েছেন তাদের হাতে। যে মানুষটি সারাজীবন চাকরি করেছেন, তিনি হঠাৎ করে ব্যবসায়ী হতে গিয়ে সবকিছু হারিয়ে নিঃস্ব হলেন। এই কঠিন সময়ে অনেক বছর পর হঠাৎ ব্যাংক নোটিশ এলো—তাকে সেই ক্রেডিট কার্ডের টাকাটা শোধ করতে হবে। কিন্তু সামর্থ্য নেই বলে প্রথমে তিনি বাসা বদলে ফেললেন। ভেবেছিলেন, ব্যাংক তাকে খুঁজে পাবে না। কিন্তু কয়েক বছর পর আইনি নোটিশ পেলেন—তার নামে মামলা হয়েছে।

ঋণের চিন্তায় এবং সব হারানোর ভয়ে তার স্ট্রোক হলো। নিরুপায় হয়ে তাকে শোধ করতে হলো এক লক্ষ ৬০ হাজার টাকা প্রায়। স্ত্রীর জমি বিক্রি করে এবং আত্মীয়স্বজনের সহযোগিতায় সেই টাকা শোধ করলেন। এখানেই শেষ নয়। কিছুদিন পর আবার ওয়ারেন্ট এলো। ব্যাংকের করা এই মামলার সমস্ত খরচ তাকেই শোধ করতে হবে। এই হলো ক্রেডিট কার্ডের পরিণতি। তরুণ বয়সে প্রলুব্ধ করে ক্রেডিট কার্ড ধরিয়ে দেয় আর জীবনের শেষপ্রান্তে ভাগ্যে জোটে দুশ্চিন্তা, অপমান, স্ট্রোক আর সীমাহীন দুর্ভোগ।’

আমরা সবসময় এই পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করছি। যারা সচেতন হয়েছেন, তারা এই গজব থেকে মুক্ত থেকেছেন। যেমন কোয়ান্টাম পরিবারের এক সদস্য লিখেছেন—

‘তিন বার আস্তাগফিরুল্লাহ বলে তিনটি ফুটো করে দিয়েছি আমার শখের প্লাটিনাম ক্রেডিট কার্ড। ব্যাংকে গিয়ে নিয়ম অনুযায়ী ক্যানসেল করিয়েছি এটা। এর আগেও কয়েকবার বাদ দিতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু চা-বিস্কুট খাইয়ে সুন্দর করে বুঝিয়ে আবার ধরিয়ে দিয়েছে। আবারো এই কার্ড আমার পকেটে। এটা একটা চোরাবালি। শুকরিয়া জানাই, আল্লাহ আমাকে অভিশাপ হতে মুক্তি দান করেছেন। ঋণ করে ঘি খাব না, এমনকি ঋণ করে সয়াবিন তেলও খাব না। জীবনের এই চরম বাস্তব সত্যটি আমাদের বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে গুরুজী, আপনার প্রতিও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ যেন সবাইকে এই চরম সত্যটি বোঝার তৌফিক দান করেন।’

আসলে পুঁজিবাদী বেনিয়া শোষণের মূল অস্ত্র হচ্ছে এই ঋণ, এটা আপনি বুঝলে আপনাকে কেউ ঋণের জালে আটকাতে পারবে না। এই গজব থেকে বাঁচতে হলে সচেতন থাকতে হবে নিজেকে।

**প্রশ্ন :** আমি সাত বছর আগে ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলাম। সেই টাকা শোধ করতে হয়েছিল অন্য জায়গা থেকে ৭০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে। এটা শোধ করতে আরো ঋণ হয়ে গেল। এভাবে ঋণ বাড়তে বাড়তে বাড়তে এখন ১৮ লক্ষ টাকা হয়েছে। প্রতিমাসে সুদ দিতে হয় ৪০ হাজার টাকা। আমার আয় মাত্র ১৫ হাজার টাকা। দয়া করে পরামর্শ দিন কীভাবে ঋণ থেকে মুক্ত হবো? আমার জন্যে আমার মা-বাবাও অনেক বিপদে আছে।

**উত্তর :** এটাই হয়। এই যে আপনার ৫০ হাজার টাকা সাত বছর পর ১৮ লক্ষ টাকা হয়েছে। এই ঋণের চক্রে পড়ে গেলে এটা শুধু রিশিডিউলিং হয় এবং এভাবে ঋণের পরিমাণ বাড়তেই থাকে। এজন্যে আমরা গত তিন যুগ ধরে বলে আসছি, ঋণ মানে অভিশাপ, ঋণ মানে অসম্মান ও অশান্তি। আমি যত চিঠি পাই তার মধ্যে একটা বড় অংশ হচ্ছে শুধু ঋণমুক্তির জন্যে দোয়া চেয়ে চিঠি। শুধু দোয়াতে কী হবে? ঋণ করলে অর্থাৎ উপার্জনের আগেই ব্যয় করে ফেললে তার পক্ষে দুর্দশার বৃত্ত ভাঙাটা খুব কঠিন। তাকে তো কুমিরে আটকে ফেলেছে। কুমিরের দাঁতের মধ্যে পড়লে কী হয়? বেরোনোর উপায় থাকে না, টুকরা টুকরা করে খায়। ঋণ হচ্ছে এরকম ভয়াবহ!

আসলে মানুষকে দাসে পরিণত করে রাখার জন্যে শোষকদের অব্যর্থ হাতিয়ার এই ঋণ। সুদযুক্ত ঋণ, তা হোক ব্যবসা বা ভোগ্যপণ্যের জন্যে ব্যাংক, সমিতি বা অন্য কোনো অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা মহাজন থেকে নেয়া ঋণ কিংবা ক্রেডিট কার্ড, ঋণগ্রস্ত হলে আপনি পরিণত হবেন Debt Slave বা ঋণদাসে। এটা এমন এক দাসত্ব, যা শুধু একজন মানুষের স্বাধীনতাকে বিনষ্ট করে না, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এর কুপ্রভাব পড়তে থাকে।

বলা যায়, আজ দেশের একশ্রেণির মানুষের মধ্যে যে সর্বগ্রাসী নৈতিক অধঃপতন, তার অন্যতম মূল কারণ হলো ঋণ, বিশেষত ক্ষুদ্রঋণ। মানুষ যখন ঋণগ্রস্ত হয়, ঋণশোধের জন্যে অনেক সময় সে অন্যায়, অনৈতিক পথেও পা বাড়ায়। কারণ পাওনাদারের কাছে অপমানিত হওয়ার চেয়ে অন্যায়পথে দ্রুত কিছু হাসিল করে মুক্ত হওয়াকেই শ্রেয় মনে হয় তার। তা না পারলে সে আশ্রয় নেয় মিথ্যা আর ওয়াদা খেলাফের। এ কারণে যে সমাজে ঋণগ্রস্ততা বেশি, সেখানে নৈতিক অবক্ষয়ও বেশি। মিথ্যা, অসততা, অপরাধ

বেশি! সমীকরণটা খুব সহজ—একজন ঋণগ্রস্ত মানুষ মিথ্যা বলে আর যে মিথ্যা বলে সে যে-কোনো অপরাধে জড়িয়ে পড়ে সহজেই। ঋণের চাপে সে আর সৎ থাকতে পারে না। এজন্যে নবীজী (স) কুফর বা সত্য অস্বীকার এবং ঋণকে একই সমান বলেছেন। ক্ষতির বিবেচনায় দুটিই সমান।

একটি হাদীস হচ্ছে, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে সকল পাপ ও ঋণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' নবীজী (স) প্রায়ই এই দোয়া করতেন। একজন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসুল! আপনি কেন প্রায়ই ঋণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আল্লাহর আশ্রয় চান? তিনি জবাবে বললেন, ঋণগ্রস্ত হলে একজন মানুষ কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে।' [আয়েশা (রা); *বোখারী, হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী : ৮৪৭*]

প্রতিটি ধর্মই সুদ ও ঋণ থেকে মুক্ত হওয়াকে জোর দিয়েছে। তাই একজন ধার্মিক মানুষ কখনো ঋণী হতে পারে না, ঋণ রেখে মারা যাবে না।

**প্রশ্ন :** আমার বাবা বিশাল পরিমাণ ঋণ রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি বরিশালের বাড়ি হাউজ বিল্ডিংয়ে বন্ধক রেখে ২০ লাখ টাকা ঋণ করেন। আমরা নিষেধ করলেও তিনি শোনেন নি। আমরা দুই ভাইবোন স্বল্প বেতনে চাকরি করি। ঋণশোধের সামর্থ্য নেই আমাদের। আমার মা এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেন নি। অবশেষে বাড়ির অর্ধেক অংশের বিনিময়ে আমার স্বামী বাবার সেই ঋণের ২৪ লাখ টাকা শোধ করেন। এরপরও চার লাখ টাকা বাকি। এদিকে মা পেনশন পান মাসে নয় হাজার টাকা। টাকা হাতে পেলেই মা বেহুঁশের মতো হয়ে যান এবং অপ্রয়োজনীয় খরচ করতে থাকেন। আবার হা-হুতাশ করেন আর ঋণ করেন। ইতিমধ্যে সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে কিস্তি চালাচ্ছেন মা। এভাবে মা-ও ঋণের বেড়াজালে বন্দি। তাকে সহজভাবে বলি, কিন্তু গ্রহণ করেন না। অন্যকে দিয়ে বুঝিয়েছি, তা-ও মানেন না। আমরা খুব মর্মাহত ক্ষুব্ধ হতাশ। কী করব?

**উত্তর :** ২৪ লাখ দেয়ার পরেও চার লাখ টাকা বাকি রয়ে গেছে! এখন মৃত বাবার ঋণের বাকি টাকা শোধ করার চেষ্টা করুন। নয়তো তিনি পরপারে কষ্টে থাকবেন। মায়ের জন্যে দোয়া করেন এবং মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে মাকে বোঝান ঋণ যে কত ক্ষতিকর!

নিজেরা সুদে ঋণ নেয়া এবং অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটার ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। অপ্রয়োজনীয় খরচ যত কম করবেন, তত ঋণ থেকে বেঁচে যাবেন। কারণ আমাদের ৭০-৮০ ভাগ কেনাকাটাই অপ্রয়োজনীয়। শুধু ফুটানি করার

জন্যে, একটু হাততালি বা বাহবা পাওয়ার জন্যে অথবা লোক দেখানোর জন্যে আমরা ব্যয় করি।

তাই কিছু কেনার আগে নিজেকে তিনটি প্রশ্ন করবেন—আমার কি এটা প্রয়োজন? দ্বিতীয় প্রশ্ন : এটা কি আমার এখনই কেনা প্রয়োজন? দুটো প্রশ্নের উত্তরই 'হাঁ' হলে তৃতীয় প্রশ্ন : এটা ছাড়া কি আমার চলবেই না? যদি এর উত্তর 'না' হয়, তাহলে বুঝবেন এটি আপনার জন্যে একটি অপ্রয়োজনীয় ক্রয়। ঝোঁকের বশে আপনি এটা কিনতে চাইছেন।

ঋণ করাটা কিন্তু রোগ। 'স্ট্যাটাস' বাড়াতে অপ্রয়োজনীয় ও অহেতুক পণ্য কেনার অস্থিরতা মানসিক অসুস্থতারই প্রকাশ! এটা মানুষকে যেমন শান্তি দেয় না, তেমনি পরিবার ও সমাজের বুননটাকে নষ্ট করে।

**প্রশ্ন :** আমার চাচা মারা যাওয়ার পর চল্লিশা করার ব্যাপারে তার ছেলেরা আমাদের সাথে আলাপ করে। ঋণ করে হলেও চল্লিশার আয়োজন বড় করতে চাচ্ছিল চাচাতো ভাইয়েরা। আমরা তাদেরকে ঋণ করতে নিরুৎসাহিত করি এবং সামর্থ্যের মধ্যে খাওয়াতে বলি। তারা আমাদের কথা মেনে আয়োজন ছোট করেছে, ঋণ করে নি। আমাদের জন্যে দোয়া করবেন।

**উত্তর :** নিঃসন্দেহে আপনারা খুব ভালো কাজ করেছেন; ঋণের গজব থেকে তাদেরকে রক্ষা করেছেন। কারণ চল্লিশার আয়োজন বড় করায় কোনো উপকার তো হতোই না, বরং সুদযুক্ত ঋণ পরিবারটির মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও ঋণ থাকাটা কবিরা গুনাহ। নবীজী (স) বলেছেন, আল্লাহর পথে শহিদ হলেও ঋণ মাফ করা হবে না। এর শাস্তি ভোগ করতে হবে। [আবু কাতাদা হারিস ইবনে রিবি (রা); *মুসলিম; হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী ৮৫০*]। তাহলে তো মৃত ব্যক্তির চল্লিশা করতে গিয়ে ঋণ করা মানে সেটা মৃতের আত্মাকে কষ্ট দেয়ার শামিল।

ঋণের ব্যাপারে সবাইকে নিরুৎসাহিত করবেন, বোঝাবেন। কারো জীবনে যেন কখনো ঋণ না ঢোকে। ব্যাংক বা কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে কখনো ঋণ নেবেন না, এমনকি অন্য কারো ঋণের জামিনদারও হবেন না। কারণ ঋণগ্রহীতা যদি শোধ করতে না পারে, তাহলে সেই ঋণের পুরো দায়ভার জামিনদারকে বহন করতে হবে এবং আদালতের মাধ্যমে তাকে এই অর্থ সুদসহ ফেরত দিতে বাধ্য করা হবে। এতটাই ভয়ংকর!

মানুষ সাধারণত দুই ক্ষেত্রে বেশি ঋণ করে। এক হচ্ছে, বিয়েতে এবং দ্বিতীয়ত, কারো মৃত্যুর পরের আয়োজনে; অর্থাৎ মুসলমানদের চল্লিশা এবং

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধের খরচ তো ভয়াবহ ব্যাপার। কারণ বাবার শ্রাদ্ধ মানে তার বন্ধু ও প্রিয়জনদের দাওয়াত দিতে হবে এবং যত ধরনের আইটেম তিনি পছন্দ করতেন, সবগুলো দিয়ে তাদেরকে খাওয়াতে হবে!

চল্লিশা করতে গিয়ে লোক দেখানো যে বাড়াবাড়ি, সেটা মৃতের আত্মার জন্যে বরং কষ্টদায়ক। অথচ আমাদের সমাজে এমনটা ঘটছে প্রায়শই। ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট হলো—ঋণের দায়ে আত্মহত্যা করা সেই মিনারুলের চল্লিশা করা হলো ঋণ নিয়েই। গত মাসে রাজশাহীর মিনারুল ঋণের দায়ে নিজের স্ত্রী ও দুই সন্তানকে হত্যা করার পর আত্মহত্যা করেছিলেন—এই খবরটা আগেই বলেছিলাম। এই মিনারুলদের চল্লিশার আয়োজনে ১,২০০ মানুষকে খাওয়াতে এক লাখ টাকা খরচ করেছেন তার বাবা। পুরোটাই ঋণ নিয়ে! তিনি বলেন, ‘সমাজের মানুষকে নিয়ে চল্লিশা করতে হয়। বাপদাদার আমল থেকেই এটা দেখে আসছি। আমিও করলাম। টাকা জোগাড় হলো ধারদেনা করে।’

এভাবেই মানুষ ঋণের ফাঁদে পা দিয়ে নিঃস্ব হয়। কবিগুরুর ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতায় ঋণগ্রস্ত মানুষের করুণ অবস্থাটা ফুটে উঠেছে স্পষ্টভাবে। এই কবিতায় উপেন হলো ঋণগ্রস্ত শোষিত মানুষ, যার জমিজমা ভিটেবাড়ি সবই জমিদারের হয়ে গেল। পরবর্তীকালে নিজের জমিতে লাগানো গাছ থেকে ঝরে পড়া একটি আম কুড়িয়ে নেয় উপেন। এজন্যে তাকে চোর হিসেবে মার খেতে হলো! তখন নিঃস্ব উপেনের বক্তব্য ছিল—‘তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে’।

ঋণ যে আক্ষরিকভাবে মানুষকে দাসে পরিণত করে তার ইতিহাসও হাজার বছরের। আগেকার দিনে মহাজনরা যাদেরকে ঋণ দিতেন, গরিব সেই মানুষগুলোকে ঋণশোধ না হওয়া পর্যন্ত মহাজনের বাড়িতে পেটেভাতে কাজ করতে হতো। এমনকি ঋণশোধ না হলে বংশানুক্রমেও; মানে বাবার মৃত্যুর পর ছেলেকে, ছেলের মৃত্যুর পর নাতিকে, নাতির মৃত্যুর পর পুতিকে বেগার খাটতে বাধ্য করা হতো।

আমেরিকান নৃবিজ্ঞানী অধ্যাপক ডেভিড গ্রেবার তার বিখ্যাত বই *ডেট : দ্য ফার্স্ট ফাইভ থাউজেন্ড ইয়ার্স*-এ ঋণের পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসে খুব করুণ সব ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি নেপালের ঘটনা উল্লেখ করেছেন যে, সেখানে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের শিকার হতে হতো এক নিষ্ঠুর সংস্কৃতির। সেটা কেমন? নেপালে মেয়ের বিয়েতে ধুমধাম করতে হবে বলে মহাজন ঋণ দেবে এবং মেয়ের বিয়েও হয়ে যাবে। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির বদলে মেয়েটিকে বিয়ের পরদিন ভোরে চলে যেতে হবে ওই ঋণদাতা মহাজনের বাড়িতে।

মহাজন যতদিন খুশি তাকে রাখবে, ভোগ করবে যৌনদাসী হিসেবে। এমনকি ঋণশোধ করার জন্যে মেয়েটিকে পতিতালয়েও পাঠিয়ে দিতে পারে। এভাবে এক/ দুবছর পর মহাজন যখন মনে করবে যে, ঋণশোধ হয়েছে, তখন মেয়েটি মুক্তি পাবে। তারপরে মেয়েটি শ্বশুরবাড়িতে ফিরে সংসার শুরু করতে পারবে। নিম্নবর্ণের মানুষদের কষ্টটা সবচেয়ে বেশি। ঋণ থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের কোনো পরিত্রাণ নাই।

অতএব ঋণের ব্যাপারে নিজেকে সচেতন হতে হবে, আল্লাহর কাছে ঋণ থেকে পানাহ চাইতে হবে। চারপাশের মানুষকেও এই গজব থেকে বাঁচানোর জন্যে সচেতন করে তুলতে হবে। এজন্যে নিয়ত থাকাটা জরুরি যে, কোনোভাবেই আমি ঋণ এবং সুদের সাথে জড়িয়ে পড়ব না।

## সম্পত্তি নিয়ে যত দ্বন্দ্ব

**প্রশ্ন :** আমরা দুই ভাই, এক বোন। আমাদের দুই ভাইয়ের বয়স ৪১ এবং ৩০। বোন ২০ বছরের ছোট। বিয়ের পর থেকে বোন তার স্বামী ও দুই সন্তান নিয়ে আমাদের বাড়িতেই আছে। মা-বাবা আমাদের বোনের যাবতীয় খরচ বহন করে। অথচ বোন-জামাইয়ের মাসিক আয় এক লাখ টাকা। আমার বাবার একটি বাড়ি এবং মায়ের একটি বাড়ি আছে। সেখান থেকে বাবা মাসে ৭০ হাজার টাকা পান আর মা পান ৪০ হাজার। মায়ের সব টাকা বোন-জামাই পায়। টাকার নিয়ন্ত্রণ থাকে বোনের কাছে। মা ছেলেদের সাথে এমন আচরণ করে যেন ছেলেরা পর, জামাই তার পেটের সন্তান। মা শুধু ছেলেদের সাথে অভিনয় করে। তাই আমরা দুই ভাই আমাদের পরিবার ও সন্তান নিয়ে একটা অনিশ্চয়তায় ভুগি। পারিবারিক অশান্তি তো আছেই। আপনি যদি বিষয়টি নিয়ে বলেন, তাহলে খুব উপকৃত হবো।

**উত্তর :** আপনারা ৪১ বছর এবং ৩০ বছর বয়সের দুজন পুরুষ মানুষ। আপনারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন আর ভাবছেন, মা-বাবার বাড়ি বা টাকা আপনাদেরকে নিরাপত্তা দেবে। এটা বড় আফসোসের বিষয়। মা-বাবা যাকে খুশি দিয়ে দিক। আপনার রিজিক কি কাউকে দিতে পারবে? এই বয়সে মা-বাবার কাছ থেকে নিরাপত্তা চাওয়ার তো কিছু নেই। এখন মা-বাবাকে নিরাপত্তা দেবে সন্তানেরা।

এই বয়সী একজন পুরুষের নিজের কর্মক্ষমতা এবং নিজের পরিচয় থাকা উচিত। কখনোই মা-বাবার ওপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়। বরং

আপনি কীভাবে মা-বাবার সেবা করা যায় তা চিন্তা করুন। তাহলে আপনি বড় হবেন। আর আপনি যদি চান যে, মা-বাবা আপনাকে দেখবে, আপনাকে নিরাপত্তা দেবে, তাহলে কোনোদিনই আপনি বড় হতে পারবেন না। আপনার মেধাকে কাজে লাগাতে পারবেন না।

আপনি যেহেতু এ পর্যন্ত উপার্জন করে মা-বাবাকে দেন নি, অতএব তাদের উপার্জনের দিকে তাকাবেন না। তাকালে দৃষ্টিটা ছোট হয়ে যাবে। আর এই তাকানো মানে হচ্ছে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি নেতিবাচক। মা-বাবা অন্যকে কী দিয়ে দিলো, সেদিকে দৃষ্টি দিতে দিতে আপনি কী উপার্জন করতে পারেন, সেদিকে দৃষ্টি দিতে পারছেন না। কারণ যখন কেউ অন্যের দিকে দৃষ্টি দেয়, তখন সে নিজের সম্ভাবনার দিকে আর দৃষ্টি দিতে পারে না। নিজে কী করতে পারে তা সে তখন ভুলে যায়।

অতএব মা-বাবার সম্পত্তির দিকে কখনো তাকাবেন না। বরং তাদের বলবেন, তোমাদের সম্পদ যাকে খুশি তোমরা দিয়ে যাও। আমাদের যা দরকার আমরা শ্রম দিয়ে তা অর্জন করব এবং নিজেদের পাশাপাশি তোমাদের প্রয়োজনও যেন পূরণ করতে পারি সেজন্যে দোয়া করো।

অর্থাৎ এ বয়সে আপনারা মা-বাবার আশ্রয়স্থল হবেন। মা-বাবার যত সম্পদ থাক বা না থাক, মা-বাবাকে যেন প্রত্যেক মাসে হাতখরচ দিতে পারেন, সেই চেষ্টা করবেন। সুসন্তান হিসেবে এটাই হচ্ছে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি। আপনি দাতা হবেন, গ্রহীতা নয়। এমনকি মা-বাবার কাছ থেকেও নেবেন না। সবসময় চিন্তা করবেন, আমি মা-বাবাকে কী দিতে পারি। প্রার্থনা করবেন, আল্লাহ! আমার মস্তিষ্কটাকে কাজে লাগানোর সামর্থ্য দাও, যেন আমি মা-বাবাকে মাসে লাখ টাকা দিতে পারি।

মা-বাবা তাদের মেয়ে আর জামাইকে নিয়ে থাকে—এর মানে তারা মেয়ে জামাইয়ের প্রতি সন্তুষ্ট। এই জামাই তো যথেষ্ট বুদ্ধিমান। তার কাছে আপনি বুদ্ধিতে হেরে গেছেন। তা না হলে আপনার মা-বাবা আপনার সাথে অভিনয় কেন করবে? কারণ আপনি সবসময় শুধু পেতে চেয়েছেন আর পেতে শিখেছেন। কিন্তু যা পেতে চান, তা অর্জন করতে শিখুন। সে লক্ষ্যে কাজ শুরু করুন আজ এই মুহূর্ত থেকে।

মানুষ যেভাবে তার লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে, আল্লাহ তার কর্মধারাকে সেভাবেই পরিচালিত করেন। আপনার লক্ষ্যটা এখনো নেতিবাচক, ফলে আপনার কাজে বরকত আসবে কম, এটাই স্বাভাবিক। তাই লক্ষ্যকে ইতিবাচক করুন। নিজে বড় হওয়ার চেষ্টা করুন, উপার্জন করুন। দাতা হওয়ার চিন্তা করুন। তাহলে আপনি সফল হবেন।

অধিকাংশ মানুষই ব্যর্থ হয় তাদের নেতিবাচক লক্ষ্যের কারণে। কে কী পেল, কে কী উপভোগ করল, এটার দিকে দৃষ্টি চলে যায়। আমি কী করতে পারি এদিকে লক্ষ্য থাকে না। যারা লক্ষ্য স্থির করতে পেরেছেন, তারা লক্ষ্য অর্জন করেছেন।

আমি দুঃখিত, আপনার প্রতি কোনো সমবেদনা জানাতে পারলাম না। আমি দোয়া করি যেন আপনার ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি দূর হয়। এই যে মেয়ের জামাইকে মা-বাবা বেশি পছন্দ করে, এটা কিন্তু ছেলে হিসেবে আপনার ব্যর্থতা। আপনি মা-বাবাকে সেই ভরসা দিতে পারেন নি। কারণ এখনো আমাদের যে সামাজিক পরিমণ্ডল, অধিকাংশ মা-বাবা ছেলের সাথেই থাকতে চায়। মেয়ের সাথে থাকাটাকে অসম্মানজনক মনে করে। সেখানে কেন আপনার মা-বাবা আপনাকে বাদ দিয়ে মেয়ের সাথে থাকবে? কারণ তারা আপনার ওপর ভরসা করতে পারছে না। আপনি মা-বাবার ভরসাস্থল হোন। মা-বাবা আপনার কাছে চলে আসবে।

**প্রশ্ন :** আমার বাবার অবৈধ ব্যবসা। চোরাকারবারি করে তিনি টাকার পাহাড় গড়েছেন আমাদের আর্থিক নিরাপত্তার জন্যে। কিন্তু আমি বাবার এসব অবৈধ কাজ ঘৃণা করি। তার অনৈতিক কাজের জন্যে তার প্রতি কোনোরকম শ্রদ্ধার জায়গা নেই আমার মনে। বরং আমাকে হারাম উপার্জনে লালন করেছে বলে তার প্রতি প্রচণ্ড ক্ষোভ হয়। মনে হয়, এত অঢেল সম্পদ আর এত বিলাসিতার মধ্যে না রেখে যদি সৎ উপায়ে অল্প উপার্জনে আমাকে বড় করত, তাহলে গর্ববোধ হতো, মনে তৃপ্তি পেতাম। তাছাড়া একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে এসব অবৈধ অর্থসম্পদ তো আমার কাছেই আসবে। কিন্তু এগুলো দিয়ে আমি কী করব? আমি তো এ পাপগুলো নিতে চাই না। এরকম বাবাকেই বা আমি কীভাবে সম্মান করব?

**উত্তর :** বাবাকে সম্মান করার জন্যে এটুকুই যথেষ্ট যে, তিনি আপনার বাবা। বাবা অথবা মাকে তো পরিত্যাজ্য ঘোষণা করারও কোনো সুযোগ নেই। তিনি আপনার জন্মদাতা, শুধু এজন্যেই আপনার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। অন্তরে এই কৃতজ্ঞতা থাকলে আপনি তাকে সম্মান করতে পারবেন। চোরাকারবারি নিঃসন্দেহে গর্হিত কাজ। কিন্তু বাবার প্রতি ক্ষোভ রাখবেন না। ঘৃণা করবেন পাপকে, পাপীকে নয়। ঘৃণাও মনের একটা জঞ্জাল।

অতএব ঘৃণা করে আপনার মনকে কলুষিত না করে বাবার প্রতি সন্তান হিসেবে আপনার যা করণীয় তা করুন। তার সাথে উত্তম আচরণ করুন।

যতটুকু সেবা তার প্রয়োজন, তা তাকে দিন। তার জন্যে দোয়া করুন, যেন তিনি তার ভুল বুঝতে পারেন এবং অসৎ পথ থেকে ফিরে আসতে পারেন। আর উত্তরাধিকারী হিসেবে এসব অবৈধ অর্থসম্পদ আপনি ভোগ না করলেই হলো। অর্থাৎ এসব সম্পদের সবটুকু আপনি ভালো কাজে, মানুষের কল্যাণে দান করে দিতে পারেন। তাহলে অন্তত অনেক প্রান্তিক মানুষ, বঞ্চিত মানুষ এ অর্থ থেকে উপকৃত হবে। এতে আপনার আত্মা পরিতৃপ্ত হবে।

আমরা আপনাকে আপনার সুন্দর ও সঠিক মানসিকতার জন্যে অভিনন্দন জানাই যে, অবৈধ উপার্জনে বিলাসিতার প্রতি আপনার কোনো আগ্রহ নেই। আপনি বিবেকটাকে জাগ্রত রেখেছেন। ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে পারছেন। এই পবিত্র মানসিকতাটা ধরে রাখুন। আমরা দোয়া করি। আল্লাহ তায়ালা সবসময় আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন।

**প্রশ্ন :** মনে অনেক কষ্ট। মায়ের সাথে কথা বলি না পাঁচ বছর। আমার বাবা নেই। বাবা সব সম্পত্তি করেছিলেন আমার মায়ের নামে। মা সব সম্পত্তি তার দুই ভাইয়ের নামে লিখে দিয়েছেন কাউকে না জানিয়ে। আমাদেরকে কিছুই দেন নি। আমার ছোটবোন ও ভগ্নিপতি দুজনই মারা গেছে। তাদের এতিম মেয়েকে জন্ম থেকে আমি লালনপালন করছি। তাকে পর্যন্ত ঠকাতে বুক কাঁপে নি আমার মায়ের। অল্প কথায় আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না, কত স্বার্থপর আমার মা! বুকটা কষ্টে ভরে যায়। কেন এমন হয়?

**উত্তর :** সবকিছুর পরও মনে রাখবেন মা তো মা-ই। আপনার মা সব সম্পত্তি তার ভাইদের দিয়ে দিয়েছেন। ভালো হয়েছে। আপদ গেছে। সম্পত্তির জন্যে কষ্ট পাবেন কেন? মা যদি আপনাকে বুকের দুধ না দিতেন, আজকে আপনি এই কষ্টের কথা বলতে পারতেন? এই পর্যন্ত যে আসতে পেরেছেন, মা যদি ছোটবেলায় লালন না করতেন, তাহলে এই আলোকিত পথে আসতে পারতেন? মাকে অন্তর থেকে মাফ করে দিন। সম্পত্তির জন্যে মায়ের সাথে রাগ করা যায় না। নীতিগত কোনো ব্যাপার হলে ভিন্ন কথা হতো।

আপনি একজন এতিম মেয়েকে লালন করছেন। এটা অনেক বড় কাজ। নবীজী (স) বলেছেন, 'আমি [নবীজী (স)] এবং একজন এতিমের দায়িত্ব গ্রহণকারী, আমরা একসাথে জান্নাতে প্রবেশ করব। (তর্জনী ও মধ্যমা একসাথে তুলে দেখিয়ে বললেন, এই দুই আঙুলের মতো) জান্নাতে একসাথে থাকব।' [সহল ইবনে সাদ (রা); *বোখারী, মুসলিম; হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী : ৩২৮*]

আপনি সৌভাগ্যবান যে, আপনি একটা এতিম মেয়েকে লালন করছেন। একে লালনের জন্যে আপনার মায়ের সম্পত্তির কোনো প্রয়োজন নেই। তার মা-বাবা না থাকার পরও আপনি যে-রকম তাকে লালন করছেন, তেমনি আপনি না থাকলেও কেউ না কেউ তাকে লালন করবে। কিন্তু তাকে লালন করে আপনি সওয়াবের অধিকারী হচ্ছেন।

এখন মায়ের প্রতি এই যে কষ্ট রাখছেন, এই কষ্টটা আপনাকে অসুস্থ করছে। যদি এই সম্পত্তি আপনার মায়ের কাছ থেকে কেউ জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যেত, তখন আপনি কী করতে পারতেন? অতএব সম্পত্তির জন্যে কখনোই মায়ের সাথে রাগ করবেন না। আল্লাহ তায়ালা এর শতগুণ প্রতিদান আপনাকে দেবেন, ইনশাআল্লাহ।

**প্রশ্ন :** আমার স্বামী একটি মামলায় জেল খেটেছেন নয় মাস। এখন আরেকটা মামলায় হাইকোর্টের নির্দেশ মোতাবেক আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ১৩ লক্ষ টাকা এবং পরের মাসে ব্যাংকে ২০ লক্ষ টাকা ঋণশোধ করতে হবে। এমতাবস্থায় আমার একটি ফ্ল্যাট বিক্রির সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু ফ্ল্যাটটি যেহেতু আমার ভাইয়ের নামে কেনা, সে দাবি করছে ফ্ল্যাট বিক্রি করলে তাকে ৩০ লক্ষ টাকা দিতে হবে। এখন আমরা এমনিতেই মৃত, সে আমাদের আরো মেরে ফেলতে চাচ্ছে। গুরুজী, আমাদের করণীয় কী?

**উত্তর :** আমরা সমব্যথী, কিন্তু আদতে এটাই হওয়ার ছিল। কারণ আপনি যখন ভাইয়ের নামে ফ্ল্যাট কিনেছেন, তখন বাস্তবতা হয়তো এই—আপনার অর্থটা বৈধ কোনো পথে অর্জিত ছিল না। তাই নিজের নামে কেনার চেয়ে ভাইকে নিরাপদ মনে করেছেন। এখন ভাই মনে করছে, 'যো আপসে আপ আতা হ্যায় সব হালাল হ্যায়'।

সেই গল্পটা তো জানেন নিশ্চয়ই। এক মওলানা সাহেব ওয়াজ করছেন যে, তিনি গোশত খান না। কিন্তু খেতে বসে দেখলেন, গোশত ছাড়া আর কিছুই নেই। তখন বললেন, ঠিক আছে একটু ঝোল দাও। ঝোল দিতে গিয়ে গোশতের একটি টুকরো পাতে পড়ে গেছে। মেজবান খুব শঙ্কিত হয়ে উঠিয়ে নিতে যাবেন, তখন মওলানা সাহেব তাকে থামিয়ে বললেন, 'ছোড় দো ছোড় দো, যো আপসে আপ আতা হ্যায় সব হালাল হ্যায়'। অর্থাৎ আপনাআপনি যেহেতু এসে পড়েছে, অতএব এটা হালাল।

আপনার ভাইও সেটাই মনে করছে—নিশ্চয়ই দুলাভাই নয়-ছয় করেছে। তা না হলে আমার নামে কেন ফ্ল্যাট রাখবে? অতএব আমি এর সুযোগ তো

নিতেই পারি। একথা বলার উদ্দেশ্য হলো বাস্তবতা তুলে ধরা, কাউকে ছোট করা নয়। এখন আপনার কাজ হবে, যা হয়ে গেছে সেজন্যে তওবা করা। তওবার অর্থ হলো আন্তরিক অনুশোচনা ও আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করা। সেইসাথে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া যে, এ অন্যায় আর কখনো হবে না। আমরা দোয়া করি, যেন আপনারা দ্রুত এ জটিলতা কাটিয়ে উঠতে পারেন।

**প্রশ্ন :** মা-বাবা, দুলাভাই সবার সাথে আমার ছোট ভাই অন্যায় ব্যবহার করে। বাবাকে গালিগালাজ করে। তার কথা, এক বনে দুই বাঘ থাকতে পারে না। বাবাকে তার কাছে মাফ চাইতে হবে। কারণ বাবা তার জীবন নষ্ট করে দিয়েছে। বাবা কেন তাকে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেন নি? কেন বাবা টেক্সটাইল ব্যবসা তার হাতে ছেড়ে না দিয়ে বিক্রি করে দিয়েছে? এসব কারণে বাসায় অশান্তি শুরু হয়েছে। কথায় কথায় সে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। টাকা না দিলে বাসায় অফিসে আগুন লাগানোর ভয় দেখায়। সে অন্যায়ভাবে মা-বাবাকে দোষ দিচ্ছে। তাকে দুই মাস আগে কোয়ান্টাম কোর্স করানো হয়েছে। দুই বছর আগে হজও করানো হয়েছে। কোনোভাবেই কিছু বোঝানো যাচ্ছে না। বাবার সাথে দুই বছর ধরে কথা বন্ধ। এখন ভাবছি তাকে মনোচিকিৎসকের কাছে পাঠাতে হবে। কী করতে পারি? উল্লেখ্য, সে অস্ট্রেলিয়া থেকে এমবিএ করেছে। গুরুজী, আপনার পরামর্শ চাচ্ছি।

**উত্তর :** যে বাবার ওপর নির্ভর করে, বাবা প্রতিষ্ঠিত করে দেবে আশা করে সে তো বাঘ নয়। সে বিড়ালও নয়, সে ইঁদুর। অবশ্য তার দোষ নেই। ছোটবেলা থেকে তাকে সঠিক জীবনদৃষ্টি দেয়া হয় নি। জীবন কী, এটা বুঝতে দেয়া হয় নি। তাকে যেভাবে লালন করা উচিত ছিল সেভাবে হয় নি।

আজকে আপনার ভাইয়ের অবস্থার জন্যে আপনার ভাই যতটা দায়ী, আপনার মা-বাবার দায়িত্বও কোনো অংশে কম নয়। কারণ একজনকে বড় স্কুলে, নামকরা কলেজে বা ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। অস্ট্রেলিয়া থেকে সে এমবিএ করেছে, কিন্তু ন্যূনতম যে মানবীয় গুণ অর্জন করা উচিত ছিল, সেটুকু করে নি। কারণ ছেলে যা চেয়েছে তা-ই দেয়া হয়েছে। তবে বাবা যখন বুঝেছে এই ফ্যাক্টরি ছেলেকে দিলে সে চালাতে পারবে না, তখন ফ্যাক্টরি আর দেয় নি। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে।

তাই ছোটবেলা থেকেই ছেলেমেয়েকে সঠিক জীবনদৃষ্টি দিতে হবে। তাকে বোঝাতে হবে যে, তোমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। তাকে পরিশ্রমী ও কষ্টনির্ভর করে গড়ে তুলতে হবে। একটা পাকা বাঁশ আর সোজা

করা যায় না, কাঁচা থাকতেই সেটিকে যা করার করতে হয়। এখন তাকে মনোচিকিৎসকের কাছেই পাঠানো প্রয়োজন। আর আপনি আপনার ভাইকে মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে বোঝাতে থাকুন। তার কল্যাণের জন্যে নিয়মিত দান এবং দোয়া করতে থাকুন।

**প্রশ্ন :** বাবার সম্পত্তি চাইতে গেলে ভাইয়েরা এমন বাজে কথা বলে, যা সহ্য করতে পারি না, আবার রাগও করতে পারি না। কিন্তু খুব মন খারাপ থাকে। আমার সম্পত্তি আমাকে দেবে, কিন্তু তাদের এমন অহংকার—যেন দয়া করে দেবে। আপনজনদের কাছ থেকে কষ্ট পেলে কিছুতেই ভুলতে পারি না। সারাদিন মনে মনে কষ্ট পেতে থাকি। কী করব, দয়া করে বলবেন কি?

**উত্তর :** আমরা রক্তের সম্পর্ককে আপন মনে করি, এটাই বড় ভুল। রক্তের সম্পর্ক রক্তীয়। রক্তীয় সম্পর্কও রক্তারক্তির কারণ হতে পারে, যদি সে সম্পর্ক আত্মার বা চেতনার না হয়। বরং বলা যায়, ইতিহাসে রক্তের সম্পর্কে যত রক্তারক্তি হয়েছে, অন্য সম্পর্কে তা হয় নি। ক্ষমতার জন্যে, সম্পদের জন্যে, নারীর জন্যে ভাই ভাইকে যত খুন করেছে শত্রুও শত্রুকে তা করে নি।

কিন্তু সম্পর্ক চেতনার হলে এই ভুল বোঝাবুঝি হতো না। আসলে চেতনা ও বিশ্বাসের সম্পর্ক ছাড়া মানুষ কখনো আপন হয় না। মনে রাখতে হবে, আত্মার সম্পর্ক যার সাথে সে-ই প্রকৃত আত্মীয়। এখন যে ভাই বাবার সম্পত্তির ভাগ দেয় না, সে আপন হয় কীভাবে? আর যদি আপনই মনে করেন, তাহলে বাবার সম্পত্তি দিচ্ছে না বলে কেন কষ্ট পাবেন?

যদি আপনি মনে করেন যে, আপনার অধিকার ছাড়বেন না; তাহলে এ অধিকার আদায়ের জন্যে আপনার যা যা করা দরকার, তা করতে পারেন। দরকার হলে আইনের আশ্রয় নিতে হতে পারে। এখানে আবেগকে স্থান দেয়ার সুযোগ নেই। অর্থাৎ আপনাকে কোনো একটি অবস্থান নিতে হবে। হয় সম্পত্তির তুলনায় ভাইকে বড় মনে করতে হবে এবং তার আচরণকে মেনে নিতে হবে। নয়তো নিজের আইনসঙ্গত অধিকার আদায়ে যথাযথ পদ্ধতিতে এগোতে হবে। এ দুটোর মাঝামাঝি থাকলে আপনি কষ্ট পাবেন।

**প্রশ্ন :** আমি বাবার বাড়ি থেকে কিছু জমি পেয়েছি। এই জমি আমার ভাইয়ের ছেলের কাছে বিক্রি করেছি, কিন্তু সে জমির সঠিক দাম দেয় নি। জমি বিক্রির টাকা আমি লামার মাদ্রাসা/ মসজিদে দান করতে চাই। জমি বিক্রির ন্যায্য টাকা আদায়ের জন্যে আমার কি কোনো পদক্ষেপ নেয়া উচিত হবে?

**উত্তর :** পদক্ষেপ নেবেন কিনা এটা নির্ভর করে সম্পর্কের ওপর। সে যেহেতু ভাইয়ের ছেলে, বেশি ধমকাধমকি করলে কী হবে? বলবে, আচ্ছা দিয়ে দেবো। হয়তো পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে আর কোনো খবর নেই। সে যদি বলে—আর দিতে পারব না ফুপু, মাফ করে দেন, আপনি কী করবেন তখন? এ-ক্ষেত্রে অন্য পদক্ষেপ নিয়েও লাভ নেই। শুধু আপনার পয়সা খরচ হবে, অর্জন কিছুই হবে না। অতএব টাকা দিলে ভালো, না দিলে আরো ভালো।

যদি আপনি একান্তই টাকাটা আদায় করতে চান, তাহলে মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে তাকে বোঝান। রাগ ক্ষোভ নিয়ে নয়, খুব মমতার সাথে বোঝাবেন যে, এই টাকাটা আমার ন্যায্য পাওনা। তুমি যদি দিয়ে দাও, টাকাটা আমি ভালো কাজে ব্যয় করব। এর সওয়াব তুমিও পাবে। মেডিটেশনে কখনো রাগ, ঘৃণা বা ঈর্ষা করে কাউকে কিছু বলতে যাবেন না। খুব দরদ দিয়ে বলবেন। আশা করা যায় এটা কাজ করবে।

## পরিবার থেকে দূরে থাকা

**প্রশ্ন :** পেশাগত কারণে সপ্তাহে ছয় দিন পরিবার হতে দূরে থাকি। একাকী থাকার জন্যে কিনা জানি না অনেক নেতিচিন্তা ও দুশ্চিন্তা মাথায় ভর করে। স্ত্রীর নিকট প্রিয় স্বামী, একমাত্র ছেলের নিকট প্রিয় বাবা হয়ে উঠতে পারছি না। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্যে আমার কী করণীয়?

**উত্তর :** আপনি ছয় দিন আলাদা থাকছেন। সপ্তম দিন তো আপনার পরিবারের সাথে থাকছেন। একদিন যে থাকলেন, কোয়ালিটি টাইম দিন। মনোযোগ দিন ওই একদিন। পরিবারের সাথে সপ্তাহে সাত দিন থাকার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো একসাথে কাটানো সময়গুলো সুন্দর করা।

আসলে সুখের স্মৃতির সংখ্যা কিন্তু কম। আমরা তো পরিবারকে কোয়ালিটি টাইম দেই না। আপনি যদি প্রতিদিন সন্ধ্যায় পরিবারে ফিরেই সোফায় হেলান দিয়ে টেলিভিশন বা স্ক্রিন দেখেন, তাহলে তো পরিবারকে সময় দেয়া হলো না। এটা স্ক্রিনকে সময় দেয়া হলো। যারা এভাবে সপ্তাহে ছয় দিনও সময় দেন, তারা কি পরিবারের প্রিয় হতে পারবেন?

পরিবারের প্রিয় হওয়ার জন্যে কত সময় দিলেন এটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। মনে রাখার মতো সময় দিচ্ছেন কিনা এটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। মনে করবেন, সেই সময়টুকুতে স্ত্রী এবং সন্তান ছাড়া আপনার জগতে কেউ নেই। তাহলে আপনার স্ত্রী ছয় দিন সময় চাইবেন না। তিনি অপেক্ষা করবেন সপ্তম দিনের

জন্যে। ছেলে ছয় দিন সময় চাইবে না, অপেক্ষা করবে ওই দিনের জন্যে যে, বাবা আজকে আসবে। বাবা এলে আমাকে ছাড়া কাউকে চিনবে না। জীবনে সুখের রহস্যটা এখানে। যতটুকু সময় আপনি দিচ্ছেন এটুকু যেন তার জীবনে খুব ভালো স্মৃতি হয়ে থাকে।

**প্রশ্ন :** আমার বন্ধুবান্ধব কেউ নেই। পরিবার থেকেও আমি অনেক দূরে থাকি। নিজেকে অনেক একা মনে হয়। পরিবারকে জানালে তারা বলে, আমরাও ছাত্রজীবনে একা ছিলাম। তুমিও পারবে। আমি নিজেকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারছি না। কী করব?

**উত্তর :** ছাত্রজীবনে এত সহপাঠী থাকতে এবং এত বড় কোয়ান্টাম পরিবার থাকতে আপনি কীভাবে একা হবেন? একা থাকার তো কোনো সুযোগ নেই। আপনার জন্যে প্রথম সঙ্গী হবে বই। ক্লাসের পর পাঠ্যবই ছাড়াও ভালো ভালো নানারকম বইয়ের ভেতর ডুব দিন।

দ্বিতীয়ত, নিয়মিত সাদাকায়নে যান। কোয়ান্টামে সেবামূলক কাজের সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংযুক্ত হোন। এখানে কাজের অভাব নেই। তাছাড়া কোয়ান্টিয়ার হিসেবে অন্যের কল্যাণে কাজ করলে আপনার মধ্যে নতুন নতুন দক্ষতা সৃষ্টি হবে, আপনি বিকশিত হবেন। এ কাজগুলো করতে গিয়ে আপনি নানান বয়সের সঙ্গীও পাবেন, যারা সুখে-দুঃখে আপনার পাশে থাকবে, আপনার জন্যে দোয়া করবে। ফলে আপনার একাকিত্বও থাকবে না আর।

**প্রশ্ন :** সারাদিন একা থাকা ধূমপানের মতোই ক্ষতিকর, সেটা জানি। কিন্তু স্বামীর চাকরিসূত্রে পরিবার থেকে দূরে থাকি। দিনের প্রায় ১২ ঘণ্টা একা থাকি। নিয়মিত মেডিটেশন করি। এই ক্ষতি থেকে পরিত্রাণের উপায় কী?

**উত্তর :** একা থাকাটা কাদের জন্যে ক্ষতিকর? যারা একা ডিভাইস নিয়ে পড়ে থাকে এবং মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন থাকে। যাদের আত্মিক শক্তির সাথে বা ধারাপরম্পরার সাথে কোনো বন্ধন নেই। অনেক সাধু মুনি ঋষি দিনের পর দিন একা থাকতেন জঙ্গলে। সেটা তাদের কোনো ক্ষতি করে নি। কারণ তারা একা থেকেও বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। তারা প্রভুর সাথে সংযুক্ত ছিলেন।

আপনিও যদি এই সময়টাকে কাজে লাগান এবং মৌনতায় ডুব দিতে পারেন, আপনি আপনার শিক্ষককে অতিক্রম করে যাবেন। আপনার জন্যে এটা তো একটা বিশাল সুযোগ, যদি সময়টাকে কাজে লাগাতে পারেন। বিয়ে

করার পরেও প্রতিদিন ১২ ঘণ্টা একা থাকার মতো নিজস্ব নিরিবিলি সময় কজন মহিলা পায়? এতক্ষণ একা থাকার সময় পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। অতএব শুকরিয়া আদায় করুন।

আগামী একবছরের জন্যে একটি রুটিন করে নিন। এসময় আপনি প্রভুর জিকিরে থাকবেন। আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করবেন; আপনার জীবনে তাঁর দয়া ও করুণার কথা স্মরণ করবেন। জ্ঞানের সাথে থাকবেন। মোবাইল এবং সব ধরনের স্ক্রিন থেকে দূরে থাকবেন। ঘরের কাজ যা থাকে সেই কাজ করবেন। ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও ঝকঝকে করে রাখবেন।

বাকি সময়টুকু হিরন্ময় মৌনতা। এসময় *আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী* এবং *হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী* পড়বেন। কোয়ান্টাম মেথড বই এবং কোয়ান্টামের অন্যান্য প্রকাশনা পড়বেন। নিয়ম করে প্রতিদিন চার ঘণ্টা কোয়ান্টায়ন করবেন। যা যা পড়লেন সেটা নিয়ে মৌন থেকে ভাববেন। শুধু ভাবনার জগতে থাকবেন যে, আজ আমি এই এই পড়লাম, এই শিখলাম, এই এই বিষয় নতুন করে উপলব্ধি করলাম।

এভাবে ১২ মাসের জন্যে কর্মপরিকল্পনা করুন। নিজেকে এরকম রুটিনে ব্যস্ত রাখলে আপনি আল্লাহর সাথে যুক্ত থাকবেন। একবছর পর নিজের পরিবর্তন নিজেই বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

## পরিবার ॥ বিবিধ

**প্রশ্ন :** মেডিটেশন করতে পারছি না। ছোট ছোট দুটি সন্তান এবং পারিবারিক দায়িত্ব সামলে আমি কখনো ধ্যানমগ্ন হতে পারি না গত দুবছর ধরে। অবশেষে ঠিক করেছি আমার বাস্তবতাই আমার মনের বাড়ি। চারপাশের সব কোলাহলের মাঝেই আমি নির্লিপ্তভাবে সচেতন থাকব। সবসময় স্রষ্টা-সচেতন থাকব এবং প্রতিটি কাজ আনন্দিতচিত্তে দায়িত্ব নিয়ে শুধু স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্যে করব। আমি অনেকটা সক্ষম হয়েছি। এভাবে করলে কি ধ্যানের পথে এগিয়ে যেতে পারব? দোয়া করবেন।

**উত্তর :** বাহ! একজন সংসারী মানুষ সংসারের মধ্যে থেকে ধ্যানস্ত থাকবে, এটাই তো প্রয়োজন। ধ্যানস্ত থাকা মানে কী? যখন যে কাজটা করছেন সেটা সবচেয়ে মনোযোগ দিয়ে করা এবং স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্যে করা। আপনার এই যে আইডিয়া—কোলাহলের মাঝে নির্লিপ্তভাবে সচেতন থাকব, প্রতিটি কাজ

আনন্দিতচিত্তে দায়িত্ব নিয়ে শুধু স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্যে করব, এত সুন্দর চিন্তার জন্যে আপনাকে অভিনন্দন।

মেডিটেশন মানুষকে এই সহজ চিত্তটার জন্যেই প্রস্তুত করে। আপনি যেহেতু পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে কাজ করতে পারছেন, ইনশাআল্লাহ আপনি সবসময় এগিয়ে থাকবেন। আপনার সামর্থ্য যেন আরো বৃদ্ধি পায় এবং অন্যরাও যেন আপনার এই আইডিয়া অনুসরণ করতে পারে, চারপাশের কোলাহলের মাঝেই ধ্যানস্ত হয়ে নিজের কাজে ফোকাস করতে পারে, সেজন্যে আমরা দোয়া করি।

**প্রশ্ন :** আমি একটু কিছুতে রেগে যাই। আমার এই রাগের জন্যে পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি হয়। এই রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কী করব?

**উত্তর :** রেগে গেলে নিজেকে শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। কষে নিজের গালে কয়েকটা চড় দেবেন। নিজের গালে জোরে দিতে না পারলে আরেকজনকে টাকা দিয়ে তারপর আপনার গালে চড় লাগাতে বলবেন। অর্থাৎ রাগটা ক্রমাগত কমাতে হবে। কারণ রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন।

আর আপনি যেহেতু বুঝতে পারছেন যে, রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, ইনশাআল্লাহ আপনি পারবেন। তবে সচেতন থাকতে হবে। মন ঠান্ডা করার জন্যে দরুদ শরীফ পড়বেন। *হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী* থেকে রাগের অধ্যায়টা পড়বেন এবং আমল করবেন। তাহলে নবীজীর (স) সুন্নত পালনের সওয়াবও পাবেন। অতএব রাগটাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখবেন। না হলে নিজেকে শাস্তি দেবেন।

**প্রশ্ন :** আমি প্রচণ্ড রাগী ছিলাম। রাগের কারণে আমার মেয়েকে ও গৃহকর্মীকে প্রহার করতাম। যার সাথে অন্যায় করা হয় তার কাছে নাকি ক্ষমা চাইতে হয়। আমার গৃহকর্মী মেয়েটা তো চলে গেছে। আমি তার কাছে কীভাবে ক্ষমা চাইব? প্রতিনিয়ত অনুশোচনায় ভুগি এবং চোখে জল আসে। কিন্তু তারপরও স্বস্তি পাচ্ছি না। আমি এখন কী করব?

**উত্তর :** আপনার মধ্যে আন্তরিক অনুশোচনা এসেছে এবং আপনি যার কাছে ক্ষমা চাইবেন, সে এ মুহূর্তে নেই, কিন্তু আপনার অন্তর তো আল্লাহ দেখছেন। তাই এখন থেকে তার নামে সদকা দেবেন। আল্লাহকে বলবেন, এই দানের সমস্ত সওয়াব যেন ওই মেয়েটি পায়, যেহেতু তার কাছ থেকে আপনি ক্ষমা

চাইতে পারছেন না। আপনি যদি আপনার সাধ্যমতো সদকা দিতে থাকেন, আশা করি আল্লাহ ক্ষমা করবেন। কারণ আল্লাহ ক্ষমাশীল। আর ভবিষ্যতে যেন এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। কারণ যে ঘরে গৃহকর্মীদের ওপর অত্যাচার করা হয়, যেখানে মজলুমের আর্তনাদ থাকে, সে ঘরে আল্লাহর রহমত থাকে না। সেখানে কখনো শান্তি আসে না।

**প্রশ্ন :** কেন অতীতকে ভুলতে পারছি না? আমি সব কষ্ট ভুলে নতুনভাবে পরিবার সাজাতে চাই। অথচ অবচেতনে শুধু পুরনো বাড়ির ছবি।

**উত্তর :** মানুষ চাইলেই সহজে ভুলে যেতে পারে না। ভুলে যেতে চেষ্টা করলে বরং আরো বেশি বেশি মনে পড়ে। অতএব জোর করে ভোলার চেষ্টা করবেন না। পুরনো বাড়ির ছবি যত খুশি আসুক। সেদিকে মনোযোগ না দিলেই হলো, খেয়াল না করলেই হলো। সচেতনভাবে শুধু নতুন পরিবার সাজাতেই ব্যস্ত থাকবেন। আস্তে আস্তে অবচেতন মন থেকে পুরনো বাড়ি মুছে যাবে।

এটা জীবনের সব ক্ষেত্রেই সত্য। অর্থাৎ কোনোকিছু মোছার জন্যে মন থেকে চেষ্টা করবেন না। অন্য কাজের চিন্তায় মনোযোগ দিলে আগের চিন্তাটা এমনিতে হারিয়ে যাবে।

**প্রশ্ন :** আমার ছেলের বউ ছেলের সাথে খারাপ আচরণ করে। তাই সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। পরিবারের সবাই অশান্তিতে ভুগছে। প্রতিকার কী?

**উত্তর :** আগে বুঝতে হবে, আপনার ছেলের বউ কেন তার স্বামীর সাথে সবসময় খারাপ আচরণ করে। কোনো কারণ নিশ্চয়ই রয়েছে। হয় ছেলের কোনো ভুলের কারণে অথবা বউয়ের ব্যক্তিগত কোনো অসন্তুষ্টি বা না-শুকরিয়া মনোভাবের কারণে। দুজনের শারীরিক, মানসিক অথবা পারিবারিক বোঝাপড়ার অভাবের কারণেও হতে পারে।

কারণটা প্রথমে খুঁজে বের করতে হবে। সমস্যা যে কারণেই হোক না কেন, তা খুঁজে বের করা এবং দূর করা—দুটোই করতে পারবে কেবল আপনার ছেলে। আপনি বা আপনার পরিবারের অন্য কেউ নয়। কাজেই এটা নিয়ে আপনাদের অশান্তিতে ভুগে কোনো লাভ নেই। আপনি ছেলেকে মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে ভালো করে বোঝান, ‘বাবা, এ সমস্যা দূর করার জন্যে মানসিকভাবে অস্থির না হয়ে যা যা করা দরকার তুমি করো।’ আর তাদের সুখের জন্যে দোয়া করুন।

সব চেষ্টার পরও তাদের মধ্যে যদি মিল না হয়, তাহলে শোকর আলহামদুলিল্লাহ, তুমি তোমার মতো চলো, আমি আমার মতো। তোমার জীবন তোমার, আমার জীবন আমার। কারণ বিয়ে একটা চুক্তি। অবশ্যই আমরা ডিভোর্স পছন্দ করি না। কিন্তু ক্রমাগত অশান্তির চেয়ে আগেভাগেই ডিভোর্স হয়ে যাওয়া অনেক ভালো। আর যদি দেখা যায় যে, সমস্যাটা দূর করা সম্ভব, তাহলে তা করতে হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে ছেলেকেই উদ্যোগী হতে হবে এবং বউয়ের সাথে সরাসরি কথা বলতে হবে যে, তারা কী চায়।

**প্রশ্ন :** স্বামী সন্তান মা-বাবা ও ভাইবোনদের জন্যে মনছবি দেখা যায় কিনা?

**উত্তর :** অবশ্যই আপনি তাদের জন্যে মনছবি দেখে দোয়া করবেন। কিন্তু তাদের নিজেদেরও মনছবি দেখতে হবে। তাদেরকে মনছবি দেখতে উদ্বুদ্ধ করবেন। আপনি দেখলেন ঠিক আছে, এটা একটা দোয়া হলো। সাথে তারাও যদি দেখে, তাহলে এটা আরো কার্যকর হবে।

**প্রশ্ন :** বিয়ের পর সন্তানদের বিশেষত ছেলেদের আচরণে পরিবর্তন আসে। ফলে মা-বাবাকে অসম্মান করতে শুরু করে। এ বিষয়ে কি কিছু বলবেন?

**উত্তর :** 'বিয়ের পরে' কথাটি বলে কিন্তু আপনি ছেলের বউকে দোষ দিচ্ছেন। এটা ঠিক নয়। ছেলে যদি আপনার সাথে ভালো আচরণ করতে চায়, ছেলের বউ কী করবে? কতক্ষণ বাধা দিতে পারবে সে আপনার ছেলেকে? বিয়ের পরে মা-বাবার বা শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে খারাপ আচরণ করছে, এ দোষ কোনো অবস্থাতেই বউকে দেবেন না। এটা ছেলের সমস্যা। আপনার ছেলের লালনপালন সেভাবে হয় নি বলেই সে খারাপ আচরণ করছে।

অবশ্য কিছু ক্ষেত্রে সন্তানকে সঠিক শিক্ষা দেয়া হলেও সে তা নেয় না এবং স্ত্রীর আজ্ঞাবহ হয়ে নিজের মা-বাবাকেও উপেক্ষা করতে শুরু করে। সন্তানকেও স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রকৃতি অত্যন্ত নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

**প্রশ্ন :** ছয় মাস হলো আমার বিয়ে হয়েছে। বিয়ের আগে দুজন দুজনকে জানতাম। আমার স্বামীর প্রেরণাতেই কোয়ান্টামের সাথে আমার পরিচয়। গত মাসে আমরা লামা ঘুরে আসি এবং এরপর থেকেই নাকি তার আত্মজাগরণ হয়। তিনি এখন মনে করছেন, বিয়ে না করলেই ভালো ছিল। তাহলে তিনি নিজেকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারতেন। বিয়ের কারণে

তিনি সঠিকভাবে আত্ম উন্নয়ন করতে পারছেন না। বিয়ের আগে তিনি তার পরিবারের প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তিনি সত্যিকার একজন সৎ, পরিশ্রমী, ভালো মানুষ। আমার প্রশ্ন, আমি তাকে বিয়ে করে কি তার আত্মজাগরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালাম?

**উত্তর :** বোঝা যাচ্ছে, আপনি আপনার স্বামীকে ভালবাসেন। তার মঙ্গল চান, কল্যাণ চান। তার আত্মজাগরণ ঘটুক, এটাও চান। আপনাকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

এই যে আত্মজাগরণের কথা বলছেন, এটা যে-কোনোভাবেই ঘটতে পারে। সংসারে থেকেও ঘটতে পারে, সংসার ত্যাগ করেও ঘটতে পারে। সন্ন্যাসী হয়েও ঘটতে পারে, সংসারী হয়েও ঘটতে পারে। বিয়ে করলেও ঘটতে পারে, বিয়ে না করলেও ঘটতে পারে। অনেক সাধক আছেন, যারা বিয়ে করেন নি, তাদের আত্মজাগরণ ঘটেছে।

আমরা রসুলুল্লাহর (স) জীবন দেখতে পারি। বিয়ে কিন্তু তাঁর আত্মজাগরণ ও তাঁর সাধনার জন্যে সহায়ক হয়েছে। বিয়ের পরই তিনি হেরা গুহায় আত্মনিমগ্ন হয়েছিলেন এবং মা খাদিজা (রা) তাঁকে সেখানে গিয়ে খাবার-পানীয় দিয়ে আসতেন। আপনারা যারা হজে গিয়েছেন, নিশ্চয়ই দেখেছেন—হেরা গুহা কত দুর্গম! একজন মহিলা তার স্বামীর সাধনার জন্যে কতটা সহযোগী হলে এরকম দুর্গম পর্বতসংকুল পথ পাড়ি দিয়ে স্বামীর জন্যে খাবার নিয়ে যেতেন! অর্থাৎ মা খাদিজার (রা) সাথে বিয়ে রসুলুল্লাহর (স) জন্যে সহায়ক ছিল বৈকি।

আমি কিন্তু কোয়ান্টাম মেথড শুরু করার ব্যাপারে আপনাদের মা-জীর কাছে অনেক ঋণী। তিনি সবসময় সহায়ক ছিলেন সাধনার জন্যে, পরিশ্রমের জন্যে, কাজের জন্যে। ওনার সহযোগিতা ছাড়া এত দূর আসা কঠিন হতো। এখন আমরা কাজগুলো একসাথে করছি। অতএব আত্মজাগরণের পথে বিয়ে সহায়ক হতে পারে, যদি পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়াটা সুন্দর হয়। আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই। আপনিও আপনার স্বামীর আত্মজাগরণে সহায়ক হবেন—এটাই আমরা কামনা করি।

**প্রশ্ন :** বিয়ের পর স্ত্রীকে ডায়মন্ড উপহার দেয়া কি অবিদ্যা? এটা কি ক্ষতিকর?

**উত্তর :** বিজ্ঞাপনের কারণে ডায়মন্ড এখন 'ফরএভার' হয়ে গেছে। কিন্তু দাম্পত্য জীবনে ডায়মন্ডের চেয়ে অশুভ জিনিস আর হয় না। এর প্রভাব

শতকরা ৯৯ ভাগ ক্ষেত্রে অশুভ। অতএব স্ত্রীকে ডায়মন্ড গিফট করতে গিয়ে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারবেন না।

আর ডায়মন্ড দেবেন কী কারণে? ফুটানির জন্যে? এখনকার ডায়মন্ড ফুটানিও বাড়াবে না। কারণ ডায়মন্ড সব সিন্থেটিক হয়ে গেছে এখন। এটা একেবারেই মূল্যহীন এবং ক্ষতিকর জিনিস।

**প্রশ্ন :** অনেক মা-বাবা, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে এবং নিজেদের সন্তানদের খুব ছোট ছোট কারণে কেন অভিশাপ দেন?

**উত্তর :** কথায় কথায় অভিশাপ দেয়া একটা মানসিক রোগ। তাদের চিকিৎসা হওয়া উচিত। আমরা যারা কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্য, যে-কারো প্রতি নেতিবাচক কথা বলার ব্যাপারে আমরা সবসময়ই সতর্ক থাকব। কারণ নবীজী (স) বলেছেন, 'কোনো বিশ্বাসীকে লানত বা অভিশাপ দেয়া তাকে খুন করার সমান অপরাধ'। [সাবিত ইবনে দাহাক (রা); *বোখারী, মুসলিম, হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী : ১০৭৭*]

**প্রশ্ন :** সবকিছু নিয়ে মত দেয়া, মাথা ঘামানো অপছন্দ করি। এরকম মানুষ যখন নিজ পরিবারে থাকে এবং গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে আসে, কী করব?

**উত্তর :** যখনই কেউ গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে আসবে, হাসিমুখে তাকে বলবেন—'আসসালামু আলাইকুম, আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক'। এতে সে আরো রেগে গেলে বা আরো খারাপ আচরণ করলে আপনি তখনও শান্তভাবে বলবেন, আসসালামু আলাইকুম। দেখবেন যে, সে আপনার সাথে আর ঝগড়া করতে আসছে না। এটা পরীক্ষিত। আপনি যদি ঝগড়ায় অংশ না নেন, ঝগড়া হবে কীভাবে। আমরা সবসময় বলি, বুদ্ধিমান মানুষের প্রথম কাজ হলো বিতর্কে না জড়ানো। কারণ বিতর্কে জড়িয়ে কখনো কোনো সমস্যার সমাধান করা যায় না।

**প্রশ্ন :** আমি একজন পিএইচডি গবেষণারত ছাত্র। মাঝে মাঝে গবেষণার কাজকে নেশার মতো মনে হয়। এটাকে কি আসক্তি বলব? পরিবার আমার ওপর বিরক্ত যে, আমি তাদের সময় দিচ্ছি না। আমার কী করা উচিত? আমার পিএইচডি-র বিষয় ছাড়াও বিজ্ঞান বিষয়ক অন্য কিছু পেলে সেটাতেও ডুবে যাই। এই আসক্তি থেকে কীভাবে বের হবো?

**উত্তর :** গবেষণামূলক কাজ এরকম যে এসময় অন্য কোনোদিকে নজর দেয়াটা খুব কঠিন। এমনকি অনেক সময় পরিবারে নজর দেয়াটাও কঠিন হয়। পরিবারকে বোঝাতে হবে—সময় যে দিতে পারছি না, এটা আমার ইচ্ছাকৃত নয়। পিএইচডি শেষ হলে সময় দেয়ার ব্যাপারে আমার কোনো অনীহা থাকবে না। এটা বোঝাবেন এবং নিজের কাজে মন দেবেন।

যদি গবেষণা আপনার লক্ষ্য হয়, লক্ষ্যের বিপরীত কোনোকিছুর সাথে জড়াবেন না। আর বিজ্ঞান বিষয়ক অন্য কিছু পেলে সেটাতে ডুবে যাবেন পিএইচডি শেষ করার পরে। অর্থাৎ যখন যেটা লক্ষ্য হিসেবে স্থির করবেন, সেই লক্ষ্যের বিপরীত কিছু করবেন না। এদিক-ওদিক তাকাবেন না। তাহলে আপনি সঠিক জায়গায় পৌঁছাবেন।

আমরা হেরম্যান হেস-এর উপন্যাস *সিদ্ধার্থ* থেকে উদাহরণস্বরূপ নায়ক সিদ্ধার্থের উপলব্ধির কথা বলি। নায়ক সিদ্ধার্থ কেন জয়ী হবে এটার ব্যাখ্যায় বলেছিল, আমি যখন কোনো লক্ষ্য স্থির করি, তখন আমি লক্ষ্যের বিপরীত কিছু করি না। একটা পাথর পানিতে ফেলে দিলে সেটা যে-রকম পুকুরের বা নদীর তলদেশে চলে যায়, আমিও সোজা লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাই।

অর্থাৎ যখন যে লক্ষ্য স্থির করেন, সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে সময় দিতে হবে। এটা আসক্তি নয়, এটা হচ্ছে লক্ষ্যের দাবি। যদি আপনি কোনোকিছু স্থির করেন, সেই লক্ষ্যের জন্যে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।

**প্রশ্ন :** আপনি আমাদের বলেন প্রশান্ত থাকতে। কিন্তু পরিবারের বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনতে শুনতে আর শান্ত থাকতে পারি না। অসুস্থ হয়ে যাই। কী করলে এ থেকে মুক্তি পাব?

**উত্তর :** নিয়মিত শিথিলায়ন করবেন। যত নিয়মিত মেডিটেশন করবেন তত আপনার ভেতরে প্রশান্তি আসবে এবং চারপাশের কোনো নেতিবাচক সমস্যা, অশান্তি আপনাকে প্রভাবিত করতে পারবে না। আপনার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না। কারণ সেটা আর আপনার ভেতর পর্যন্ত যাবে না।

মেডিটেশন করতে থাকলে বরং সমস্যাকে কীভাবে নতুন সম্ভাবনায় রূপান্তরিত করা যাবে, সেই আইডিয়া আপনার মধ্যে আসবে। পাশাপাশি সবসময় অটোসাজেশন দেবেন—‘সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন’। আপনি প্রশান্ত থাকতে পারবেন।

# পারিবারিক সম্পর্ক ॥ মা-বাবা

**প্রশ্ন :** আমি নবম শ্রেণিতে পড়ি। আপনি সবসময় বলেন, খারাপ সন্তানকে কীভাবে ভালো পথে আনা যায়। কিন্তু কখনো বলেন নি যে, বিভ্রান্ত মা-বাবার সন্তান তার মা-বাবার প্রতি কীরূপ আচরণ করবে? আমি মাদক ঘৃণা করি, কিন্তু আমার মা-বাবা মাদকাসক্ত। আমি তাদের প্রতি কেমন আচরণ করব?

**উত্তর :** সংসারে একজন মাদকাসক্ত থাকলে সেই ঘরই পরিণত হয় জাহান্নামে। সেখানে যদি দুজন মাদকাসক্ত হয় এবং তারা যদি মা-বাবা হয়, সেই সন্তানের কী করুণ অবস্থা! তবে আপনি যে কোয়ান্টাম পর্যন্ত আসতে পেরেছেন তাতে বোঝা যায়, আপনার মনের শক্তি আছে, পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে তা মোকাবেলা করার সাহস আছে। পৃথিবী সাহসী মানুষের জন্যে। মানুষ যখন সাহস করে এবং সত্যিই বিশ্বাস করে যে, সে সবকিছুকে অতিক্রম করতে পারবে—সে তখন আসলেই তা পারে।

প্রথমত, জীবনটা আপনার এবং নিজের পরিচয়ে আপনাকে পরিচিত হতে হবে। এজন্যে পারিপার্শ্বিক সব প্রতিকূলতার মুখেও ধীরস্থির থেকে এবং পরিস্থিতির চাপে কোনো ভুল না করে আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে। যেহেতু আপনি এখনো ছাত্রী, ক্লাসে প্রথম হওয়ার চেষ্টা করতে হবে, তাহলে আপনি জীবনেও প্রথম হতে পারবেন।

সাধারণত এসময় মেয়েরা যে ভুলটা করে, তা হলো, তারা ধুরন্ধর ছেলেদের পাল্লায় পড়ে যায়। যে একটু মিষ্টি করে কথা বলে, তাকেই জীবনের আশ্রয় মনে করে বসে। ভাবে, সে-ই হয়তো আমার জীবনটাকে বদলে দেবে। কিন্তু তা তো হয়ই না, বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসব ছেলেরা অত্যন্ত নির্মমভাবে এ ধরনের সরলমনা মেয়েদের দুর্বলতার সুযোগ নেয়। যার শোচনীয় মূল্য দিতে হয় ওই মেয়েটিকে।

অতএব এরকম কাউকে আশ্রয় মনে করতে যাবেন না। মা-বাবাই তো আশ্রয় হতে পারেন নি, তখন অন্য কাউকে সরলমনে আশ্রয় ভাবাটা বোকামি। মনে রাখবেন, মজনুদের মহানুভবতার কাহিনী শুধু বই আর কবিদের কল্পনাতে পাওয়া যায়, বাস্তবে নয়। তাই নিজের আশ্রয় হতে হবে নিজেকেই। এই কাজটা কঠিন এবং চ্যালেঞ্জিং। আপনি যেহেতু মেডিটেশন করছেন, নিয়মিত কোয়ান্টামে আসছেন, ইনশাআল্লাহ আপনি পারবেন। কষ্ট হবে, কিন্তু পারবেন।

দ্বিতীয়ত, আপনি অন্য কাউকে মা-বাবা বানাতে পারবেন না। তাই যতটুকু পারবেন, তাদের সেবাযত্ন করবেন। যেটুকু পারবেন না সেখানে আপনার কোনো দায়িত্ব নেই। অর্থাৎ তাদেরকে মাদক সরবরাহ করার দায়িত্ব আপনার নয়। কিন্তু অসুস্থ হলে যতটুকু দেখাশোনা করতে পারেন, যতটুকু ভালো আচরণ করতে পারেন, সেটা করবেন।

সেইসাথে প্রতিদিন মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে মা-বাবাকে মমতা দিয়ে বোঝান—যেন তারা এ গজব থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন। তারা তো আপনারই মা-বাবা। মা-বাবার সাথে রাগারাগি করে কোনো লাভ নেই। কারণ মাদকের প্রতি আসক্তি সৃষ্টি হলে তাদের কাছে মা-বাবা, ছেলেমেয়ে, ভাইবোন, স্বামী-স্ত্রী কারোরই মূল্য থাকে না। তাদের চাই শুধু মাদক।

অতএব তাদের আচরণ দিয়ে আপনি বিভ্রান্ত হবেন না। সবসময় প্রো-একটিভ থাকবেন এবং সত্যটা সহজভাবে নেবেন যে, ঠিক আছে, আমি আমার মা-বাবাকে আদর্শ হিসেবে পাব না। এটা মেনে নিয়েই আমাকে চলতে হবে এবং নিজের পরিচয় সৃষ্টি করতে হবে। এজন্যে বিশ্বাস নিয়ে মনে মনে অটোসাজেশন দেবেন—আমি পারি আমি করব, আমার জীবন আমি গড়ব।

**প্রশ্ন :** বাবার সাথে কোনোভাবেই সম্পর্ক ভালো করা যাচ্ছে না। কীভাবে বাবার সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা যায়? বাবা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে আছেন।

**উত্তর :** সমস্যাটা যেহেতু আপনি বুঝেছেন, সমাধান করাটাও আপনার জন্যে সহজ হওয়া উচিত। বাবার সাথে কোনোভাবেই সম্পর্ক ভালো করা যাচ্ছে না, এই ধারণাটা ভুল। আপনি যেভাবে চেষ্টা করছেন সেভাবে হয় নি। তাতে হাল ছেড়ে দেয়ার কিছু নেই। আপনাকে নতুনভাবে, নতুন ভঙ্গিতে, নতুন বিশ্বাস নিয়ে চেষ্টা করতে হবে।

সবসময় চিন্তা করবেন ইতিবাচকভাবে যে, হবে না কেন? কোথায় সমস্যা? অন্যের ভুলত্রুটি দেখে লাভ নেই। কারণ অন্যকে ঠিক করতে পারবেন না, কিন্তু নিজেকে আপনি ঠিক করতে পারবেন। আরেকজনের কর্মকৌশল আপনি বদলাতে পারবেন না, কিন্তু নিজের কর্মকৌশল যে-কোনো সময় বদলাতে পারেন। যেমন সমুদ্রে যাওয়ার পথে ঝর্নাধারাকে কোনোকিছুই আটকে রাখতে পারে না। যত বাধা আসুক, যত প্রতিকূলতার পাহাড় দাঁড়িয়ে থাকুক সে পাহাড়ের পাশ দিয়ে গতি করে নেবে, সমুদ্রে যাবেই।

অতএব আপনার লক্ষ্য যদি হয় যে বাবার সাথে সম্পর্ক ভালো করবেন, আপনি অবশ্যই পারবেন। তবে বাবাকে নিজের মতো করে দেখতে চাইবেন

না। তিনি কখনো আপনার মতো হবেন না। বাবাকে বাবার মতো ভেবে আপনাকে সম্পর্ক ভালো করতে হবে। তিনি যতই নেতিবাচকতায় আচ্ছন্ন হোক আপনি তার সম্পর্কে সবসময় ইতিবাচক ভাববেন এবং তার সাথে মমতাপূর্ণ সদাচরণ করবেন। বাবার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেন। তাহলে দেখবেন, আপনি বাবাকে জয় করতে পারছেন।

**প্রশ্ন :** আমার মা-বাবা যদি আমাকে ভুলপথে চালিত করতে চান, তাহলে আমি তাদের সাথে কেমন আচরণ করব?

**উত্তর :** মা-বাবা যদি চেতনা এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আপনাকে ভুলপথে চালিত করতে চান, তবে আপনি অবশ্যই সে পথে যাবেন না। কিন্তু তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবেন না। তাদের বিশ্বাসের সঙ্গে আপনার বিশ্বাসের পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু আচরণ সবসময় সুন্দর হতে হবে। চেতনায় মিল থাকলে যে আচরণ করতেন, চেতনায় অমিল থাকলেও একই আচরণ করবেন।

**প্রশ্ন :** আমার মা আমাকে বোঝেন না। কীভাবে সম্পর্কের উন্নতি করব?

**উত্তর :** সম্পর্ক কেমন হবে, তা নির্ভর করে অপেক্ষাকৃত নবীন পক্ষের ওপর। ছেলে হোন বা মেয়ে, মাকে বোঝাতে না পারলে পৃথিবীর আর কাউকে আপনি বোঝাতে পারবেন না। মা আপনাকে বোঝে না, কারণ আপনি কখনো তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন নি, চাপিয়ে দিতে চেয়েছেন। তাই মাকে বোঝাতে চেষ্টা করুন সেই ভাষায়, যা তিনি বোঝেন। আর সেটা হলো মমতার ভাষা।

**প্রশ্ন :** কমান্ড সেন্টারে গিয়ে নিজের মা-বাবার হৃদয়ের সাথে কি একাত্ম হওয়া যাবে? যদি যায়, তাহলে সবসময়ই কি মা-বাবার আদর আমি পাব?

**উত্তর :** মেডিটেশনে গিয়ে মা-বাবার হৃদয়ের সাথে নিজের হৃদয় মিলিয়ে একাকার হয়ে যাবেন। তখন শ্রদ্ধা ও মমতা বাড়বে। প্রাচ্যে পারিবারিক বন্ধন যে-রকম, পাশ্চাত্যে কিন্তু সে-রকম নয়। আমাদের মা-বাবারা যে সন্তানকে কতটা ভালবাসেন এটা আমরা অনেক সময় বুঝি না বা অনুভব করতে পারি না। সন্তানের অসুস্থতায় মায়ের নিশি-জাগরণ, স্বামীর আরোগ্যলাভের জন্যে স্ত্রীর উপবাস করা, স্ত্রীর মৃত্যুতে উদ্‌ভ্রান্ত স্বামী—এগুলো প্রাচ্যেই সম্ভব। সন্তানের জন্যে নিজের জীবন দেয়া আমাদের পক্ষেই সম্ভব।

ইউরোপিয়ান-আমেরিকানরা এটা ভাবতে পারবে না। একটি বিখ্যাত সিনেমার কাহিনী—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্রান্সের এক যুদ্ধক্ষেত্র। ৪৯ দিন ধরে টানা যুদ্ধ চলছে। এ যুদ্ধেই একপক্ষের হয়ে লড়ছে এক তরুণ লেফটেন্যান্ট। যুদ্ধ তার পছন্দ নয়। তার ভালো লাগে সাহিত্য, কবিতা, শিল্পকর্ম। কিন্তু তার বাবা একজন জেনারেল এবং যে বাহিনীর হয়ে সে লড়ছে সেটার অধিনায়ক তিনি। সে বাবাকে জানাল যে, সে সেনাবাহিনী ছেড়ে চলে যেতে চায়। বাবা প্রথমে আপত্তি করলেও শেষমেশ রাজি হলেন। শর্ত দিলেন যে, জার্মান বাহিনীর সীমারেখায় যদি একটা বাহিনীর নেতৃত্ব সে দেয়, তাহলে তিনি তাকে অন্য জায়গায় বদলি করে দেবেন।

ছেলে রাজি হলো। কিন্তু অপারেশনটা সফল হলো না। লড়াইয়ের একপর্যায়ে ভীরুর মতো সে পালিয়ে এলো। তার কোর্ট মার্শাল হলো। কাপুরুষের মতো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো তাকে। মৃত্যুদণ্ডের চেয়েও ছেলের কাপুরুষতার অভিযোগই বেশি দুঃখিত করল বাবাকে। তাই তিনি আশ্রয় নিলেন এক অভাবনীয় প্রতারণার। আগের রাতে সবকিছু যখন নীরব, কারাগারে ছেলের সেলে গিয়ে বাবা দেখা করলেন। পরদিন ফায়ারিং স্কোয়াডে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে।

বাবা বোঝালেন, তুমি আমার ছেলে। বীরের ছেলে বীরের মতো থাকবে। মরার আগে তুমি মদ চাইবে। মাতাল হয়ে হাসতে হাসতে মরবে। ফায়ারিং স্কোয়াডের শ্যুটারদের রাইফেলে আমি আসল গুলির বদলে নকল গুলি ভরে রাখব। গুলির আওয়াজ হবে, কিন্তু তোমার কিছু হবে না। তুমি মরার ভান করে পড়ে যাবে। যখন সবাই চলে যাবে, তখন তুমি সেখান থেকে উঠে পালিয়ে যাবে। তুমি সেনাবাহিনীতে আসতে চাও নি, আমার কোনো কথা কোনোদিন রাখো নি, বীরত্বের কোনো পরিচয় কখনো দাও নি। আজ আমার জন্যে তুমি এটুকু করবে, যেন সবার সামনে আমার মুখ উজ্জ্বল হয়, আমি যেন আর অপমানিত না হই। যেহেতু নকল গুলি, পরে তুমি পালিয়ে যেতে পারবে—যদিও এটা যুদ্ধনীতিবিরুদ্ধ।

পরদিন ফায়ারিং স্কোয়াডে ছেলে খুব নিশ্চিন্ত মনে গেল। মদ চাইল। যখন গুলি করা হলো, হাসিমুখে সে পড়ে যাওয়ার ভান করল। কিন্তু পড়ে গিয়ে সে বুঝল, গুলিটা আসল ছিল। তার বাবা তার সাথে প্রতারণা করেছে। কারণ সে গুলির আঘাতেই পড়ে গেছে। বাবার সাথে আর যে অফিসাররা ছিল, তারা বলল, সত্যিই তোমার ছেলে! জীবিত অবস্থায় বীরত্ব দেখাতে পারে নি, কিন্তু মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে সে বীরত্ব দেখিয়েছে। বাবাও মাথা নেড়ে সায় দিলেন। ছেলের লাশ পড়ে থাকল, বাবা সবার সাথে ফিরে গেলেন। এই

হচ্ছে পাশ্চাত্যের বাবা! জেনারেল বাবা, যিনি নিজের অহমকে ঠিক রাখার জন্যে সন্তানের সাথে প্রতারণার আশ্রয় নেন। এটা পাশ্চাত্যের ঐতিহ্য।

আর প্রাচ্যের ঐতিহ্য হচ্ছে, আমরা সন্তানের জন্যে জীবন দান করতেও প্রস্তুত থাকি। ভারতে মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবরের ছেলে হুমায়ুন যখন মৃত্যুশয্যায়, অনেক চিকিৎসায়ও কাজ হলো না, তখন বাবর গেলেন তার মুর্শিদের কাছে। মুর্শিদ বাবরকে বললেন, হুমায়ুনের আর আয়ু নেই। তার বাঁচার কোনো পথ নেই, সে বাঁচবে না। শুধু একটাই উপায় আছে, যদি তিনি তার আয়ু পুত্রের সাথে বিনিময় করেন এবং এর জন্যে কীভাবে প্রার্থনা করতে হবে, তা বললেন। বাবর প্রার্থনায় বসে পড়লেন। হুমায়ুন ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করলেন আর বাবর অসুস্থ হতে লাগলেন। একসময় মারা গেলেন। এরকম সন্তানবাৎসল্য আমাদের প্রাচ্যেই সম্ভব।

আমরা চারপাশে দেখি, অনেকে সন্তান লালনপালনের জন্যে উঁচুপর্যায়ের সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ তিনি যদি ব্যস্ত থাকেন, তাহলে সন্তান মানুষ করতে পারবেন না। বোনের সম্ভ্রম বাঁচাতে গিয়ে ভাইয়ের জীবন দান, এটা আমাদের দেশেই সম্ভব, আমাদের ঐতিহ্য। ভাইবোনের লেখাপড়ার জন্যে, তাদের ভরণপোষণের জন্যে নিজের ক্যারিয়ার ত্যাগ—এগুলো আমাদের দেশেই সম্ভব।

মায়া ও মমতার তাগিদে পাশ্চাত্য কখনো এসব করতে পারে না। কারণ পাশ্চাত্যে পারিবারিক, সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে জৈবিকতা এবং ভোগবাদী মানসিকতা। আমি কী পাব, এটা তারা নিশ্চিত করতে চায়। এটা নিশ্চিত না করে তারা পারিবারিক সম্পর্কে জড়াতে চায় না। আর আমাদের পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে সমমর্মিতা, ভিত্তি হচ্ছে আত্মিক বন্ধন। তাই আমাদের জন্যে মা-বাবার সাথে একাত্ম হওয়া সহজ।

**প্রশ্ন :** কোয়ান্টামের সাথে একাত্ম হয়ে আমি জীবনে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করেছি। তাই আমি ফাউন্ডেশনের সব প্রোগ্রামে নিয়মিত অংশ নিই। কিন্তু আমার আম্মা বলে এটা বাড়াবাড়ি আর আমার আব্বা এই বিষয়ে কিছুই জানেন না। আম্মাকে কীভাবে বোঝাব যে, এটা আমার জন্যে কত জরুরি।

**উত্তর :** মায়ের একটু খেদমত করতে হবে, আর কিছুই না। মাকে একটু পানিটা এগিয়ে দিতে হবে, এটা করে দিতে হবে, ওটা করে দিতে হবে। অর্থাৎ মাকে তার কাজে সাহায্য করতে হবে এবং সবসময় সুন্দর আচরণ করতে হবে। মাকে বোঝানো তো সহজ ব্যাপার।

মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে নিয়ে এসে তাকে বোঝাবেন। সেইসাথে আপনার আচরণে যখন ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে, তখন পুরো বিষয়টা মা নিজেই বুঝবেন এবং আপনাকে সমর্থন দেবেন।

**প্রশ্ন :** আমার বয়স ৩০ বছর। আমি কিছুদিন আগে জানতে পেরেছি, আমার মা পড়তে পারেন। কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করে মা যখন *আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী* নিজে নিজে পড়ছিলেন, তখন এটা জানতে পেরেছি। তারপর থেকে আমার মধ্যে একধরনের কষ্ট কাজ করছিল। আমি ভাবতাম, আমার মা সংসারের কাজ ছাড়া আর কিছুই জানেন না। নয়টি ছেলেমেয়ে বড় করতে গিয়ে নিজে যে পড়তে জানেন, সেটাই হয়তো তিনি ভুলে গিয়েছিলেন।

**উত্তর :** যিনি পড়তে জানেন, তিনি কখনো পড়তে ভুলে যান না। আপনার মাকে স্যালুট করুন। তিনি তার নয়টি সন্তানকে মানুষ করেছেন। এই মা সন্তানদের উৎসাহেই হয়তো কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করেছেন। এটা আপনার মায়ের জন্যে সবচেয়ে বড় উপহার। এখন আপনারা মায়ের যত্ন নিন।

আর কোরআনের জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। ভালো কাজ যখন কেউ করে, আল্লাহর পথে যখন কেউ আসে, তখন তার অতীতের সবকিছুই মাফ হয়ে যায়। সবচেয়ে বড় কথা, আপনাদেরকে মানুষ করার কাজে কতটা ব্যস্ত ছিলেন যে, তিনি পড়তে জানেন, এটাই আপনার কোনোদিন মনে হয় নি। অর্থাৎ কোনোদিন পড়ার সুযোগ তিনি পান নি। আমরা স্যালুট করি এরকম একজন মাকে, যিনি পরিবারের জন্যে নিজেকে এভাবে উৎসর্গ করতে পারেন। আল্লাহ অবশ্যই তাকে তার ত্যাগের উত্তম প্রতিদান দেবেন।

**প্রশ্ন :** বাবার সাথে সম্পর্ক ভালো নয়। যতবার বোঝাতে চাই যে, আমার পরিবর্তন হচ্ছে, আমি বদলে যাব, তা-ও যদি সে না বোঝে এবং আমাকে আলোকিত মানুষ হতে সাহায্য না করে, তাহলে আমার করণীয় কী?

**উত্তর :** করণীয় হচ্ছে, একা একাই আলোকিত মানুষ হতে চেষ্টা করা। আপনি চেষ্টা করে যান। আপনার মধ্যে যদি পরিবর্তন আসে, আপনি যদি বদলে যান, আপনাকে বলতে হবে না। বাবা এমনিতে বুঝে যাবেন। সামনে বকা দিলেও বাবা অন্যের কাছে আপনার প্রশংসা করবেন। ছেলে যে বদলে গেছে, এটা বাবাদের পক্ষে স্বীকার করা একটু কঠিন। কারণ বাবা নিশ্চিত হতে পারেন না যে, আপনি বদলেছেন নাকি বদলানোর ভান করছেন।

তাই নিজে আলোকিত হওয়ার জন্যে চেষ্টা করুন। কারো সাহায্য প্রত্যাশা করবেন না। দেখবেন, বাবা নিজেই একদিন বলবেন যে, আমার ছেলেটা তো ভালো। অর্থাৎ আপনার পরিবর্তনই বলে দেবে যে, আপনি আগের চেয়ে বদলে গেছেন।

**প্রশ্ন :** আমার আম্মার সাথে আমার কখনো মতের ও পছন্দের মিল হয় না। কীভাবে এ সমস্যার সমাধান করতে পারি?

**উত্তর :** সব ব্যাপারেই যে মত এবং পছন্দের মিল হবে এমন নয়। নিজের ক্ষেত্রে নিজের পছন্দকে গুরুত্ব দিন। মায়ের ব্যাপারে মায়ের পছন্দকে গুরুত্ব দিন। তাহলেই আর সমস্যা থাকবে না। আমাদের সমস্যা হয় কোথায়? আপনার একটা জিনিস পছন্দ। মা ওটা না কিনে দিলে ভাবেন, এটা কী কিনল? আবার মা ভাবেন, মেয়েকে আমার পছন্দমতোই কিনতে হবে। যখনই আমরা পরস্পরের পছন্দকে সম্মান করতে শিখব, এ সমস্যা আর থাকবে না।

**প্রশ্ন :** আমার বাবার কোনোকিছু আমার ভালো লাগে না। আমি কীভাবে এ পাপবোধ থেকে মুক্তি পাব?

**উত্তর :** পারিবারিক সম্পর্কে কখনো কখনো এরকম হয়। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে লাভ-হেইট রিলেশনশিপ। ভালোও লাগে আবার সামনে গেলে ঝগড়া-বিরক্তি। অনেক স্বামী-স্ত্রী একসাথে বেশিক্ষণ থাকলেই ঝগড়া শুরু হয়ে যায়, বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। কিন্তু দূরে গেলে একজন আরেকজনকে মিস করতে থাকেন। আপনি আসলে আপনার বাবাকে খুব ভালবাসেন। সেজন্যেই আপনার বাবার যে আদর্শিক রূপ আপনি দেখতে চান, সেটা দেখতে পাচ্ছেন না বলে তাকে আপনার ভালো লাগছে না।

আপনার বাবাকে নিয়মিত মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে নিয়ে আসুন। তাকে কত ভালবাসেন এটা বলুন। বাবাকে বোঝাবেন, বাবা, তোমাকে এই এই কাজগুলো করতে দেখলে আমার ভালো লাগবে। এই কাজগুলো তোমার করা উচিত, এগুলো করা উচিত নয়। তাহলেই দেখবেন, বাবার প্রতি আপনার মমতা বাড়বে এবং এই সমস্যা আপনি কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

**প্রশ্ন :** পিতা দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকায় দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এখন দেশে থাকায় পারস্পরিক বোঝাপড়ার সমস্যা হচ্ছে। এ থেকে মুক্তির উপায় কী?

**উত্তর :** কয়েকদিন ক্রমাগত দুবার করে পারস্পরিক সম্পর্কে সেতুবন্ধন রচনার মেডিটেশন করুন। দেখবেন, সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। মা-বাবার সাথে সুসম্পর্ক তৈরির জন্যে আপনার লালনপালনে তাদের ভূমিকা, তাদের ত্যাগ, তাদের শ্রম মেডিটেশনে অনুভব করার চেষ্টা করুন। আসলে তাদের ত্যাগের প্রতিদান দেয়া তো সম্ভব নয়, শুধুই অনুভব করা সম্ভব।

একটা বিষয় ভেবে দেখুন, তিনি কিন্তু প্রবাসে ছিলেন পরিবারের এবং আপনাদের ভরণপোষণের জন্যেই। প্রবাসে একাকী থাকতে তারও তো কষ্ট হয়েছে। সবসময় চিন্তা করবেন, আমার মা, আমার বাবা, আমার পরিবার তাদের ওপর আমি কতটুকু নির্ভর করছি, তাদের কাছ থেকে কতটুকু নিচ্ছি এবং সে তুলনায় তাদের কতটুকু দিচ্ছি। এ অনুভূতি যখন আপনার মধ্যে আসবে, তখন দূরত্ব এমনিতেই কমে যাবে।

## মা-বাবার প্রতি ক্ষোভ

**প্রশ্ন :** মা-বাবার প্রতি যে ক্ষোভ ছিল সেগুলো মেডিটেশনের মাধ্যমে দূর করতে পেরেছি। এই ক্ষোভগুলো ছিল পাওয়া না-পাওয়া নিয়ে। কিন্তু এখন নতুন করে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। বাবা আমার মাকে মাঝেমধ্যে মারে। কখনো ভালো ব্যবহার করে না, সুন্দর আচরণ করে না, সবসময় রেগে কথা বলে। অন্যদিকে মা-ও ঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করে না। বাবার সাথে আমার অনেক গ্যাপ। তাই বোঝানোর সাহস পাই না। ছেলে হিসেবে কীভাবে এই সমস্যার মোকাবেলা করব?

**উত্তর :** অনেক পরিবারের ছেলেমেয়েদের সমস্যা এটি। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মা-বাবারা ছেলেমেয়েদের সামনে নিজেদেরকে আদর্শ হিসেবে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। অনেক মা-বাবা শুধু মা-বাবা হয়েছেন, কিন্তু মানুষ হন নি। অতএব আপনার মা-বাবাকে সরাসরি বলতে যাওয়া অর্থহীন। তাদের দুজনকেই মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে বোঝান, যেন তাদের পরস্পরের প্রতি মমতা এবং দায়িত্ববোধ বাড়ে।

আর এ ঘটনায় নিজে উত্তেজিত হয়ে বা কষ্ট পেয়ে কোনো লাভ নেই। কারণ এটি আপনার আয়ত্তের বাইরে। মা-বাবার পারস্পরিক এই দুর্ব্যবহার দ্বারা অনেক ছেলেমেয়ে ইমোশনালি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মা-বাবার মধ্যকার ঝগড়া দ্বারা আবেগীয়ভাবে প্রভাবিত হলে আপনার পড়াশোনার ক্ষতি হবে, ক্যারিয়ার বাধাগ্রস্ত হবে।

আপনার দৃষ্টিভঙ্গি হবে—মা-বাবার মধ্যে সম্পর্ক যা-ই থাকুক, জীবনে সফল ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যে লক্ষ্য আপনার সামনে, তা যেন কোনোভাবেই বিঘ্নিত না হয়। কারণ যদি জীবনে সফল হন, খুব ভালো অবস্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, একদিন আপনার মা-বাবাই আপনার কথা শুনবে। তখন আপনি তাদেরকে প্রভাবিত করার মতো যোগ্যতা অর্জন করবেন। এটা বাস্তবতা। এমন উদাহরণ একটি দুটি নয়, অসংখ্য। কিন্তু মা-বাবার আজকের আচরণ যদি আপনার সাফল্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে, তাহলে আপনি লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হবেন কীভাবে?

অতএব মা-বাবা যা করছে করুক, আপনাকে জীবনে প্রথম হতে হবে, নিজের অবস্থান শক্ত করতে হবে—এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করতে থাকুন। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, ভবিষ্যতে আপনি এর প্রতিকার করতে পারেন। বড় হয়ে নিজের বিবাহিত জীবনে স্ত্রীর সাথে আপনার বাবার মতো আচরণ করবেন না। কারণ বাবা আপনার মাকে প্রহারের জন্যে আপনার যে কষ্ট হয়েছে, আপনি যদি আপনার স্ত্রীর সাথে এমন দুর্ব্যবহার করেন, তাহলে আপনার ছেলেমেয়ের মনেও একইরকম কষ্ট হবে।

**প্রশ্ন :** আমার মা-বাবার প্রতি প্রায়ই আমার ক্ষোভ হয়, যদিও আমি জানি এটা ঠিক নয়। এ থেকে বাঁচার উপায় কী? আমি কী করতে পারি?

**উত্তর :** মা-বাবার সাথে সবসময় খুব ভদ্রভাবে, বিনয়ের সাথে কথা বলতে হবে। তাদের সাথে কখনোই রেগে, ঝাড়ি দিয়ে কথা বলবেন না। আজ পাশ্চাত্যে যে অশান্তি, তার মূল কারণ হলো পরিবার সম্পর্কে ভুল ধারণা। কে বাবা, কে মা, কীভাবে তাদের সম্মান করতে হবে তা ওরা অনেকেই জানে না। যারা জানে, তাদেরও আবার মা-বাবার প্রতি কোনো শ্রদ্ধাবোধ নেই। মূলত এজন্যেই আজকে তাদের সমাজে এত দুঃখ, এত অশান্তি। যে কারণে পাশ্চাত্যে এত রকমারি ভোগ্যপণ্য থাকা সত্ত্বেও একদিকে সহিংসতা ও অন্যদিকে আত্মহত্যার হার সবচেয়ে বেশি।

মায়ের স্পর্শ, বাবার আদর একজন মানুষের দুঃখকে যত সহজে ভুলিয়ে দিতে পারে, পৃথিবীর আর কোনোকিছু সেটা পারে না। সেই মা-বাবাকে কষ্ট দিলেও তারা আপনাকে ছেড়ে যেতে পারেন না, কারণ আপনি ছাড়া তাদের কোনো বিকল্প নেই। আপনি যে-রকম দুঃখ পান, সে-রকম মা-বাবাও তো আপনার কাছ থেকে কষ্ট পান। এই কষ্ট থেকে বদদোয়া আপনার জীবনে লেগে যেতে পারে, যা আপনার শান্তি নষ্টের কারণ হবে।

একসময় আমি অনেকের অনেক দুঃখ দেখেছি। যার অন্যতম কারণ ছিল মা-বাবাকে কষ্ট দেয়া। মা-বাবার সাথে আমাদের আচরণ সবসময় অত্যন্ত বিনয়ী হতে হবে, অত্যন্ত সুন্দর হতে হবে। জীবনে যে আমরা প্রথম হতে চাই, সফল হতে চাই, সেটি আমরা প্রমাণ করব মা-বাবাকে জয় করে। আমরা বিশ্বাস করি, মা-বাবাকে জয় করা খুব সহজ কাজ।

যে-কারো সাথে সুসম্পর্কের পূর্বশর্ত হলো মমতা, ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ। মমতাই মানবিক। মমতার গুণাবলি বিকশিত করতে না পারলে কারো সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হতে পারে না। এর জন্যে প্রয়োজন নিয়মিত মেডিটেশন এবং একটি ভালো পরিবেশ—সৎসঙ্ঘে একাত্মতা। কারণ মেডিটেশনে নিমগ্ন হতে পারলে রাগ ক্ষোভ দূর হয়, ক্ষমা করা সহজ হয়, পারস্পরিক একাত্মতা বাড়ে, সমমর্মিতা বৃদ্ধি পায়।

আপনার প্রতি মা-বাবার ভালবাসা, শৈশব থেকে এ পর্যন্ত আপনার বেড়ে ওঠায় তাদের অবদান আর তাদের সাথে সুখস্মৃতিগুলো বার বার মনে করুন। তাদের প্রতি রাগ আসতে চাইলেই এগুলো সামনে নিয়ে আসুন। দেখবেন, সুন্দর স্মৃতির তোড়ে দুঃখগুলো ভেসে যাচ্ছে। আপনিও তাদের প্রতি আগের চেয়ে বিনয়ী ও শ্রদ্ধাশীল হতে পারছেন। আপনার এ মমতাপূর্ণ চিন্তা আপনার মা-বাবাকেও প্রভাবিত করবে। আপনাদের পারস্পরিক সম্পর্ক দেখবেন তখন অনেক সহজ হয়ে গেছে।

**প্রশ্ন :** আমি মাকে জীবনের চেয়ে ভালবাসি, কিন্তু ততটাই ক্ষোভ-ঘৃণা বাবাকে ঘিরে। যতবারই পারিবারিক মেডিটেশনে বা ক্ষোভ ও ক্ষমার মেডিটেশনের মাধ্যমে বাবার প্রতি আমার ক্ষোভ কমাতে চাই, তার কাছাকাছি যেতে চাই, তখনই সে এমন কিছু করে, যার জন্যে আমার ক্ষোভ-ঘৃণা আরো বেড়ে যায়। আমার মন থেকে বাবা আরো দূরে সরে যায়। কী করণীয়?

**উত্তর :** বাবার প্রতি ঘৃণার কথাটা আপনি যেভাবে বললেন, সেটাই প্রমাণ করে বাবার প্রতি আপনার অবচেতন আকর্ষণ ও ভালবাসাকে। এই ঘৃণার উৎস আসলে ভালবাসা। আপনি আপনার মাকে যতটা ভালবাসেন বাবাকেও ততটাই ভালবাসেন। পারিপার্শ্বিক নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশটা নেতিবাচক হয়ে গেছে।

আপনার ভালবাসা আপনি মায়ের কাছে যেভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন, বাবার কাছে ততটা প্রকাশ করতে পারেন নি। ফলে একটা শূন্যতা তৈরি হয়েছে, যা দিনে দিনে বেড়েছে। সেজন্যেই আপনার মনে হচ্ছে আপনি

বাবাকে ততটাই ঘৃণা করেন। সত্যটা হলো, আপনার অবচেতন মনের এই ক্ষোভের কারণে বাবার এমন আচরণ ও বৈশিষ্ট্য আপনার চোখে পড়ে, যা আপনাকে তার কাছ থেকে আরো দূরে নিয়ে যায়। কিন্তু দূরে গিয়েও আপনি থাকতে পারেন না, স্বস্তি পান না। আবার কাছে যেতে চান, বাবাকে ভালবাসেন বলেই যেতে চান।

এখন এই ক্ষোভটাকে দূর করতে হবে। আপনি আজ থেকে বিশ্বাস করুন—আমার মাকে যেমন ভালবাসি বাবাকেও ঠিক তেমনি ভালবাসি। আর বাবা যে আচরণই করুক আপনাকে প্রো-একটিভ থাকতে হবে। আপনার লক্ষ্য হবে, বাবার আচরণে কোনোভাবে প্রভাবিত না হয়ে বরং তার সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্যে যা যা করা দরকার, তার সবকিছু আমি করব। আপনি অবশ্যই পারবেন। বাবার প্রতি আপনার মমতাই সেটা সম্ভব করবে।

**প্রশ্ন :** মা-বাবা অবশ্যই সন্তানদের মনিটর করবেন, কিন্তু তাই বলে যদি তারা অযথা আমাদের নানা বিষয় নিয়ে কথা বলতে থাকেন তখন দেখা যায় যে, সত্যি সত্যি আমরা সেই অন্যায় কাজটা করতে শুরু করি। কেন তাদের এত সন্দেহ? এ-ক্ষেত্রে কী করণীয়?

**উত্তর :** আসলে এটা সন্দেহ নয়, বরং জবাবদিহিতা। একজন তরুণ এবং তরুণীকে তার কাজের জবাবদিহি করতে হবে। এই জবাবদিহিতা হতে পারে মা-বাবার কাছে বা অন্য কারো কাছে, এমনকি নিজের কাছেও হতে পারে। কারণ যে জীবনে জবাবদিহিতা নেই, সৎ থাকার সম্ভাবনা সেখানে খুব কম। যেমন কোনো গরু যদি একটা সীমানার মধ্যে থাকে, তাহলে সে যে-কারো ক্ষেতে ঢুকতে পারে না। এই সীমানাটা নিজেকে তৈরি করতে হবে।

নিজে সীমানা তৈরি করতে না পারলে অবশ্যই অভিভাবককে এটা তৈরি করে দিতে হবে এবং এ ব্যাপারে কুশলী হতে হবে। অভিভাবক যদি ছেলে বা মেয়ে বাসায় ফেরার সাথে সাথে ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করেন যে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ? পড়ালেখার নাম নেই; শুধু টইটই করে ঘুরে বেড়ানো! এটা ঠিক নয়। সুন্দরভাবে বলতে হবে। সে অভিভাবকই সবচেয়ে ভালো, যিনি এমনভাবে খেয়াল রাখেন যে, যাকে নজরদারি করা হচ্ছে সে বুঝতেই পারে না যে, তাকে নজরদারি করা হচ্ছে।

একবার দুই ভাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, তারা অঙ্ক শিখবে না। যত শিক্ষকই আসেন, সব ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান। এক শিক্ষক এসে বললেন, আমি তোমাদের অঙ্ক শেখাব না। তাই কাগজ কলমেরও কোনো দরকার নেই। খুব

খুশি দুই ছেলে। বাগানে ঘুরতে গিয়ে এক ভাইয়ের সাথে কথাবার্তার একপর্যায়ে শিক্ষক জিজ্ঞেস করলেন, দেখ তো কয় জোড়া পাখি আছে এখানে? এই ডালে একটা, ওই ডালে একটা, তাহলে কটা হলো? দুটো। এভাবে পাখি ডালপালা দেখিয়ে তাকে হিসাব করাচ্ছেন আর যোগ-বিয়োগ শেখাচ্ছেন। আচ্ছা, ওই পাখিটা তো উড়ে গেল। এখন কয়টা আছে দেখ তো! এভাবে মোটামুটি শিখিয়ে ফেলছেন।

অনেকক্ষণ পরে বড়টার খেয়াল হলো। সে বলল, স্যারের সাথে কথা বলিস না, তোকে অঙ্ক শেখাচ্ছে! যোগ-বিয়োগ শেখাচ্ছে পাখি দেখিয়ে। অর্থাৎ মনিটর করতে হবে বুদ্ধিমত্তার সাথে। এটাই সবচেয়ে সুন্দর শিক্ষা। সন্তানের প্রতি তো মমতা থাকবে আর মমতার সাথে যে মনিটরিং সেটাকে সন্তান কখনোই খারাপভাবে নিতে পারে না। যদি সন্তানের বন্ধু না হয়ে অহেতুক তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন সে-তো মনে করবেই যে, তাকে আটকে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে সন্তানের সঙ্গে যখন মা-বাবার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকে, তখন মনিটর করারও প্রয়োজন হয় না। তাই সন্তান হিসেবে মা-বাবার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে আপনি নিজেই উদ্যোগী হোন। তখন তারা আর অহেতুক সন্দেহ করবে না।

**প্রশ্ন :** আমার কখনো মনে হয় নি যে, বাবা আমাকে বোঝে না বা ভালবাসে না। তাই এ বিষয়ে আমার কোনো ক্ষোভ নেই। আমার প্রয়োজন মেটাতে তিনি অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু তার বিরুদ্ধে আমার ক্ষোভ অন্যখানে। তিনি কারণে-অকারণে পরিবারের যে-কোনো সদস্য—বিশেষত গৃহকর্মীকে মারধর বা গালিগালাজ করেন, যা পরিবারের সদস্যরা বুঝিয়ে ঠিক করতে পারেন না। আমার ছোটবেলায় তিনি আমার সাথে এমন নৃশংস আচরণ করেছেন, যা আমি জীবনে ভুলতে পারব না। ক্ষমাও করতে পারব না। ছোটবেলায় আমি খুব দুষ্টু ছিলাম। ক্লাস ওয়ান/ টু-তে থাকতে তিনি আমার হাত ব্লেড দিয়ে কেটে লবণ মরিচ লাগিয়ে বিবস্ত্র করে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলেন। ক্লাস ফোরে একবার আমাকে এমনভাবে পেটালেন যে, আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম, আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল। এই ক্ষোভ আমি ভুলতে পারছি না। কী করব?

**উত্তর :** তিনি আসলে মানসিকভাবে সুস্থ নন। মানসিকভাবে অসুস্থ না হলে কারো পক্ষে তার সন্তানের হাত ব্লেড দিয়ে কেটে লবণ মরিচ লাগিয়ে বিবস্ত্র করে ঘর থেকে বের করে দেয়া সম্ভব নয়। নিঃসন্দেহে তিনি কোনো মানসিক

অসুস্থতায় ভুগছেন। যখন ভালো থাকেন তো খুব ভালো, আবার কখনো কখনো হঠাৎ ভিন্ন আচরণ করেন। যখন রেগে যান, সমস্ত কিছু তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, অন্য এক সত্তা তার মধ্যে কাজ করে। সেজন্যেই আপনার বাবা এরকম আচরণ করে ফেলেন।

অতএব মানসিকভাবে অসুস্থ একজন ব্যক্তির ওপর রাগ রাখবেন না। তাকে মাফ করে দিন এবং তার জন্যে দোয়া করুন যে, হে প্রভু! বাবা যেন আর কারো সাথে এরকম আচরণ না করেন। সেইসাথে তাকে কোনোভাবে বুঝিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করাটাই উত্তম।

**প্রশ্ন :** আমার মা-বাবা কথায় কথায় বলে যে, 'তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না। লেখাপড়ার দরকার নেই, ঘরে বসে কাজ করবে'। আমি এখন কী করব?

**উত্তর :** নেতিবাচক কোনোকিছু দিয়ে কখনো প্রভাবিত হবেন না। এগুলো আমলে নেবেন না। সেইসাথে মা-বাবার জন্যে দোয়া করবেন আর আপনি নিজে প্রো-একটিভ থাকবেন। যখনই তারা বলবে, তোমার লেখাপড়ার দরকার নেই, তখনই আপনি মনে মনে বলবেন, তওবা তওবা, আমার লেখাপড়ার অনেক দরকার। তোমরা বুঝতে পারছ না যে, আমার লেখাপড়া শেখা না হলে মা-বাবা হিসেবে আল্লাহর কাছে তোমরা কী জবাব দেবে? কারণ আল্লাহ তো জ্ঞান অর্জনকে ফরজ করে দিয়েছে। সন্তানকে জ্ঞান দান করা মা-বাবার জন্যে একটা ফরজ কাজ।

যে মা-বাবা এরকম কথা বলেন, এদের মতো হতভাগা মা-বাবা আর নেই। এরা নিজের সন্তানের সর্বনাশ নিজেরা করতে চায়। কিন্তু কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্য হিসেবে আপনি তো প্রো-একটিভ থাকার শিক্ষা লাভ করছেন। তাই সবসময় মনে রাখবেন, শুধু মা-বাবা নয়, যে-কেউ কটুকথা বলুক না কেন, আপনাকে প্রো-একটিভ থেকে নিজের করণীয় কর্তব্যে ডুবে থাকতে হবে। তাহলে আপনি সফল হবেন, বড় হবেন।

ধরুন, আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। তিনি ইন্দোনেশিয়ার একটা স্কুলে পড়তেন। তার মতো অদ্ভুত চেহারার শিশু ইন্দোনেশিয়ার শিশুদের কাছে নতুন এবং আজব। এজন্যে স্কুলে শিশুরা সবাই মিলে তাকে ঢিল মারত। কিন্তু বারাক ওবামা কোনোরকম প্রতিবাদ না করে দৌড়াতেন। আবার যখন শিশুরা থামত, তখন তিনি তাদের সাথে সহজভাবে মিশতেন। তাদের প্রতি কোনো ক্ষোভ মনে রাখতেন না। এমনকি অন্য মায়েরা তাদের সন্তানদের থামাতে চাইলেও ওবামার মা বলতেন, তার সমস্যা

তাকেই সমাধান করতে দিন। তার মা বেশ প্রো-একটিভ মহিলা। তিনি ওবামাকে শিখিয়েছেন সবক্ষেত্রে প্রো-একটিভ থাকতে এবং লক্ষ্যে অবিচল থেকে নীরবে কাজ করতে। যার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে পেরেছেন তিনি। অতএব আপনি আপনার চিন্তায়, বিশ্বাসে অটল থাকবেন। তাহলেই আপনি জয়ী হবেন।

**প্রশ্ন :** আমার মা আমার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করেন। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে আমার ব্যাপারে নেতিবাচক কথা বলেন। আমাকে বলেন, 'ফেল করবি'। তাই আমি সবসময় ফেল করি। এ থেকে বাঁচার উপায় কী?

**উত্তর :** মা-বাবা সম্পর্কে কোনো রাগ অভিমান ক্ষোভ পুষে রাখবেন না। আর মা হয়তো রাগের মাথায় বলছেন 'ফেল করবি', কিন্তু সেজন্যেই যে আপনি 'ফেল' করেন, তা নয়; বরং ভেবে দেখুন—পরীক্ষার আগে যথাযথ প্রস্তুতি আপনার হয়েছিল কিনা।

এখন থেকে আপনার কাজ হচ্ছে এরকম পরিস্থিতিতে ইতিবাচক থাকা এবং পড়াশোনায় আরো বেশি মনোযোগী হওয়া। আপনি আপনার মাকে পরিবর্তন করতে পারবেন না, কিন্তু নিজেকে পরিবর্তন করতে পারবেন। কারণ অন্যকে বদলানো যায় না, বদলাতে হয় নিজেকে।

অতএব যখনই আপনার মা কোনো নেতিবাচক কথা বলবেন, আপনি মনে মনে তওবা তওবা বলুন। একে মায়ের দোয়া বলে মনে করুন। মিষ্টি হেসে মাকে বলুন, মা! দোয়া করো, যাতে আমি ভালো রেজাল্ট করতে পারি।

**প্রশ্ন :** আমার ক্ষোভ মা-বাবাকে নিয়ে। তারা আমাকে বোঝেন না। আমার সবকিছুতেই 'না' বলেন। তাদের ধারণা, আমি সবকিছুতেই ভুল আর তারা সবসময় সঠিক। এজন্যে তাদের সাথে আমার ভুল বোঝাবুঝি লেগেই থাকে।

**উত্তর :** তারুণ্যে সবচেয়ে বেশি অভিমান ও ক্ষোভ থাকে মা-বাবার বিরুদ্ধে। মনে হয়, মা-বাবা আমাকে বোঝেন না। কেউ-বা মনে করে, মা-বাবা আমাকে ভালবাসেন না। কারো মনে হয়, আমার স্বাধীন বিকাশের পথে বড় অন্তরায় আমার মা-বাবা। আপনার হয়তো মনে হয়, তারা তাদের নিজস্ব চিন্তা চাপিয়ে দিচ্ছেন আপনার ওপর, যা আপনার দৃষ্টিতে ভুল। আপনার মনে হতে পারে, তারা কঠিন নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে চাচ্ছেন আপনাকে। মনে হতে পারে, শাসন ও শৃঙ্খলার নামে তারা আপনাকে পীড়ন করছেন।

বাস্তবতা হচ্ছে, মা-বাবা যা করছেন, তা তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে করছেন। তাদের অভিজ্ঞতা যেমন সঠিক হতে পারে, তেমনি তারাও ভ্রান্ত বিশ্বাসের শৃঙ্খলে বন্দি হতে পারেন। আবার আপনি যা সঠিক মনে করছেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা হচ্ছে আপনার সমবয়সী বন্ধুবান্ধব বা সোশ্যাল মিডিয়া দ্বারা প্রভাবিত সিদ্ধান্ত। বাস্তবতার বিচারে আপনার সিদ্ধান্ত সবসময় সঠিক না-ও হতে পারে।

মা-বাবার সাথে আপনার চিন্তার ব্যবধানের প্রধান কারণ হচ্ছে, জেনারেশন গ্যাপ। কালের দিক থেকে আপনি আধুনিক। আপনার ভাষা যদি মা-বাবা না বোঝেন, তাহলে বোঝানোর দায়িত্ব আপনার। তারা যে ভাষায় বোঝেন, সে ভাষায় তাদেরকে বোঝাতে হবে। তা হচ্ছে মমতার ভাষা, শ্রদ্ধার ভাষা। প্রেম, মমতা, শ্রদ্ধার ভাষার কোনো কাল নেই।

মা-বাবার সাথে মতের যত অমিলই থাকুক, পৃথিবীতে তারাই আপনাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন, স্নেহ করেন। তবে এই স্নেহের প্রকাশ সবাই ঠিকভাবে করতে পারেন না। কিন্তু প্রকাশ যেমনই হোক না কেন, আপনিই তাদের স্বপ্ন। আপনার মাঝেই তারা তাদের অপূর্ণ স্বপ্নকে বাস্তবরূপে দেখতে চান। তাই হয়তো কখনো কখনো তাদের চাওয়ায় বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, যা আপনার কষ্টের কারণ হতে পারে। কিন্তু আপনার ব্যাপারে তাদের আন্তরিকতার কোনো অভাব নেই। পৃথিবীতে তারাই আপনার আপন। আপনার সাফল্য, কল্যাণ ও মঙ্গলেই তাদের আনন্দ।

মা-বাবা আপনার প্রতিটি আবদারই পূরণ করতে চান। কোনো চাহিদা বা আবদার রক্ষা না করার দুটো কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, হয়তো তা দেয়ার সামর্থ্য তাদের নেই। সামর্থ্য না থাকলে তাদের কাছে কোনোকিছু চাওয়া এবং সেজন্যে জেদ ধরা উচিত নয়। কারণ তা মা-বাবার দুঃখ ও কষ্টকে বাড়িয়ে দেয়। সন্তান হিসেবে আপনার কর্তব্য হচ্ছে, এই চাহিদা পূরণ করার সামর্থ্য মা-বাবার আছে কিনা, সেদিকে খেয়াল রাখা।

দ্বিতীয় কারণ হতে পারে যে, তারা সেটিকে আপনার জন্যে ক্ষতিকর মনে করছেন। সে-ক্ষেত্রে তাদের রায়ের ব্যাপারে আপনার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। বিষয়টিকে তারা অযৌক্তিক মনে করলে ধরে নিতে হবে, আপনি এর যৌক্তিকতা বোঝাতে পারছেন না।

তাই তাদের সাথে বিতর্কে জড়ানো আপনার জন্যে বোকামি ছাড়া কিছু নয়। আপনি তাদের সাথে একাত্মতা বাড়ানোর চেষ্টা করুন, তাদের জন্যে নিয়মিত দোয়া করুন। আপনার মমতা শ্রদ্ধা তাদের হৃদয়কে জয় করবে।

**প্রশ্ন :** শিশুরা মা-বাবার ভালবাসা চায়। কিন্তু অল্প বয়স থেকেই বাবার অতিরিক্ত গাম্ভীর্য এবং ক্রোধ প্রভাব ফেলে আমার ওপর। ফলে আমি তাকে বাবা বলে সম্বোধন করতে পারতাম না। এজন্যে আমার শাস্তি হয়েছিল ম্যাচের কাঠিতে আগুন ধরিয়ে পেটের সামনে ধরা। আমার চাওয়া ছিল শুধু তাদের একটু মুখের হাসি, তাদের ভালবাসা। কীভাবে কষ্ট থেকে মুক্ত হবো?

**উত্তর :** অনেক বাবা আছেন, পরিবারের সবাইকে ধমকের ওপর রাখেন, ছেলেমেয়েকে সারাক্ষণ ভয়ের মধ্যে রাখেন। তাদের ধারণা, এরকম গম্ভীর, কড়া মেজাজের বাবা বা স্বামী হতে পারলেই বোধহয় ভালো শাসন করা যাবে। এটি একটি অবিদ্যা। তারা যে কত ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করছেন, তা তারা বুঝতে পারেন অনেক পরে, যখন বার্ধক্যে তারা ছেলেমেয়ের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হন। কারণ যতদিন তার কর্মক্ষমতা থাকে, ততদিন সবাই মুখ বুজে এই অন্যায় কর্তৃত্ব মেনে নেয়।

কিন্তু ছেলেমেয়েরা স্বনির্ভর হয়ে গেলেই প্রবীণ এবং অক্ষম পিতার প্রতি অবহেলার মাধ্যমে তারা তাদের অতীত ক্ষোভের প্রকাশ ঘটায়। আপনার সামনে যেহেতু এখন সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে, তাই আপনার দায়িত্ব হলো নিজেই এগিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ বাবা বলে সম্বোধন করে আপনাকেই তার সাথে সম্পর্ক সহজ করে নিতে হবে। সেইসাথে সাধ্যমতো মা-বাবার সেবাযত্ন করার মধ্য দিয়ে তাদের মন জয় করতে হবে। কারণ আপনার জীবনে কিন্তু মা-বাবার দোয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ।

**প্রশ্ন :** মা-বাবা যদি মনে করেন, আমাদের কাছ থেকে তাদের শেখার কিছু নেই এবং আমাদের কথা শুনতে তারা আগ্রহী না হন, তাহলে কী করণীয়?

**উত্তর :** এ-ক্ষেত্রে দায়িত্ব সন্তান হিসেবে আপনাদেরই। মা-বাবা যে ভাষায় বোঝেন, সে ভাষায় তাদেরকে বোঝাতে হবে। আপনারা যদি শ্রদ্ধা করার মতো কাজ করেন, তাহলে আপনাদের মা-বাবাও আপনাদেরকে শ্রদ্ধা করবেন। এটাই বাস্তবতা। কিন্তু তার আগে নিজেদেরকে সে পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। আর মা-বাবার আস্থা অর্জন করতে হবে। তাহলে আজ হোক, কাল হোক আপনাদের কথা তারা শুনবেন।

**প্রশ্ন :** আমি আমার মা-বাবা ছাড়া আর কারো সাথে রাগারাগি বা দুর্ব্যবহার করি না। মেডিটেশনের পর বুঝলাম, আমার এ রাগের কারণ হীনম্মন্যতা।

এর উৎস হলো মা-বাবার নেতিবাচক কথা। আমি লেখাপড়ায় বেশ ভালো হলেও কিছুটা আত্মভোলা হওয়ায় মাঝে মাঝে কিছু ভুলও হয়। অন্যদিকে আমার ছোট ভাই অনেক মেধাবী ও গোছানো। তাই দেখা যায়, ছোট ভাইয়ের যে দোষটা তারা এড়িয়ে যান, সেটাই আমি করলে মহাদোষ হয়ে যায়। এজন্যে আজকাল আর তাদেরকে সহ্য করতে পারছি না। এতে আমার পাপ হচ্ছে, এটা বুঝতে পেরে মানসিক অশান্তি আরো বেড়েছে। কী করব?

**উত্তর :** সন্তান লালনের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মা-বাবা এ ভুলটাই করেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। তারা এক সন্তানকে অন্য সন্তানের সঙ্গে তুলনা করেন। একজনের দোষ এড়িয়ে যান, আর একই ভুলের জন্যে অন্যজনকে শাসন করেন। ভর্ৎসনা করেন যে, তুই কেন ওর মতো ভালো হতে পারিস না! অথচ এটা ভেবে দেখেন না যে, তিনি কি তার অন্য ভাইদের মতো বা বোনদের মতো হয়েছিলেন? নিশ্চয়ই না। প্রত্যেকে তো তার নিজের মতো। আরেকজনের সাথে তাকে তুলনা করা অর্থহীন। এ-কাজটা যখন মা-বাবা করেন, তখন সেটা আসলে অপরাধের পর্যায়ে পড়ে।

তবে সন্তান হিসেবে মা-বাবার ওপর রাগ করা নির্বুদ্ধিতা। কারণ তারা যদি বুঝতেন, তাহলে তো এভাবে বলতেন না। আপনাকে তাই প্রো-একটিভ হতে হবে। হীনম্মন্যতায় না ভুগে গোছানো হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। যেহেতু বুঝতে পারছেন যে, আপনি কিছুটা আত্মভোলা, তাই মা-বাবার সাথে রাগ করে যে সময়টা নষ্ট করছেন, সেটাকে ব্যয় করুন সুবিন্যস্ত হওয়ার কাজে। কারণ রাগ-ক্ষোভ যত করবেন, দুর্ব্যবহার যত করবেন, তত আপনার মা-বাবার মমতা আপনার দিক থেকে সরে যাবে। তাছাড়া দুর্ব্যবহার অত্যন্ত নিন্দনীয়। তা যদি মা-বাবার সাথে হয়, তাহলে তা আরো ক্ষতিকর। কারণ মা-বাবার যত ভুলই থাকুক, তারাই তো আপনাকে লালন করছেন।

**প্রশ্ন :** মা-বাবা দুজনই চাকরিজীবী। বাবা আমার মাকে কখনো টাকা দেন না। এতে আমার মায়ের মন খারাপ থাকে। আর আমার রাগ লাগে বাবার ওপর। বাবার কাজটি কি ঠিক?

**উত্তর :** অবশ্যই ঠিক নয়। কিন্তু এটা নিয়ে আপনি কিছু বলতে যাবেন না। আর আপনার মা-ও যেহেতু চাকরি করছেন, তিনি কি আপনার বাবাকে হাতখরচ দেন? তার স্বামী যে তাকে খরচ করার জন্যে টাকা দেন না, এটা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যেই তিনি স্বামীকে নিয়মিত হাতখরচ দিতে

পারেন। প্রতি মাসে কিছু টাকা স্বামীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে তিনি বলতে পারেন, বুঝতে পারছি তোমার খুব টানাটানি যাচ্ছে। এই নাও, তোমার খরচের টাকা। স্ত্রীকে না চাইতেই পর্যাপ্ত হাতখরচ দেয়া এবং তা কীভাবে খরচ হলো জানতে না চাওয়া একজন স্বামীর ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদাকেই সমুন্নত করে।

**প্রশ্ন :** পিতামাতা যদি বিয়ের পর ছেলে ও ছেলের বউকে আলাদা থাকতে বলেন, সে-ক্ষেত্রে কী করণীয়?

**উত্তর :** মা-বাবা যদি খুশিমনে বলেন, তাহলে অসুবিধা নেই। তবে বুড়ো বয়সে মা-বাবাকে যতটা সেবা করা সম্ভব, ছেলেমেয়ের তা করা উচিত।

**প্রশ্ন :** মায়ের বিয়ে হয়েছিল খুব অল্প বয়সে। আমি তার প্রথম সন্তান। কিন্তু মা আমাকে খুব আদর করছে তেমন কোনো স্মৃতি নেই; বরং আমার শৈশবের স্মৃতিতে আছে মায়ের নিষ্ঠুরতা। এই দুঃসহ স্মৃতি থেকে মুক্তির উপায় কী?

**উত্তর :** মেডিটেশনে মনের বাড়ির আলফা স্টেশনে গিয়ে সব লিখে তারপর ধুয়ে-মুছে ফেলবেন। আর এসবের জন্যে মায়ের ওপর কোনো ক্ষোভ রাখবেন না। কারণ সবকিছুর পরেও মা কিন্তু মা-ই। তিনি তো আপনাকে ছেড়ে চলে যান নি। এমনও তো অনেক মা আছে যে, নবজাতককে ফেলে আরেকজনের সাথে চলে গেছে। আপনার মা-তো তা করেন নি। এজন্যে শুকরিয়া আদায় করবেন এবং মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করবেন।

**প্রশ্ন :** আমি এমন পরিবার দেখেছি, যেখানে সন্তানের সামনে তার মাকে বেদম প্রহার করেছে তার বাবা। মৃত্যুকামনা করেছে, যদিও মা মারা যান নি। আমার পরিবারও এর ব্যতিক্রম নয়। বাবার আচরণে আমরা অতিষ্ঠ। পরিবারে সুন্দর পরিবেশ বজায় রাখার জন্যে আমি কী করতে পারি?

**উত্তর :** এই হতভাগা পুরুষটির জন্যে দোয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারেন না। যে লোক তার স্ত্রীকে প্রহার করে, মৃত্যুকামনা করে, সে ইহকালে বা পরকালে—কোনোকালেই মুক্তি পাবে কিনা আমি জানি না। আমরাও তার পরিবর্তনের জন্যে দোয়া করি, যেন তিনি শোধরাতে পারেন নিজেকে। বাবাকে নিয়মিত মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে বোঝাবেন, কিন্তু বাস্তবে কিছু বলবেন না। আপনি প্রো-একটিভ থাকুন।

আপনি বাবার এই আচরণ থেকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হবেন না। বড় হয়ে আপনি যখন বিয়ে করবেন, তখন যদি বাবার এ আচরণ মনে রেখে আপনিও স্ত্রীর সঙ্গে এমন ব্যবহার করেন, তাহলে কিন্তু একই দুর্দশার পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

**প্রশ্ন :** জন্মদাতা যদি জন্মদানের পর আর কোনো খোঁজ না রাখেন, তবে তাকে বাবা না বলে জন্মদাতা বলা-ই ভালো না? এরূপ জন্মদাতার জন্যে কোনো দায়িত্ব থাকতে পারে কি? কোয়ান্টামের দৃষ্টিতে বুঝিয়ে বলবেন?

**উত্তর :** এ প্রশ্ন থেকে বোঝা যাচ্ছে, জন্মদাতার প্রতি আপনার দুর্বলতা রয়েছে। জন্মদাতা আপনার খোঁজ রাখেন নি। আপনি তার মমতা পান নি। এজন্যে তার প্রতি আপনার ক্ষোভ আছে আর থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এটাও সত্য যে, আপনি জন্মদাতার ব্যাপারে দুর্বল।

এখানে জন্মদাতা হয়তো ভুল করেছেন। কিন্তু আপনি কোয়ান্টাম পরিবারের একজন হয়ে ভুল করবেন কেন? তার প্রতি আপনার যা করণীয়, আপনি করে যান। এটাই হচ্ছে এর প্রতিকার। তখন তার মনে অনুশোচনা জাগতে পারে যে, সেই সন্তান এখন আমার সেবাযত্ন করছে, যাকে আমি অবহেলা করেছি, যার কোনো খোঁজখবর রাখি নি। অতএব সবসময় অন্যের প্রতি যা করণীয়, তা করবেন নির্দ্বিধায়।

**প্রশ্ন :** আমার মা-বাবাকে আমিই প্রথম ভুল বুঝি, তারপর তারাও ভুল বোঝেন। সেই শৈশব থেকে ২১ বছর পর্যন্ত খালি মেরেছে কথা শুনতাম না বলে। ভেতরে বড়ই ব্যথা। দোয়া করবেন। এখন করণীয় কী?

**উত্তর :** এটা দুঃখজনক যে, ২১ বছর বয়স পর্যন্ত আপনি শুধু মারই খেয়েছেন। তবে সবকিছুর পরও মা-বাবা মানে মা-বাবাই। মা-বাবা যেদিন থাকবেন না, সেদিন যত কষ্টই থাকুক, 'মা' বলে বা 'বাবা' বলে আর কাউকে ডাকতে পারবেন না। তারা হয়তো আপনার ভালোর জন্যেই এমনটি করেছিলেন। বুঝতে পারেন নি যে, পদ্ধতিটা ভুল।

কিন্তু আপনি মা-বাবাকে ভালবাসেন ও মা-বাবার প্রতি একটা দুর্বলতা আছে বলেই আপনার ভেতর ব্যথা। অতএব ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্যে দোয়া করুন, কান্না এলে তাদের জন্যে কাঁদুন। তাহলেই দেখবেন, আপনার ভেতরের ব্যথা চলে গেছে।

**প্রশ্ন :** এক মা তার এমএ পড়ুয়া মেয়েকে সর্বদা গালি দেন। সামান্য ত্রুটির জন্যে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করেন। মেয়ের পক্ষে কেউ কথা বললে তার ওপরও রেগে যান। মেয়েটির অসহায়ত্বের প্রতিকার কী?

**উত্তর :** আমরা মেয়েটির জন্যে সমবেদনা প্রকাশ করছি। মেয়ের মায়ের জন্যেও দোয়া করছি, তিনি যেন মানসিকভাবে সুস্থ হন। তিনি যদি সুস্থ হতেন, তাহলে নিজের মেয়ের প্রতি এরকম অন্যায় আচরণ করতেন না। এখন মেয়েটির দায়িত্ব অনেক বেশি এই মায়ের প্রতি। আমি বিশ্বাস করি, অসুস্থ মায়ের জন্যে করণীয়টুকু ভালোভাবে করতে থাকলে প্রাকৃতিক নিয়মেই মেয়েটি পুরস্কৃত হবে এবং মায়ের মন জয় করতে পারবে। আল্লাহই তখন মেয়েটির অসহায়ত্ব দূর করে দেবেন, ইনশাআল্লাহ।

**প্রশ্ন :** আমি জন্মের পর মায়ের সমস্যার কারণে বুকের দুধ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। এখন আমি অনেক বড় হয়েছি। কিন্তু অনেক প্রাপ্তির পরও কেন যেন আমি এখনো মানসিকভাবে নিশ্চয়তা বোধ করি না। এটা কি সেজন্যেই হয়েছে? তাহলে এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কী?

**উত্তর :** এটা ঠিক, যে সন্তান মায়ের বুকের দুধ পায় না তারা মানসিকভাবে অনিশ্চয়তায় ভোগে। এখন আপনার ক্ষেত্রে তো কিছু করার নেই। যা হওয়ার হয়ে গেছে। আপনি চিন্তা করুন, মায়ের চেয়েও যিনি বড়—আপনার স্রষ্টা—সকল নিরাপত্তা, সকল নিশ্চয়তার উৎস, তিনি আপনাকে নিরাপত্তা দিচ্ছেন।

আপনাকে যেমন তিনি সৃষ্টি করেছেন, তেমনি আপনার মাকেও তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং মায়ের দুধের মাধ্যমে নিশ্চয়তাবোধ সৃষ্টির প্রক্রিয়ার উৎসও তিনি। অতএব তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখুন। তাঁর কাছে প্রার্থনা করুন। নিয়মিত তাঁকে স্মরণ করুন। দেখবেন, আপনার অনিশ্চয়তাবোধ আর থাকছে না। কারণ সত্যিকার ক্ষমতা তাঁরই হাতে।

**প্রশ্ন :** আমার সামনে যখন অন্যের মা-বাবা তাদের সন্তান এবং আমার মধ্যে পার্থক্য করে, তখন আমার মনে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। আমার বাবা মারা গেছেন আমার বয়স যখন ছয়। এখন আমি ১৭+। এ-ক্ষেত্রে আমি কী করতে পারি?

**উত্তর :** এ-ক্ষেত্রে তাদের জন্যে দোয়া করতে পারেন। আপনি তো ছয় বছর পর্যন্ত আপনার বাবাকে পেয়েছেন, কিন্তু নবীজী (স) তো বুঝতেই পারেন নি

বাবা কী! জন্মের ছয় মাস আগেই নবীজীর (স) বাবা মারা যান। এদিক থেকে আপনি অনেক ভাগ্যবান। এরপর যখন কোনো মা-বাবা তার সন্তানদের আদর করবে, আপনি তাদের সবার জন্যে দোয়া করবেন, 'হে আল্লাহ! এরা কত ভাগ্যবান! এদের মা-বাবা যেন সবসময় আদর করে।' যখনই দোয়া করবেন, দেখবেন, আপনিও কোথাও না কোথাও থেকে আদর পাচ্ছেন।

হয়তো অন্যের মা-বাবা আপনাকেও আদর করতে চায়, কিন্তু আপনার অবচেতন ও সচেতন মনের ক্ষোভ আপনাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে তাদের কাছ থেকে। যখনই আপনি অন্যের জন্যে এভাবে দোয়া করবেন, আপনার জীবনে আদর পাওয়ার পরিমাণ বাড়তে থাকবে।

**প্রশ্ন :** আমার বাবার ইদানীং বাসায় থাকার পরিমাণ বেড়ে গেছে। মা-বাবাকে আমার অসহ্য লাগে। কারণ সারাক্ষণ আমার দোষ ধরে, বকাবকি করে। যা-ই করি, সবটাই মন্দ। ইচ্ছে হয় দূরে কোথাও চলে যাই।

**উত্তর :** কোথায় আর যাবেন? স্বর্গ তো মা-বাবার কাছেই! আপনাকে যেটা করতে হবে, জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। জীবনের লক্ষ্যটা কী? ক্লাসে ১ম হওয়া, জীবনে ১ম হওয়া।

আপনি যেহেতু শিক্ষার্থী, নিয়মিত মনছবির মেডিটেশন করবেন। রাগ-ক্ষোভ দূর করার মেডিটেশন করবেন। কোয়ান্টাম শিক্ষার্থী কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হবেন। ক্লাসে ১ম হওয়ার কৌশলগুলো আপনি জানতে পারবেন।

জীবনে ১ম হওয়া মানে অনন্য মানুষ হওয়া। যিনি স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্যে নিজের মেধাকে সবচেয়ে সুন্দরভাবে বিকশিত করে সৃষ্টির কল্যাণে কাজে লাগান, যিনি হাজার মানুষের আশ্রয়স্থল, তিনিই অনন্য মানুষ।

আপনি যখন জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন হবেন, লক্ষ্যের বিপরীত কাজগুলো বর্জন করবেন, মা-বাবার বকাবকি এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে।

**প্রশ্ন :** মা প্রায়ই আমাকে বকাঝকা করেন এবং রেগে গেলে চিৎকার-চেঁচামেচি করতে থাকেন। আমি তখন প্রো-একটিভ থাকতে চেষ্টা করি এবং পারতপক্ষে জবাব দেয়াকে এড়িয়ে যাই। কিন্তু এমন কিছু সময় আসে যখন উনি আমাকে জবাব দিতে বাধ্য করেন। তখন আমিও রেগে গিয়েই জবাব দেই। ওনার অকথ্য ভাষায় বকাবকির কারণে ওনাকে কখনো প্রো-একটিভ উপায়ে মমতা দিয়ে বোঝাতে ইচ্ছে করে না। অনেক রাগ-জেদ হয় মায়ের ওপর। এ অবস্থায় কী করণীয়? মিষ্টি ভাষার কথা মনে হয় উনি আর বোঝেন না।

**উত্তর :** পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ কাজ হলো মাকে বোঝানো। আপনি কৌশলটা ধরতে পারেন নি। উনি যখন চিৎকার-চেঁচামেচি করবেন, চুপ করে শুনুন। যদি কিছু বলতেই চান তো বলবেন, মা তুমি ঠিকই বলেছ। অর্থাৎ উনি যতই বকাবকি করুন, আপনি কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবেন না।

সবসময় মনে রাখবেন, মা কিন্তু মা-ই। মায়ের কোনো বিকল্প হয় না। মা চলে গেলে বুঝবেন, মায়ের এ বকাঝকার মধ্যেও কত মমতা ছিল! আপনাকে লালন করার জন্যে তিনি যতটা কষ্ট করেছেন, পৃথিবীর আর কেউই এত কষ্ট করেন নি এবং করবেনও না।

অতএব মায়ের সাত খুন মাফ। মা যত কিছুই করুন, মনে রাখবেন, আপনার দিক থেকে মায়ের জন্যে যা করার, সবকিছু করার পরেও সেটা অনেক কম হয়ে যায়। মা যেখানে বুঝতে চান না, বোঝানোর প্রয়োজন নেই। কিন্তু মায়ের প্রতি আপনার কর্তব্যে কখনো অবহেলা করবেন না। মায়ের সেবাযত্ন করুন। মা শুধু এটুকু বুঝলেই হলো যে, আমার ছেলে বা আমার মেয়ে এখনো আমাকে ভালবাসে। মায়ের জন্যে এটুকুই অনেক।

**প্রশ্ন :** মেডিটেশনে যখন আপনি বাবার জন্যে দোয়া করতে বলেন, তখন বাবার মুখ কল্পনা করতে গেলে ঘৃণা হয়। আমি ব্রোকেন ফ্যামিলির সন্তান। যখন আপনি বাবার কথা কল্পনা করতে বলবেন, তখন আমি কী করব?

**উত্তর :** বাবার মুখ কল্পনা করতে গেলে ঘৃণা লাগে, কারণ আপনি আপনার বাবাকে ভালবাসেন। আপনি আপনার বাবার আদর চান, কিন্তু তার আদর থেকে বঞ্চিত বলে আপনার এই ক্ষোভ। যদি আপনি আপনার বাবাকে ভালো না বাসতেন, তাহলে কিন্তু ঘৃণাও অনুভব করতেন না। যেমন, স্ত্রীর সাথে ঝগড়া হলে স্বামী মনে করেন, এর চেয়ে বাজে মহিলা পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। আর স্ত্রীও তেমনি মনে করেন, দুনিয়াতে যদি একটা দজ্জাল লোক থাকে, সেটা তার স্বামী। আবার যখন মিল হয়ে গেল, তখন মনে হয় এর চেয়ে ভালো মহিলা পৃথিবীতে আর নেই অথবা এর চেয়ে ভালো স্বামী পৃথিবীতে আর নেই। এর কারণ তার কাছে প্রত্যাশাটা ছিল বেশি।

আপনি বাবাকে ক্ষমা করে দিন। বাবা তার কর্তব্য করেন নি, কিন্তু তার জন্যে আপনার যা-কিছু করা সম্ভব আপনি করবেন। নিজের ভালো থাকার জন্যেই তাকে ক্ষমা করে দিন, আপনি অনেক শান্তিতে থাকবেন। কষ্টটা বয়ে বেড়ালে জীবনের আনন্দ থেকে আপনি বঞ্চিত হবেন। মহামানবেরা কখনো কোনো কষ্ট বয়ে বেড়ান নি। কেউ গালি দিলেও তারা সেটা বয়ে বেড়ান নি।

এজন্যে তারা এত শান্তিতে ছিলেন, এত আনন্দে ছিলেন। আপনিও কষ্ট বয়ে বেড়াবেন না। তাহলে আপনি শান্তিতে থাকবেন, আনন্দে থাকবেন।

**প্রশ্ন :** আমার মা-বাবা বখাটেদের উৎপাতে আমাকে ১২ বছর বয়সে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। আমি সামাজিকভাবে মেনে নিলেও মন থেকে মানতে পারি নি। বাবা বার বার ক্ষমা চায়। কিন্তু আমি ক্ষমা করতে পারি না।

**উত্তর :** নিঃসন্দেহে আপনার জন্যে এটা খুব দুঃখজনক। কারণ ১২ বছর তো বিয়ের বয়স নয়। কবি জসীম উদ্‌দীনের আসমানীদের যুগে এমনটা হতো। কিন্তু আপনি এসব অভিযোগ একপাশে সরিয়ে রেখে ঠান্ডা মাথায় একটু চিন্তা করে দেখুন, এখন যে বিভিন্ন জায়গায় প্রেমের নাম করে কত রকম প্রতারণা হচ্ছে, অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে সর্বনাশ করা হচ্ছে। এ কারণে আপনাকে নিয়ে আপনার মা-বাবা কী পরিমাণ উদ্বিগ্ন ছিলেন!

এটা বোঝা যায় যে, আপনি আপনার বাবাকে এখনো ভালবাসেন। এজন্যেই ক্ষোভটা বেশি। আপনার জন্যে মা-বাবা যে পরিমাণ উদ্বিগ্ন ছিলেন, সেটা চিন্তা করে তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার চেষ্টা করুন। ক্ষমা করে দিলে আপনার শান্তি বাড়বে। আপনি ভালো থাকবেন। আর তাদের জন্যে দোয়া করুন। অতীতকে যত বহন করে না বেড়ানো যায় তত ভালো।

**প্রশ্ন :** আমার মা কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্য। হজ করেছেন ও নিয়মিত নামাজ পড়েন। কিন্তু বাবার সঙ্গে ঝগড়া-মারামারি-সন্দেহ সবসময় লেগে থাকে। ছেলে, ছেলের বউকে সন্দেহ করা এবং তাদের মধ্যে ঝগড়া লাগানোর জন্যে ব্যস্ত থাকেন। পরিবারে সবার মধ্যে অশান্তি। কোয়ান্টামে আসার পরও বানিয়ে বানিয়ে কথা বলে ঝগড়া করেন। আমাদের করণীয় কী?

**উত্তর :** মানসিকভাবে তিনি আসলে পুরোপুরি সুস্থ নন। তার হয়তো কোথাও কোনো বঞ্চনা আছে, কোনো অভাব আছে। যে অভাবটাকে আপনি সন্তান হিসেবে কখনো বুঝতে পারেন নি বা তিনি হয়তো বুঝতে দেন নি। যে কারণে হয়তো এই অসংগত আচরণগুলো করছেন।

মায়ের প্রতি আপনার আরো মমতা দরকার, সহানুভূতি দরকার। আর নিজের ভেতরে তার সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসুন। যা-কিছুই করুন, তারপরও তিনি আপনার মা। তাকে মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে বোঝান। তারপর বাস্তবে বলুন। তিনি যে ভুল করছেন, এটা সরাসরি তাকে

বলার দরকার নেই। তাকে মমতা দিয়ে বোঝান—মা, তুমি যে এই কথাটা বললে, তুমি ভালোর জন্যেই বলেছ। কিন্তু আমি তো কষ্ট পেয়েছি। ধীরে ধীরে তাকে বোঝান। তার জন্যে দোয়া করুন। মনছবি দেখুন, আস্তে আস্তে তিনি প্রশান্ত হচ্ছেন এবং তার এ প্রবণতা কমে যাচ্ছে।

অর্থাৎ ইতিবাচকভাবে তথ্য দিতে থাকুন। কোয়ান্টামের প্রোগ্রামে আসেন বলেই এখনো তিনি এটুকু ঠিক আছেন। যদি না আসতেন, যদি মেডিটেশন না করতেন, তাহলে হয়তো তাকে ক্লিনিকে রাখতে হতো। এখানে কিছু সময় ভালো কথা শুনছেন, ভালো চিন্তা করছেন। কিন্তু যখনই এখান থেকে যাচ্ছেন, তখন আবার আগের পরিবেশ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। এ-ক্ষেত্রে তার পরিবার ও চারপাশের মানুষের ইতিবাচক ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

**প্রশ্ন :** গুরুজী, আমি আগে একবার আপনাকে জানিয়েছিলাম আমার মা-বাবার মাদকাসক্তি নিয়ে। তখন থেকে পরের তিন-চার মাস বাসায় মাদক আসা বন্ধ ছিল। কিছুদিন হলো তারা আবার মাদক নিয়ে বাড়াবাড়ি করছে। তারা এতটাই অন্যায় আচরণ করে যে, আমার আর তাদের সাথে কথাও বলতে ইচ্ছা হয় না। মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারেও ডাকতে ইচ্ছে হয় না, দোয়াও আসে না। আমি কী করব? খুব কষ্টে আছি।

**উত্তর :** মা-বাবা দুজনই মাদকাসক্ত—নিঃসন্দেহে এটা দুঃখজনক। কিন্তু তারপরও তারাই তো আপনার মা এবং বাবা। আপনার পক্ষে তাদেরকে বাদ দিয়ে থাকা কঠিন। কারণ মেয়েদের কাছে মা-বাবার পরিচয়টা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আপনার কষ্টটা আমরা অনুভব করি এবং দোয়া করি, আল্লাহ যেন তাদেরকে ঠিক করে দেন। দোয়ার বরকতে তিন-চার মাস তো ঠিক ছিল।

আপনি তাদের জন্যে হিলিংয়ে নাম দিতে থাকুন। ধৈর্য নিয়ে নিজেও মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে মা-বাবাকে বোঝান। পড়াশোনায় মন দিন। যত কিছুই হোক, পড়াশোনা যেন খারাপ না হয়। আপনার দৃষ্টি নিজ লক্ষ্যে স্থির থাকলে নেতিবাচক বাস্তবতাগুলোকে ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ মনে হবে; যেটা কানে ঢুকলেও আমরা পাত্তা দেই না। এভাবে লক্ষ্যে ফোকাস করে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতে পারলে এগুলো আপনাকে আর অতটা কষ্ট দেবে না।

**প্রশ্ন :** আমি ক্লাস নাইনের ছাত্রী। আমার আব্বু খুব নেতিবাচক মানুষ। আমি যখন মেডিটেশন করি বা ভালো কথা বলি উনি কিছুই গ্রাহ্য করেন না। তা-ও প্রো-একটিভ থাকার চেষ্টা করি। কিন্তু তার প্রতি আমার কোনো সহানুভূতি

কাজ করে না, বরং মনে অনেক ক্ষোভ। আমার বন্ধুরা যখন তাদের বাবার কথা বলে, আমি তখন চুপ হয়ে যাই। কারণ তার সম্পর্কে কথা বলতে ভালো লাগে না। আমি এই মনোভাব থেকে বের হয়ে আসতে চাই। কী করব?

**উত্তর :** সমস্যাটা মূলত জেনারেশন গ্যাপের কারণে। নতুন প্রজন্ম এবং আগের প্রজন্মের সাথে বয়সের একটা ব্যবধান আছে। আগের প্রজন্মের অনেকে পুরনো ধ্যানধারণা নিয়ে নিজেকে নতুন প্রজন্মের সাথে মানিয়ে নিতে পারে না। ফলে বোঝাপড়ার একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়।

বোঝানোর দায়িত্বটা নিতে হবে নতুন প্রজন্মকে। আপনি কখনো বাবার সমালোচনা করবেন না। সবসময় বাবার প্রশংসা করবেন যে, বাবা তুমি কত ভালো, তুমি সুযোগ দিয়েছ বলেই আমি মেডিটেশন করতে পারছি। আমার গ্রেট বাবা তুমি। বন্ধুদের সামনে এবং বিশেষত যাদের সাথে আপনার বাবার কথা হতে পারে, তাদের সামনে বেশি বেশি বাবার প্রশংসা করবেন। বলবেন যে, বাবার মতো বাবা হয় না। বাবা আমাকে এত পছন্দ করে! এটা মিথ্যাও নয়। কারণ আপনার বাবা যদি আপনাকে পছন্দ না করত, আপনি এ পর্যন্ত আসতে পারতেন না, মেডিটেশনও করতে পারতেন না।

জীবনে প্রো-একটিভ থাকলে জয় নিশ্চিত। বাবা বাবাই। মেয়েদের কাছে বাবা খুব দুর্বল একটা জায়গা। আপনি এখন বাবার সাথে কথা বলছেন না; একটা দিন আসবে যখন বাবা বলে ডাকতে চাইবেন, কিন্তু ডাকতে পারবেন না। কারণ কেউ তো সারাজীবন বাঁচবে না। বাবাও একদিন মারা যাবেন। তখন আপনার মনে অনুশোচনা হবে। তো দরকারটা কী?

বাবা গ্রাহ্য না করলেও আপনি আপনার মেডিটেশন করবেন। তাকে ভালো কথা যা বলার বলবেন। ইতিবাচক মানুষের কাজ হচ্ছে নেতিবাচক আপনজনদেরকে ইতিবাচক করে তোলা এবং তাদের নেতিবাচক কথা দিয়ে প্রভাবিত না হওয়া। কখনো বিরক্ত হবেন না, মেজাজ দেখাবেন না। তার ইগনোর করাটাকে আনন্দিতচিত্তে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেবেন। ভাববেন যে, আমি আমার বাবাকে পরিবর্তন করতে পারব না কেন? আমি তো ভালো কাজ করছি, ভালো কথা বলছি এবং ভালোর পথে বাবাকে আনতে চাচ্ছি। আজ হোক কাল হোক আপনি সফল হবেন ইনশাআল্লাহ।

**প্রশ্ন :** ভুল কি কেবল সন্তানেরাই করে? মা-বাবার কি কোনো ভুল হয় না? ভুলকে যখন তারা ভুল বলে না, তখন এটা ভুল হচ্ছে বোঝাতে গেলে ইঁচড়ে পাকা বলে। এ-ক্ষেত্রে করণীয় কী?

**উত্তর :** এ-ক্ষেত্রে দায়িত্ব আপনার। কারণ আপনি হচ্ছেন লেটেস্ট, মা-বাবা যদিও গ্রেটেস্ট। মা-বাবাকে বোঝানোর আলাদা ভাষা আছে, পদ্ধতি আছে। এ ভাষায় যখন বোঝাতে পারবেন, তখন আর আপনাকে ইঁচড়ে পাকা বলবে না। শুধু মা-বাবার ক্ষেত্রেই নয়, প্রবীণদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য।

এ সম্পর্কে একটি মজার ঘটনা রয়েছে—

রসুলুল্লাহর (স) প্রিয় দুই নাতি ইমাম হাসান (রা) এবং ইমাম হোসেনের (রা) বয়স তখন অল্প। এক প্রবীণ বেদুঈনকে তারা ওজু করতে দেখলেন। কিন্তু তার ওজুর পদ্ধতিটা যথাযথ ছিল না। কিন্তু একজন প্রবীণকে সরাসরি তার ভুল ধরিয়ে দেয়াটাও অশিষ্টাচার। শেষে তারা দুজন মিলে একটা বুদ্ধি বের করলেন। দুজনই ঝগড়ার ভান করে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, আমি ঠিক। অপরজন বললেন, আমি ঠিক।

এসব শুনে বেদুঈন এগিয়ে এলে দুজনই বলে উঠলেন, জনাব, আপনিই ফয়সালা করে দিন আমাদের মধ্যে কার ওজু ঠিক হচ্ছে। এই বলে দুজনই যথাযথ নিয়মে ওজু করতে লাগলেন। বেদুঈন দেখলেন, তারা একই নিয়মে ওজু করছে। তা দেখে বেদুঈন বুঝে গেলেন, আসলে ভুল ছিল তার নিজের ওজুতেই। বালক দুজন তা ধরিয়ে দিচ্ছে মাত্র। তেমনি ভুল হতে পারে প্রত্যেক মা-বাবারই। ভুল হতে পারে যে-কারোরই। কিন্তু ভুল ধরিয়ে দেয়ার বা তা বলারও নিয়ম আছে। বলার ক্ষেত্রে সবসময় কুশলী হবেন, তাহলে আপনি সব জায়গাতে জয় করতে পারবেন।

## বয়োবৃদ্ধ মা-বাবার যত্ন

**প্রশ্ন :** গুরুজী, লামায় আপনি শিশুকানন তৈরি করেছেন। কখনো কি বঞ্চিত মা-বাবাদের জন্যে কিছু ভেবেছেন? মাঝে মাঝে টিভিতে বৃদ্ধাদের করুণ চিত্র আর মর্মস্পর্শী কথা শুনলে চোখে পানি ধরে রাখা যায় না। কিছু কিছু গানও আছে। একটি গানের কথা হচ্ছে, খোকাকে মা কত আদর যত্ন করেছে। এখন খোকা বড় হয়েছে, বড়লোক হয়েছে। বাড়িতে বিদেশি কুকুর ও ময়না পাখি রয়েছে। কিন্তু মায়ের জায়গা বৃদ্ধাশ্রমে। মা বলছেন, ১০০ বছর বাঁচতে চাই। আমার বয়স যখন হবে ১০০, খোকার হবে ৬০। তখন খোকার সাথে দেখা হবে এই বৃদ্ধাশ্রমে। ভুক্তভোগী মা-বাবারা তাদের খোকাদের মানুষ করেছেন কত কষ্টে; কিন্তু তার পরিণতি এত করুণ! এসব খোকাদের জন্যে কি আপনার কিছু বলার আছে?

**উত্তর :** এসব খোকাদের জন্যে দোয়া করা ছাড়া কিছু করার নেই। কারণ অর্থসম্পদ থাকুক বা না থাকুক, যারা মায়ের জন্যে কর্তব্য পালন করে না, তাদের মতো হতভাগা আর কেউ নেই। এসব খোকাদের জন্যে দোয়া করুন যেন তারা বুঝতে পারে, বৃদ্ধ মা-বাবার নিঃসঙ্গ জীবনযাপনের যন্ত্রণা কত! আমরা বিশ্বাস করি, কোয়ান্টাম পরিবারের কাউকে বৃদ্ধাশ্রমে থাকতে হবে না।

**প্রশ্ন :** কোনো লোক যদি মাকে সেবা না করে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে শুধু নসিহত করে, তাহলে তার ইবাদত কি কবুল হবে? বৃদ্ধা মাকে কোনো সময় না দিয়ে, সেবাযত্ন না করে কেবল নামাজ-রোজা করলেই কি হবে?

**উত্তর :** কারো নামাজ-রোজা কবুল হবে কিনা, এটা বলার ক্ষমতা আমার নেই। এটা সম্পূর্ণ আল্লাহর এখতিয়ারে। একমাত্র তিনিই বলতে পারবেন, কার নামাজ তিনি কবুল করবেন, কার রোজা তিনি কবুল করবেন।

দ্বিতীয়ত, বৃদ্ধা মায়ের দেখাশোনা না করা তো অপরাধ। আর এ অপরাধের শাস্তি তো নামাজ-রোজা দিয়ে মওকুফ হবে না। নবীজীর (স) শিক্ষার সাথে এর কোনো মিল নেই। জেহাদে যাওয়ার চেয়েও মা-বাবার খেদমত করাকে বেশি পুণ্যের কাজ বলেছেন নবীজী (স)।

হাদীস হচ্ছে, 'জেহাদে যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে এক যুবক নবীজীর (স) কাছে এসে উপস্থিত হলো। নবীজী (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মা-বাবা কি জীবিত রয়েছেন? যুবকটি বলল, জ্বী! নবীজী (স) বললেন, তা হলে ফিরে যাও। তোমার জেহাদকে জোরদার করো তাদের সেবাদানের মাধ্যমে' [আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা); *বোখারী, মুসলিম; হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী : ৮৮৩. ক*]।

আরেকটি হাদীস হলো—'আমি নবীজীকে (স) জিজ্ঞেস করলাম, আমার কাছ থেকে সুন্দর ব্যবহার ও সেবা পাওয়ার অধিকার কার সবচেয়ে বেশি? নবীজী (স) উত্তর দিলেন, তোমার মা। আমি আবার প্রশ্ন করলাম, তারপর? উত্তর : তোমার মা। আবার প্রশ্ন করলাম, তারপর? এবারও উত্তর : তোমার মা। চতুর্থ বার প্রশ্ন করলাম, তারপর কার? এবার উত্তর দিলেন, তোমার বাবা।' [মোয়াবিয়া ইবনে হায়দা (রা); *মুফরাদ, তিরমিজী; হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী : ৮৮৬*]।

অর্থাৎ বাবার অধিকার ২৫% হলে মায়ের অধিকার হবে ৭৫%। মাকে এত বেশি সম্মান দেয়া হয়েছে। আর সেই বহুল প্রচলিত হাদীসটি তো সবাই

জানি—'মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত' [মোয়াবিয়া ইবনে জাহিমা (রা); *নাসাঈ; হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী : ৯৬১*]।

এ থেকেই মায়ের গুরুত্ব বোঝা যায়। যত ইবাদতই করুন না কেন, মায়ের সেবাযত্ন না করার যে অপরাধ, যে জুলুম, এটার শাস্তি পেতেই হবে। অতএব যাদেরই মা-বাবা আছেন, আন্তরিকভাবে তাদের সেবাযত্ন করবেন।

**প্রশ্ন :** আমি আমার শ্বশুর-শাশুড়িকে ভরণপোষণ দিয়ে যাচ্ছি। তবুও জামাই হিসেবে তাদের কাছে ভালো হতে পারি নি। কী করা উচিত?

**উত্তর :** নিজের মা-বাবার মতো করে তাদের সেবা করা উচিত। কারণ তাদের বয়স হয়েছে এবং তারা এখন সেবাপ্রার্থী। যদি তারা বকা দেন, গালিগালাজও করেন, আপনি মনে করবেন এটা আপনার জন্যে তাদের দোয়া। আপনার দরকার হচ্ছে আল্লাহর কাছে ভালো হওয়া। অন্যরা ভালো বলে কিনা বা স্বীকৃতি দিচ্ছে কিনা এগুলো কখনো দেখবেন না। আপনি যা করছেন আল্লাহ দেখছেন এবং আল্লাহ আপনার কাজের পুরস্কার দেবেন।

সবসময় মনে রাখবেন, আপনি যার জন্যে করছেন বা যার উপকার করছেন, তার কাছ থেকে কোনোরকম ধন্যবাদের প্রত্যাশাও করবেন না। আপনার যখন প্রয়োজন হবে, আপনি এমন মানুষের উপকার পাবেন, যাকে জীবনে হয়তো দেখেনও নি। আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাই—আপনি শ্বশুর-শাশুড়ির ভরণপোষণ দিয়ে যাচ্ছেন। যতদিন তারা বেঁচে আছেন তাদের আন্তরিক খেদমত করবেন। পুরস্কার পাবেন আল্লাহর কাছ থেকে।

**প্রশ্ন :** আমার বাবা নেই। বড় ভাইবোন আমাদের কোনো খোঁজ নেয় না। আমার মা এবং ছোট ভাইবোন আমাকে ছাড়া কিছু বোঝে না। মনে করে, আমার কাছে টাকা, বুদ্ধি, অভিভাবকত্ব সব আছে। আমার মা অনেক অসুস্থ; হাঁটাচলা করতে পারেন না। মাকে কোনো ভাইবোন পছন্দ করে না। তারা তাকে রাখতে চায় না। মা শুধু কান্না করে আর নেতিবাচক কথা বলে। এদিকে আমার দুই ছেলে ডিজিটাল টক্সিনে আক্রান্ত। ওদের বাবা আরো বেশি আসক্ত। অনেক বেশি সময় টিভি দেখে কাটায়। নামাজও পড়ে না। ছেলেদের আসক্তিকে সাপোর্ট দেয়। দুই পরিবার নিয়ে আমি কী করব?

**উত্তর :** যেহেতু আপনার ওপরে মা নির্ভর করে, যতটুকু পারেন অবশ্যই মায়ের সেবা করবেন। অন্যরা না দেখলে তাদের কর্মফল তারা ভোগ করবে।

কিন্তু আপনি যতটুকু সেবা করবেন এটুকু আপনার সঞ্চয়। এই সেবাটুকু অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এটা ইবাদত। যত দায়িত্ব পালন করতে পারবেন তত আপনার পরকালীন সঞ্চয় বাড়তে থাকবে।

যেহেতু স্বামী ও সন্তান আসক্ত, বাস্তবে তারা আপনার কোনো কথা শুনবে না। তাদেরকে যত নিষেধ করতে যাবেন, তত সেই কাজটা বেশি করবে। তাই বোঝানোর চেষ্টা করবেন মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে। মমতা দিয়ে ডিজিটাল টক্সিনের বিপদ সম্পর্কে বলবেন এবং দোয়া করবেন।

**প্রশ্ন :** আমার জন্মের পূর্বেই বাবা মারা যান। মা খুব কষ্ট করে আমাকে বড় করেছেন। বর্তমানে আমি ঢাকায় থাকি। মা গ্রামের বাড়িতে। মায়ের সেবা করা আমার দায়িত্ব। কিন্তু স্ত্রী মাকে একটুও সহ্য করতে পারেন না। মাকে সাথে রাখার সাপোর্ট তো দেন-ই না, আমি মায়ের কাছে যেন না যাই সেজন্যে মিথ্যা অপবাদ দেন। মায়ের সেবা করতে গেলে সংসারে অশান্তি, দেখাশোনা করতে না পারলে নিজেকে পাপী মনে হয়। এখন কী করব?

**উত্তর :** আপনি যদি মায়ের সেবা করতে চান, তাহলে স্ত্রী কতক্ষণ আটকে রাখবে? মায়ের সেবা না করার জন্যে স্ত্রীর দোষ দেবেন না। প্রয়োজনে আপনাকে দৃঢ় হতে হবে। স্ত্রীকে বলুন, তোমার অধিকার তোমার, মায়ের অধিকার মায়ের। ফোনে নিয়মিত মায়ের খবর নিন। মাকে দেখতে যান। কারণ মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত, স্ত্রীর পায়ের নিচে নয়। মায়ের সাথে আপনার যোগাযোগ যদি স্ত্রী কোনোভাবেই পছন্দ না করে, তবে মায়ের জন্যে আপনি কী করছেন এই বিবরণ স্ত্রীকে দেবেন না।

কোনো নারী স্বামীকে তার মা-বাবার সেবা করা থেকে কখনো বঞ্চিত করবেন না। কোনো স্বামীও কখনো স্ত্রীকে তার মা-বাবার সেবা করা থেকে বঞ্চিত করবেন না। এটা মহাপাপ। আজ আপনি বঞ্চিত করলে যখন আপনার সেবার প্রয়োজন হবে, আপনি পাবেন না। আপনার যদি ছেলে থাকে, দেখা যাবে যে, ছেলের স্ত্রীও আপনার ছেলেকে আপনার সেবা করা থেকে বঞ্চিত করতে বাধ্য করছে। যে স্বামী তার স্ত্রীকে তার মা-বাবার সেবা থেকে বঞ্চিত করবে তিনিও তার মেয়ের সেবা থেকে বঞ্চিত হবেন। সাধারণভাবে এটাই ঘটে থাকে। এটা হচ্ছে প্রকৃতির শাস্তি। আল্লাহর শাস্তি তো আছেই।

তাই প্রতিজ্ঞা করুন, আমি আমার স্বামী/ স্ত্রীকে তার মা-বাবার সেবা করা থেকে কখনো বঞ্চিত করব না। নিজেও মা-বাবার সেবা করতে কার্পণ্য বা গড়িমসি করব না।

**প্রশ্ন :** আমার বেতন এবং সামর্থ্য অনুসারে মা-বাবাকে তেমন কিছু দিতে পারি না। কিন্তু তারা মাঝে মাঝে কিছু পাওয়ার আশা করেন। আমি যে দিতে পারছি না—এটা কীভাবে তাদের বোঝাব যাতে তারা কষ্ট না পান?

**উত্তর :** মা-বাবাকে বোঝানো খুব সহজ। মাঝে মাঝে আপনি কি মায়ের পাশে গিয়ে তার হাতটা ধরে কিছুক্ষণ বসেছেন? বাবার হাতটা ধরে কি কিছুক্ষণ বসে থেকেছেন? এর জন্যে তো অর্থের প্রয়োজন হয় না। যদি আপনার ভেতরে মমতা থাকে, মা-বাবা অবশ্যই বুঝবেন। আপনার চেহারা দেখলেই তারা বুঝবেন যে, আপনার আর্থিক সামর্থ্য আছে কিনা।

ছেলে যদি মা-বাবার সাথে একান্তে সময় কাটায়, আন্তরিকভাবে তাদের খোঁজখবর নেয়, তাদের কি চাওয়ার আর কিছু থাকে? আমরা মনে করি, শুধু বস্তু দিলেই বোধহয় সবাই খুশি হবেন। মা-বাবাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে, বোঝানোর জন্যে অর্থ লাগে না। আপনার চেহারা দেখেই তারা বুঝতে পারবেন, যদি আপনার ভেতরে তাদের প্রতি ভালবাসা থাকে।

**প্রশ্ন :** মেয়ের বিয়ের পর বৃদ্ধ মা-বাবাকে যদি দেখার কেউ না থাকে, মেয়ের স্বামীও যদি এ ব্যাপারে কোনো আগ্রহ না দেখায়, তাহলে মেয়ে কীভাবে মা-বাবার প্রতি দায়িত্ব পালন করবে? কীভাবে তাদের খেদমত করবে?

**উত্তর :** এটা খুব কঠিন বিষয়। একটা হচ্ছে আগ্রহ না দেখানো, আরেকটা হচ্ছে বাধা দেয়া। দুটো কিন্তু আলাদা পরিস্থিতি। স্বামী যদি আগ্রহ না দেখায় এবং বাধাও না দেয়, আপনি একভাবে করতে পারেন। অশান্তি সৃষ্টি না করে যতটা সম্ভব আপনি আপনার দিক থেকে মা-বাবার খেদমত করবেন। স্বামীকে জড়াতে যাবেন না, যেহেতু তার আগ্রহের অভাব রয়েছে। কারণ তখন তিক্ততা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

অতএব আপনি যতটা পারেন, আপনার মা-বাবার খেদমত করবেন। সেইসাথে স্বামীর প্রতিও মনোযোগটা ঠিক রাখবেন, যেন স্বামী অভিযোগ করার সুযোগ না পায়। আর স্বামীকে মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে নিয়ে এসে বোঝাবেন। কারণ মা-বাবা তো আসলে সবারই। স্ত্রীর মা-বাবা আর নিজের মা-বাবা বা স্বামীর মা-বাবা আর নিজের মা-বাবা—এর মধ্যে তো কোনো পার্থক্য করা উচিত নয়। যারা পার্থক্য করে তারা আসলে হতভাগা।

তাই সবাইকে নিজের মা-বাবা হিসেবেই দেখবেন। যেহেতু স্বামীর আগ্রহ নেই, তাই আপনি মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে তাকে বোঝাবেন

যে, আমরা দুজনে মিলে মা-বাবার খেদমত করলে আল্লাহর রহমত আমাদের ওপর থাকবে। আর স্বামীর সাথে ভালো আচরণ করবেন। তার অনাগ্রহ বা অপারগতা নিয়ে তাকে কখনো প্রশ্ন করবেন না, খোঁটা দেবেন না। নিজের পক্ষে যতটুকু সম্ভব মা-বাবার জন্যে করতে থাকুন।

**প্রশ্ন :** মা-বাবার সেবা করতে আনন্দ হয়। মাঝে মাঝে মায়ের সেবা পেতে ইচ্ছা হয়। এমন হলে আমি কোন দলের অন্তর্ভুক্ত হবো?

**উত্তর :** এটাকে কিছুটা সংশোধন করে আমরা বলতে পারি—মা-বাবার সেবা করে আনন্দ পাই, কিন্তু মাঝে মাঝে মায়ের আদর পেতে ইচ্ছা হয়। মা কেন শুধু সেবা দিয়ে যাবেন? আমাদের জন্মের আগে এবং ছোটবেলায় প্রথম ১২ মাস যে সেবা মা করেছেন, আমরা যদি ১২০ বছরও মায়ের সেবা করি, তবুও এর প্রতিদান দেয়া সম্ভব হবে না। আর মাঝে মাঝে কেন, সবসময়ও যদি মায়ের আদর পেতে ইচ্ছা হয়, তবুও আপনি দাতার দলেই থাকবেন, গ্রহীতার দলে নয়। আন্তরিকতার সাথে আনন্দিতচিত্তে মা-বাবার সেবা করে যান। সেবক ও দাতার দলে থাকার মানসিকতা লালন করুন।

**প্রশ্ন :** আমার আম্মুর বয়স হলেও তেমন কোনো অসুখ নেই, কিন্তু সারাক্ষণ শুয়ে থাকেন। তাই না চাইলেও অনিচ্ছাকৃতভাবে খারাপ ব্যবহার করা হয়। মনে মনে খুব অনুশোচনা হয়। এ-ক্ষেত্রে কী করণীয়?

**উত্তর :** বয়োবৃদ্ধ মা-বাবা এবং ছোট্ট শিশুর মধ্যে আসলে কোনো পার্থক্য নেই। অতএব বয়স হয়ে গেলে তখন মা-বাবার সাথে কোনোভাবেই খারাপ ব্যবহার করবেন না। কারণ আজকে আপনার মায়ের বয়স হয়েছে, আপনারও তো ওই বয়স আসবে! প্রকৃতির শাস্তি কিন্তু অত্যন্ত নির্মম। আপনার ওই বয়সে যাতে আপনার সাথে কেউ খারাপ ব্যবহার না করতে পারে, সেজন্যে আপনি ভালো কিছু সঞ্চয় করুন, মায়ের সাথে ভালো ব্যবহার করুন। কারণ আপনি যা-ই করবেন, সেটাই আপনার জন্যে জমা হয়ে থাকবে।

দ্বিতীয়ত, আপনি সম্ভবত মাকে সময় দিতে পারেন না। তিনি করবেনটা কী? তাই যখনই যান তাকে শুয়ে থাকতে দেখেন। আপনার যদি সময় থাকে, আপনিই তাকে ব্যস্ত করে তুলুন। তার সাথে কথা বলুন, হাঁটাহাঁটি করুন, তার সাথে বসে ভালো কিছু পড়ুন। অর্থাৎ আপনি যদি তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, দেখবেন তিনিও ব্যস্ত থাকছেন।

**প্রশ্ন :** জীবিকার প্রয়োজনে মা-বাবার কাছ থেকে দূরে থেকেও তাদের প্রতি আত্মিক ও আর্থিকভাবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হলে সেটা কি অবিদ্যা হবে?

**উত্তর :** জীবিকার প্রয়োজনে বাস্তব কারণে মা-বাবার কাছ থেকে দূরে থাকতে হতে পারে। সে-ক্ষেত্রে ছেলে হিসেবে মা-বাবার আর্থিক প্রয়োজন ও দেখাশোনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করাটা অবশ্যই আপনার দায়িত্ব। আপনি আত্মিক ও আর্থিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারলেও মা-বাবার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার ব্যাপারে আন্তরিক হবেন এবং তাদের জন্যে দোয়া করবেন। এটা আপনার এবং তাদেরও মানসিক প্রশান্তি বাড়াবে।

**প্রশ্ন :** আমার এখনকার মা-বাবা আমাকে শৈশবে পালক নিয়ে বড় করেছেন। তাদের সংসারে এমনিতেই অনেক অভাব। আমার বিয়ের পর থেকে তাদের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যায়। আমি এবং আমার স্বামী নিয়মিত মাটির ব্যাংকে দান করি। হিলিংয়ে সদকায় নাম দেই সারাবছর এবং প্রতিমাসে কোয়ান্টাম এতিমান ফান্ডে দান করি। মাটির ব্যাংক ও এতিমান ফান্ডে দান জমা করে আমি অনেক উপকার পেয়েছি। কিন্তু আমার পালক মা আমাকে বলেন, 'তোমরা এত টাকা কোয়ান্টামে দান করছ। অথচ আমরা ঠিকমতো খেতে পাই না। আল্লাহ বলেছেন, মা-বাবার হক আগে।' আবার আমার গর্ভধারিণী মা একদিন বললেন, 'তুমি কোয়ান্টামে এতিমদের দান করো। কিন্তু তোমার আপন বোন বাচ্চা জন্ম দেয়ার সময় মারা যায়। পরে ওর বাবা বাচ্চাটাকে আমাদের কাছে ফেলে চলে যায়। এই এতিম বাচ্চাটাকে আমরা কত কষ্টে বড় করছি! তুমি তো এই বাচ্চাটার খরচ দিতে পারো।' গুরুজী, আমি কী জবাব দেবো? আমার করণীয় কী হবে?

**উত্তর :** নিঃসন্দেহে মা-বাবার অধিকার সবার আগে। মা ও বাবাকে খাইয়ে তারপর নিজে খাবেন। মা-বাবা অভাবগ্রস্ত হলে তাদের প্রয়োজন পূরণ করাটা শ্রেষ্ঠ দান। এ ব্যাপারে দ্বিমত নেই।

আপনি কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক ও এতিমান ফান্ডে দান জমা করে উপকৃত হয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ। এখানে যেভাবে দান করছেন, করতে থাকুন। সেইসাথে মা-বাবার যত্ন নেয়ার নিয়ত করুন। কারণ পালক মা-বাবা হলে কী হবে, তারা মমতা দিয়ে লালন করেছেন বলেই তো আপনি আজকের অবস্থানে এসেছেন। সেই কৃতজ্ঞতার প্রকাশ করুন তাদের অভাব দূর করে। আপনার কোনোরকম অভাব হবে না ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশটি হলো, বোনের মৃত্যুর পর তার সন্তানকে আপনার মায়ের কাছে রেখেছে এবং তিনি খুব কষ্টে তাকে লালন করছেন। তার মানে শিশুটি এখানে স্বাভাবিকভাবে অবহেলিত। আসলে বাবা মারা গেলে তবুও মায়ের মমতা থাকে। কিন্তু মা মারা গেলে শিশুটি সত্যিকারের এতিম হয়ে যায়। কারণ সে তখন মমতা থেকেও বঞ্চিত হয়।

অন্য আত্মীয়রাও শিশুটির তেমন কোনো দায়িত্ব নেয় না; বরং খোঁটা দেয় যে, নিজের জোটে না, আবার একটা এতিম জুটিয়েছে! আমাদের দুর্দশার একটা কারণ কিন্তু এটা। কোরআন শরীফে সূরা ফজরের ১৭ নম্বর আয়াতে মানুষের দুর্গতির কারণ হিসেবে আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা এতিমের প্রতি সম্মানজনক আচরণ করো না... ।' অর্থাৎ এতিমকে শুধু দয়া করলে হবে না, নিজের সন্তানের মতো তাকেও একইরকম সম্মান ও আদর করতে হবে।

আপনার মায়ের যেহেতু বয়স হয়েছে, তার জন্যে শিশুটির যত্ন নেয়া কঠিন। তাই শিশুটির জন্যে আপনি শুধু দান করে লাভ হবে না। এজন্যে আপনার মাকে সরাসরি বলুন, শিশুটিকে তোমাদের কষ্ট করে মানুষ করার দরকার নেই। তাকে বান্দরবান লামাতে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তি করে দাও। সেখানে সে একজন আত্মবিশ্বাসী প্রত্যয়ী মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে। কোয়ান্টাম সম্মানজনকভাবে এতিম শিশুদের লালনের কাজটি করছে। মাকে উদ্বুদ্ধ করুন শিশুটিকে লামায় দিয়ে দিতে, যেন সে স্বমর্যাদায় স্বমহিমায় আত্মপরিচয় সৃষ্টি করতে পারে।

**প্রশ্ন :** আমার একটা চাকরি লাভের জন্যে দোয়া করবেন, যেন আমি খুব দ্রুত মা-বাবার দায়িত্ব ও যত্ন নিতে পারি।

**উত্তর :** আমি অভিনন্দন জানাই যে, আপনি মা-বাবার দায়িত্ব নিতে চান। এই জামানায় মা-বাবা অনেকের কাছে শুধুই সাপ্লায়ার। এর বেশি কিছু ভাবতে চায় না অনেকে। আপনার এই দায়িত্ব নিতে চাওয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। দোয়া করি আপনি যেন দ্রুত সফলতার সাথে দায়িত্ব নিতে পারেন।

**প্রশ্ন :** ইদানীং ঈদের ছুটিতে অনেকেই দেশে-বিদেশে বেড়াতে যায়। কিন্তু বৃদ্ধ মা-বাবা ঈদে ছেলেমেয়েকে কাছে পেতে চায়। এদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন?

**উত্তর :** বৃদ্ধ মা-বাবাকে রেখে যদি প্রতি ঈদেই বেড়াতে যান, মনে রাখবেন, আপনিও একদিন বৃদ্ধ হবেন। অর্থাৎ এই দিনই দিন নয়। তখন আপনার

সন্তানরাও বলবে, ড্যাডি, তুমি তো অনেক বুড়ো হয়ে গেছ। তুমি আমাদের সাথে বেড়াতে পারবে না। তাই বাড়িতে বৃদ্ধ মা-বাবা থাকলে বছরে অন্তত একটা ঈদ তাদের সাথে উদযাপন করুন। আরেকটা ঈদে চাইলে বেড়াতে যেতে পারেন। আবার সুযোগ থাকলে মা-বাবাকে সাথে নিয়েও বেড়ানোর প্রোগ্রাম করতে পারেন।

## আপনজন হারানো

**প্রশ্ন :** আমার স্বামী ৪৭ বছর আমার সাথে থেকে আমাকে ছেড়ে দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। এই কষ্টটা আমি মেনে নিতে পারছি না। আমাদের তিন মেয়েই পরিবার নিয়ে বিদেশে থাকে। আমি খুব অসহায় অনুভব করছি। কী করলে আমি এই কষ্ট থেকে মুক্তি পাব গুরুজী?

**উত্তর :** আপনারা ৪৭ বছর একসাথে ভালোভাবে কাটিয়েছেন। এজন্যে শুকরিয়া আদায় করুন যে, আল্লাহ এই সুযোগ আপনাদেরকে দিয়েছেন এবং এখনো আপনি তাকে ফিল করছেন। নিশ্চয়ই তিনি ভালো মানুষ ছিলেন। আর তিন মেয়ে বিদেশে আছে। আপনার তো তাদেরকে বিয়ে দেয়ার টেনশনও নেই। এখন আপনি দোয়া করুন যেন তারা ভালো থাকে।

আপনার যেহেতু এখন স্বামী সন্তান সংসার বা অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ততা নেই, আপনি যত সঙ্ঘের সাথে থাকবেন তত ভালো থাকবেন। যারা সঙ্ঘে একাত্ম থাকেন, তারা কখনো একা অনুভব করেন না। আপনিও একাত্ম থাকুন, সঙ্ঘকে সবসময় আপনার পাশে পাবেন। আর সেবামূলক কাজে সম্পৃক্ততা আপনার অন্তরে আনবে তৃপ্তি।

**প্রশ্ন :** পরকালেও কি সঙ্গী হিসেবে আমার স্বামীকে পাব? যদি তা না হয়, তবে তাকে সঙ্গী হিসেবে পাওয়ার উপায় কী? উল্লেখ্য, তিনি মারা গেছেন। আমি প্রায়ই তাকে স্বপ্নে দেখি এবং অনুভব করি তিনি আমার পাশে।

**উত্তর :** বোঝা যাচ্ছে, আপনি স্বামীকে খুব ভালবাসেন। যেহেতু স্বামীকে আপনি খুব ভালবাসেন এবং আপনার স্বামী যদি সামান্যতম সৎকর্ম করে থাকেন আর আপনি যদি আল্লাহকে বলেন, আল্লাহ, তাকে আমার পরবর্তী জীবনের সঙ্গী কোরো, আল্লাহ অবশ্যই করবেন। আর আপনি আপনার স্বামীর

জন্যে যেটা করতে পারেন, আপনার সমস্ত সৎকর্ম তাকে দিয়ে দিন—যেন আপনার স্বামী পরকালে আপনার সঙ্গী হয়। একজন বিশ্বাসী মানুষ পুরস্কার হিসেবে স্রষ্টার কাছে যা চান, স্রষ্টা তাকে তা-ই দেন।

**প্রশ্ন :** আমার মৃত শ্বশুরের নামে দানের নিয়ত করেছি। কিন্তু মৃত ব্যক্তির নামে কি দান হয়? নাকি যে টাকা দেবে দানটা তার নামে হবে?

**উত্তর :** মৃত আত্মীয়ের জন্যে দোয়া এবং দান দুটোই অত্যন্ত কার্যকর। আপনারা তার অনন্ত শান্তির জন্যে দান করতে পারেন। এর পাশাপাশি মৃত ব্যক্তির জন্যে *আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী* এবং *হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী* বিতরণ করুন, যত বেশি সম্ভব। সম্প্রতি একজন বললেন, তার মরহুম বাবার চল্লিশা করবেন। কিন্তু একে তো এতে অনেক খরচ; উপরন্তু খেয়ে অধিকাংশ অতিথিই তৃপ্ত হয় না। অনেকে আবার খাবারের বদনাম করতে করতে যায়।

তাকে বললাম, আমন্ত্রিতদের খাওয়াদাওয়ার জন্যে চল্লিশা প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু এ দিয়ে মৃত ব্যক্তির কী উপকার হবে? জানতে চাইলাম, কতজনকে খাওয়াতে চান? বললেন, দুশ জনকে খাওয়াতে হবে এবং জনপ্রতি খরচ সেই সময় লাগবে ন্যূনতম দুশ টাকা। বললাম, আপনারা জনপ্রতি দেড়শ টাকা খরচ করেন। বললেন, কীভাবে? বললাম, আপনি এই দুশ জনের কাছে দুশ *আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী* নিয়ে যান। প্রত্যেককে বলুন, ভাই, আমি তো বাবার নামে চল্লিশা করতাম, কিন্তু তাতে যে টাকাটা খরচ হতো তা দিয়ে কোরআনের মর্মবাণী আপনাকে দিলাম। আপনি এই মর্মবাণী পড়ে বাবার জন্যে দোয়া করবেন।

এই দুশ জনের মধ্যে ১০ জন মানুষও যদি মর্মবাণী পড়ে উপকৃত হয়, যদি আলোর পথ পায়, হেদায়েতের পথ পায়, যদি সত্যের পথে আসে, এটা আপনার বাবার জন্যে সদকায়ে জারিয়া হয়ে থাকবে। আর এ মর্মবাণী ঘরে থাকলে কেউ না কেউ এটা পড়বেই এবং যারা পড়বে তাদের মধ্যে কেউ না কেউ এ থেকে উপকৃত হবেই। অতএব চল্লিশায় ভোজের আয়োজনের চেয়ে ৪০ কপি মর্মবাণী বিতরণ করা অনেক উত্তম সৎকর্ম। এখন তো চাইলে হাদীস মর্মবাণীও যুক্ত করতে পারেন।

মনে রাখবেন, মৃত আত্মীয়ের জন্যে চল্লিশা খাওয়ানো হচ্ছে একটা সংস্কার। অর্থহীন সংস্কার অনুসরণের সাথে মৃত ব্যক্তির কল্যাণের কোনো সম্পর্ক নেই। তার চেয়ে বরং একজন মানুষকেও যদি আপনি কোরআন ও

হাদীসের জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করতে পারেন, তাতে মৃত ব্যক্তির পারলৌকিক মুক্তির পথ সুগম হতে পারে। দানের মানি রিসিট যার নামেই হোক, নিয়তের কারণে মরহুম ব্যক্তি সওয়াব পেয়ে যাবেন ঠিকই।

**প্রশ্ন :** আমাদের মা-বাবা হয়তো অনেক ভুল করে গেছেন। তাদের সন্তান যদি সঠিক পথে থাকে, তাহলে কি সে তার মা-বাবার পরকালীন সুখের জন্যে কিছু করতে পারবে না? নিজের সুখ-শান্তি বিনাশ করে মা-বাবা সন্তানের সুখের কথা চিন্তা করে। সেই সন্তান কেন পরকালে মা-বাবার পাশে দাঁড়াতে পারবে না? আর কেয়ামত পর্যন্ত সওয়াব পাওয়ার উপায় কী?

**উত্তর :** মা-বাবার জন্যে নেক সন্তান সবচেয়ে বড় নেয়ামত। আমরা মেডিটেশনে, আলোচনায় এবং যখনই দোয়া করি, আমাদের সমস্ত পুণ্য আমাদের অভিভাবকদের জন্যে উৎসর্গ করে দেই। সন্তানের সবচেয়ে বড় কর্তব্য হচ্ছে, যখনই সে নামাজ পড়ে, প্রার্থনা করে, মেডিটেশন করে, তখন তার মা-বাবা ও অভিভাবক অর্থাৎ যাদের কাছে তার ঋণ রয়েছে, যাদের কাছে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার বিষয় রয়েছে, যাদের কাছ থেকে উপকার পেয়েছে, প্রত্যেকের জন্যে দোয়া করা। যারাই মারা গেছেন, তাদের জন্যে এই দোয়াই সবচেয়ে শান্তির।

অবশ্যই একজন নেক সন্তান, একজন সৎকর্মশীল সন্তান তার মা-বাবা বা অভিভাবকদের জন্যে শুধু নয়, হাজারো মানুষের জন্যে সে কল্যাণের দরজা খুলে দিতে পারে। অনেক সময় মা-বাবারা বলেন, নিজেদের বিনাশ করছি কীসের জন্যে? তোদের সুখের জন্যে। আসলে সেটা কি নেক সন্তান বানানোর জন্যে? অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা কিন্তু নয়। সন্তানের জন্যে বাড়ি করে রাখব, সন্তানের জন্যে ব্যাংক-ব্যালেন্স রাখব যেন তাদের কষ্ট না হয়।

এই বাড়ি, ব্যাংক-ব্যালেন্স, সম্পদ দিয়ে যদি সন্তান সৎকর্ম করে অবশ্যই মা-বাবা সে পুণ্যের অধিকারী হবেন। কিন্তু এই টাকা যদি সে মাদকের পেছনে বা অন্যায় কাজে ব্যয় করে, তাহলে মা-বাবা যত কষ্ট করেই তার জন্যে সম্পদ রেখে যাক, এই গুনাহের অংশীদার তাকেও হতে হবে।

সন্তানের জন্যে মা-বাবার সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে তাকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করা, শুদ্ধাচারী মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। এটার জন্যে কোনো মা-বাবা যদি ত্যাগ স্বীকার করেন যে, আমি আমার সন্তানকে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছি বা গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি; তারপর সেই সন্তান যদি অন্যায় করে, সেই অন্যায়ের কোনো প্রতিফল

মা-বাবার কাছে যাবে না। কারণ মা-বাবা তাকে আলোকিত মানুষ করার জন্যেই সবকিছু করেছেন। কিন্তু মা-বাবা যদি অর্থসম্পত্তি রেখে যান, আর সে অপব্যবহার করে, সেটা দিয়ে সে অন্যায় করে, তাহলে মা-বাবা তো দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারেন না।

আর কেয়ামত পর্যন্ত সওয়াব পাওয়ার উপায়টা খুব সহজ। সেটা হচ্ছে, মানুষকে আলোকিত করা এবং মানুষের জীবন থেকে অবিদ্যাকে দূর করার কাজ। *আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী* বিতরণের কাজ, এই আলোকিত করার কাজটা কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। এটা সদকায়ে জারিয়া। সদকায়ে জারিয়ার অনেক কিছু আছে। তবে মানুষকে আলোকিত করার কাজটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সদকায়ে জারিয়া। নবী-রসুল, অলি-বুজুর্গ, মহামানবেরা এ-কাজ করেছেন। মানুষের জীবন থেকে অবিদ্যা দূর করেছেন। অবিদ্যা দূর করার কাজটাই সবচেয়ে পুণ্যের।

এ-ছাড়াও আরো ভালো কাজ আছে। ধরুন, আপনি একটা টিউবওয়েল বসালেন। এই টিউবওয়েল থেকে যতদিন মানুষ পানি পান করবে, ততদিন আপনার পুণ্য হতে থাকবে। আবার হয়তো একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করলেন। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যতদিন থাকবে এবং এখান থেকে জ্ঞানের আলো যতদিন বিকিরণ হতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত এটার সওয়াব আপনি পাবেন। অর্থাৎ ভালো কাজের প্রভাব প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলতে থাকে। সেই কাজের সাথে যদি আপনি সংযুক্ত থাকেন, তো যতদিন ওই কাজ চলবে ততদিন পর্যন্ত আপনি সওয়াব পেতে থাকবেন।

**প্রশ্ন :** সন্তানদের সাথে কী কী ভুল আচরণ করেছি এটা মনে করতে গিয়ে মনে পড়ে গেল আমি মা-বাবার সাথে কত না অহেতুক রাগ করেছি। মা-বাবা তো মারা গেছেন। আমার ভুল শোধরানোর কোনো উপায় আছে?

**উত্তর :** আমরা কেউ কেউ সময়মতো বুঝি, কেউ দেরিতে বুঝি। যিনি সময়মতো বোঝেন তিনি নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমান আর যিনি দেরিতে বোঝেন, এটা একধরনের দুর্ভাগ্য। কারণ দেরিতে বুঝলে করার কিছুই থাকে না। তাই মা-বাবার জন্যে দোয়া করবেন। দোয়াটাই মৃতদের কাছে যাবে।

**প্রশ্ন :** আমার বাবা মারা গেছেন। শেষ বয়সে তার যেটুকু যত্ন করার প্রয়োজন ছিল তা করতে পারি নি। খুব অনুশোচনায় ভুগছি। কী করতে পারি এই অনুশোচনা থেকে বাঁচতে?

**উত্তর :** আপনার অনুশোচনায় আমরা সমব্যথী। কিন্তু অনুশোচনা বহন করে বেড়ানো অর্থহীন। যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। এখন মানসিক কষ্ট থেকে বাঁচতে আপনি এক বা একাধিক এতিমের দায়িত্ব নিন, *আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী* এবং *হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী* বিতরণ করুন। আপনার আক্ষেপ ঘুচবে, সেইসাথে বাবার জন্যে এটি হবে সদকায়ে জারিয়া।

এতিমের যত্নে অংশ নেয়া তো আমাদের জন্যে খুব সহজ। এককভাবে বা পরিবারের কয়েকজন মিলে প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা কোয়ান্টামের এতিমান ফান্ডে দান করে একজন এতিমের দায়িত্ব নিতে পারেন। এ ফান্ডে একজনকে উদ্বুদ্ধ করা মানে এতিমের অভিভাবকের সংখ্যা বৃদ্ধি। এই সংখ্যা যত বাড়বে, সমাজ তত সুন্দর হবে। বঞ্চিত শিশুরা গড়ে উঠবে আলোকিত মানুষ হিসেবে। আমাদের ওপর থাকবে আল্লাহর রহমত। কারণ এতিমের দায়িত্ব যে নেয়, আল্লাহ তার দায়িত্ব নেন।

দুঃখজনক হলেও সত্য, বয়োবৃদ্ধ মা-বাবার যে যত্ন নেয়া প্রয়োজন, এটাই সন্তানেরা কখনো কখনো ভুলে যায়। এ-ক্ষেত্রে মা-বাবার দায়িত্বও কম নয়। ছোটবেলা থেকেই সন্তানকে সমমর্মী মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তাকে বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখাতে হবে। এ-ক্ষেত্রে সন্তানের সামনে দৃষ্টান্ত হতে হবে মা-বাবাকেই। আপনার মা-বাবার প্রতি যে আচরণ আপনি করবেন, আপনার সন্তানের কাছ থেকেও প্রাকৃতিক নিয়মে তা-ই পাবেন।

অতএব যারা বয়োবৃদ্ধ মা-বাবার সেবা করার সুযোগ পাবেন, তারা ভাগ্যবান। আন্তরিকভাবে তাদের যত্ন নিন, যাতে পরে অনুশোচনা করতে না হয়। আর যাদের মা-বাবা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন, তারা যথাসাধ্য সৎকর্ম করুন, দান করুন, এতিমের দায়িত্ব নিন এবং সদাচারী মানুষ হওয়ার চেষ্টা করুন। এই ভালো কাজগুলো মৃত মা-বাবার আমলনামায় যুক্ত হতে থাকবে।

**প্রশ্ন :** আমার মা-বাবা মারা গেছেন অনেক আগে। তাদের নামে আমি লামার শিশুদের জন্যে এক লক্ষ টাকা দিয়েছি। এখন আমি আমার মা-বাবার আত্মার মাগফেরাতের জন্যে প্রতিমাসে সদকা হিলিং দিতে পারব কি?

**উত্তর :** মৃত কারো মাগফেরাতের জন্যে হিলিং দেয়ার দরকার নেই। হিলিং যা দেবেন সেই টাকাটা আপনি অনাথ শিশুদের জন্যে কোয়ান্টাম এতিমান ফান্ডে দান করে দেবেন। কারণ মৃত ব্যক্তির তো আর নিরাময় কামনার কিছু নেই। পরিবারের যারাই মারা গেছেন তাদের নামে ফাতেহা ফান্ডে দান করবেন। লামাতে তাদের মাগফেরাত ও অনন্ত প্রশান্তির জন্যে দোয়া হতে থাকে।

**প্রশ্ন :** আমার শ্বশুর কিছুদিন আগে মারা গেছেন। আমি তার নিকট থেকে মাফ চেয়ে নিতে পারি নি। এখন আমি কীভাবে মাফ পেতে পারি?

**উত্তর :** আপনি তো জানতেন না যে, তিনি মারা যাবেন। তার সাথে যদি কোনো ভুল করে থাকেন, তাহলে ভালো কাজ করুন এবং সেই সওয়াব তার জন্যে উৎসর্গ করে দিন। তাহলে আপনার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হবে। অর্থাৎ ভুল করলে কাফফারা দিতে হবে। কাফফারাটা হচ্ছে ভালো কাজ।

**প্রশ্ন :** আমি ছিলাম বাবার অবাধ্য সন্তান। প্রায় ছয় বছর পূর্বে তিনি মারা যান। এখন প্রায় প্রতিরাতেই তাকে স্বপ্নে দেখি। পূর্বে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে আমার সাথে তার প্রচণ্ড ঝগড়া হয়। মাঝে মাঝে উনি আমাকে হাত ধরে কোথায় যেন নিয়ে যেতে চান। একহাত ধরে বাবা আরেক হাত ধরে মা টানে (মা জীবিত)। আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠি। সারারাত সেই ভয় আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। আমি এখন কী করব?

**উত্তর :** আপনি বাবার অবাধ্যতা করেছেন বলে আপনার ভেতর যে অন্তর্গত বেদনাবোধ, এটা তারই বহিঃপ্রকাশ। তাই এখন ধ্যানের স্তরে গিয়ে অন্তর থেকে মাফ চান। বাবার অনন্ত শান্তি কামনা করুন এবং সাধ্যমতো দান করুন। এই নিয়তে ৪০ কপি *আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী* বিতরণ করুন। আর বাবার পছন্দের যে মানুষগুলো বেঁচে আছেন, তাদের খোঁজখবর নিন। সেইসাথে মা যেহেতু জীবিত, আপনি মায়ের সেবা করুন যত বেশি সম্ভব।

**প্রশ্ন :** সন্তানেরা পুরোপুরি দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাওয়ার আগেই যদি মা-বাবা কেউ মারা যান, তাহলে এ ঋণ কীভাবে শোধ করা যাবে?

**উত্তর :** মা-বাবার ঋণ কখনো শোধ হয় না। কিন্তু মা-বাবা মারা গেলে আপনি তাদের নামে সৎকর্ম করতে পারেন, তাদের মাগফেরাতের নিয়তে দান করতে পারেন, *আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী* বিতরণ করতে পারেন। সেটা তাদের আমলনামায় যুক্ত হবে। সন্তানদের দিক থেকে এটা সর্বোত্তম কাজ।

**প্রশ্ন :** আমি মনে করি, পৃথিবীতে একজন মানুষের জন্যে মা-বাবার চেয়ে বেশি আপন আর কেউ হয় না। আমার বাবা মারা গেছেন তিন বছর আগে। কিন্তু বাবা চলে যাওয়ার পর আমার সুন্দর চাওয়াগুলো যেন শেষ হয়ে গেছে।

যদিও কখনো চিন্তা করি, বাবা হারানোর কষ্টগুলো আমি পড়াশোনার মধ্যে ভুলে থাকব। কিন্তু মাঝে মাঝেই তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কষ্টগুলো বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আমার কী করা উচিত বললে উপকৃত হবো।

**উত্তর :** বাবা মারা গেছেন, এটি বাস্তব সত্য। আপনিও একসময় মারা যাবেন। সবাই মারা যাব। এর চেয়ে বাস্তব সত্য আর কিছু নেই। বুদ্ধিমান মানুষ কখনো অতীতে নয়, সবসময় বর্তমানে বসবাস করে। বর্তমান হচ্ছে, বাবা নেই। সেই কষ্টে আপনি পড়াশোনায় খারাপ করলে আপনার ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে, বাবার কিছু হবে না। কারণ বাবা এখন এ সবকিছু থেকে ঊর্ধ্বে উঠে গেছেন। বাবার প্রতি সত্যিকারের সম্মান প্রদর্শন করা হবে তখনই, যখন বাবার চাওয়াগুলো পূরণ করবেন এবং আপনি ভালো মানুষ হবেন।

একজন বাবা চান, তার ছেলে বা মেয়ে যেন তার চেয়েও বড় হয়। তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, যে স্বপ্ন তিনি বাস্তবায়িত করতে পারেন নি, তা তার সন্তান করবে—এটাই একজন বাবার চাওয়া। সেটা করতে পারলেই বাবার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়, বাবাকে ভালবাসা হয়। কাজেই আপনি যদি আসলেই বাবাকে ভালবাসেন, আপনার কর্তব্য হলো পড়াশোনায় মনোযোগী হওয়া এবং জীবনে একজন সফল এবং ভালো মানুষ হওয়া।

**প্রশ্ন :** সন্তান হিসেবে আমার মরহুমা মায়ের জন্যে কী কী করণীয়?

**উত্তর :** নামাজে, মেডিটেশনে আপনি মায়ের জন্যে দোয়া করবেন। দ্বিতীয়ত, যখন আপনি কোনো ভালো কাজ করবেন, সব মায়ের নামে উৎসর্গ করবেন—হে আল্লাহ! এর সমস্ত সওয়াব আমার মাকে দিয়ে দাও। এরপর আপনার যদি সামর্থ্য থাকে, আর্থিক সঙ্গতি থাকে, তাহলে মায়ের নামে এমন কাজ করতে পারেন, যা সদকায়ে জারিয়া। *আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী* এবং *হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী* বিতরণ করতে পারেন। সেই পুণ্যটা মাকে উৎসর্গ করবেন। কোয়ান্টাম এতিমান ফান্ডে দান করতে পারেন। এখানে একজন এতিমের দায়িত্ব নিতে পারেন। এটিও সদকায়ে জারিয়া হবে।

**প্রশ্ন :** আমার শাশুড়ির মৃত্যু হয়েছে আজ তিন মাস হলো, কিন্তু আমার স্বামী এখনো শোক কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। এ কারণে তিনি পরিবারে ও কর্মস্থলে নানা অস্থিরতায় ভুগছেন, কখনো কখনো আমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করছেন। কীভাবে তিনি এই শোক কাটিয়ে উঠতে পারেন?

**উত্তর :** মা-বাবাকে হারিয়েছেন, এমন মানুষের সংখ্যা কম নয়। একদিন সবাইকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। এটা খুব সহজ সত্য। কোরআনে বলা হয়েছে, নিশ্চয়ই মৃত্যুর সময় নির্ধারিত। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো মৃত্যু হতে পারে না। ... (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৪৫)

মায়ের মৃত্যুশোকে অস্থির হয়ে আপনার স্বামী যখনই পরিবারের সাথে বা তার কর্মস্থলে দুর্ব্যবহার করছেন, তিনি নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এবং চারপাশের মানুষদেরও কষ্ট দিচ্ছেন। দুর্ব্যবহার সবসময়ই পাপ। এতে করে তিনি তার মাকেও পুণ্য থেকে বঞ্চিত করছেন।

এসময় তিনি যদি *আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী* পড়েন ও দান করেন, এটা অনেক বেশি কল্যাণকর। এখন আপনারা যত দোয়া করবেন, সদকা দেবেন এবং সৎকর্ম করবেন, মৃত ব্যক্তি তত ভালো থাকবেন। সন্তানের শোক কখনো মৃত মা-বাবার আমলনামায় যুক্ত হয় না। তাদের আমলনামায় যুক্ত হয় সন্তানের সৎকর্ম আর দোয়া। অতএব সৎকর্মের পরিমাণ বাড়ানোই উত্তম।

কোয়ান্টামে আমরা বলি, মাথার ওপর দিয়ে কোনো পাখি উড়ে যেতে পারে, কিন্তু মাথায় সেটার বাসা বানাতে দেয়া যাবে না। নবীজীর (স) জীবদ্দশায় তাঁর অনেক আপনজন তাঁকে ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর চোখেও পানি এসেছে, কিন্তু সেই শোক তাঁর কোনো দায়িত্বকে বা কাজকে কখনো ব্যাহত করে নি। নবী-রসুলদের জীবনে দুঃখকষ্ট এসেছে, প্রতিকূলতা এসেছে। কিন্তু শোকের কারণে তাঁরা কখনো কাজ বন্ধ করেন নি, কখনো সৎকর্ম থেকে দূরে থাকেন নি।

অতএব আমরা যেন শোক বা দুঃখ প্রকাশ করতে গিয়ে কখনো অজ্ঞদের মতো আচরণ না করি। আমাদের উচিত শোকটাকে সৎকর্মে রূপান্তরিত করা, সাদাকায় রূপান্তরিত করা। আমরা দোয়া করি, আপনার স্বামী যেন শোককে শক্তিতে ও সাদাকায় রূপ দিতে পারেন।

## পারিবারিক সম্পর্ক ॥ বউ-শাশুড়ি

**প্রশ্ন :** শাশুড়ির সাথে বউয়ের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত? অনেক সময় মতের মিল হয় না। অনেক সময় মনে হয়, নিজের মেয়ে হলে তিনি এমন বলতে পারতেন না।

**উত্তর :** পুত্রবধূর পক্ষে শাশুড়িকে প্রভাবিত করা খুব সহজ। শাশুড়ির সমস্যা একটিই—তিনি অনিশ্চয়তায় ভোগেন যে, বউ ছেলেকে তার কাছ থেকে দূরে

সরিয়ে দেয় কিনা। আর শুধু পুত্রবধূই পারে শাশুড়ির এ অনিশ্চয়তাকে দূর করতে। এ নিয়ে প্রাচীন গল্প আছে—

গ্রামের এক তরুণী। বিয়ের পর যখন স্বামীর বাড়িতে গেল, শাশুড়ির সাথে শুরু হলো তার সমস্যা। শাশুড়ির আচার-আচরণ কথাবার্তা সে সহ্য করতে পারত না। শাশুড়িও সারাক্ষণ শুধু বউয়ের সমালোচনা করত। অবস্থা আরো অসহনীয় হয়ে উঠল, যখন পারিবারিক রীতি অনুযায়ী প্রতিদিন তার শাশুড়িকে পা ছুঁয়ে সালাম করতে হতো এবং সব কথা মেনে নিতে হতো। এ সবকিছুর অসহায় দর্শক হওয়া ছাড়া স্বামী বেচারার কিছুই করার ছিল না।

একপর্যায়ে মেয়েটি তার বাবার এক বন্ধুর কাছে গেল, পেশায় যিনি হেকিম। সব কথা খুলে বলে তার কাছে এমন এক বিষ চাইল, যা খাইয়ে বুড়িকে সে দুনিয়া থেকে চিরতরে সরিয়ে দিতে পারবে। একমুহূর্ত ভেবে হেকিম বললেন, সমাধান আমি করে দেবো, যদি তুমি আমার কথামতো চলো। মেয়েটি রাজি। তিনি একটা পুঁটুলিতে কিছু ভেষজ লতাপাতা বেঁধে তাকে দিলেন। বললেন, একবারে কোনো বিষ দিয়ে যদি শাশুড়িকে মেরে ফেলো, তাহলে সবাই তোমাকে সন্দেহ করবে।

তাই আমি এমন কিছু লতাপাতা দিয়েছি, যা ধীরে ধীরে তার শরীরে বিষক্রিয়া ঘটাবে এবং সে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে। একদিন পর পর খুব ভালো কোনো খাবার রান্না করে তার মধ্যে এগুলো মিশিয়ে তোমার শাশুড়িকে খেতে দেবে। লোকে যেন তোমাকে কোনো সন্দেহ করতে না পারে, সেজন্যে এ সময়টায় শাশুড়ির সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করবে। কোনো ঝগড়াঝাঁটি করবে না এবং তার সব কথা বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেবে।

পুঁটুলিটা কাপড়ের মাঝে লুকিয়ে সে বাড়ি ফিরে এলো। বহুদিন পর তার মনটা খুব হালকা হয়ে গেল। এতদিনে সে মুক্তি পেতে যাচ্ছে। হেকিমের কথামতো সে একদিন পর পর ওই বিষ-মেশানো খাবার রান্না করে শাশুড়িকে খাওয়াতে লাগল। সেইসাথে তার সব কথা মেনে চলল। এসময় শাশুড়ির ওপর যত রাগই হোক, আপ্রাণ চেষ্টায় তা দমন করল। শাশুড়িকে সে তার মায়ের মতোই দেখতে লাগল। এভাবে কেটে গেল ছয় মাস। ঘরের পরিবেশ এখন অনেক শান্তিময়।

এর মধ্যে সে আবিষ্কার করল, সে তার রাগকে এখন অনেক সহজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আগে মুহূর্তে রেগে গিয়ে যে তুলকালাম বাঁধাত, এখন আর তা করে না। গত ছয় মাসে একবারও শাশুড়ির সাথে তার কোনো ঝগড়া হয় নি। ছোটখাটো বিষয়গুলোকে এখন খুব অনায়াসেই সে ক্ষমা করতে পারে, ছাড় দিতে পারে।

শাশুড়ির পরিবর্তনও ইতোমধ্যে লক্ষণীয়। তিনি এখন বউকে নিজের মেয়ের মতোই ভালবাসেন। আত্মীয়, পাড়া-প্রতিবেশী সবাইকে বলে বেড়ান—আমার বউমার মতো ভালো মেয়ে আর হয় না। বউ-শাশুড়ি থেকে তারা এখন মা-মেয়ের মতো। মমতা-ভালবাসার সম্পর্কে আবদ্ধ দুজন নারী। এতে মেয়েটির স্বামীও খুশি। কিন্তু মেয়েটির মনে শান্তি নেই। কারণ বিষের কথা যখনই তার মনে পড়ে, গভীর বিষণ্নতায় সে ডুবে যায়।

একদিন সে আবারও গেল বাবার বন্ধু হেকিমের কাছে। হাত ধরে বলল, দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন। আমি এখন আর আমার শাশুড়িকে মেরে ফেলতে চাই না। তিনি বদলে গেছেন। মায়ের মতোই তাকে এখন ভালবাসি আমি। তিনিও আমাকে অনেক আদর করেন। যে বিষ তার শরীরে ঢুকেছে, দয়া করে তা বের করে আনার ব্যবস্থা করুন।

হেকিম হাসলেন। মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, চিন্তা কোরো না মা। তোমার শাশুড়ি মরবেন না। বিষের নামে আমি যে লতাপাতাগুলো দিয়েছিলাম, তা আসলে বিশেষ ধরনের এক ভেষজ ভিটামিন, যা তার স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাবে। বিষ আসলে ছিল তোমার মনে, তোমার দৃষ্টিভঙ্গিতে। এখন সে বিষ ভেসে গেছে তার প্রতি তোমার ভালবাসা আর শ্রদ্ধায়।

অতএব শাশুড়ির সাথে এমন আচরণ করুন, যেন তিনি ভাবতে পারেন আপনি তার মেয়ে। মমতাপূর্ণ কথা ও আচরণ এমনই, যা পারস্পরিক সম্পর্ককে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবেই।

**প্রশ্ন :** প্রতিটি ঘরে শাশুড়ির সাথে পুত্রবধূর দ্বন্দ্ব থাকে কেন? এটা দূর করার জন্যে দুজনের কর্তব্য কী হওয়া উচিত?

**উত্তর :** শাশুড়ি এবং পুত্রবধূর দ্বন্দ্বের মূল কারণ সামাজিক। আমাদের উপমহাদেশের সমাজব্যবস্থায় পরিবারে যতদিন পর্যন্ত কোনো বউ পুত্র সন্তানের মা না হতো, ততদিন তার অবস্থান নড়বড়ে থাকত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ছেলেকে বলা হয় বংশের বাতি আর মেয়ে তো অন্যের ঘরে চলে যাবে। যদিও এখন এই দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে।

এ সমস্ত কারণে মায়ের কাছে ছেলে হলো তার অবস্থান শক্ত করার খুঁটি। মা যখন এই ছেলেকেই বিয়ে দিয়ে বউ নিয়ে আসেন, তখন তিনি ভোগেন এক অন্তর্দ্বন্দ্বে। অবচেতনভাবেই তিনি ভাবতে শুরু করেন, এখন হয়তো ছেলের কাছে তার গুরুত্ব কমে গেছে। এখান থেকেই মূলত সম্পর্কের টানাপোড়েনটা শুরু হয়।

শাশুড়িকে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি দিতে বউয়ের ভূমিকাই হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শাশুড়ির চেয়ে বয়সে ছোট হলেও চিন্তাভাবনায় সে আধুনিক। তার উচিত শাশুড়ির মনে এরকম ধারণা তৈরি করা যে, আমি আপনার প্রতিপক্ষ নই। আমি এসে আপনার ছেলেকে ছিনিয়ে নিচ্ছি না, বরং ছেলের সাথে সাথে আপনি আমাকেও পাচ্ছেন। একথা যদি আপনি শাশুড়িকে বোঝাতে পারেন, তাহলে দেখবেন দূরত্ব এমনিতেই কমে গেছে।

**প্রশ্ন :** মা, স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে আমাদের পরিবার। আমরা তিন জনই কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট। শাশুড়ি-বউ, স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব প্রায় প্রতিদিনের ঘটনা। একদিনও পারিবারিক মেডিটেশনে একসাথে বসার সুযোগ হয় নি। ত্রিমাত্রিক দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তির উপায়গুলো বলবেন কি?

**উত্তর :** আপনাকে আপনার দিক থেকে প্রো-একটিভ থাকতে হবে। স্ত্রীকে স্ত্রীর মতো, মাকে মায়ের মতো বোঝান। মা এবং স্ত্রী দুজনের কাউকেই আপনি বাদ দিতে পারবেন না। শাশুড়ি এবং বউয়ের দ্বন্দ্বে সবচেয়ে বড় শিকার হচ্ছে ছেলে। সেজন্যে আপনাকেই প্রো-একটিভ থাকতে হবে। তাদের দুজনের মধ্যে তো সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু আপনার সাথে তাদের সম্পর্ক সরাসরি। আপনি একটু কুশলী হোন এবং মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে দুপক্ষকেই বোঝান, আশা করছি এ সমস্যা কেটে যাবে।

**প্রশ্ন :** আমি চাই আমার স্ত্রী ও মায়ের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকুক। কিন্তু আমার মায়ের আচরণের কারণে আমার স্ত্রী মাঝে মাঝে খুব বেশি রেগে যায়। এ-ক্ষেত্রে আমার কী করণীয়?

**উত্তর :** অনেক পুরুষেরই এরকম উভয় সংকট হয়ে থাকে। এ-ক্ষেত্রে আপনাকে কুশলী হতে হবে। স্ত্রীকে বোঝান, মায়ের পরে কর্তৃত্ব তো তোমারই। অতএব যতদিন তিনি বেঁচে আছেন, তার আচরণকে ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখার চেষ্টা করো। নিজের মায়ের মতো তার সেবাযত্ন করো। আর মা এখন যা করছেন, এই একই আচরণ হয়তো একসময় পুত্রবধূ হিসেবে তার শাশুড়ির কাছ থেকে তিনি পেয়েছেন। তারই প্রতিক্রিয়া এটি।

আধুনিক শিক্ষার আলোবঞ্চিত একজন মানুষের এ আচরণকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখার দায়িত্ব আমাদেরই বেশি—এভাবে স্ত্রীকে বোঝান। প্রয়োজনে মায়ের হয়ে তার কাছে ক্ষমা চান। কিন্তু স্ত্রীর সাথে রাগারাগি করবেন না।

আর আপনার মায়ের সাথে সবসময় ভালো ব্যবহার করবেন। আপনি যত ভালো ব্যবহার করবেন, যত বেশি তার খোঁজ নেবেন, তিনি তত আশ্বস্ত হবেন যে, ছেলে তারই আছে। আশা করি, একসময় তার বোধোদয় হবে এবং তিনিও তার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে সচেষ্ট হবেন।

**প্রশ্ন :** তিন ছেলেকে বিয়ে করিয়েছি, তিন বউ তিন রকম। বড় ছেলের বউ কথা বা কাজ পছন্দ না হলে কথা বলে না, অভিমান করে। দ্বিতীয় বউ কোনো সমস্যা হলে ছেলেকে গালি দেয় এবং আমার সাথে কথা বলে না। তারা ঘরে অশান্তি সৃষ্টি করে, আমি কী করতে পারি?

**উত্তর :** ছেলে যদি তার বউয়ের গালি হজম করতে পারে, তাহলে সেখানে আপনার আর কিছু না বলাই ভালো। অর্থাৎ বউ তার সাথে কী ব্যবহার করছে বা সে তার বউয়ের সাথে কী ব্যবহার করছে, এখন এটা একান্তই তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। অনেক মা ছেলেকে বিয়ে করানোর পরও মনে করেন, ছেলে এখনো নাবালক। ছেলে বউ নিয়ে বাইরে যাবে কি যাবে না—এটা যদি মা-বাবাকে জিজ্ঞেস করতে হয়, তাহলে তো ঝামেলা হবেই।

বউয়ের গালি খেতে যদি ছেলের অসুবিধা না হয়, তাতে আপনার অসুবিধা হওয়ার কোনো কারণ নেই। এগুলো নিয়ে আপনি ভাববেন না। একটা বয়সের পর অনেক কিছু ছেড়ে দিতে হয়। যদি ছেড়ে দিতে পারেন, আপনি ভালো থাকবেন। অনেক বুদ্ধিমান মা-বাবা সন্তানকে বিয়ের আগেই আলাদা ফ্ল্যাট দিয়েছেন। আসলে সমস্যা তো শুরু হয় চাবি ধরে রাখতে চাওয়া নিয়ে। এর প্রয়োজন নেই। আপনি চাবি নিয়ে তো কবর পর্যন্ত যেতে পারবেন না। আপনি শুধু তাদের জন্যে দোয়া করুন।

**প্রশ্ন :** আপনি সরাসরি কথা বলতে বলেছেন, কিন্তু আমার শাশুড়ি এতে মাইন্ড করেন। ভাবেন, বউ কত সেয়ানা! কীভাবে যে কথা বলব, বুঝতে পারছি না।

**উত্তর :** আপনার কথা বলার ধরনের ওপর নির্ভর করবে আপনাকে সেয়ানা ভাববে, না বোকা ভাববে। একটু কুশলী হতে পারলে যেভাবে যে সমস্যার সমাধান করা উচিত বা তাকে যেভাবে সামলানো উচিত আপনি সামলাতে পারবেন। যখন কথা বলবেন যেখানেই কথা বলেন, এমনভাবে বলবেন যেন আপনার কথা থেকে শত্রুতা তৈরি না হয়। এটা নিয়ে জ্যোতিষীদের গল্প আছে। এটা খুব পরিচিত গল্প—

এক রাজা তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলার জন্যে জ্যোতিষীকে ডাকলেন। জ্যোতিষী কোষ্ঠী গণনা করে বললেন যে, আপনার সামনে আপনার ছেলে মারা যাবে, আপনার সামনে আপনার নাতি মারা যাবে, এমন হতভাগা রাজা আর কেউ নেই। এটা শুনেই রাজার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। তাই জ্যোতিষীকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন রাজা। কিন্তু জ্যোতিষীর কথাগুলো তিনি ভুলতে পারলেন না। আবার অন্য জ্যোতিষীকে খবর দিলেন।

আরেক রাজ্য থেকে জ্যোতিষী এসে কোষ্ঠী গণনা করে একই কথা বললেন, কিন্তু বললেন এভাবে—'মহারাজ! আপনার মতো ভাগ্যবান মানুষ খুব কম হয়। আপনি আপনার সন্তান নাতিপুতির চেয়েও দীর্ঘায়ু হবেন।' শুনে তো মহারাজ খুশি হয়ে গলার মালা খুলে তাকে পুরস্কৃত করলেন।

তো একই সত্য বলে প্রথমজনের ভাগ্যে জুটল মৃত্যুদণ্ড। আর দ্বিতীয় জ্যোতিষী শুধু কথাটা ঘুরিয়ে বলেছেন, ইতিবাচকভাবে বলেছেন। ফলে তিনি পেলেন রাজার উপহার।

এজন্যে আপনি কাকে, কখন এবং কীভাবে বলছেন এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। সত্যটাও আপনি যখন বলবেন আরেক পক্ষ মনে কষ্ট পেতে পারে বা দুঃখ পেতে পারে বা রাগ করতে পারে সেভাবে বলবেন না। তার মর্জি বুঝে সময় বুঝে ইতিবাচকভাবে বলতে হবে। তাহলে দেখবেন যে, দৈনন্দিন জীবনে আপনার সমস্যা থাকছে না। আর যে যত কিছু বলুক আলোচনার দরজা কখনো বন্ধ করবেন না।

অর্থাৎ আপনার শাশুড়ির সাথে আপনি এমনভাবেই কথা বলবেন, যেন আপনি কিছুই বোঝেন না। আপনি সব বুঝেও না বোঝার ভান করবেন। তাহলেই আর সেয়ানা ভাববে না। আর আপনিও তার মনের কথাটাকে বের করতে পারবেন।

**প্রশ্ন :** আমি টিভি একেবারেই দেখি না, মোবাইল প্রায়শই বন্ধ থাকে। মাইগ্রেনের সমস্যা হয়। কিন্তু এটার কারণ হলো আমার শাশুড়ি। উনি সকাল সাড়ে ৭টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত টিভি দেখেন। মোবাইল সারাক্ষণ সঙ্গে রাখেন। তার মেজাজ থাকে তিরিক্ষি। সারাক্ষণ আমার ওপর আক্রমণাত্মক কথাবার্তা চলতে থাকে। এজন্যে আমার জীবন অতিষ্ঠ। দুই সন্তান নিয়ে ওনার সাথে সংসারে খুব অশান্তিতে আছি। আমার সারাদিন যা-হোক কাটে। সন্ধ্যায় স্বামী বাসায় এলে কেন জানি না সব ক্ষোভ তার ওপর চলে আসে। কোনো কারণ ছাড়াই তার সাথে আমার ঝগড়া হয়। অথচ স্বামীর সাথে আমার মৌলিক কোনো দ্বন্দ্ব নেই। এ থেকে মুক্তির উপায় কী?

**উত্তর :** অধিকাংশ পরিবারে দাম্পত্য কলহের এটা একটা কারণ। শাশুড়ির কথা শুনে বিরক্ত হলেন, শাশুড়িকে তিনি কিছু বলতে পারলেন না, বললেন গিয়ে স্বামীর সাথে। সারাদিন কাজ করে আসার পরে স্বামী কদিন শুনবে? একদিন, দুই দিন, তিন দিন, একমাস, দুই মাস, তিন মাস। তারপরে কিন্তু স্বামী আপনার ওপরেই বিরূপ হয়ে যাবে।

সকাল সাড়ে ৭টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত যদি কেউ টিভি দেখে তাকে তো সুস্থ মনে করার কোনো কারণ নেই। আপনি মনে করুন, শাশুড়ি অসুস্থ মানুষ। একজন অসুস্থ মানুষ কত কিছু বলে! আল্লাহ তায়ালা তো মস্তিষ্কটা এই বিষয়গুলো বোঝার জন্যে দিয়েছেন। আপনি যেহেতু সুস্থ, তাই পরিস্থিতি সামলাতে আপনার মস্তিষ্কটাকে ব্যবহার করুন। নিজে দায়িত্ব নিয়ে নিন যে, শাশুড়ি অসুস্থ, ওনাকে দেখাশোনার দায়িত্ব আমার।

আর মহিলারা কখনো শাশুড়ির ওপরে করা রাগ স্বামীর ওপরে ঝাড়বেন না। কারণ স্বামী বেচারার উনি তো মা। সে আপনাকেও ছাড়তে পারছে না, মাকেও ছাড়তে পারছে না। আপনি নিজেই বলছেন তার সাথে মৌলিক কোনো দ্বন্দ্ব নেই। আপনি তো অত্যন্ত ভাগ্যবতী। কারণ অনেক পরিবারেই দেখা যায়, স্বামীর সাথেও দ্বন্দ্ব থাকে।

অতএব সবসময় প্রো-একটিভ থাকবেন। শাশুড়ি যা বলে বলুক। শাশুড়ি যখনই তিরিক্ষি মেজাজ করেন আপনি হাসবেন। যখন তিনি দেখবেন যে, আপনার ওপরে এটার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই, তখন আপনার শাশুড়ির কষ্ট দেয়া কথা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাবে। এই কৌশল ৪০ দিন অনুসরণ করবেন। এর সাথে প্রতিদিন মাটির ব্যাংকে সামর্থ্য অনুযায়ী দান করবেন এই নিয়তে যে, শাশুড়ির কথায় যেন আমার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া না হয়। দেখবেন, আপনি সফল হবেন, ইনশাআল্লাহ।

**প্রশ্ন :** এক পরিবারের দুই ভাই তাদের বউয়ের কারণে মাকে নিয়ে একসাথে থাকতে পারছে না। যদিও ছেলেরা চাচ্ছে মায়ের সাথে থাকতে। আলাদা থাকার তেমন ভালো সামর্থ্যও তাদের নেই। এটা নিয়ে অশান্তি হচ্ছে। এ অবস্থায় বউদের এমন আলাদা থাকার ইচ্ছা কীভাবে পরিবর্তন করা যাবে? কীভাবে বোঝালে তারা বুঝতে পারবে?

**উত্তর :** যদি ছেলেরা একত্রে থাকতে চায়, বউরা আলাদা হয়ে কোথায় থাকবে? বউরা তো ছেলেদের সাথেই থাকবে। আমরা আসলে দেয়াল তুলে ফেলি। সবসময় সেতুবন্ধন তৈরি করবেন, দেয়াল নয়। আপনি ছেলেসন্তান

হলে নিয়মিত মেডিটেশন করুন। স্ত্রীকে মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে পরিবারের সবাই মিলে একসাথে থাকার সুফলটা তাকে বোঝান।

এখন তো মা-বাবার সাথে থাকা ছেলেমেয়েদের জন্যে আশীর্বাদ। কারণ তা না হলে আপনারা বের হলে ছেলেমেয়েরা থাকবে কোথায়? মা-বাবার কাছে আপনার ছেলেমেয়েরা যে নিরাপত্তায় থাকবে, অন্য কারো কাছে এই নিরাপত্তায় থাকবে না। এটা স্ত্রীকে বোঝান। শুধু বউয়ের দোষ দিয়ে তো লাভ নেই। স্ত্রীকে বোঝানোর দায়িত্ব হচ্ছে স্বামীর। যদি মমতা দিয়ে বোঝাতে পারেন, স্ত্রী অবশ্যই বুঝবেন।

**প্রশ্ন :** আমার শ্বশুর-শাশুড়ি সবসময় আমাকে ডমিনেট করতে চান, রান্নাবান্না থেকে শুরু করে সব ব্যাপারে। এমনকি সন্তানদেরকে আমি প্রয়োজনমতো শাসন করব কি করব না তা নিয়েও। অথচ ১৪ বছর হলো আমার বিয়ে হয়েছে, আমি তাদের জন্যে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছি, কিন্তু তা কখনো ওনারা স্বীকার করেন না। এ-ক্ষেত্রে আমার করণীয় কী?

**উত্তর :** শ্বশুর-শাশুড়ি যেহেতু ডমিনেটিং এবং বোঝা যাচ্ছে, আপনার স্বামীর ভূমিকা খুব কম। তাই আপনাকেই সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। এজন্যে এখন আপনাকে কুশলী হতে হবে।

শ্বশুর-শাশুড়িকে মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে নিয়ে আসুন। তাদেরকে যে কত ভালবাসেন এবং তাদের জন্যে আপনার যে মমতা এটা নিয়মিত বলুন। নিয়মিত তাদেরকে বোঝাতে থাকুন—আমার সন্তানের জন্যে এভাবে এটা এটা করা উচিত। অর্থাৎ যে মেসেজটা আপনি বাস্তবে সরাসরি বলতে পারছেন না, সেটা আপনি মেডিটেশনে আলফা লেভেলে নিয়মিত দিতে থাকুন। তাদের জন্যে আন্তরিকভাবে দোয়া করুন। বাস্তবে কোনোরকম স্বীকৃতির প্রত্যাশা ছাড়াই তাদের সেবা করুন।

**প্রশ্ন :** আপনি এ যুগের নারীদের উপদেশ দেবেন শাশুড়িকে যেন নিজের মায়ের মতো মনে করে, কখনো যেন প্রতিপক্ষ মনে না করে।

**উত্তর :** আমরা তো এ কথাটাই বলি। শাশুড়িকে মায়ের মতো মনে করে যত আপন করে নেয়া যায়, অন্য কোনোভাবে সেটা সম্ভব নয়। বউ যদি শাশুড়িকে নিজের মায়ের মতো করে সম্মান করেন, ভালবাসেন, কতটা সেবা দেয়া যায় এই চিন্তা করেন, তাহলে সম্পর্কটা অনেক সুন্দর এবং মমতাময় হয়।

সমস্যা হলো, এখনকার অনেক সন্তান নিজের মাকেও সম্মান মমতা ভালবাসা এবং সেবা দেয় না ঠিকমতো। কারণ সে দিতে শেখে নি। মায়ের সাথেও যেমন দুর্ব্যবহার করে, শাশুড়ির সাথেও তা-ই করে। এজন্যে মা-বাবা এবং গুরুজনদের প্রতি কীভাবে সম্মান দেখাতে হয়, কেমন আচরণ করতে হয়, তা সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই শেখানোটা জরুরি। একজন শুদ্ধাচারী ভালো মানুষ কারো প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না। কারো সাথে দুর্ব্যবহার করে না। সে নিজেকে যেমন সম্মান করে, তেমনি অন্যদেরকেও সম্মান করে।

**প্রশ্ন :** বিয়ের পরপরই আমি শ্বশুরবাড়ির সবাইকে দোষ-গুণসহ আপন করে নিয়েছি। কিন্তু আমার স্বামী তা না করে আমার বাবার বাড়িকে এড়িয়ে চলে। আমি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেও পারি নি। এ ব্যাপারে আমার দুঃখবোধ না থাকলেও সামাজিকভাবে খুব অসুবিধা হয়। সন্তানদের ওপর এর খারাপ প্রভাব পড়বে। এ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কী?

**উত্তর :** নিজের বাড়ির সঙ্গে যেমন, শ্বশুরবাড়ির সঙ্গেও তেমনি স্বাভাবিক সম্পর্ক প্রত্যেক স্বামীর, প্রত্যেক স্ত্রীর রাখা উচিত। তা না হলে এটা অপরাধ বলে গণ্য হবে। এখন স্বামীকে নিয়মিত মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে বোঝান এবং বাস্তবেও মমতা দিয়ে বোঝান। তার এমন আচরণের কারণটা বোঝার চেষ্টা করুন। কোনো ভ্রান্ত ধারণা বা ভুল বোঝাবুঝির কারণে এমনটা হয়ে থাকলে তা দূর করতে উদ্যোগ নিন। এ-ক্ষেত্রে অবশ্য আপনাকে কুশলী হতে হবে এবং সবসময় মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে।

**প্রশ্ন :** বিয়ের পর শ্বশুর-শাশুড়িকে আব্বা-আম্মা বলা কি বাধ্যতামূলক? স্ত্রী কিংবা স্বামীকে খুশি করার জন্যেই কি এটা প্রয়োজন?

**উত্তর :** শ্বশুর-শাশুড়িকে আব্বা-আম্মা না বলে আন্টি-আঙ্কেল বলে ডাকা বা পশ্চিমা দেশগুলোর মতো নাম ধরে ডাকবেন? এ সম্বোধন বাধ্যতামূলকও নয়, স্বামী/ স্ত্রীকে খুশি করার জন্যেও নয়। বরং একাত্মতা সৃষ্টির জন্যে। কারণ স্বামী/ স্ত্রীর মা-বাবা আপনারও মা-বাবা। আপনি যদি শ্বশুর-শাশুড়িকে নিজের মা-বাবার মতো শ্রদ্ধা করতে না পারেন, তাহলে স্বামীর/ স্ত্রীর সাথে দূরত্ব বাড়বে, এটাই স্বাভাবিক।

একজন পুরুষ ও একজন নারীর বিয়ের পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে পারিবারিক। একটি পরিবারের সাথে আরেকটি পরিবারের যোগসূত্র। এই দুই

পরিবারের মধ্যকার সম্পর্ক যত ভালো থাকবে, আপনারাও তত ভালো থাকবেন। ওখানে যত দ্বন্দ্ব হবে, আপনার অশান্তি তত বাড়বে। তাই কোনোরকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই শ্বশুরকে আব্বা আর শাশুড়িকে আম্মা বলে সম্বোধন করবেন।

**প্রশ্ন :** ছেলেকে বিয়ে করিয়েছি। সব বিষয়ে অনেক উদারতা দেখাই। তবুও বউ বলে, আমি আধুনিক যুগের বউ। তাই আউটডেটেড শাশুড়ির আউটডেটেড কথা মানতে রাজি নই।

**উত্তর :** এরকম আপডেটেড মেয়েকে ছেলের বউ করিয়েছেন; বিয়ে করানোর আগেই চিন্তা করা উচিত ছিল যে, আমাকে আবার আউটডেটেড করে দেয় কিনা! বিয়ের আগেই এ সমস্ত চিন্তাভাবনা করে নিতে হয়।

মানুষ দেখে বিয়ে করাবেন। ভালো ছেলে, ভালো মেয়ে দেখে বিয়ে করাবেন। আজকাল আমরা শুধু জৌলুস অথবা চেহারা দেখে বিয়ে করাই। যে কারণে এত অশান্তি। এখন তাকে নিয়মিত হিলিং করুন, দোয়া করুন।

**প্রশ্ন :** উচ্চবিত্ত ঘরের সুন্দরী মেয়েকে ছেলের বউ করে ঘরে এনে দেখলাম, সে-তো বউ নয়, সংসার ভাঙার এক ভয়ংকর কারিগর। আমাদের দেশে এজন্যে বহু ছেলে হতাশায় ভোগে ও বিপথে চলে যায়। কী করব?

**উত্তর :** নিজের ছেলে বা নিজের মেয়ে হলে তার সাত খুন মাফ। আর পরের মেয়ে হলে সে ঘরভাঙার কারিগর! শুধু কি মেয়েরাই দোষী, আর ছেলেরা সব ধোয়া তুলসী পাতা? বহু শ্বশুরবাড়িতে মেয়েরাই তো নির্যাতিত হচ্ছে, মার খাচ্ছে, যৌতুকের জন্যে অত্যাচারিত হচ্ছে। এসব ছেলেকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উসকানি দিচ্ছে পরিবারের লোক এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছেলের মা। এটা হচ্ছে বাস্তবতা।

নিজের ছেলে যদি মাকে ফেলে রেখে না যায়, ছেলে যদি দৃঢ়তার সাথে পারিবারিক একাত্মতা বজায় রাখে, বউ কীভাবে সংসার ভাঙবে? এক হাতে কখনো তালি বাজে? শুধু নিজের ছেলে বলে ভালো আর পরের মেয়ে খারাপ—এভাবে বিষয়টিকে না দেখে বাস্তবতার নিরিখে সমস্যাটা সমাধান করার চেষ্টা করুন। কারণ অন্যায়কারী যে-ই হোক—ছেলে বা মেয়ে সে সমভাবে নিন্দনীয়। এখন মা হিসেবে ছেলে এবং ছেলের বউয়ের জন্যে দোয়া করুন, যেন তারা ভালো থাকে।

**প্রশ্ন :** আমার শাশুড়ি আমার সাথে খাচ্ছে, হাসছে, খেলছে, কিন্তু শত্রুতাও করছে। তিনি সবসময় আমার বিরুদ্ধে। আমি তার হাত-পা টিপে দেই, অনেক আদর করি। কিন্তু তিনি আমাকে মন থেকে ভালবাসেন না। মেডিটেশনও করেন। এখন আমি কী করব, আপনি বলে দিন।

**উত্তর :** আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, আপনি আপনার শাশুড়ির হাত-পা টিপে দিচ্ছেন, তার প্রতি আপনার কর্তব্য পালন করছেন। এদিকে আপনার শাশুড়ি আপনার সাথে খাচ্ছেন, হাসছেন। তার মানে বাহ্যিক একটা সুসম্পর্ক আছে আপনাদের মধ্যে। এই যে আপনি বলছেন, আপনার শাশুড়ি শত্রুতা করছে বা মন থেকে আপনাকে ভালবাসে না, এটা স্রেফ আপনার মনে করাও তো হতে পারে। কারো মনে তো আপনি প্রবেশ করতে পারেন না। মনে কী আছে, তা তো আপনি জানেন না। বড়জোর বলতে পারেন, তিনি আপনার সাথে খারাপ আচরণ করছেন। তিনি যা-ই করুন, আপনি মন থেকে সবসময় তার প্রশংসা করবেন।

যে-কোনো কারণে হোক, তার ওপরে আপনার একটা বিরক্তি চলে এসেছে। ভেতরে বিরক্তি নিয়ে অনেক সেবা দিলেও আপনি সেটার বরকত পাবেন না। কারণ বিরক্তি কাজের বরকতকে নষ্ট করে দেয়। এই বিরক্তিটাকে জয় করতে পারাই ধ্যান। তাই মেডিটেশন করুন নিয়মিত। বিরক্তি ভাবটা জোর করে হলেও মন থেকে সরিয়ে দিন। শাশুড়ির বয়স হয়েছে, হাত-পা টিপে দিলে স্বাভাবিকভাবে একটু আরাম পাবেন। আপনি যে তা দিচ্ছেন, তার এই আরামটুকুই আপনার জন্যে দোয়া। এখন আপনি করছেন, আপনার সন্তানেরা একসময় আপনার জন্যে করবে। যদি শাশুড়ির সাথে খারাপ ব্যবহার করেন, নিশ্চিত থাকবেন, সময় এলে আপনিও ঠিক তা-ই পাবেন।

অতএব আপনি শাশুড়ির যত্ন করে সঠিক কাজটিই করছেন। নিজের মায়ের মতো তাকে যত্ন করতে থাকুন। মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে তাকে এনে সবসময় বলবেন, আপনি আমার মা আর আমি আপনার মেয়ে; সেভাবেই আমি আপনার সেবা করতে চাই। নিঃস্বার্থ সেবার প্রতিদান আপনি অবশ্যই পাবেন ইনশাআল্লাহ।

**প্রশ্ন :** আমি বিয়ের পর থেকে সবসময় শাশুড়ি, ননদ-দেবরদের জন্যে সবদিক থেকে ত্যাগ স্বীকার করে আসছি। বাসার সবচেয়ে ছোট রুমটাই আমাকে নিতে হবে, কারণ আমার ঘরে তেমন ফার্নিচার নেই। খাবার সময় মাছের ছোট টুকরোটাই তুলে দেবে আমাকে। তাছাড়া আর্থিক দিক তো আছেই।

যখন যার প্রয়োজন, ‘বউ চাকরি করছ—ব্যবস্থা করো’। সবাই খুশি। কেবল আমিই মনে মনে কষ্ট পাই। তবুও একফোঁটা শান্তির জন্যে সবকিছু সহ্য করছি। কিন্তু মনের ব্যথা তো ধুয়ে-মুছে ফেলতে পারছি না। কী করব—দয়া করে বলবেন কি? শারীরিক মানসিকভাবে সবসময় বিপর্যস্ত থাকছি।

**উত্তর :** আপনার জন্যে দুঃখ হচ্ছে এ কারণে যে, এত সৌভাগ্যবান হয়েও শুধু দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আপনি কষ্ট পাচ্ছেন। ফার্নিচার কম বলে ছোট বেডরুমটা দিয়েছে আপনাকে, এটা এত বড় করে দেখছেন কেন? ব্যাপারটাকে এভাবে কেন দেখতে পারছেন না যে, ছোট রুমটাই আমার থাক। ঝাড়পোছের ঝামেলা কমল, আর ওরাও থাকুক না একটু আরাম করে!

ননদ-দেবর তো বিয়ের পর চলেই যাবে। থাকবেন তখন কেবল শাশুড়ি। এ যুগে শাশুড়ি থাকাটা তো আশীর্বাদ। কদিন বাদে যখন আপনার সন্তান হবে, তখন তাকে রেখে কাজে যাওয়ার জন্যে শাশুড়ির মতো এমন নির্ভরযোগ্য আপন একজনকে পাওয়াটা আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছু নয়। কয়েক বছর পর বুয়া-আয়াদেরকে তো আর পাবেন না। পেলেও এদের চেয়ে দাদা-দাদি অনেক নির্ভরযোগ্য। কারণ আপনার সন্তান হচ্ছে তার বংশের চেরাগ। অতএব আপনার সন্তানের প্রতি তাদের যে-রকম দরদ মমতা থাকবে, এটা অন্য কারো থাকবে না।

আর মাছের ছোট টুকরোটা আপনি নিজেই নিয়ে নিন না! মনে মনে ভাবুন, ছোট টুকরোটাই আমার জন্যে ভালো, ডায়েটিং-এর সুযোগ পাচ্ছি। বড় টুকরোটা নিজ হাতে তুলে দিন শাশুড়ির প্লেটে। দিতে পারার একটা আলাদা আনন্দ আছে। সেটা উপভোগ করুন। দেখবেন, কিছুদিন পর শাশুড়ি নিজেই হয়তো লজ্জা পেয়ে বলবে, বউমা, প্রতিদিন তো বড়টা আমাকে তুলে দাও, আজ তুমি এটা খাও।

পরিবারে বাকি যারা আছে, আগামী পাঁচ বছর বা ১০ বছর পরে তারা কেউ কিন্তু এখানে থাকবে না। থাকবেন শুধু আপনি আর আপনার স্বামী। অতএব এ সবকিছু আপনাকে আনন্দ দিতে পারে, আপনি সবচেয়ে সুখী মানুষ হতে পারেন, যদি দৃষ্টিভঙ্গিটা একটু পাল্টে দেন।

সেবা দিয়ে পুণ্য অর্জনের সোনালি সুযোগ ছড়িয়ে রয়েছে যে পরিবেশে, সেখানে থেকেও শুধু ভুল দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আপনি কষ্ট পাচ্ছেন। এই যে শাশুড়ি যখন বলছে, ‘বউ চাকরি করছ—ব্যবস্থা করো’, তার মানে তারা আপনার ওপর নির্ভরশীল। এরা সবাই আপনার অনুগত হয়ে যাবে, আপনার কর্তৃত্ব মেনে নেবে, যদি আপনি শুধু দৃষ্টিভঙ্গিটাকে ঠিক করে ফেলতে পারেন।

লিডার মানে সেবক, লিডার মানে নিজে কষ্ট করে সুখটা অন্যকে দেয়া। আপনি অন্তর থেকে দিয়ে যান। স্বামী-শাশুড়ি-ননদ-দেবর কেউ না দেখুক, স্রষ্টা দেখছেন। স্রষ্টা এর প্রতিদান দেবেন। আপনি দিচ্ছেন ঠিকই, অথচ মনে কষ্ট নিয়ে দিচ্ছেন। এই দেয়ার কোনো প্রতিদান নেই। আপনি যখন আনন্দিতচিত্তে দেবেন, তখন স্রষ্টা আপনাকে অনেক বেশি দেবেন।

**প্রশ্ন :** বিয়ে হয়েছে তিন বছর। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে কাউকে খুশি করতে পারি না। আমার স্বামী আমাকে অনেক ভালবাসে দেখে আমার শাশুড়ি সহ্য করতে পারে না। উনি আমাকে জাদু-টোনা করছেন, যাতে ওনার ছেলে আমাকে ছেড়ে দেয়। সেটা আমি এবং আমার স্বামী জানি। সবার কাছে আমার বদনাম করেন। তিন বছর ধরে আমার জীবনে শান্তি নষ্ট করে দিয়েছেন। কী করব আমি বুঝতে পারছি না। একবার জাদু কাটানোর পরেও আবার করেছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, মরে যাই। কীভাবে আমি পরিত্রাণ পেতে পারি?

**উত্তর :** আপনি অহেতুক ছটফট করছেন। আপনার স্বামী আপনাকে ভালবাসেন, এটা তো আপনার জন্যে সবচেয়ে বড় পাওয়া। আপনি সারাক্ষণ আপনার শাশুড়ির প্রশংসা করবেন। যাদের কাছে আপনার বদনাম করে, সেখানে অনেক বেশি করে তার প্রশংসা করতে থাকুন।

তাদের বলবেন যে, আমার শাশুড়ির মতো এমন শাশুড়িই হয় না, তাকে আমি মায়ের মতো দেখি। এমনভাবে এসব কথা বলবেন, যেন তিনি শুনতে পান বা তার কানে যায়। নিয়মিত এই চর্চা করুন। দেখুন, আপনার শাশুড়ির আচরণ বদলে যাবে। অর্থাৎ আপনাকে প্রো-একটিভ হতে হবে।

আপনার স্বামী আপনাকে ভালবাসে আর আপনি বলছেন, মাঝে মাঝে মনে হয় আমি মরে যাই। আপনি তো বোকার মতো কথা বলছেন! পৃথিবীতে খুব কম মানুষ আছে, যে মাঝে মাঝে মনে করে না যে, আমি মরে যাই। অহেতুক কষ্ট বহন করে বেড়াবেন না।

সেই গল্প জানেন তো—এক লোক ভারী বোঝা নিয়ে যাচ্ছে। বোঝার ভারে সে এত ক্লান্ত যে, সে বলছে, যমও আমাকে দেখে না, এর চেয়ে মরে যাওয়া ভালো! এর মধ্যে যম চলে এসেছে। এসে বলল, তুমি আমাকে ডাকছিলে? সে তখন বলল, তুমি এসেছ খুব ভালো হয়েছে। আমার বোঝাটা খুব ভারী, এটা একটু বহন করো। অর্থাৎ পৃথিবীতে কেউ মরতে চায় না।

আরেকটি বিষয় হলো, এসব জাদু-বান-টোনা কাটাতে যাবেন না। কারণ কোয়ান্টামে মেডিটেশন চর্চাকারীদের ওপর জাদু-বান-টোনার কোনো প্রভাব

থাকে না। বরং এসব করতে গিয়ে কবিরাজকে যে পয়সা দিয়েছেন, সেটা অপচয় ছাড়া কিছুই নয়। সেই টাকা দান করে দিন, আপনার কল্যাণ হবে।

**প্রশ্ন :** যে স্ত্রী তার স্বামীকে তীব্র ভালবাসেন, তিনি কী করে শাশুড়ি আর ননদদের ঘৃণা আর অপছন্দ করেন। এ ভালবাসায় খাদ আছে, তাই নয় কি?

**উত্তর :** 'তীব্র ভালবাসেন' এই শব্দটাই হচ্ছে একটা অহেতুক শব্দ। বিয়েটা কোনো ভালবাসাবাসির ব্যাপার নয়। বিয়ে হচ্ছে দৈহিক, মানসিক এবং সামাজিক প্রয়োজন। এগুলোর পোশাকি নাম হচ্ছে ভালবাসা। প্রেম যদি হতো, তাহলে তো আপনার কোনো অভিযোগ থাকত না। প্রেম কখনো অভিযোগ করে না। আপনি যখনই কোনো প্রতিদান প্রত্যাশা করছেন, তখন সেটা আর প্রেম থাকছে না। প্রেমের কোনো প্রতিদান নেই। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কটা প্রেম নয়, এটা একটা প্রয়োজন।

শাশুড়ি-ননদদের সাথে ভুল বোঝাবুঝি হওয়া, অপছন্দ করা দুটো কারণে হতে পারে। প্রথমত, তাদের সাথে মতের মিল না হলে। দ্বিতীয়ত, শাশুড়ি-ননদের খারাপ ব্যবহার করার কারণে। প্রকৃত কারণটা কী, সেটা খুঁজে বের করুন। আবার কিছু কিছু বউয়ের কিন্তু এটা নিয়েও সমস্যা থাকে—যদি তার স্বামীর অর্থ তার শাশুড়ি-দেবর ও ননদের জন্যে খরচ করতে হয়। এরকম স্ত্রীরা কিন্তু চিন্তা করে না যে, তার স্বামীর বিকশিত হওয়ার পেছনে এই পরিবারের মানুষগুলোর ভূমিকা কত বেশি! অনেক স্ত্রীর ভুল ধারণা হলো, স্বামীর উপার্জনে শুধু তার একার অধিকার। এরা এই আত্মকেন্দ্রিকতার বৃত্ত থেকে বের হতে পারে না। এজন্যে এরা কখনো সত্যিকার অর্থে সুখী হয় না। কারণ সবার প্রতি সমমর্মিতা না থাকলে সুখী হওয়া যায় না। তাই আত্মকেন্দ্রিকতার এই বৃত্তকে ভাঙতে হবে।

**প্রশ্ন :** আমি বিয়ে করেছি পাঁচ বছর। স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ভালো। কিন্তু বিয়ের কয়েক মাস পর থেকে আমার মা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে তার মনোমালিন্য শুরু হয়, যা চলছে এখনো। আমার মা বা ওই বাসার কারো সাথে আমার স্ত্রী কথা বলে না। আমরা একই বিল্ডিংয়ে দুটি ফ্ল্যাটে থাকি। রান্না-খাওয়া সব আলাদা। তারপরও আমার স্ত্রী আলাদা বাসায় যাওয়ার জন্যে জেদ ধরেছে। এদিকে বাবার মৃত্যুর পর বহুকষ্টে মা আমাদের মানুষ করেছেন। আমার করণীয় কী? মেয়েকে একটা দূরের স্কুলে ভর্তি করিয়েছি। স্কুলের অজুহাত দেখিয়ে বাসা পাল্টানোর কথা মাকে বলব কিনা ভাবছি।

**উত্তর :** এটা যদি করেন, তাহলে আপনি একটা অপরাধ করবেন। বাবার মৃত্যুর পর যে মা এত কষ্ট করে আপনাদের মানুষ করেছেন, স্ত্রীর অন্যায় জেদের কারণে তাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার চিন্তা করছেন, সেটাই তো অন্যায়। আপনি আবার অজুহাতও বের করে ফেলেছেন দূরে যাওয়ার জন্যে। যদি এই মা আপনাকে শৈশবে বুকের দুধ না দিতেন, যদি এতিম আপনাকে ফেলে আরেকটা বিয়ে করে নিজে সুখী হওয়ার চিন্তা করতেন, তখন আপনার এত ফুটানি কোথায় থাকত? কোথায় থাকত এত প্ল্যান-প্রোগ্রাম?

আর যে স্ত্রী এরকম কথা বলে সে মোটেও ঠিক কাজ করছে না। আলাদা বাসায় থাকছেন, আলাদা রান্না হচ্ছে, আলাদা খাওয়া হচ্ছে। তারপরও মাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে কেন? যতদিন মা জীবিত আছেন, মাকে যতভাবে সম্ভব সেবা করবেন। স্ত্রী করতে চায় না, সেটা স্ত্রীর ব্যাপার। স্ত্রী তার জবাব দেবে। কিন্তু যদি আপনি আপনার মায়ের কাছ থেকে দূরে সরে যান, তাহলে আল্লাহর কাছে জবাব দিতে পারবেন না। যেহেতু স্ত্রী আপনার, তাকে দেখার দায়িত্বও আপনার। একইসাথে মাকে দেখার দায়িত্বও আপনার। স্ত্রী এবং মায়ের অধিকারের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে।

একটা হাদীস হচ্ছে 'আমি [আয়েশা (রা)] নবীজীকে (স) জিজ্ঞেস করলাম, একজন নারীর ওপর কার অধিকার সবচেয়ে বেশি? তিনি বললেন, তার স্বামীর। তাহলে একজন পুরুষের ওপর সবচেয়ে বেশি অধিকার কার? তিনি বললেন, তার মায়ের' [আয়েশা (রা); *হাকেম; হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী : ৮৮৭*]।

অর্থাৎ নবীজী (স) বলেছেন, পুরুষের ওপর তার মায়ের অধিকার সবচেয়ে বেশি। অতএব মায়ের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে আপনাকে মনোযোগ বেশি দিতে হবে। আর আজকে বউয়ের কথা শুনে যদি আপনার মাকে রেখে চলে যান, বুড়ো বয়সে একই পরিণতি আপনার হতে পারে।

অতএব বৃদ্ধ মা-বাবা যাদেরই আছে, যতটুকু সময় পান তাদের খেদমত করবেন, তাদের সেবা করবেন। এ ব্যাপারে কারো কোনো কথা দিয়ে প্রভাবিত হবেন না। স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করে লাভ নেই। আপনি তা-ই করবেন, যা আপনার মায়ের জন্যে করা দরকার। এ-ক্ষেত্রে আপনি কখনো কোনো কার্পণ্য করবেন না। যিনি দেখার তিনি দেখছেন এবং তিনি এ-কাজের উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন।

**প্রশ্ন :** মৌনতাকে অনেকে অহংকার বা বেয়াদবের মতো চুপ করে থাকা ভাবে। কিন্তু সেই সময় কথা বলার মতো কিছু আছে বুঝতে পারি না। মূলত

আমি কথা কম বলি। এ বিষয়ে আমার শ্বশুরবাড়িতে বেশ ভুল বোঝাবুঝি হয়। এর কী সমাধান হতে পারে? ইদানীং কথা বলার পরিমাণ বাধ্য হয়ে বাড়িয়েছি। কিন্তু সেগুলো আমার কাছে শুধুই কথার অপচয় বলে মনে হয়।

**উত্তর :** এ-ক্ষেত্রে টেকনিক সহজ—আপনি বেশি কথা না বলে, যে কথা বলতে এসেছে তাকে দিয়ে কথা বেশি বলান। আপনাকে প্রশ্ন করলে খানিকটা বলার পর আপনি পাল্টা প্রশ্ন করুন। সে ওই কথা বলতে বলতে তাকে আরেকটা পয়েন্ট ধরিয়ে দিন, যেন সে বলতেই থাকে। আপনি শুনতে থাকুন। দেখবেন, কিছুদিনের মধ্যেই শ্বশুরবাড়িতে আপনার কদর বেড়ে গেছে। কারণ বেশিরভাগ মানুষই বলতে চায়, শুনতে চায় খুব কম মানুষ। আপনি কথা কম বলেন, এটা আপনার একটা শক্তি। আপনি আপনার এই গুণটাকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করুন।

**প্রশ্ন :** শ্বশুরবাড়িতে আমি একমাত্র ছেলের বউ। শাশুড়ি আত্মকেন্দ্রিক। শুধু তার মতো করে আমাকে চালাতে চায়। আমার অধিকার মতামত কিছুই মূল্যায়ন করতে চায় না। এমনকি আমার মা-বাবা, ভাইবোন বাসায় আসাটা পর্যন্ত সহ্য করে না। আমার স্বামী বোঝাতে চাইলে বলে, বউ তোকে বশ করেছে। নিজের মেয়ের সাথেও তার মন-মানসিকতা মিলে না। বর্তমানে শাশুড়ি আমার সাথে থাকলেও আমি দূরত্ব বজায় রাখি অশান্তি এড়িয়ে চলার জন্যে। আমি শুধু দায়িত্ব পালন করি। এই সমস্যা সমাধানের উপায় কী? কী করতে পারি? আমার মন একেবারে তিক্ত হয়ে গেছে অনেক বছর ধরে।

**উত্তর :** আমরা সবসময় বলি, যে সম্পর্ক ছিন্ন করা যায় না তার মাঝে দেয়াল তুলবেন না। মনে তিক্ততা রেখে দেয়াটা আপনার জন্যে ক্ষতিকর। মন থেকে এসব আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্যেই নিয়মিত মেডিটেশন করুন। ক্ষমা করে দিন। কারণ শাশুড়িকে নিয়েই আপনাকে থাকতে হচ্ছে। তাহলে এটাকে স্পোর্টিংলি নিন, উপভোগ করুন। শাশুড়ি যখন আপনাকে বকাঝকা করবে, এটাকে সহজভাবে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখুন। মনে মনে বলুন, বেচারি বুঝতে পারে না যে, এসব কথার কোনো প্রভাব আমার ওপর পড়ছে না।

আপনার কাছে তো আপনার স্বামী গুরুত্বপূর্ণ। আপনার স্বামীর মাধ্যমেই না তিনি শাশুড়ি হয়েছেন। অতএব স্বামী যেহেতু আপনার পাশে আছে, শাশুড়ি নিয়ে চিন্তা করার তো দরকার নেই। শাশুড়ি যা খুশি বলুক, সেটাকে মনে মনে উপেক্ষা করবেন। তবে তাকে যতটুকু খেদমত করতে পারেন,

করবেন। মন থেকে, নিজের মায়ের মতো করে খেদমত করবেন। কারণ আপনার কাজ দিয়েই আপনাকে বিচার করা হবে, আরেকজনের কাজের হিসাব আপনাকে দিতে হবে না। আল্লাহ কারো ধৈর্যের সাথে করা সৎকর্ম কখনো নষ্ট করেন না। তাই নিজের যা সেবা দেয়া দরকার, আনন্দিতচিত্তে দিয়ে যান। একসময় ঠিকই আপনার কাজ মূল্যায়িত হবে।

**প্রশ্ন :** আমি হোম-অফিস করি। শাশুড়ি সারাদিন ছোট শিশুর মতো তার রাগ-বিরক্তি আমাকে দেখায়। আগেও দীর্ঘদিন বুলিং করেছে। এতে কাজের ফোকাস এবং আউটপুট সবদিকেই আমি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। প্রেগনেন্ট, তাই বাইরে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কী করব?

**উত্তর :** বাইরে যেতে হচ্ছে না, এটা তো ভালো। এসময় *আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী* পড়বেন এবং এর অডিও শুনবেন। লাউডস্পিকারে শোনাটা বেশি ভালো। এতে গর্ভের সন্তানের ওপর ভালো প্রভাব পড়বে। শাশুড়ি যখনই রাগ-বিরক্তি প্রকাশ করতে আসে, আপনি হাসিমুখে বলবেন—‘আম্মা, আমি আপনার জন্যে দোয়া করছি। এজন্যে কোরআনের মর্মবাণী শুনছি। আপনিও আমার জন্যে দোয়া করেন, যাতে এই কোরআন খতম ঠিকমতো দিতে পারি। যাতে আপনার ভবিষ্যৎ বংশধর ভালো মানুষ হয়।’

অর্থাৎ সবসময় কুশলী হবেন। আগে শাশুড়ি আম্মার কাছ থেকে অনুমতি নেবেন যে, এই কদিন কোরআন খতম করব, আপনি আমার জন্যে দোয়া করবেন তা যেন ঠিকমতো করতে পারি। তিনি কি আপনাকে কোরআন খতম করতে না বলবেন, নাকি বিরক্ত করবেন? কোনোটাই করতে পারবেন না।

একজন মানুষ সারাদিন ছোট শিশুর মতো রাগ আর বিরক্তি দেখায় মানে বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি সেকেন্ড চাইল্ডহুডে চলে গেছেন। এখন আপনার সন্তান বিরক্তি দেখালে যেভাবে দেখতেন, শাশুড়িকে সেভাবে দেখবেন। কারণ একটা সময় আপনারও ওই বয়স হবে। আপনার এখনকার সদাচরণের উসিলায় তখন আপনি ভালো থাকবেন। অতএব সেকেন্ড চাইল্ডহুডে যারা চলে যায়, তাদেরকে সন্তানের মতো দেখবেন।

**প্রশ্ন :** ছেলে ও ছেলের বউ আমার প্রতিটি কথা ও কার্যকলাপ অপছন্দ করে। বিদ্রূপ মন্তব্য করে ও আমাকে অপমান করে স্থানকালপাত্র না দেখে। আমি বিস্মিত না হয়ে পারি না। আমার নিজের ছেলেরা আমাকে কেন হিংসা করে তা বোধগম্য নয়। আমি অমায়িক উদার, সর্বোপরি একজন কোয়ান্টাম মা।

এত ভালো হওয়ার পরও ওদের প্রিয় হতে পারছি না। ওরা আমার সবকিছুই বিদ্রুপের চোখে দেখে। এটা কীভাবে প্রতিকার করা যায়? ওদের সাথে সাধারণভাবে কথা বলতেও ভয় পাই। তাই অনেক দূরত্বে থাকতে হয়। কিন্তু সবসময় কি এটা সম্ভব? বলে দিন কীভাবে চলব।

**উত্তর :** যে ছেলেদের আপনি গর্ভে ধারণ করেছেন, তাদেরকে কেন ভয় পাবেন? কোয়ান্টাম মা তো বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের আত্মবিশ্বাসী মা হবেন। বি আম্মি বেগমের মতো মা হবেন, যিনি খেলাফত আন্দোলনের নেতা মওলানা মোহাম্মদ আলী ও মওলানা শওকত আলীর মা ছিলেন।

মওলানা মোহাম্মদ আলী ও মওলানা শওকত আলী—তাদের আলী ভ্রাতৃদ্বয় বলা হতো। যখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছিল—একদিকে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন, আরেক দিকে আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে খেলাফত আন্দোলন। ইংরেজরা প্রমাদ গুনল। একসাথে দুই আন্দোলন মানে হিন্দু-মুসলমান একত্র হয়ে গেলে তো তাদের জন্যে মহা মুশকিল। কারণ আজকে সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি, হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষ বলে যে কথাগুলো আছে, গত ১৫০০ বছরে এসব আমাদের এখানে কখনো ছিল না। ইংরেজরা এদেশে আসার পর হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে, মুসলমান-বৌদ্ধের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগিয়েছে।

ইংরেজরা গান্ধীজীকে গ্রেফতার করল। মওলানা মোহাম্মদ আলী, মওলানা শওকত আলীকেও গ্রেফতার করল এবং রটিয়ে দিলো যে, মোহাম্মদ আলী এবং শওকত আলী নাকি এই মুচলেকা দিয়ে জেলখানা থেকে বেরিয়ে আসবেন যে, মুক্তি পাওয়ার পর তারা আর আন্দোলন করবেন না।

এদিকে তাদের মা বি আম্মি বেগমের কানে যখন এসব কথা গেল, তিনি জেলখানায় গেলেন ছেলেদের সাথে দেখা করার জন্যে। তারা ভাবলেন যে, মা বোধহয় তাদেরকে বন্ড দিয়ে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্যে এসেছেন। তারা অস্থির হয়ে উঠলেন। মা বললে তারা 'না' করবেন কীভাবে? মাতৃ-আজ্ঞা বলে কথা!

কিন্তু তাদেরকে অবাক করে দিয়ে বি আম্মি বেগম বললেন, আমি শুনেছি তোমরা নাকি ইংরেজদের কাছে মুচলেকা দিয়ে জেলখানা থেকে বেরিয়ে আসার চিন্তা করছ? যদি এরকম চিন্তা করে থাকো তো আমি তোমাদের মা বলছি—তোমাদের দুজনকে গলা টিপে মারব!

চিন্তা করুন, কীরকম মা! তো এরকম মা হবেন। কেন ছেলের সাথে কথা বলতে ভয় পান? সবসময় মনে রাখবেন, দুনিয়া হচ্ছে শক্তের ভক্ত, নরমের যম। মা মায়ের মতো থাকবেন। আদরের সময় আদর করবেন। যখন

শক্ত হওয়ার শক্ত হবেন। ছেলে না থাকলে কী হবে? ছেলে চলে যাবে, যাক না। ছেলে কি আপনার সাথে কবরে যাবে নাকি? কিন্তু থাকলে ছেলের মতো থাকতে হবে। অর্থাৎ মাকে শ্রদ্ধা করে চলতে হবে।

**প্রশ্ন :** আমার স্বামীর বাড়ির লোকজন সবসময় আমার মা-বাবাকে নিয়ে কথা বলে। তাদেরকে ছোট করে। কেন আমার মা-বাবা এটা দিলো না, ওটা খাওয়াল না ইত্যাদি অভিযোগ। এ-ক্ষেত্রে আমার কী করা উচিত?

**উত্তর :** বলুক না! তাদের বলতে দিন। আপনি এগুলোতে রাগ করবেন না। কারণ রাগ করলে তারা আরো পেয়ে বসবে। তখন আরো খোঁচাবে, কষ্ট দেবে। আপনি যদি কষ্ট না পান তাহলে ভাববে, এসব বলে লাভ কী? সে-তো প্রভাবিত হচ্ছে না। আর আপনার স্বামীর জন্যে দোয়া করবেন, তুমি পুরুষের মতো পুরুষ হও। কারণ কোনো পুরুষ কখনো শ্বশুরবাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে না। এটা খাওয়াল না, ওটা দিলো না—এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না।

**প্রশ্ন :** পরিবারে বউ শাশুড়ি দুজনেই যদি মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে গিয়ে একে অন্যকে তাদের মনের ইচ্ছা অনুসারে কমান্ড করতে থাকে, ফলাফল কি দাঁড়াবে? এ-ক্ষেত্রে কোনো সংঘাত সৃষ্টি হবে কি?

**উত্তর :** এ-ক্ষেত্রে বউ শাশুড়ি দুজনেই যার যার অবস্থান থেকে মনে করছেন যে, তিনিই সঠিক। বউ ভাবছে—শাশুড়ি আমার কথা শুনবে। শাশুড়ি মনে করছেন, আমি ঠিক, বউ আমার কথা শুনবে। এখন দুজন দুজনকে মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে আনলে কিছু কথাবার্তা তো হবে! যখন কথাবার্তা হয়, আলাপ-আলোচনা হয়, তখন আপসের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

যেমন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে সবচেয়ে বড় সমস্যা কোথায়? স্বামীদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়, যখন স্ত্রী কথা বলা বন্ধ করে দেয়। স্ত্রীর জন্যে সমস্যা হয়, যদি স্বামী কথা বলা বন্ধ করে দেয়। কথা বললে তো অন্তত একটা পর্যায়ে পৌঁছা যাবে। অর্থহীন যুক্তি বা ঝগড়া কতক্ষণ চলতে পারে? যখন দুজন বসবে, কথা বলতে বলতে তারা তো একটা জায়গায় আসবে! তাই এ আলাপ-আলোচনাটা গুরুত্বপূর্ণ।

মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে একজন আরেকজনের সাথে কথা বললে বাস্তবে দেখা যাবে, তারা আর ঝগড়া করতে পারছে না। কারণ মেডিটেটিভ লেভেলে আরেকজনকে ঠান্ডা মাথায় সুন্দরভাবে নিজের বিষয়টা

বোঝাতে পারবেন, আবার নিজেও অন্যের দিকটা সহজেই বুঝবেন। তাই দুজনেই যদি মেডিটেশন করেন এবং পরস্পরকে কমান্ড সেন্টারে এনে বোঝান, তাহলে ইনশাআল্লাহ তাদের মধ্যে দূরত্ব কমে যাবে।

**প্রশ্ন :** শাশুড়ির সাথে বউয়ের মতের মিল না হলে এবং জীবনাচার, খাদ্যাভ্যাস, চিন্তাভাবনা কোনোকিছুই না মিললে আলাদা বাসায় থাকার সিদ্ধান্ত নেয়া কি যৌক্তিক নয়?

**উত্তর :** এটা এখনকার মেয়েদের একটা কমন প্রবলেম। কেন? কারণ তারা মনে করে যে, আলাদা থাকতে পারলেই ভালো থাকা যাবে। এটা তার সংসার, চাবি তার, সবকিছু তার নিজের মতো করে চলবে। তাই শাশুড়িকে মনে করে একটা উপদ্রব। এই নেতিবাচক চিন্তার ফলে দেখা যায় শাশুড়ির কিছুই আর ভালো লাগে না।

আপনাকে সবসময় চিন্তা করতে হবে, কীভাবে আমি মানিয়ে চলতে পারি, কীভাবে শাশুড়িকে মোটিভেট করতে পারি। তার খাদ্যাভ্যাস, জীবনাচার, চিন্তাভাবনা কোনোকিছু কেন মিলবে না? এই সমাজের, এই সংসারের মানুষ তিনি। কিছু তো মিল থাকবে। ৭০% মিল না হতে পারে, ১০%, ২০%, ৩০% তো মিল থাকবে। সেটুকু মিল ধরে আপনাকে এগোতে হবে। আলাদা বাসায় একা থাকা তো খুব সহজ। সংসার ভেঙে ফেলা সহজ, কিন্তু পরিণতিটা খুব খারাপ। সবসময় চেষ্টা হওয়া উচিত কীভাবে সবাইকে নিয়ে একত্রে থাকা যায়, কীভাবে মানিয়ে চলা যায়।

নিশ্চয়ই আপনি কোয়ান্টাম সূত্র প্রয়োগ করছেন না। সূত্র প্রয়োগ করবেন। মেডিটেশনকে দৈনন্দিন জীবনে চর্চার মধ্যে নিয়ে আসবেন। শাশুড়িকে মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে বোঝাবেন। মানিয়ে চলার চেষ্টা করবেন। মনে রাখবেন, আপনিও একদিন শাশুড়ি হবেন। এটা ভুলে যাবেন না। এটা যারা মনে রেখে সেভাবে কাজ করেন, তাদের কাজের পুরস্কার আল্লাহ অবশ্যই দেবেন।

কদিন আগে কোয়ান্টাম পরিবারের এক সদস্যের একটা চিঠি পেলাম। তিনি লিখেছেন, 'আমি শ্বশুরবাড়ি গিয়েছি এই মাসের প্রথম সপ্তাহে। খুব ভালো সময় কাটল। এবার গিয়ে যেটা ভালো লাগল তা বলার জন্যে লিখছি। বাড়িতে আমি প্রায় ৫০টার মতো *হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী* বিতরণ করেছি নিজের টাকায়। আত্মীয়দের ঘরে যাওয়ার সময় নিতাম উপহার হিসেবে। টাকা নেয়ার সুযোগ ছিল না। মজার বিষয় হলো, এতদিন যাদেরকে

উপহারস্বরূপ দিয়েছি তারাই এখন আমাকে বলছেন বইটির আরো কপি যেন নিয়ে আসি। তারা নিজে থেকেই বইয়ের টাকা দিয়ে দিচ্ছেন। এবার গিয়ে সাতটা হাদীস মর্মবাণী দিয়েছি। তারা তাদের পরিচিতদের কাছে বিতরণ করছেন। প্রত্যেকে খুব প্রশংসা করছেন বইটির।'

চিঠিটার মজার অংশ হলো—'আমার শাশুড়ি আম্মা এসব কাজে আমাকে খুব সহযোগিতা করছেন। আম্মা এখন আমার ওপরে এত সন্তুষ্ট যে, আমি যেটাই বলি তিনি মনে করেন—এর ওপর আর কোনো কথা থাকতে পারে না। এই অর্জনও আসলে আমার কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের শিক্ষা অনুসরণ করার ফলে সম্ভব হয়েছে। বউ-শাশুড়ির যে আলোচনা আপনি করেন, বিয়ের শুরু থেকে আমি সূত্রগুলো প্রয়োগ করেছি।

প্রথম তিন বছর সবরের সাথে সব হজম করেছি। আমার শাশুড়ি-ননদ সবার অদ্ভুত সব আচরণ মেনে নিয়ে চলেছি। দোয়া এবং দান করেছি। সবসময় মাথা ঠান্ডা রেখে তাদের সাথে সদাচরণ করেছি। তাদেরকে বুঝতে এবং তাদের প্রয়োজন পূরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। সেইসাথে মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারেও মাঝে মাঝে শাশুড়ি আম্মাকে বোঝাতাম যে, আমি আপনারই মেয়ে। আপনার নিজের মেয়ের চেয়েও আপনাকে আরো বেশি সেবা দেয়ার সুযোগ আমি গ্রহণ করতে চাই।

এখন সত্যিই তিনি আমাকে অনেক ভালবাসেন। আমি যেভাবে বলি আম্মা সেভাবে নিজেকে সাজান, শুধরে নেন। নিজের মেয়েকে বলেন আমার কাছ থেকে শিখতে। গুরুজী, আমি এত ধৈর্যশীল হতে পারতাম না, যদি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের আলোচনাগুলো আমার সামনে না থাকত।'

আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। আমাদের যে সূত্র এটা জীবন থেকে নেয়া। এখানে কোনো তাত্ত্বিকতা নেই। আমাদের অলি-বুজুর্গদের কথা মহামানবদের কথাই সাজিয়ে সময়োপযোগী করে বলা হয়েছে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে। যে-কোনো ক্ষেত্রে যে-কোনো কাজে এই ধৈর্য এবং বিশ্বাস নিয়ে লেগে থাকাটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ধরুন, আপনার শাশুড়ির যে আচরণ নিয়ে আপনি কষ্ট পাচ্ছেন তা তিনি করছেন মূলত তার অসহায়ত্ব থেকে। তিনি মনে করছেন যে, তিনি হেরে যাচ্ছেন পুত্রবধূর কাছে। আর হেরে যাচ্ছেন এমন মানসিকতার কাউকে যদি আপনি জয়ের আনন্দ দিতে পারেন, তখন আপনি তার মনটাকে জয় করে ফেলছেন। কাউকে হারানো আর কাউকে জয় করা দুটোর মধ্যে অনেক পার্থক্য।

ইতিহাস থেকে যদি দেখি, মানসিংহ এবং ঈশা খাঁর মধ্যে যুদ্ধের সময় কী হলো? ঈশা খাঁ বুঝলেন যে, এদের সাথে যুদ্ধ হলে তার বাহিনী কিছুক্ষণের

মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তিনি প্রস্তাব দিলেন যে, সৈন্যক্ষয়ের দরকার নেই, বরং আমাদের দুই সেনাপতির মধ্যে ফয়সালা হোক। তখনকার দিনে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ একটা বিশাল ব্যাপার। কোনো সেনাপতি দ্বন্দ্বযুদ্ধে অংশ নিতে নাকচ করলে তার নিজের বাহিনীর মধ্যেও তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা আর থাকবে না। মানসিংহের তো রাজপুত রক্ত। তিনি প্রস্তাব গ্রহণ করলেন।

দ্বন্দ্বযুদ্ধের একটা পর্যায়ে মানসিংহের তরবারি ভেঙে গেল। তখন ঈশা খাঁ তাকে আঘাত করতে পারতেন। তাতে যুদ্ধ কিন্তু শেষ হতো না। মানসিংহের পরে যিনি সেনাপতিত্ব গ্রহণ করতেন তার সাথে যুদ্ধ শুরু হতো এবং ঈশা খাঁর পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ছিল। ঈশা খাঁ সেই মুহূর্তে প্রতিপক্ষকে আঘাত না করে কী করেছিলেন? নিজের তরবারিটা তাকে দিয়ে দিয়েছিলেন। কারণ নিরস্ত্র বীরকে কখনো আঘাত করতে হয় না। এটা বীর ধর্মের বিপরীত আচরণ। নিজের জন্যে আরেকটা তরবারি আনালেন।

ঈশা খাঁ তার নিজের তরবারি দিয়ে কিন্তু মানসিংহকে জয় করে ফেললেন। তার অন্তর জয় করে ফেললেন। মানসিংহ ভাবলেন, এ লোক তো আমাকে হত্যা করতে পারত। করে নি যখন ঠিক আছে, আমরা কথা বলে মীমাংসা করি। ব্যস, যুদ্ধ বা ক্ষয়ক্ষতি কিছুই আর হলো না।

যিনি পরাজিত বা হেরে যাচ্ছেন বলে মনে করছেন তাকে যখন সম্মান দেন, তখন তাকে জয় করা হয়। তাকে তখন জয়ী হওয়ার অনুভূতি দেয়া হয়। আর যখন আপনি তাকে জয় করবেন, তখন জয়ের মালাটা আপনার গলাতেই আসবে। শাশুড়ির ক্ষেত্রেও তা-ই। তাকেও আপনি জয় করার চিন্তা করবেন। কারণ একটা বয়সের পরে মানুষ ইমোশনালি নির্ভরশীল হয়ে যায় শিশুর মতোই। আপনি চিন্তা করেন আপনিও একদিন শাশুড়ি হবেন। তখন কিন্তু আপনি আপনার পুত্রবধূর ভালো আচরণই চাইবেন। অতএব যতদিন শাশুড়িকে পাচ্ছেন আন্তরিক সেবা ও সম্মান দিয়ে যান। প্রকৃতিতে ভালো কাজগুলো সঞ্চয় করে রাখুন, যা পরে আপনার কাছে ঠিকই ফিরে আসবে।

## পারিবারিক সম্পর্ক ॥ ভাইবোন

**প্রশ্ন :** আমরা দুই ভাই। আগে আমাদের সম্পর্ক তেমন ভালো ছিল না। আমি ৪৫৩ ব্যাচে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করার পর থেকে সম্পর্ক ভালো হতে থাকে। পরে ছোট ভাইকেও কোর্স করাই। এখন আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ। গ্রামের পুরুষরা আমাদের দেখে প্রশংসা ও দোয়া করে। কিন্তু

গ্রামের মহিলারা বলে যে, এই সম্পর্ক নাকি বিয়ের পর আর এমন থাকবে না, নষ্ট হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে চাই।

**উত্তর :** ভাইয়ের সাথে সুন্দর সম্পর্ক রক্ষা করার জন্যে অভিনন্দন। আসলে কেউ যদি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের সূত্রগুলো নিজের জীবনে অনুসরণ করে, তাহলে নিঃসন্দেহে সে ভালো থাকবে; সবার সাথে এমনকি শত্রুর সাথেও সুসম্পর্ক থাকবে। কারণ শত্রুর শত্রুতা তখন একতরফা হবে। শত্রু হয়তো শত্রুতা করছে, কিন্তু আমরা সবর করি এবং শত্রুর জন্যে দোয়া করি। ফলে একতরফা শত্রুতা কখনো শক্তি পায় না।

এবার আসা যাক আপনার প্রশ্নে। গ্রামের মহিলারা বলছেন, বিয়ের পর আপনাদের দুই ভাইয়ের সুন্দর সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে—এতে আপনারা কেন প্রভাবিত হবেন? দুই ভাইয়ের সম্পর্ক নষ্ট হবে কীভাবে, যদি আপনারা সম্পর্ক রক্ষা করতে চান এবং কোনো অজুহাত না দেন? আমরা আসলে অন্যের ওপর দোষ চাপাতে পছন্দ করি। বিয়ের পরে মানে বউকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। আপনারা দুই ভাই ঠিক থাকলে বউ কী করবে?

যে-কোনো সম্পর্ক তখনই নষ্ট হয়, যখন সম্পর্কটা সরাসরি থাকে না, যখন ভায়া মিডিয়া হয়ে যায়। অর্থাৎ সম্পর্কের মধ্যে যখন তৃতীয় পক্ষ চলে আসে, তখন সম্পর্ক নষ্ট হয়। এজন্যে কোয়ান্টাম সূত্র কী? সরাসরি কথা বলা; সেটা ভাইবোন, মা-বাবা, স্বামী বা স্ত্রী সবার সাথে। বলবেন যে, এরকম এরকম শুনলাম, এটা কি ঠিক? দেখবেন, সাথে সাথে সমাধান হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা সরাসরি না বলে ত্রিপক্ষীয় কথা বলতে এবং মন্দ কথা শুনতে পছন্দ করি। এজন্যে অন্যরাও মন্দ কথা বলে যায়।

এই যে বলা হচ্ছে, বিয়ের পরে দুই ভাইয়ের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে। এটা শুনেই ধরে নিই যে, বিয়ের পরে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে সম্পর্ক নষ্ট হতে থাকে। কারণ সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার চিন্তা ব্রেনে ঢুকে গেলে এই নেতিবাচক ভাবনাটা লালিত হতে থাকবে। তখন বিয়ের পরে আপনাদের দৃষ্টি থাকবে যে, আচ্ছা, দেখি তো আমার ভাইয়ের কী কী পরিবর্তন এলো। যেহেতু এটা প্রত্যাশা করছেন, তাই বাস্তবতাও এমনই হয়। তখন সামান্য বিচ্যুতিও বেশি মনে হয়।

মনে রাখবেন, নেতিবাচকতাও একটা প্রত্যাশা। আপনার ইতিবাচক চাওয়া যদি পূরণ হতে পারে, তো নেতিবাচক প্রত্যাশা পূরণ হওয়াটা আরো সহজ। কারণ আগাছা জন্মাতে কোনো যত্ন লাগে না, গাছ জন্মাতে অনেক যত্ন নিতে হয়। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করতেও তেমনি যত্ন লাগে।

অতএব বিয়ের পরে বা আগে বলে কোনো কথা নেই, সম্পর্ক সুন্দর রাখার টেকনিকটা খুব সহজ। সম্পর্কটা সবসময় সরাসরি রাখবেন। সরাসরি যোগাযোগ করবেন, কথা বলবেন। বউ থাকবে বউয়ের স্থানে, ভাই থাকবে ভাইয়ের স্থানে। ভাইয়ের ব্যাপারে বউ কিছু বললে আপনার শোনার প্রয়োজন নেই। আপনিও ভাইয়ের বউয়ের ব্যাপারে কখনো কিছু বলতে যাবেন না। যখন আপনাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক দেখবে, তখন স্ত্রীরাও সেটাই অনুসরণ করবে। কারণ অধিকাংশ মানুষ শান্তিপ্রিয়। দুয়েকজন থাকে সব জায়গাতেই ঝামেলার, কিন্তু তাদের সংখ্যা কম। তাই কখনো অন্যের কথায় প্রভাবিত হবেন না।

**প্রশ্ন :** আমার ভাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে গাঁজা এবং সিগারেট ধরেছে। আমিও একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি। আমার ভাইকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করার উপায় কী? দয়া করে জানাবেন।

**উত্তর :** আপনার ভাই অসৎ বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে এ অবস্থা হয়েছে। এজন্যে নিয়মিত মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে তাকে এনে বোঝাতে হবে। আর বাস্তবে মমতার সাথে নেশার কুফল সম্পর্কে ভাইকে সরাসরি বোঝান। সেইসাথে তাকে মেডিটেশনে উদ্বুদ্ধ করুন।

**প্রশ্ন :** আমার ভাইয়ের বয়স ৩০। সে খারাপ পথে চলে গেছে এবং এখন মা-বাবার নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ বাইরে। বোন হিসেবে আমার দায়িত্ব ও করণীয় কী? ছেলের প্রতি মায়ের অন্ধ ভালবাসা আছে।

**উত্তর :** ছেলে তো একদিনে নষ্ট হয় নি। ছেলের প্রতি মায়ের অন্ধ ভালবাসার কারণে অধিকাংশ সময় ছেলে নষ্ট হয়। বোন হিসেবে আপনি তার জন্যে দোয়া করতে পারেন। তার কোনো অন্যায়কে যদি প্রশ্রয় দেন, আপনিও সমান অপরাধী হবেন।

**প্রশ্ন :** আমরা দুবোন। আমি ঢাকায় পড়ি। আমার মা-বাবা-বোন ঢাকার বাইরে থাকে। আমি ঢাকায় একা থাকি বলে মা আমার খাওয়াদাওয়া নিয়ে বেশ চিন্তিত থাকেন। সেটা নিয়ে আমার বোন সবসময় আমার মায়ের সাথে ঝগড়া করে। আবার আমি কখনো নিজেরটা নিজে চেয়ে নিই না বলে মা আমার কথা বেশি চিন্তা করেন। আমার বোন নিজেরটা নিজে বেছে নিলেও

আমার প্রতি ঈর্ষা করে। আমি ওকে খুব ভালবাসি। কিন্তু কীভাবে ওকে ঈর্ষা থেকে বাঁচাতে পারব?

**উত্তর :** ঈর্ষাটা তো তার, ঈর্ষা থেকে বেরিয়ে আসতে হলেও তাকেই উদ্যোগ নিতে হবে, তাকেই বুঝতে হবে। তাকে যত আদর দিয়ে, যত মমতা দিয়ে বোঝাতে পারবেন যে, আপনি তাকে ভালবাসেন এবং সে যে আচরণই করুক না কেন, আপনি যদি তাকে ভালবেসে যেতে পারেন, তাহলেই এ ঈর্ষা থেকে তাকে একটা সময় বের করে আনতে পারবেন।

**প্রশ্ন :** আমার ছোট দেবর এই বছর একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হয়েছে। প্রথম পরীক্ষায় পাঁচটি বিষয়ের তিনটায় শূন্য পেয়েছে। সে বলে, সে নাকি পড়াশোনা বোঝে না। সে সারাদিন মোবাইল ফোন নিয়ে পড়ে থাকে। বোঝালেও বোঝে না, রেগে যায়। কোয়ান্টামে আনতে চেয়েছি। বলে যে, আমার কোয়ান্টাম লাগবে না। এসব থেকে তাকে কীভাবে ফেরানো যায়?

**উত্তর :** একজন ছাত্র যদি পাঁচটি বিষয়ের তিনটিতেই শূন্য পায়, তার আসলে পড়াশোনার দরকার নেই। তাকে উপার্জনে ঢুকিয়ে দিন। কিছুদিন সে দেখুক, উপার্জন করতে গিয়ে কত কষ্ট! তারপর যদি পড়াশোনায় সে আগ্রহী হয়! এটা হলো একটি প্রক্রিয়া।

কোয়ান্টাম প্রক্রিয়া হলো, তাকে বোঝানোর চেষ্টা করা। যেহেতু আপনার দেবর, আপনি বড় বোনের মতো তাকে বোঝাতে পারেন। যদি আপনি না পারেন, আপনার স্বামীকে বলুন। আপনি মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে তাকে বোঝান এবং বাস্তবে আপনার স্বামীকে দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করুন।

এ সমস্যার কথা আপনার স্বামীকে এখনই জানান। অনেক সময় আমরা পরিবারে অনেক কিছু গোপন রাখি। ভাবি যে, জানালে আবার কী অশান্তি হয়! কিন্তু অশান্তি যা হওয়ার তা হবেই। এখন হলেও হবে, ছয় মাস পরে হলেও হবে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে বরং আরো বেশি সমস্যা হবে। তাই পারিবারিক এই তথ্যগুলো সবসময় অভিভাবককে বা যিনি সমাধানের উদ্যোগ নিতে পারবেন, তাকে শুরুতেই জানানো উচিত।

**প্রশ্ন :** আমার ভাই ও ভাইয়ের বউ মাঝে মাঝে আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে, যা আমি সহ্য করতে পারি না। ভীষণ মানসিক অশান্তিতে ভুগি আর কাঁদি।

আর জেদে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। পড়তেও পারি না। সামনে ডিগ্রি ফাইনাল পরীক্ষা। এ অবস্থায় নিজেকে কীভাবে শক্ত এবং স্বাভাবিক রাখব?

**উত্তর :** মূল সমস্যা তো ভাই ও ভাইয়ের বউয়ের নয়, সমস্যা আপনার মনোজগতে। এখনো রি-একটিভ দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করছেন আপনি। তারা মাঝে মাঝে দুর্ব্যবহার করলে সহ্য করতে পারছেন না, কান্নাকাটি করছেন, অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন। স্বামী-স্ত্রীও তো মাঝে মাঝে কঠিন কথা বলে, খারাপ ব্যবহার করে। তাতে কেন অশান্ত হবেন? কেন অস্থির হবেন? গায়ে না মাখলেই তো হলো। রেজাল্ট ভালো করার দিকে পুরোপুরি মনোযোগ দিলে অন্য কিছু আপনাকে ডিস্টার্ব করবে না। মন আপনার, কোনদিকে মনোযোগ দেবেন সেটাও আপনাকে ঠিক করতে হবে।

**প্রশ্ন :** বেশি ভাইবোন থাকলে তার মধ্যে একজন মানসিকভাবে অসুস্থ থাকবে—কথাটি কতটুকু সত্য? আমার এক ভাইয়ের আচরণ মোটেও সন্তোষজনক নয়। তাকে নিয়ে কী করি?

**উত্তর :** সিজারিয়ান শিশু হলে শিশুর বুদ্ধি বেশি হয়, এটা যেমন মিথ্যা, বেশি ভাইবোন থাকলে তাদের একজন অসুস্থ থাকবে—এটাও তেমনি ঠিক নয়। এগুলো নিয়ে না ভেবে আপনার ভাইকে শোধরানোর চেষ্টা করুন। তাকে মেডিটেশন করতে উদ্বুদ্ধ করুন। তার জন্যে হিলিং ও প্রার্থনা করুন।

**প্রশ্ন :** আমার বড় বোন মানসিকভাবে অসুস্থ। আমার সাথে সারাক্ষণ খারাপ আচরণ করে। মাঝে মাঝে খুব রাগ হয়। আমি কীভাবে রাগ কমাব?

**উত্তর :** মানসিকভাবে অসুস্থ কারো সাথে রাগ করার কোনো সুযোগ নেই। তিনি খারাপ আচরণ করতেই পারেন; কিন্তু সুস্থ মানুষ হয়ে আপনি কেন রাগ করবেন? আপনি তো আপনার মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখবেন, দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক রাখবেন। অসুস্থ মানুষটির প্রতি আরো সমমর্মী হবেন। তাহলে তার ওপর আর রেগে যাবেন না।

এরপরও রাগ এলে মনে মনে বার বার বলবেন, আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রাজিম। কারণ এটা শয়তানের কাজ। আরেকটি উপায় হচ্ছে দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়বেন এবং বসা থাকলে শুয়ে পড়বেন। রাগের আগুন নেভানোর জন্যে ওজু করবেন। বেশি বেশি তওবা ইস্তিগফার করবেন।

**প্রশ্ন :** আমার নিজের অন্যায়ের কারণেই ভাই ও বোনের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়েছে। বাস্তবে কোনো পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। মা-বাবার অনেক চেষ্টাতেও সম্পর্ক স্বাভাবিক হয় নি। এখন আমি কী করতে পারি?

**উত্তর :** যেহেতু আপনার অন্যায়ের কারণে ভাইবোনের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়েছে, আপনাকেই প্রমাণ করতে হবে যে, আপনি অনুতপ্ত। এটা তাদের বোঝাতে হয়তো সময় লাগবে, কিন্তু আন্তরিক চেষ্টা করলে আপনি অবশ্যই সফল হবেন। আর তাদের জন্যে সবসময় দোয়া করবেন।

**প্রশ্ন :** আমরা অনেকগুলো ভাইবোন। বড় বোন ছোট ভাইবোনের যত্ন নিতেন, কাঁথা-কাপড় ধুয়ে দিতেন। এখন বড় বোনের খোঁটা শুনতে হয়। সারাক্ষণ বলেন, তোমরা কেউ আমার ঋণ কখনো শোধ করতে পারবে না। এটা কি ঋণ? ঋণ হলে সেটা কীভাবে শোধ করব?

**উত্তর :** এটা অবশ্যই ঋণ। আমরা যে যত্নটা পাই—মা বাবা ভাই বোন, কোনো অভিভাবক, আত্মীয়, এমনকি একজন অনাত্মীয়ও হতে পারেন—যার যে সেবাই আপনি নিচ্ছেন সেটা ঋণ।

আপনার মতো এই অবস্থা আমাদের অনেকের জীবনে ঘটে। মনে রাখবেন, কেউ যখন খোঁটা দেয় এটা আপনার জন্যে একটা পরীক্ষা। আপনি প্রো-একটিভ থাকুন, তার জন্যে দোয়া করুন, তাহলে আল্লাহর কাছে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন। কিন্তু আপনি যদি বিরক্ত হন, তাহলে আপনি রি-এক্ট করছেন—যা নবী-রসুলদের শিক্ষা নয়।

বড় বোন খোঁটা দিচ্ছেন, এটা তার সীমাবদ্ধতা। কারো উপকার করে কখনো খোঁটা দেয়া উচিত নয়। খোঁটা দিলে উপকারের বরকত থাকে না। আল্লাহর কাছেও এর মূল্য থাকে না। কিন্তু আপনি কখনো বিরক্ত হবেন না, তিনি যতই খোঁটা দিন। তার প্রতি কোনো অবহেলার কারণে তিনি এমন রি-একটিভ হয়ে উঠেছেন কিনা সেটাও খেয়াল করে দেখুন।

আপনি তাকে বিনয়ের সাথে বলবেন, 'আপা, আপনার ঋণ তো সত্যিই শোধ করার নয়'। আর যতটুকু পারবেন তার উপকার করবেন। তার কখনো সেবাযত্ন প্রয়োজন হলে আপনি আন্তরিকভাবে এগিয়ে যাবেন। তার জন্যে দোয়া করবেন—তিনি আপনাকে শৈশবে যে যত্ন করেছেন, আল্লাহ যেন তাকেও সে-রকম যত্নে রাখেন। তার প্রাপ্য পুরস্কার থেকে আল্লাহ যেন তাকে বঞ্চিত না করেন। এতে আল্লাহর কাছে আপনার মর্যাদা বাড়বে।

এসব ঋণ কখনো শোধ হয় না। মায়ের ঋণ কে শোধ করতে পারবে? বাবার ঋণ কে শোধ করতে পারবে? কিন্তু তাদের প্রতি আমরা যখন কৃতজ্ঞ থাকব, আল্লাহর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে হাজির হতে পারব।

**প্রশ্ন :** আমি আমেরিকাতে আসার পরই ভাইবোন ও তাদের পরিবারকে আনার জন্যে অ্যাপ্লিকেশন জমা দেই। কিন্তু আমার ভাইবোনদের স্বার্থপরতা এবং আরো অনেক পারিবারিক ঝামেলার কারণে তাদেরকে আমেরিকাতে আনতে আর ইচ্ছে হয় না। প্রশ্নটা হচ্ছে এজন্যে আমি কি গুনাহগার হবো?

**উত্তর :** খুব ভালো প্রশ্ন। আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে আপনি গুনাহগার হচ্ছেন কিনা এটাও তো চিন্তা করতে হবে। ওখানে নেয়ার পর যদি তারা পারিপার্শ্বিক প্রভাবে গুনাহের কাজ করে, তাহলে আপনিও গুনাহগার হবেন। কারণ এই গুনাহের পৃষ্ঠপোষক আপনি। বিদেশে নিয়ে অড জব করানো এবং ওখানকার বাজে পরিবেশে কাউকে রাখাটা পুণ্যের কাজ হতে পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদেশে অড জব করতে হয়। ওখানে অড জব করে যেভাবে থাকবে, দেশে অড জব করলেও আজকাল অনেক ভালো থাকে। তাই দেশে কাজ করার ব্যবস্থা করে দেয়া বরং কখনো কখনো অনেক ভালো।

আপনার কাছে বিষয়টা স্পষ্ট থাকতে হবে যে, আপনি তাদেরকে কেন আমেরিকায় নেবেন? আপনার ভাইয়ের ছেলেমেয়ে ও তাদের পরিবার যেন ভালো মানুষ হয় সেই উদ্দেশ্যে নেবেন? যারা ছেলেমেয়ের সুন্দর ভবিষ্যতের চিন্তায় পাশ্চাত্যমুখী হয়েছে, তাদের একটা বড় অংশেরই ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ বরং শেষ হয়ে গেছে। অতএব কী উদ্দেশ্যে বিদেশে নিচ্ছেন এটা গুরুত্বপূর্ণ।

**প্রশ্ন :** আমার ভাইবোন কেউই আমার সাথে যোগাযোগ করে না। যতদিন স্বার্থ ছিল, ততদিন যোগাযোগ করেছে। আমি সবসময় ভাবি, মা-বাবা কেউ নেই, তাই ভাইবোনদের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখা উচিত। কিন্তু জানি না, কেমন যেন স্বার্থের সম্পর্ক হয়ে গেছে। দেশের বাইরে চলে আসার পর থেকে আমি যদি ফোন দেই, তখন তারা কথা বলে। কিন্তু নিজে থেকে কখনো আমার সাথে যোগাযোগ করে না। সবসময় আমাকে সেধে সেধে তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে হয়। কীভাবে তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখব?

**উত্তর :** সম্পর্ক রাখার ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় ভাইদের চেয়ে বোনরাই বেশি দায়িত্ব পালন করে। এটা বাস্তবতা। আবার কিছু কিছু ভাই সম্পর্কের ব্যাপারে

খুব সিরিয়াস হয়। দুটোই ঠিক। আপনি ভাইবোনদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবেন আপনার মতো করে। সময়-সুযোগমতো যখন ইচ্ছা তাদেরকে ফোন করবেন। তাদের আচরণ দিয়ে আপনি প্রভাবিত হবেন কেন? তারা ফোন করুক বা না করুক তাতে আপনার কী যায়-আসে?

আপনি যেটা চাচ্ছেন সেটা হলো, আপনাদের সম্পর্কটা পারস্পরিক হোক, অন্যপক্ষও যেন যোগাযোগটা রক্ষা করে। যখনই এই প্রত্যাশা করবেন, আপনার কষ্ট বাড়বে। কারণ তখন আপনার চাওয়ার সাথে বাস্তবে পাওয়ার মিল থাকবে না। তখন আপনার মধ্যে নেগেটিভিটি সৃষ্টি হবে। মনে হবে, আমিই সব করছি, অন্যরা কিছু করছে না। তখন সম্পর্ক আলগা হতে হতে সম্পর্কহীন হতে থাকবে।

অতএব প্রতিদানের প্রত্যাশা করে কখনো কিছু করবেন না। প্রতিদানের প্রত্যাশা করে আপনি যা-ই করবেন সেটা হচ্ছে একটা বিজনেস ডিল। এই ডিলে আপনি লাভবানও হতে পারেন, লসও হতে পারে। কিন্তু যদি মনে করেন যে, আমার ভাই বা বোন যেমন আচরণই করুক না কেন, আমার যতটুকু দেখার আমি দেখব; তাহলে আপনার হারানোর কিছু নেই, বরং পাওয়ার আছে অনেক।

আপনি যখন আন্তরিকতার সাথে আপনার ভাইবোনদের খোঁজখবর নেবেন, দেখা যাবে যে, এমন মানুষ আপনার খোঁজখবর নিচ্ছে, যারা নিজের ভাইবোনের চেয়ে আপন হয়ে উঠেছে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। এজন্যে কোনো প্রত্যাশা ছাড়া আন্তরিকতার সাথে ভাইবোনদের খোঁজখবর নেবেন।

## পারিবারিক সম্পর্ক ॥ অন্যান্য

**প্রশ্ন :** আমার ছোটবোনের শাশুড়ি ওর সাথে অনেক খারাপ ব্যবহার করছে। মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে। আমার বোন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ওর সন্তান হয়েছে চার মাস হলো। আমরা ওকে এই অবস্থায় মায়ের বাসায় এনে রাখতে চাই। ওর হাজবেন্ড দেশের বাইরে থাকে। এখন ওকে আনতে গেলে ওর শাশুড়ির সাথে আমাদের কথাবার্তা কেমন হওয়া উচিত? আমরা কি তাকে জেরা করব? আমাদের কী করণীয়?

**উত্তর :** এই নাক গলানোটা খুব অসুবিধাজনক। কখনো অন্যের পরিবারে হস্তক্ষেপ করবেন না। আপনার বোন যদি তার স্বামীকে বোঝাতে না পারে,

তার স্বামী যদি নিজের মাকে বোঝাতে না পারে, আপনি কিছুই করতে পারবেন না। মাঝখান থেকে ঝামেলা আরো বাড়াবেন। আপনার সাথে ছোটবোনের শাশুড়ির যে খুব একটা সম্পর্ক নেই সেটা আপনার কথা থেকেই বোঝা যাচ্ছে। আপনি কী কারণে জেরা করতে যাবেন তাকে?

আর আপনার বোন যা বলেছে আপনি সেটাই বলছেন। বোন কতটুকু সত্য বলছেন, কতটুকু অতিরঞ্জন করছেন—সেটা তো আপনি জানেন না। একতরফা শুনে কখনো আসল ঘটনা বুঝতে পারবেন না। তাছাড়া প্রেগনেন্সি ও সন্তান জন্ম দেয়ার পরের সময় একজন নারী শারীরিক ও মানসিক অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। এসময় ঘুমের স্বল্পতা ও হরমোনাল ভারসাম্যহীনতার ফলে অনেক কিছু বিরূপ মনে হতে পারে। তাই তাকে ইতিবাচক থাকতে এবং প্যারেন্টিংয়ে আপনারা সহযোগিতা করুন।

আপনার বোন যদি আপনার কাছে চলে আসে, তখন আপনি সাপোর্ট দিতে পারেন। সে যদি স্বামীর সংসারে কিছুতেই থাকতে না চায় সেটা আলাদা কথা। কিন্তু তাদের সংসারে গিয়ে জেরা করা বা এই জাতীয় কোনোকিছু করাটা বোকামি। ইনশাআল্লাহ সে সবই সামলে নিতে পারবে।

**প্রশ্ন :** আমার শ্বশুর-শাশুড়ি ভাশুর সবাই আমাকে অনেক আদর করে, কিন্তু আমার জা এই আদর এবং প্রশংসা সহ্য করতে পারে না। প্রথম প্রথম আমি এগুলোকে পাত্তা দিতাম না। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে ততই যেন আমার জা-য়ের উদ্ধত আচরণ বাড়ছে। আমাদের সবার সাথে সে খুব খারাপ আচরণ করে; বিশেষ করে আমার শাশুড়ির সাথে খুব বাজে ব্যবহার করে। উল্লেখ্য, আমার শাশুড়ি খুব সহজসরল ও ভালো মানুষ। আমার জা-য়ের অত্যাচারে কাজের মানুষ এবং ড্রাইভারও বিরক্ত। কী করি?

**উত্তর :** আপনি নিজেকে এটার মধ্যে জড়াতে যাবেন না। আপনি আপনার জা-কে মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে ক্রমাগত বোঝাতে থাকুন যে, তার এই কাজটা ঠিক নয়। তাকে আলফা লেভেলে বলুন—প্রতিযোগী হয়ে নয়, তার সহযোগী হয়ে আপনি এই পরিবারে এসেছেন।

আরেকটি বিষয় হলো, আমরা যেমন সন্তানদের মাঝে তুলনা করতে নিষেধ করি, তেমনি পুত্রবধূ ও মেয়ের জামাইদের ক্ষেত্রেও পরস্পরের সাথে তুলনা বা বৈষম্যমূলক আচরণ করা উচিত নয়। এই তুলনা পারস্পরিক সম্পর্কের মাঝে তিক্ততা সৃষ্টির কারণ হতে পারে। এমন কোনো ঘটনার শিকার হয়ে আপনার জা ক্ষুব্ধ কিনা তা যাচাই করে দেখতে পারেন।

আর আপনি নিয়মিত মেডিটেশন করুন, যাতে সবসময় মাথা ঠান্ডা রাখতে পারেন। সেইসাথে তার নেতিবাচক আচরণে প্রভাবিত না হয়ে আপনি তার সাথে সহজ স্বাভাবিক সুসম্পর্ক বজায় রাখুন। আশা করি অবস্থার পরিবর্তন হবে ইনশাআল্লাহ।

**প্রশ্ন :** নিজের চিন্তাচেতনার সাথে পরিবারের অন্য সদস্যদের মতপার্থক্য থাকলে কীভাবে সুসম্পর্ক রক্ষা করা যায়?

**উত্তর :** চেতনাগত পার্থক্য আর মতপার্থক্য দুটো ভিন্ন বিষয়। চেতনা বিশ্বাসের ব্যাপার। কিন্তু মতপার্থক্য বিশ্বাসের ব্যাপার নয়। মতভেদ চেতনা নিয়ে, নাকি ছোটখাটো বিষয় নিয়ে, তা আপনাকে শনাক্ত করতে হবে। যেমন, আপনার স্ত্রী যদি বলেন কোনো অন্যায় উপায়ে অর্থ নিয়ে আসতে হবে, তখন আপনাকে তা অগ্রাহ্য করতে হবে।

কিন্তু তিনি যদি বলেন ঘরের অমুক আসবাবটা এভাবে রাখতে হবে, তখন আপনি তা মেনে নিন। অর্থাৎ চেতনার ব্যাপারে ছাড় দেয়া যায় না, কিন্তু পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে ছাড় দেয়াই যায়।

**প্রশ্ন :** পরিবারে কেউ নামাজ-কোরআন সম্পর্কে উদাসীন হলে এবং অনেক বোঝানোর পরও না বুঝলে কী করণীয়?

**উত্তর :** এ-ক্ষেত্রে সে না বোঝা পর্যন্ত যত রকমভাবে সম্ভব তাকে বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে। সময় ও পরিস্থিতি বুঝে কৌশল অবলম্বন করতে হবে। আসলে কেউ না বুঝলে আমরা সহজে ক্ষুব্ধ হয়ে যাই, তাকে অভিযুক্ত করি। কিন্তু তাকে তার মতো করে তার ভাষায় বোঝাতে পারছি না বলে যে সে বুঝছে না, এটা বুঝি না। অতএব আপনার চেষ্টা থাকবে, সময় এবং অবস্থা বুঝে তাকে বলার চেষ্টা করা।

**প্রশ্ন :** কিছু আত্মীয় আমার চরম বিপদে আমাকে সাহায্য করেছিল। তাদের এই উপকারের প্রতিদান আমি কীভাবে দিতে পারি?

**উত্তর :** তাদের জন্যে দোয়া করুন, দান করুন। তাদের আলোকিত পথে নিয়ে আসুন। অনন্য মানুষ হতে তাদের উৎসাহিত করুন, উদ্বুদ্ধ করুন—এটা হবে তাদের জন্যে সবচেয়ে বড় উপকার।

**প্রশ্ন :** গত বছর আমার মামার বিয়ে হয়। তিনি এখন দেশের বাইরে থাকেন। মামি নানা কারণে মামার সাথে ঝগড়া করে ও যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। পরে শোনা যায় তার অন্য কারো সাথে সম্পর্ক আছে। আমি মামির মোবাইল চেক করে তাতে এক ছেলের নম্বর ও বাজে মেসেজ পাই। এতে মামি রেগে যায় এবং আমাদের সবাইকে অপমান করে। মামির এই কাজে মামা ও আমাদের পরিবার সবাই খুব কষ্টে আছে। আমার বিশ্বাস, মামি যদি মাফ চায়, তবে মামা তাকে গ্রহণ করবে। আমাদের কী করা উচিত?

**উত্তর :** প্রথমত, মামির সাথে তার স্বামী অর্থাৎ আপনার মামার সম্পর্ক কেমন হবে, তিনি থাকবেন, না চলে যাবেন—এটা সম্পূর্ণ তাদের ব্যাপার। অন্য কারো সাথে তার সম্পর্ক আছে জেনে কী করা উচিত, সেটাও আপনার মামাকেই ঠিক করতে হবে, আপনাকে নয়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে তৃতীয় পক্ষ হয়ে কেউ জড়িয়ে গেলেই সমস্যাটা বাড়ে। যে কারণে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে আমরা বলি, স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে নিজের মাকেও জড়াবেন না।

আপনার মামি কার সাথে থাকবেন, আপনার মামা তাকে ক্ষমা করবেন কিনা, তারা ঘর করবেন কি করবেন না, এ সিদ্ধান্ত তারা নেবেন। মনে রাখবেন, অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপারে জড়াতে গেলে নিজের অশান্তি সৃষ্টি হবে, অন্যকেও অশান্তিতে ভোগাবেন। আপনি তো আপনার মামার অভিভাবক নন। আপনি শুধু শুধু তাদের ব্যাপারে নাক গলাতে যাবেন না।

দ্বিতীয়ত, আপনার মামির মোবাইল চেক করতে গিয়ে আপনি যেটা করেছেন, এটা একটা অপরাধ। এভাবে কারো ব্যক্তিগত জিনিসে হাত দেয়া অশোভন, অশিষ্টাচার ছাড়া আর কিছু নয়। আপনার মামি যে অপমান করেছে, এটা আপনার প্রাপ্য ছিল। মনে রাখতে হবে, আমরা কেউই যেন নিজেদের সীমাটাকে লঙ্ঘন না করি।

তৃতীয়ত, আরেকজনের ব্যাপারে আমার কতটুকু অধিকার আছে, আমার পরামর্শ চায় কিনা, এটা আগে জেনে নিতে হবে। না হলে যাকে দিচ্ছেন, সে সেটা গ্রহণ করবে না। অযাচিত পরামর্শ সবসময় ক্ষতির কারণ হয় নিজের এবং অন্যের জন্যে। এখানে আপনি বা আপনাদের জন্যে যেটা করণীয় ছিল—মামার জন্যে দোয়া করা যে, আল্লাহ তুমি তা-ই করো, যা তার জন্যে এবং সবার জন্যে মঙ্গলজনক। সবাইকে তুমি প্রশান্তি দাও।

**প্রশ্ন :** আমি বেশিরভাগ সময়ই আপনজনদের নিকট থেকে অন্যায় বা বৈষম্যমূলক আচরণ পাওয়ার পর তাদেরকে ক্ষমা করতে পারি না।

একাধিকবার ক্ষমা করেছি, কিন্তু তারা ঘটনার পুনরাবৃত্তি করলে তখন আর ক্ষমা করতে পারি না। আমি ক্ষমা করার গুণ অর্জন করতে চাই।

**উত্তর :** ক্ষমা করতে হয় নিজের কল্যাণের জন্যেই। যত ক্ষমা করতে পারবেন তত অন্তরটা পরিষ্কার হবে। এতে আপনার ঘুম ভালো হবে, আপনি শান্তি পাবেন। আর ক্ষমা না করা মানে হচ্ছে নিজের ভেতরে কষ্ট থেকে যাওয়া। কষ্টটা যদি থেকে যায়, ভোগান্তি আপনার। কারণ রাগ ক্ষোভ বিদ্বেষ ঘৃণা কষ্ট দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা এগুলো হচ্ছে আবর্জনা। মনের ভেতর এসব আবর্জনা থাকলে আপনি সুখী হবেন কীভাবে?

তবে আমরা যেহেতু সাধারণ মানুষ, রাগ হতেই পারে। কিন্তু এই কষ্ট বহন না করে ক্ষমা করে দিন। প্রথম প্রথম অন্তর থেকে ক্ষমা আসবে না। সে-ক্ষেত্রে ক্ষমার ভান করুন। একটা সময় পরে দেখবেন, ভেতর থেকেই আপনি ক্ষমা করতে পারছেন! আর অটোসাজেশন চর্চা করুন—'আল্লাহ ও তাঁর রসুল ক্ষমা করতে পছন্দ করেন, আমিও ক্ষমা করব।'

নবীজীর (স) জীবন দেখেন, চারপাশের লোকজন কত কষ্ট দিয়েছে তাঁকে! কিন্তু তিনি সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এজন্যে তিনি প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি বলেছেন, 'তোমার মনে কখনো কারো প্রতি কোনো বিদ্বেষ বা অমঙ্গল চিন্তা থাকবে না—এটাই আমার সুন্নত। যে আমার সুন্নতকে ভালবাসল, সে আমাকে ভালবাসল। আর যে আমাকে ভালবাসল, জান্নাতে সে আমার সাথে থাকবে।' [আনাস ইবনে মালেক (রা); *তিরমিজী; হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী :* ৬৬৭]

অতএব নবীজীর (স) সুন্নত হিসেবে অন্তরে কোনো বিদ্বেষ জমিয়ে রাখবেন না। এই হাদীসটার ওপর আমল করবেন। দেখবেন, আস্তে আস্তে ক্ষমা করার গুণ আপনি অর্জন করতে পারছেন।

**প্রশ্ন :** অনেক চেষ্টার পরও আমার কাছে পরিবারের সবাইকে শত্রু মনে হয় কেন? পরিবারে বড় সন্তান হিসেবে ঐক্য ও সুখ বজায় রাখতে কী করণীয়?

**উত্তর :** পরিবারের লোকজন কি আপনার সাথে শত্রুতা করছে, নাকি আপনি মনে করছেন তারা আপনার শত্রু? যদি আপনি মনে করেন তারা শত্রু, তাহলে সমস্যাটা আপনার। আপনি শুধু দৃষ্টিভঙ্গিটা বদলে দিন যে, তারাই আমার বন্ধু, আমার শুভাকাঙ্ক্ষী, আপনজন। তারা ছোটবেলা থেকে যত্ন ও মমতা দিয়ে আমাকে বড় করেছে। তাই তাদেরকে এখন আমি সাধ্যমতো সেবা,

মমতা ও মানসিক বা আর্থিক সাহায্য দিয়ে যাব। এভাবে চিন্তা করলে আপনি দাতা হবেন এবং দানের বরকত পেতে থাকবেন; একটা সুরক্ষা বলয়ে থাকবেন। এজন্যে পরিবারে আমি কী দিতে পারছি এটা নিয়ে ভাববেন। তাহলে কোনো নেতিবাচকতাই আপনাকে আর প্রভাবিত করবে না।

আরেকটি ব্যাপার হলো, পরিবারে বাবা বা বড় ভাই বা বোন—যারা হয়তো একসময় পরিবারের জন্যে অনেক করেছেন, তারা মনে করেন, ভাইবোন বড় হয়ে যাওয়ার পরও আগের মতোই বিনা বাক্যব্যয়ে সব মেনে নেবে বা সারাক্ষণ তাকেই মধ্যমণি ভাববে—এটা বাস্তবসম্মত নয়। একটা পর্যায়ের পর সবাই ইন্ডিভিজুয়াল হয়ে যায়, তখন সবার মতামতকেই গুরুত্ব দিতে হয়। তখন যদি বড় ভাই বা বোন, এমনকি বাবাও নিজের মত চাপিয়ে দিতে চান, সম্পর্কের টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়। তখন ঐক্য থাকে না।

পারিবারিক ঐক্য ও সুখ তখনই আসবে, যখন পরিবারের সবার মতামতকে আপনি গুরুত্ব দেবেন এবং সবাই মিলে সবার পারস্পরিক মতের গুরুত্ব দেবেন, সম্মান করবেন। দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত—তোমরা পাঁচ জন মিলে বা ১০ জন মিলে যে সিদ্ধান্ত নেবে, আমার সিদ্ধান্তও তা-ই। তাহলে দেখবেন, আপনার আর কোনো সমস্যা নেই।

**প্রশ্ন :** পরিবারে মা-বাবা, ভাইবোন বা স্ত্রী এদের ব্যাপারে প্রায়ই এমন হয় যে, হঠাৎ হঠাৎ কোনো আচরণ বা কারণ সমস্যা তৈরি করে। তখন কি সম্পর্ক ছেদ করা ঠিক হবে, নাকি সম্পর্কের সেতু নির্মাণ করব?

**উত্তর :** পরিবারের সাথে সম্পর্ক ছেদ করা—এটি হচ্ছে চূড়ান্ত পর্যায়, যখন আর কোনো বিকল্প থাকবে না। তার আগ পর্যন্ত চেষ্টা করতে হবে সেতু রচনা করার এবং বিশ্বাস রাখবেন, সম্পর্কটাকে পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব।

**প্রশ্ন :** আমার এক মামা বিভিন্ন ব্যাংকের কাছে ও আম্মুর কাছে মিলে ১২ লাখ টাকা ঋণ করেছেন। কিন্তু ব্যবসায় লস খাওয়ার কারণে টাকা শোধ করতে পারবেন কিনা সন্দেহ। এই মামা আমার নানার অনেক সম্পত্তি পেয়েছে। তাকে কি কমান্ড সেন্টারে এনে বোঝানো যায় যে, সম্পত্তি বিক্রি করে আমার মায়ের টাকা পরিশোধ করে দিক?

**উত্তর :** হাঁ, হতে পারে। তাকে ক্রমাগত সাজেশন দিন, মামা, আমার টাকার প্রয়োজন। তোমার তো অভাব নেই। তুমি চাইলেই সম্পত্তি থেকে আমার

আম্মুর টাকাটা ফেরত দিতে পারো। টাকাটা তুমি ঋণ নিয়েছ এবং এ ঋণ আমি মাফ করি নি। অতএব এই ঋণ নিয়ে যদি তুমি মারা যাও, আল্লাহর কাছে তো ঋণী অবস্থায় যাবে। তাই ঋণমুক্ত হওয়ার জন্যে যেভাবে টাকা সংগ্রহ করা দরকার, তুমি করো এবং আমার টাকা আমাকে দিয়ে দাও। এভাবে ক্রমাগত বোঝাতে থাকুন এবং বিশ্বাসটাকে দৃঢ় করুন।

আপনার মাকে বিশ্বাস দৃঢ় করতে হবে, আমার ভাই আমাকে টাকা ফেরত দেবেই। আমরা অনেক সময় নেতিবাচক হয়ে যাই যে, ফেরত দেয় নাকি দেয় না। যারা মেডিটেশন করেন, তাদের মধ্যে যখন নেতিবাচকতা ঢুকে যায়, তখন তা আরো শক্তি পায়। কারণ আপনার মনোযোগটা অনেক শক্তিশালী। আর নেতিবাচকতা কাজ করে খুব দ্রুত। কোনোকিছু গড়তে সময় লাগে, ভাঙতে সময় লাগে না। এজন্যে নেতিবাচক হবেন না। বিশ্বাসকে প্রবল করবেন। মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে ক্রমাগত তাকে বোঝান।

**প্রশ্ন :** আমার দেবর মারা যাওয়ার পর আমরা তার স্ত্রী ও মেয়ের ব্যয় বহন করতাম। এখন দেবরের স্ত্রী বিয়ে করেছে। মেয়েটার বয়স ১৭ বছর। মেয়েকে আমার কাছে থাকতে বলেছি, কিন্তু মেয়ে তার মায়ের কাছে থাকতে চায়। এখন আমরা আর মেয়ের খরচ দিচ্ছি না। এটা কি ভুল হচ্ছে?

**উত্তর :** অবশ্যই ভুল হচ্ছে। যেহেতু মেয়ের মা বিয়ে করেছে, তার ব্যাপারে আপনাদের আর কোনো দায়িত্ব নেই। তার ভরণপোষণের দায়িত্ব এখন তার নতুন স্বামীর। আবার এটাও তো ঠিক যে, মেয়েকে নিজের কাছে রাখার ব্যাপারে মায়ের অধিকার সবচেয়ে বেশি। কারণ মায়ের চেয়ে বেশি নিরাপত্তা ও মমতা মেয়েকে কেউ দিতে পারবে না। তাই মেয়ে তার মায়ের সাথে থাকতে চাওয়াটাও স্বাভাবিক।

আপনাদের জন্যে মানবিক আচরণ হবে—দেবরের মেয়েটির ভরণপোষণ আগে যেভাবে করতেন এখনো সেভাবেই করা। যতদিন পর্যন্ত সে স্বাবলম্বী না হচ্ছে কিংবা বিয়ে না করছে ততদিন পর্যন্ত এটা আপনার নৈতিক দায়িত্ব। আপনি এতদিন ভরণপোষণ করতেন মানে আল্লাহ আপনাকে সেটা করার সামর্থ্য দিয়েছেন। আল্লাহ কখন কার মাধ্যমে একজনের রিজিক দেন কেউ বলতে পারে না।

বান্দরবান লামাতে যখন আমরা কোয়ান্টামের কার্যক্রম শুরু করি, আমাদের সবকিছুই ছিল স্বল্প পরিসরে। তারপরও আমরা বলেছিলাম, কেউ কোয়ান্টামমে এলে ক্ষুধার্ত অবস্থায় যেন ফিরে না যায়। কারণ লামার দুর্গম

দীর্ঘপথে কোথাও সে খাবারের দোকান পাবে না। আমাদের একজনের প্রশ্ন ছিল—কত লোককে খাওয়াব? আমরা বলেছি, যত জন আসে তত জনকে খাওয়াবেন। কারণ সে তার রিজিক নিয়ে এসেছে। তাকে না খাওয়ালে আমাদের অকল্যাণ হবে।

কারো জন্যে কিছু করতে পারাটা আসলে অত্যন্ত সৌভাগ্যের। তাই সবসময় চিন্তা করবেন অন্যের জন্যে কতটা করতে পারলাম, কতটা দিতে পারলাম। কতটা নিতে পারলাম, তা নয়। যত তৃপ্তি সব দেয়ার মধ্যেই।

অতএব যে মেয়েটিকে এতদিন লালন করেছেন, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এখন আপনি কেন তা করবেন না? এতিমের মাথায় হাত রাখার সুযোগ থেকে কেন নিজেকে বঞ্চিত করবেন?

## পারস্পরিক সম্পর্ক

**প্রশ্ন :** পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কী?

**উত্তর :** পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, আপনি অন্যের কাছ থেকে যে ব্যবহার প্রত্যাশা করেন, নিজে সে ব্যবহার করা এবং ক্রমাগত সেটা করে যাওয়া। আপনি যখন ক্রমাগত ভালো ব্যবহার করে যাবেন, দেখবেন, আপনার কাজের ফলাফল আপনি পেতে শুরু করেছেন। সুসম্পর্ক তৈরির সবচেয়ে সহজ উপায় এটি।

**প্রশ্ন :** আমার নেতিবাচকতা দূর করার জন্যে আমি অনেকবারই প্রার্থনাসহ অন্যান্য যা যা লাগে তা করেছি। কিন্তু যার সাথে আমার ঝগড়া-বিবাদ থাকে, তার সাথে আমি কথাও বলি না। এভাবে কাছের অনেকে হয়ে পড়ছে দূরের মানুষ। আর আমি হয়ে যাচ্ছি আরো একা, নিঃসঙ্গ। এ-ক্ষেত্রে আমার নেতিবাচকতা দূর করার উপায় কী?

**উত্তর :** খুব সহজ। তার সাথে কথা বলবেন। যার সাথে ঝগড়া-বিবাদ তাকে দেখলেই আগে সালাম দেবেন। এই সালামের রেজাল্ট আমরা কিন্তু পেয়েছি। লামাতে এক প্রতিবেশী আমাদের সাথে খুব ঝগড়া করত। দেখলেই গালিগালাজ-বকাবকি। আমরা বললাম যে, তার সাথে দেখা হলে সে কিছু বলার আগেই তাকে 'আসসালামু আলাইকুম' বলতে হবে। আমাকে জানানো

হলো, সে-তো সালামের কোনো জবাব দেয় না। বললাম, যতদিন পর্যন্ত জবাব না দেয়, আপনি সবসময় অন্তর থেকে সালাম দিতে থাকবেন।

কয়েক বছর পর সেই প্রতিবেশী বলল যে, 'এরকম বেহায়া! সালামের জবাব না দেয়ার পরও সালাম দেয়। এদের সাথে আর পারা গেল না!' এরপর সে সালামের জবাব দিতে শুরু করল এবং সম্পর্ক ভালো হয়ে গেল।

আসলে সাধারণ মানুষ ঝগড়া জিইয়ে রাখে বলেই পারস্পরিক সম্পর্কে এত ঝগড়া-বিবাদ আর নেতিবাচকতা। অতএব যার সাথে বিবাদ, তাকে সালাম দেবেন সবচেয়ে বেশি এবং সবার আগে। দেখবেন যে, কোনো ঝগড়া-বিবাদ থাকবে না। তা না করে যদি কথা বলা বন্ধ করে দেন, তাহলে কী হবে তা তো আপনিই বুঝতে পারছেন—কাছের মানুষ হয়ে যাবে দূরের, আর আপনি একাকিত্বের মতো নীরব ঘাতকের শিকার হবেন।

**প্রশ্ন :** আমার প্রতিবেশী এক পরিবারের স্কুলপড়ুয়া ছেলে এক বোতল স্যাভলন খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। সময়মতো হাসপাতালে নেয়ার পর সে বেঁচে গেছে। এর কয়েকদিনের মধ্যে সে আবার তার হাত কেটে ফেলল। তাকে নিয়ে তার পরিবারও আতঙ্কিত। এত অল্প বয়সে কেন ছেলেটি এরকম ভুল করল? এসব নিয়ে আমিও চিন্তিত, বিচলিত। আমি অনার্সে পড়ি। কীভাবে তাদের সাহায্য করতে পারি? দয়া করে সমাধান দেবেন।

**উত্তর :** এটা তরুণ প্রজন্মের একটা সমস্যা। এসব ব্যাপারে আমরা একটা জায়গায় ভুল করি। সমবেদনা জানানো আর কারো সমস্যার মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা দুটো আলাদা বিষয়। গৃহপালিত প্রাণী হাঁস ও মুরগির কথাই ধরুন। হাঁস পানিতে ডুব দিয়ে উঠে এসে যখন গা ঝাড়া দেয়, তখন তার গায়ে পানির চিহ্নও থাকে না। কিন্তু মুরগিকে পানিতে ডোবানো হলে সে ভিজে একেবারে চুপসে যায়। পার্থক্যটা এখানেই।

যে সমস্যা আপনি সমাধান করতে পারবেন না, সেটার মধ্যে কখনো জড়াবেন না। সেটা হোক ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক বা রাষ্ট্রীয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারব না, সেটা নিয়ে আমরা বেশি চিন্তা করি। এটা হচ্ছে আমাদের পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ। আপনি যে ছেলেটির কথা উল্লেখ করেছেন, সে যে-কোনোভাবেই হোক নেতিবাচক হয়ে গেছে। তার মধ্যে আত্মহত্যা প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে। এখন সে ছেলেটির কথা ভেবে যদি আপনি চিন্তিত হন, বিচলিত হন, আপনার পড়াশোনা নষ্ট করেন—তাহলে আপনি নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

তার সঠিক চিকিৎসা প্রয়োজন, বিশেষজ্ঞের সাথে কাউন্সেলিং প্রয়োজন। কারণ তার সমস্যাটা মানসিক। এ ব্যাপারে তাকে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট সহযোগিতা করতে পারেন। আপনার পক্ষে তাকে সাহায্য করা সম্ভব নয়। কেন তার মধ্যে আত্মহত্যা প্রবণতা সৃষ্টি হলো—এর সমাধান আপনি করতে পারবেন না, এটা আপনার বিষয়ও নয়।

এ কারণেই আমরা বলেছি যে, নেতিবাচক লোক থেকে সবসময় দূরে থাকতে হবে, যেন তার কোনো বিষয় আপনাকে প্রভাবিত ও ক্ষতিগ্রস্ত না করে। তাকে কখনো বন্ধু ভাবতে যাবেন না। সবসময় তার কল্যাণ কামনা করবেন, তার জন্যে দোয়া করবেন, এ-ই যথেষ্ট। অল্প বয়সে আসলে মন খুব কোমল থাকে, এ সমস্ত ব্যাপারে তারা বেশি জড়িয়ে যায়। কিন্তু নেতিবাচক লোক—যারা নিজের জীবনে, অন্যের জীবনে অশান্তি সৃষ্টি করে তারা কখনো কারো বন্ধু হতে পারে না, কখনো কারো উপকার করতে পারে না।

কথাগুলো কঠিন মনে হতে পারে, কিন্তু এটা হচ্ছে রূঢ় বাস্তবতা। আপনাকে আগে নিজেকে তৈরি করতে হবে, সফল হতে হবে। তখন আপনি অনেক মানুষের উপকার করতে পারবেন। কিন্তু নিজে সফল না হয়ে আপনি যদি অন্যের প্রতি আবেগবশত কিছু করতে যান, আপনি তারও কোনো উপকার করতে পারবেন না, নিজের তো নয়ই।

**প্রশ্ন :** আমার মানসিক সমস্যার একটা বড় কারণ প্রভাবিত হয়ে যাওয়া। পরিবারে এবং কর্মক্ষেত্রেও আমি খুব সহজেই অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হই। অন্যদের সম্পর্কে ধারণার ক্ষেত্রে এটা বেশি হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবে নানা জটিলতাও তৈরি হয়। কী করণীয়?

**উত্তর :** অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হলে এমনটি হবেই। কারণ আপনি তো আপনার চোখে দেখছেন না। আপনি দেখছেন অন্যের চোখে। আর এটা আরো জটিল হবে যখন যার সম্পর্কে বলা হচ্ছে, তার ব্যাপারে আপনার যদি কোনো নেতিবাচক পূর্বধারণা থাকে। যেমন, মিস্টার 'এক্স' হয়তো আপনার কাছে এসে মিস্টার 'ওয়াই'-এর নামে নেতিবাচক কিছু বলে গেল। এদিকে মিস্টার 'ওয়াই'-এর ব্যাপারে আপনারও কিছু অসন্তুষ্টি আছে, অভিমান আছে। আপনি তখন মিস্টার 'এক্স'-এর সব কথাই বিশ্বাস করবেন।

এদিকে মিস্টার 'এক্স'-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি কিছু বলেন, আর কিছু বলেন না। অর্থাৎ একটি ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে তিনি কিছু কথা বলেন না, যার ফলে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি

হয়। ফলে মিস্টার 'এক্স'-এর চোখ দিয়ে দেখতে গিয়ে আপনি মিস্টার 'ওয়াই'-এর ব্যাপারে আরো ক্ষিপ্ত বা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন, অভিমান আরো দানা বাঁধল। হয়তো 'ওয়াই'-এর ব্যাপারে নেতিবাচক মন্তব্য করে ফেললেন। আর সেটা শুনে মিস্টার 'এক্স' হয়তো আবার 'ওয়াই'-কে গিয়ে খুব নিরীহভাবে তা বলে এলো এবং এরপর আরো অনেককেই বলতে লাগল।

এই কথাবার্তা যত আদান-প্রদান হতে থাকবে, তত বাড়তে থাকবে অভিমান। অভিমান থেকে ক্ষোভ, ক্ষোভ থেকে জেদ এবং জেদ থেকে নেতিবাচক সিদ্ধান্ত। তাই অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নয়, নিজের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করুন। জটিলতা এড়াতে আপনি কী করতে পারেন, তা নিয়ে ভাবুন, দেখবেন সমাধান বেরিয়ে আসছে। আর সাধারণ মানুষের সমস্যা হলো, নিজের লক্ষ্যটাকে বাদ দিয়ে সে সহকর্মীর সাথে, প্রতিপক্ষের সাথে, তার আপন লোকদের সাথে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ে, বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। এর মাধ্যমে সে তার জীবনের মূল্যবান প্রাণশক্তিকে বিনাশ করে।

যেমন, বলা হয়—কুকুর চাইলে দিনে দিনে দিল্লি চলে যেতে পারে। কিন্তু আদতে সে পারে না। কেন? কারণ সে তার এলাকা থেকে বের হয়ে প্রথম যে কুকুরটাকে পায়, তার সাথেই ঝগড়া শুরু করে। ঘোড়া কিন্তু দিল্লি চলে যায়। কারণ একটি ঘোড়া অন্য ঘোড়াকে দেখে ঝগড়া করে না। সাধারণ মানুষও অনেক মেধা, যোগ্যতা, প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও বিতর্ক বা বিরোধকে এড়াতে না পারার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নিয়মিত দুবেলা মেডিটেশন করুন। মন প্রশান্ত হলে এসব সমস্যা একসময় আপনিই কেটে যাবে।

**প্রশ্ন :** আমি অন্যদের সাথে মিলেমিশে থাকতে চাই। কিন্তু দেখা যায়, ছোটখাটো বিষয় নিয়ে প্রায়ই ভুল বোঝাবুঝি হয়। সমস্যাটা কোথায় আমি বুঝি না। এদিকে পরবর্তী বেশ কিছুটা সময় বিষয়টি নিয়ে ভারাক্রান্ত থাকি।

**উত্তর :** সমস্যাকে শনাক্ত করতে পারা সমাধানের অর্ধেক। আর মনোজাগতিক ক্ষেত্রে সমস্যাকে শনাক্ত করতে পারা হচ্ছে, সমাধানের ৯০ ভাগ। বাকি ১০ ভাগ হচ্ছে সচেতন থাকা, অভ্যাসটা শুধরে নেয়া আর কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে সেই সময়টাকে পার হতে দেয়া, অর্থাৎ নীরব থাকা।

ভুল বোঝাবুঝির একটি বড় কারণ হলো, সমস্যাটির জন্যে যে আমারও কিছু দায় আছে, সেটা বুঝতে না পারা। আমরা মনে করি, সমস্যাটি অপর পক্ষের কারণে হয়েছে। আমি ঠিক আছি। আমার প্রতি অবিচার করা হয়েছে। আমাকে কেন বুঝল না?

সাধারণত পরিবারের সদস্য, প্রিয়জন এবং ঘনিষ্ঠদের মধ্যেই এ জটিলতা হয়। অর্থাৎ দুপক্ষই আশা করে, অপরপক্ষ তাকে বুঝবে। কিন্তু বোঝার জন্যে প্রথম উদ্যোগ যে তিনিই নিতে পারেন, সেটা তিনি মনে করেন না। ফলে যা হওয়ার তা-ই হয়। কেউ কাউকে বুঝতে চায় না। তখন সম্পর্কে টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়। শক্তিশালী পক্ষ হয়তো অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিপক্ষের ওপর কর্তৃত্ব করেন। যেমন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্বামী যদি রগচটা হন, স্ত্রী তখন মেনে নেন যে, এটাই আমার কপাল। এটা আমার দুর্ভাগ্য। আর স্ত্রী মেজাজী হলে স্বামী আপসের মনোভাব গ্রহণ করেন। ঝামেলা পরিহার করেন।

চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াস খুব সুন্দরভাবে বলেছিলেন, মানুষ বিতর্কে জড়িয়ে প্রথম যে ভুলটা করে তা হলো, তার বুদ্ধিকে সে ব্যবহার করে বিতর্কে জেতার জন্যে, বিতর্ক এড়ানোর জন্যে নয়। কাজেই পারিবারিক ক্ষেত্রে এবং জীবনের যে-কোনো ক্ষেত্রে বুদ্ধিমানের কাজ হবে বিতর্ক এড়ানো। কারণ যে বিরোধে হার হবে, সে বিরোধে যাওয়ারই বা দরকার কী?

পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতা নিরসনের সবচেয়ে কার্যকর সমাধান হলো নিজের ভুল খুঁজে বের করা এবং অপরপক্ষের অবস্থান থেকে ভাবা, তাকে বোঝার চেষ্টা করা। কারণ আপনি নিজে যা করেন না, অপরপক্ষের কাছ থেকে আপনি সেটা আশাও করতে পারেন না।

যখন আপনি অপরপক্ষকে ভুল বলে ধরে নিচ্ছেন, তখন আপনার মনে হচ্ছে, ভুল বোঝাবুঝি দূর করার দায়িত্বও তার। কিন্তু যদি ভাবতেন, আপনি তাকে বোঝাতে পারেন নি বলে সে ভুল বুঝেছে, তখন দায়িত্বটা আপনি নিতেন। তখন দেখা যেত, আপনিই সমাধানের জন্যে এগিয়ে যাচ্ছেন এবং সমাধানও হচ্ছে খুব সহজেই।

**প্রশ্ন :** যখন কেউ বার বার অপমান করে কষ্ট দেয়, তখন কী করা উচিত?

**উত্তর :** আপনি অপমানিত বোধ না করলে আরেকজন কীভাবে অপমান করবে? একটা কুকুর ঘেউঘেউ করল আপনি কি অপমানিত বোধ করবেন? একজন আপনার মুখের সামনে দরজা বন্ধ করে দিলে তাতে আপনি কেন অপমানিত বোধ করবেন? বরং মায়া বোধ করবেন যে, আহারে! মানুষটা ভদ্রতা জানে না! পরদিন আবার যাবেন তার জন্যে *শুদ্ধাচার* বই নিয়ে।

একজন গালি দিলে বা খারাপ শব্দ উচ্চারণ করলে সে নিজেকে অপমান করল। সে যে গালিগালাজ করে পাপ করছে, সময় নষ্ট করছে এজন্যে আপনি মনে মনে দোয়া করবেন। তাহলে অন্যের মন্দ আচরণ আপনাকে স্পর্শ

করতে পারবে না। ভাববেন, তার যা আছে সে দিয়েছে, কিন্তু আমি তা নিলাম না। তার কথা বা আচরণের প্রতিবাদ করার তো কিছু নেই।

সবসময় মনে রাখবেন, মান অপমান নির্ভর করে আপনার অনুভূতির ওপরে। আরেকজন কিছু করলেই আপনার সম্মান বাড়বে না বা কমবে না। সম্মান বাড়ে এবং কমে আত্মজ্ঞানের ওপর। নিজেকে ভালবাসার ওপর। অপমানিত বোধ করলে বুঝবেন যে, নিজের প্রতি আপনার শ্রদ্ধাবোধটা কমে গেছে। আপনি নিজেকে শ্রদ্ধা করছেন না। নিজেকে নিজে শ্রদ্ধা করলে দেখবেন যে, কেউ আপনাকে অপমানিত করতে পারবে না।

**প্রশ্ন : মনের বিষ তৈরি হয় এমন পরিস্থিতি থেকে যদি কেউ পরিত্রাণ না পায়, তবে সে কীভাবে তা দূর করবে? যদি পরিবারের কোনো সদস্য নেতিবাচক, কলহপ্রিয়, জটিল মনের মানুষ হন এবং সে মানুষটির দায়িত্ব ও যত্ন তাকেই নিতে হয়, তখন তার মনে প্রতিনিয়ত বিরক্তি ক্ষোভ অভিমান ও অশান্তি তৈরি হয় এবং এটা ক্রমাগত তাকে হতাশ ও পরিশ্রান্ত করে তোলে। এই মনের বিষ থেকে কীভাবে মুক্ত থাকা যায়?**

**উত্তর :** আসলে মনের বিষের অবস্থান হচ্ছে আপনার মনে। আপনি তার দেয়া এই অপ্রয়োজনীয় ক্ষতিকর জিনিসগুলো গ্রহণ না করলেই হয়। বহু বছর আগের কথা—এক তরুণ তার বন্ধুর বাড়িতে গেছে বন্ধুকে ডাকার জন্যে। বন্ধুর বড় বোন মনে করতেন, সে একটা বাউন্ডুলে। দরজা নক করার পর দরজা খুলে এই তরুণকে দেখেই তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ও বাসায় নেই'। তারপর সজোরে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

এ ঘটনায় তরুণটি প্রথম বিস্মিত হলো। বুঝল, তার বন্ধু বাসায় আছে, কিন্তু তাকে ডেকে দেয়া হচ্ছে না। সে সিদ্ধান্ত নিল ডেকে না দেয়া পর্যন্ত সে আসতেই থাকবে। এটাকে একটা মজার খেলা হিসেবে নিল সে। প্রতিদিন গিয়ে সে নক করত, বন্ধুর বোনও 'নেই' বলে দরজা বন্ধ করে দিতেন। তবে তরুণটি কোনো ধরনের ঝগড়া বা বেয়াদবি করে নি। কিন্তু মনে মনে বলেছে, ডেকে দেবেন না কেন? একদিন না একদিন ডেকে দিতেই হবে। দিনের পর দিন এ ঘটনা ঘটতে লাগল। প্রায় মাস দুয়েক পর বোনের বিরক্তি যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে ঠেকল, তখন ছোট ভাইকে ডেকে দিয়ে বললেন, 'এই বেহায়া আজও এসেছে। প্রতিদিন দরজা বন্ধ করে দেই, তারপরও আসে!'

আপনাকেও যখন বকাবকি করে, উপভোগ করুন। ভাবুন, আহারে! বেচারা কত দুঃখী! তাকে দেখার জন্যে আমি ছাড়া কেউ নেই। ভেবে দেখুন,

কত করুণ তার অবস্থা! সে-তো মানসিকভাবে সুস্থ নয় বলেই গালিগালাজ করছে। এমন একজন মানুষের ওপরে রাগ করার কী আছে!

আর নেতিবাচক মানুষ থেকে সবসময় দূরে থাকবেন। আপনি বলবেন, পরিবারের খুব কাছের কোনো মানুষ যদি নেতিবাচক হয়, তাহলে দূরে থাকব কীভাবে? এই দূরে থাকা মানে হচ্ছে, তার কোনো কথা আমলে নেবেন না। সে যা-কিছু বলে বলুক, কখনো প্রভাবিত হবেন না। আপনি হাসবেনও না, কাঁদবেনও না। মজার খেলা হিসেবে নিন। উত্তেজিত হবেন না।

আপনি রেগে গেলেন বা দুঃখ পেলেন মানে সে জিতে গেল। কারণ সে-তো চাচ্ছে, আপনি যেন আহত হন। আপনি যদি আহত না হয়ে পাখির মতো ডানা মেলে উড়ে বেড়ান, যেন এগুলো কিছুই আপনার গায়ে লাগে না, তখন এমনিতেই সব বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ মানুষ যখন তার কথার কোনো রি-একশন পায় না, তখন স্বাভাবিকভাবেই সে একসময় কথা বলার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

**প্রশ্ন :** যখন কেউ ছলে-বলে-কৌশলে আমাকে বিপদে ফেলে বা আমার খারাপ চায়, তখন আমি কী করব? আমি তবুও তাদের ভালবাসি, তাদের আপন ভেবে যত্ন করি। মাঝে মাঝে একটু রাগ হয়, যদিও আমি কখনো কারো খারাপ চাই না।

**উত্তর :** যে আপনার অমঙ্গল চাইবে, তার জন্যেও আপনি মঙ্গল কামনা করবেন—এটাই ধর্মের শিক্ষা। এটাই নবী-রসুলদের শিক্ষা। কেউ ছলে-বলে-কৌশলে আপনাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করলে নিজের বুদ্ধিকে কাজে লাগাবেন। অর্থাৎ তাদের ছল-বল-কৌশলটা বোঝার চেষ্টা করবেন। কারণ বিপদে পড়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে যেন বিপদে না পড়েন। সেইসাথে আপনাকে যারা বিপদে ফেলতে চায় তাদের জন্যে দোয়া করবেন, যাতে তারা হেদায়েতের সাথে থাকে। সবসময় আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবেন এবং সৃষ্টির কল্যাণে সৎকর্মে নিয়োজিত থাকবেন।

**প্রশ্ন :** পরিবারে কাছের মানুষদের মধ্যে অনেকেই নেতিবাচক। এখন তাদের থেকে একটু দূরে থাকলে বা কিছুটা এড়িয়ে চললেই তারা আমাকে খারাপ মনে করে। বলে, আমার নাকি দিন দিন ভাব বেড়ে যাচ্ছে! আমি কী করতে পারি? নেতিবাচক মানুষদের কাছ থেকে দূরে থাকব কীভাবে?

**উত্তর :** নেতিবাচক মানুষ থেকে বাস্তবে দূরে থাকতে পারলে থাকবেন। কিন্তু বাস্তব কারণে যদি দূরে থাকা না যায়, তাহলে দৃশ্যমানভাবে দূরত্ব সৃষ্টি করবেন না। কারণ পরিবারে আপনজনের মধ্যে কেউ কেউ নেতিবাচক হতেই পারে। তাদেরকে এড়িয়ে চলা যেমন সম্ভব নয়, আবার তাদেরকে বদলানোও আপনার পক্ষে কঠিন।

এ-ক্ষেত্রে আপনার করণীয় হলো, তাদের নেতিবাচক কথা বা আচরণ দ্বারা আপনি কখনো প্রভাবিত হবেন না। অর্থাৎ সবসময় প্রো-একটিভ থাকবেন। তারা যখনই কোনো নেতিবাচক কথা বলবে আপনি হাসবেন এবং অপরপক্ষ যেন বুঝতে না পারে সেভাবে মনে মনে বলবেন, তওবা তওবা বাতিল বাতিল। তাহলে তাদের কথায় আপনার ব্রেনে ও মনে কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না। সম্পর্কও সহজ স্বাভাবিক থাকবে।

**প্রশ্ন :** কয়েক বছর ধরে একজন আমার পেছনে শত্রুতা করে আসছে। আমি বুঝতে পারি নি যে, এর কারণে আমি কোনো কাজে এগোতে পারি না। মেডিটেশন করে আমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু ফল হলো উল্টো। শত্রুতা আরো বেড়ে গেছে। কীভাবে তার শত্রুতা থেকে মুক্তি পাব?

**উত্তর :** এটা আপনার ভুল ধারণা যে, মেডিটেশনে বোঝানোর চেষ্টা করায় শত্রুতা আরো বেড়ে গেল। এটা একধরনের হ্যালুসিনেশন। এই ধরনের মানসিক বিভ্রান্তিতে অনেকে ভোগেন। মনে হয়, অমুকে বোধহয় শত্রুতা করছে, অমুকে তাবিজ করেছে, বান মেরেছে, বিয়ে-সাফল্য-সন্তান আটকে রেখেছে ইত্যাদি। একশ্রেণির ভণ্ড পীর-ফকির-ওঝারা এসব ভ্রান্ত বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে বেশ ফুলেফেঁপে কলাগাছ হয়ে উঠছে। অতএব এসব ভ্রান্ত ধারণা থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে প্রয়োজনে কাউন্সিলরের পরামর্শ নিন।

**প্রশ্ন :** কেউ যদি আমার সম্পর্কে ভুল ধারণা করে এবং অন্যদেরকেও বলে বেড়ায়, তাহলে কী করা উচিত? সম্পর্ক নষ্ট হবে ভেবে সরাসরি তাকে বলতে পারছি না। যদিও মনে মনে ক্ষোভ-কষ্ট ঠিকই হচ্ছে।

**উত্তর :** সরাসরি তাকে না বললেও আপনার মনে যে ক্ষোভ সঞ্চারিত হচ্ছে, তার ফলে সম্পর্ক কিন্তু নষ্ট হবেই, তা আজ হোক বা কাল। অতএব সত্যটা বলার পরও যদি দেখেন সম্পর্ক টিকে আছে, তাহলে বুঝবেন, সম্পর্কটা আপনার জন্যে কল্যাণকর। কিন্তু যদি দেখেন সম্পর্ক ভেঙে গেছে, বুঝবেন,

এ সম্পর্ক আপনার জন্যে কল্যাণকর ছিল না। আরেকটা বিষয় হলো, প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে সবসময় আলাপের পথ উন্মুক্ত রাখবেন। কখনো আলাপ-আলোচনার পথ বন্ধ করবেন না, তাহলে আপনি জয়ী হবেন। প্রতিপক্ষকে কখনো প্রকাশ্যে অপমান করবেন না। মহামানবদের জীবন দেখুন, তাঁরা কখনো প্রতিপক্ষকে অপমান করেন নি এবং প্রতিপক্ষের সাথে আলোচনার পথ তাঁরা কখনো বন্ধ করেন নি।

**প্রশ্ন :** আমার নিজের সম্পর্কে যখন কেউ অহেতুক নেতিচিন্তা করে বা মিথ্যা দোষারোপ করে, তখন নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। নানান যুক্তিতর্ক দেখিয়ে তাদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্যে অস্থির হয়ে উঠি। এ থেকে কীভাবে পরিত্রাণ সম্ভব?

**উত্তর :** কেউ যখন অহেতুক নেতিচিন্তা করবে, মিথ্যা দোষারোপ করবে, আপনি তখন কিছুই বলবেন না। এটাকে কোনো আমলই দেবেন না। তাহলে সে এমনিতেই থেমে যাবে। তাকে যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝানোর কোনো প্রয়োজন নেই, বুঝিয়ে নিজের সময় নষ্ট করারও দরকার নেই।

**প্রশ্ন :** এক ম্যাডাম আমার কাজে অনেক সমস্যা করেন। খুব খারাপ ব্যবহার করেন। এটা-ওটা ঢিলাঢিলি করেন। আমার ধারণা, উনি আমাকে এবং ওনার স্বামীকে সন্দেহ করেন। ওনার স্বামী আমার অফিসের হেড ক্যাশিয়ার। আমি প্রয়োজন ছাড়া স্যারের সাথে কথা বলি না। তারপরও উনি এমন করেন। নির্দিষ্টভাবে কিছু বলেনও না। আমার সমস্যার সমাধান চাই।

**উত্তর :** ম্যাডাম আপনার সমস্যা করছেন—এটা মনে করার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ আপনি যখনই মনে করছেন যে, ম্যাডাম আপনাকে দেখতে পারেন না বা আপনার সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করেন, তখনই আপনি ও আপনার ম্যাডামের মধ্যে একটা দেয়াল নিজে তৈরি করে ফেলছেন। তখন তার সম্পর্কে যে চিন্তাই করবেন, সেটাই হবে নেতিবাচক। তার ফলে বাস্তবে আপনি যখন তার মুখোমুখি হচ্ছেন, আপনার মনের এই নেতিবাচকতাই বাস্তব অবস্থার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করছে। ওই যে বলে না, যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা।

মূল সমস্যাটা তার চলন বাঁকা না, আসলে আপনি তাকে দেখতে পারেন না। সমস্যা আপনার মধ্যে। আপনি তার সম্পর্কে ইতিবাচক হোন। ভাবতে

শুরু করুন, আমার ম্যাডাম খুব ভালো, আমাকে খুব পছন্দ করে। যখনই তার সাথে দেখা হয়, আন্তরিকভাবে সালাম দিন। কুশল জিজ্ঞেস করুন। ছয় মাস দেখুন। দেখবেন, আর সমস্যা হচ্ছে না। দৃষ্টিভঙ্গিটাকে আপনি বদলে ফেলুন। যখন নিজের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যাবে, ম্যাডামের মধ্যেও পরিবর্তন আসবে। সেইসাথে ম্যাডাম তার স্বামীর সাথে আপনাকে নিয়ে সন্দেহ করতে পারে এমন কিছু করার ক্ষেত্রে সচেতন থাকবেন।

**প্রশ্ন :** পারস্পরিক সুসম্পর্ক কীভাবে তৈরি করতে হয়? কেউ যদি প্রচণ্ড বদমেজাজ এবং অহংকার দেখায়, আমাকে সবসময় অসম্মান ও বিরক্ত করার চেষ্টা করে, তখন করণীয় কী? তার প্রতি আমি ইতিবাচক হতে পারছি না।

**উত্তর :** এখানে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, আপনি তার প্রতি ইতিবাচক হতে পারছেন না। আপনি যতক্ষণ তাকে ক্ষমা করতে না পারছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আলফা লেভেলে কমান্ড সেন্টারে তার সাথে আপনার যোগাযোগ হবে না। কারণ আপনি মনে মনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছেন। এটা বাদ দিয়ে তারপর দোয়া করলে কাজ হবে।

অর্থাৎ আগে তার প্রতি ইতিবাচক হতে হবে। আপনাকে বুঝতে হবে যে, আসলে বদমেজাজির চেয়ে দুঃখী আর হয় না। কারণ এমন মানুষের সাথে কেউ কাজ করতে চায় না। সবাই তাকে এড়িয়ে চলে। এটা হচ্ছে সাইকোলজি। ফলে তার নির্ভর করার মতো তেমন কেউ থাকে না। এ-ক্ষেত্রে আপনি প্রো-একটিভ থাকতে পারলেই তার সাথে চলাটা সহজ হয়ে যাবে। অন্যরা তার প্রতি ক্ষোভ দেখাবে বা ঝগড়া করবে। আপনি ক্ষোভ প্রকাশ করবেন না। আপনি বরং তার প্রতি সমব্যথী হবেন যে, আহারে বেচারা! তার বদমেজাজ এবং অহংকারের ফলে অন্যরা দূরে সরে যাচ্ছে। তার প্রতি সমব্যথী হলে কিছুদিন পর দেখবেন, তিনি আপনার ওপর নির্ভরশীল হয়ে যাবেন। তখন আপনি তাকে আপনার পক্ষের শক্তি হিসেবে পাবেন।

অর্থাৎ কারো সম্পর্কে যদি আপনি স্টাডি করে ফেলতে পারেন, তার সাথে কাজ করা খুব সহজ। তাই আগে তাকে বুঝবেন। তাকে মানসিকভাবে গ্রহণ করবেন। তারপর আপনি কাজ করবেন এবং তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবেন। বিনয়, ধৈর্য, ক্ষমা ও সমমর্মিতা দিয়েই অন্যকে জয় করতে হয়।

**প্রশ্ন :** একজন লোক যদি আমার সাথে প্রায় সময়ই খারাপ ব্যবহার করে, তাহলে আমার কী করা উচিত?

**উত্তর :** আপনার সাথে যত খারাপ ব্যবহার করবে, আপনি তত ভালো ব্যবহার করবেন। সে খারাপ ব্যবহার করছে, আপনি যে তা বুঝতে পারছেন, তা তাকে বুঝতেই দেবেন না। আপনি এমন আচরণ করুন, যেন আপনি বুঝতেই পারছেন না। আর তার জন্যে দোয়া করুন।

**প্রশ্ন :** কিছু মানুষ আমাদের চারপাশে আছে, যারা সবসময় নেতিবাচক মন্তব্য করে অন্যকে দমিয়ে দিতে চায়। এরকম মানুষকে যাদের এড়ানো সম্ভব হয় না এবং প্রতিবাদ করলে উল্টো ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, তাদের সাথে সম্পর্কের সেতু নির্মাণ করা যায় কীভাবে?

**উত্তর :** যারা নেতিবাচক মন্তব্য করে দমিয়ে দিতে চায়, তাদের সাথে সেতু নির্মাণ করার কোনো প্রয়োজন নেই। আবার দেয়ালও তুলবেন না; তাদেরকে এড়িয়ে চলারও প্রয়োজন নেই। আপনি শুধু তাদের মন্তব্য দিয়ে কখনো প্রভাবিত হবেন না। তাদের কথায় হাসবেন এবং মনে মনে বলবেন, আপনার মন্তব্যের কোনোকিছুই নিলাম না। অর্থাৎ সবসময় প্রো-একটিভ থাকবেন।

**প্রশ্ন :** আমার আত্মীয়স্বজন একসময় আমাকে খুব অনাদর-অবহেলা করত। এখন আমার অবস্থা আল্লাহর রহমতে ভালো। এখন তারা আমাকে তাদের বাড়িতে যেতে বলে ও যোগাযোগ করে। কিন্তু আমার মন সায় দেয় না তাদের সাথে মিশতে। আমি কী করব?

**উত্তর :** এ ব্যাপারে আপনি স্বাধীন। তবে তারা যে অনাদর করেছে, এই অনাদরের শাস্তি হচ্ছে তাদের সাথে সুন্দর সম্পর্ক রাখা। এখন যত মিশবেন তত তাদের মনে পড়বে যে, আপনাকে তারা অবহেলা করেছিল। অর্থাৎ যত ক্ষমা করতে পারবেন, তত আপনি বড় হবেন। আল্লাহর রহমতে আপনার অবস্থা তত ভালো হতে থাকবে।

**প্রশ্ন :** আপনি বলেছেন, কাউকে তার আচরণ থেকে পৃথক করতে পারি না বলে ভুল করি। কিন্তু আচরণই তো ব্যক্তির প্রতিফলন। আচরণ দিয়েই কাউকে বিচার করা হয়। যেমন কেউ মিথ্যা বললে আমরা তাকে 'মিথ্যাবাদী' বলি। কেউ চুরি করলে 'চোর' বলি। মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং বৈশিষ্ট্য সবকিছুই আচরণ দিয়ে নির্ধারিত হয়। আচরণ শেখার জন্যেই আমরা কোয়ান্টামের সাথে যুক্ত। তাহলে আচরণ বাদ দিয়ে কীভাবে তাকে পুরস্কৃত করব?

**উত্তর :** চুরি করলে চোর হয়—এটা ঠিক। কিন্তু যেহেতু তাকে বদলাতে চাচ্ছি, এখন সবসময় যদি তাকে বলতে থাকেন, তুমি চোর ও মিথ্যাবাদী, তাহলে সে কি আপনার কথা শুনবে? আপনার বাসায় ছোট একটি শিশু কোনো জিনিস লুকিয়ে ফেলেছে। আপনি যদি এ নিয়ে সবসময় তাকে খোঁটা দেন, তাকে তো কখনো ভালো করতে পারবেন না। যেহেতু আমরা তার আচরণ শোধরাতে চাই, তাই তার আচরণ দিয়ে আমরা প্রভাবিত হবো না।

একজন আপনাকে গালি দিলো বা আপনার সাথে মিথ্যা বলল। আপনি তাকে গালি দিয়ে বা মিথ্যা বলে প্রভাবিত করতে পারবেন না। এক শাশুড়ি তার পুত্রবধূর নামে অন্যদের কাছে খুব নিন্দামন্দ করতেন। কিন্তু পুত্রবধূ তা জেনেও শাশুড়ি এবং অন্যদের সাথে খুব স্বাভাবিক আচরণ করতেন। কখনো রাগারাগি বা ক্ষোভ প্রকাশ করেন নি। এমনকি তিনি নাকি ননদদের নিন্দা করেছেন—শাশুড়ির কাছে এমন অভিযোগ শুনে ননদরাও তার দিকে তেড়ে এসেছে, তখনো তিনি স্বাভাবিক ছিলেন।

তার আচরণই পরবর্তীকালে শাশুড়ি এবং অন্য সবার ধারণা বদলাতে সাহায্য করেছে। আর তাকে পরিণত করেছে সবার প্রিয়পাত্রে। কাজেই কারো আচরণ বদলাতে চাইলে তাকে তার আচরণ থেকে আলাদা করতে হবে এবং সেই আচরণে প্রভাবিত হওয়া যাবে না।

**প্রশ্ন :** আমার সাথে একবার যদি কারো ভুল বোঝাবুঝি হয়, তাহলে তার সাথে আর কথা বলতে ইচ্ছা করে না। এ-ক্ষেত্রে আমার কী করা উচিত?

**উত্তর :** আবার তার সাথে কথা বলা উচিত। তার সাথে আপনি কথা বলছেন না মানে আপনি তাকে ঘৃণা করছেন। এ ঘৃণা দ্বারা সে যতটা না ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তার চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন আপনি। কারণ যে হৃদয়ে ঘৃণা জমে থাকে, সে হৃদয়ে কখনো স্রষ্টার রহমত যায় না। সেজন্যে তার সাথে কথা বলবেন, কথা বলার মধ্যে কোনো দোষ নেই।

**প্রশ্ন :** প্রতিপক্ষ যদি মিথ্যা অভিযোগ ও তার নিজের দোষত্রুটি আমার ওপর চাপিয়ে দেন, তাহলে আমার কী করণীয় হবে?

**উত্তর :** প্রতিপক্ষ মিথ্যা অভিযোগ ও দোষত্রুটি যা-ই আপনার ওপর চাপিয়ে দিক, আপনি সেটা গ্রহণ করবেন না, এমনকি কোনো প্রতিক্রিয়াও দেখাবেন না। এসব ক্ষেত্রে সবর করলে আপনি আল্লাহর কাছ থেকে এর পুরস্কার

পাবেন বহুগুণে। অতএব মেডিটেশনে মনের বাড়ির কমান্ড সেন্টারে যাবেন। তাকে বলবেন, আমি তো কোনো অন্যায় করি নি। আমি তোমার মঙ্গল চাই এবং আমার সাথে সম্পর্ক উন্নত হলে তুমি লাভবান হবে। সেই লাভ হতে পারে আত্মিক, বৈষয়িক, পেশাগত—এটা তাকে ক্রমাগত বোঝাতে হবে। তার হেদায়েতের জন্যে দোয়া করতে হবে। কারণ কাউকে মিথ্যা অভিযোগ করলে পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হয় এবং এটা একটা জঘন্য পাপ।

**প্রশ্ন :** মনের বিষ দূর না করে সম্পর্ক উন্নয়ন করা কি সম্ভব?

**উত্তর :** সম্পর্ক উন্নয়ন করার আগে অবশ্যই মনের বিষ দূর করতে হবে। তার বিরুদ্ধে যত ক্ষোভ, দুঃখ, গ্লানি যা-কিছু আছে, সব আলফা স্টেশনে ধুয়েমুছে একদম পরিষ্কার করে মনের বাড়িতে যাবেন।

এটা হচ্ছে মৌলিক কথা, যার সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করতে যাচ্ছেন, তার বিরুদ্ধে কোনো ক্ষোভ আপনার মনের মধ্যে রাখতে পারবেন না। যেহেতু আপনি সম্পর্ক উন্নয়ন করতে চাচ্ছেন, আপনার মন থেকে সমস্ত ক্ষোভ দূর করে দিতে হবে। তাকে পুরোপুরি ক্ষমা করে দিতে হবে।

**প্রশ্ন :** আপন মানুষগুলোর সাথে ভুল বোঝাবুঝি হলে কষ্ট লাগে। পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির ক্ষেত্রে আমার কী করণীয়?

**উত্তর :** আমরা ভুল বোঝাবুঝির পরে সম্পর্কের মাঝে দেয়াল তৈরি করে ফেলি। সম্পর্কের দুটো দিক—হয় সম্পর্ক রাখবেন, না হলে রাখবেন না; তাহলে কোনো অশান্তি নেই। কিন্তু সম্পর্ক রাখবেন, আবার দেয়াল তৈরি করবেন, তাহলে অশান্তি আরো বাড়বে।

আপনি হয়তো বলবেন, মায়ের সাথে, স্বামীর সাথে সম্পর্ক ছেদ করি কীভাবে? যেখানে সম্পর্ক ছেদ করতে পারবেন না, সেখানে দেয়াল তৈরি না করে সেতু রচনা করবেন। আমরা সেতু রচনার বদলে দেয়াল তৈরি করি। যে কারণে আমাদের সমস্যা অব্যাহত থাকে।

একজন মানুষ যত কঠিন হোক, যত খারাপই হোক, প্রত্যেক মানুষের ভেতরেই একটা নরম জায়গা আছে। যেখানে অনায়াসে আপনি টোকা দিয়ে যেতে পারেন। যে বুদ্ধিমান, সে সবসময় নরম জায়গায় নাড়া দেয়। আর আহাম্মক শক্ত জায়গায় আঘাত করে। শক্ত জায়গায় আঘাত করলে আপনার হাতই রক্তাক্ত হবে।

অতএব ভুল বোঝাবুঝি যার সাথেই হোক, যে-সম্পর্ক ছিন্ন করা যায় না, সেখানে দেয়াল তৈরি না করে সেতু নির্মাণ করুন। পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেতু তৈরি করা ইতিবাচক আর দেয়াল তৈরি করা নেতিবাচক। তাই সেতু নির্মাণ করার জন্যে নিয়মিত দোয়া করুন। আপনি যখনই কারো জন্যে দোয়া করবেন, সম্ভাবনা হচ্ছে, তার ভেতরেও আপনার জন্যে একটা সুন্দর জায়গা তৈরি হবে। আস্তে আস্তে ভুল বোঝাবুঝি কমতে থাকবে।

**প্রশ্ন :** খুব কাছের মানুষ বা পরিবারের সদস্যদের তীব্র আঘাত দেয়া কথায় খুব কষ্ট পাই। এ-ক্ষেত্রে কান্নাকাটি না করে অথবা ঝগড়া না করে একজন প্রো-একটিভ মানুষ হিসেবে কী ধরনের আচরণ করা উচিত?

**উত্তর :** একজন কথা বলছে, আপনি এক কান দিয়ে শোনেন আরেক কান দিয়ে বের করে দেন। আপনি না শুনলে তো এটার কোনো প্রভাব আপনার ওপরে পড়বে না। মনে মনে তওবা তওবা বলুন, বোঝে না, আহারে বেচারা! তার জন্যে দোয়া করুন। সে যদি বুঝত, তাহলে আরো ভালো কথা বলত। মনে মনে বলুন, আল্লাহ! তুমি তার হেদায়েত করো। আমরা এখানে ভুল করি। অপমানিত বোধ করি। আপনি যদি অপমানিত বোধ না করেন, কে আপনাকে অপমান করতে পারবে?

সবসময় মনে রাখবেন, আরেকজন কটুকথা বলতে পারে। রি-একশনটা আপনার ওপর নির্ভর করছে যে, আপনি সেটাকে কীভাবে নেবেন। তাকে আপনি বদলাতে পারবেন না। কিন্তু আপনি আপনার দৃষ্টিভঙ্গিটাকে খুব সহজে বদলে ফেলতে পারেন। পরিবারের সদস্য মা-বাবা হতে পারে, ভাইবোন হতে পারে, চাচা-চাচি হতে পারে, শ্বশুর-শাশুড়ি হতে পারে। তারা কীভাবে আপনাকে আঘাত দেবে, যদি আপনি আঘাতটাকে না নেন?

আমরা আমাদের কোর্সে মহামতি বুদ্ধের কথা বলেছি। যিশুর কথা বলেছি। নবীজীর (স) জীবন দেখেছি। তিনি কখনো আঘাত নেন নি। তায়েফে তাঁকে শুধু কটুকথা নয়, বরং পাথর মেরে রক্তাক্ত করা হলো। নবীজী (স) যখন মক্কা মুক্তির পরে তায়েফ অবরোধ করলেন, তখন তো প্রতিশোধ নিতে পারতেন। তিনি বলেছিলেন, তোমরা যে শর্তে আত্মসমর্পণ করতে চাও করো। তিনি একজন মানুষকেও তো শাস্তি দেন নি!

অর্থাৎ আরেকজন মন্দ কথা বলতে পারে। কিন্তু আপনি আনন্দিত হবেন, না কষ্ট পাবেন—এটা নির্ভর করে আপনার ওপরে। আরেকজনের জিনিস যেটা আপনার প্রয়োজন নেই সেটা কেন গ্রহণ করবেন? কারণ অপমান তো

আপনার জন্যে প্রয়োজনীয় কিছু নয়। এটা কল্যাণকর কিছুও নয়। অতএব কখনো অপমানিত বোধ করবেন না, নিবেনই না। তাহলে আপনাকে কেউ অপমান করতে পারবে না।

**প্রশ্ন :** আমার একমাত্র পুত্রবধূর বাবা প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। দেশের নাগরিক হিসেবে আমি সাধারণ ব্যক্তি। বর্তমানে বৌমার কথামতো আমাকে ও আমার পরিবারকে ওঠবস করতে হয়। এইভাবে কি বাঁচা যায়? চোরের মতো জীবন। ওরা আমার বাড়িতে ভিন্ন ফ্ল্যাটে থাকে। ছেলে বিশেষ কিছু করে না। সংসারের যাবতীয় খরচ আমার পরিবার থেকে যায়। প্রচণ্ড বেহিসেবী। আমার কী করণীয়?

**উত্তর :** আপনার ছেলে বিশেষ কিছু করে না। ভেবে দেখুন তো, আপনি কি ছেলেকে পুত্রবধূর বাবা মানে আপনার বেয়াই কিছু একটা ব্যবস্থা করে দেবে, সেই আশায়ই বিয়ে দিয়েছিলেন? আপনি সাধারণ, আপনি কী কারণে প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী অসাধারণের কাছে যাবেন? প্রদীপ যদি সূর্যের কাছে যায় তো প্রদীপের আলো কি দেখা যাবে? গিয়েছেন যখন, ক্ষমতার তেজ তো কিছু আপনাকে ভোগ করতে হবে। সূর্যের কাছাকাছি গেলে সূর্যের তাপ যে-রকম ভোগ করতে হয়।

কথাগুলো বলার কারণ হলো, আমরা অপরপক্ষের অবস্থান দেখে অনেক সময় লোভে পড়ে ভুলে যাই যে, বিয়ে শুধু ছেলে এবং মেয়ের মধ্যকার সম্পর্ক নয়। বিয়ে হয় মূলত দুই পরিবারের মধ্যে। যে কারণে আমরা সবসময়ই বলি—বিয়ে হতে হয় সম-সামাজিক ও সম-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে। বিয়ের ক্ষেত্রে পারিবারিক সাযুজ্যটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

এখন আপনার পরিবারের এ দুরাবস্থা থেকে মুক্তির পথ একটাই—দোয়া ও হিলিং। মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে পুত্রবধূকে এনে দরদ দিয়ে যথার্থ করণীয় বোঝাতে থাকুন। নিয়মিত দান করুন। দোয়া ও দানের বরকতে প্রভু যে-কোনো সময় পরিস্থিতি বদলে দিতে পারেন।

**প্রশ্ন :** কেউ যদি ভুল বুঝে রাগ করে আমার কোনো কথাই শুনতে না চায়, তাহলে কীভাবে তার ভুল ভাঙাব?

**উত্তর :** বিষয়টি নির্ভর করছে আপনার সাথে তার সম্পর্কের ওপর। যদি ভুল ভাঙানো খুব প্রয়োজন হয়, তাহলে সিদ্ধান্ত একরকম হবে আর ভুল ভাঙানোর

প্রয়োজন না হলে আরেক রকম সিদ্ধান্ত হবে। সম্পর্ক যদি এমন হয় যে, ভুল ভাঙানোর কোনো প্রয়োজন নেই, সে-ক্ষেত্রে বিষয়টি ভুলে যাওয়াই ভালো।

আর যে সম্পর্ক ছিন্ন করা যায় না, ভুলে যাওয়াও যায় না এবং ভুল ভাঙানোটা জরুরি, সে-ক্ষেত্রে পরিবেশ বুঝে তার সাথে কথা বলবেন। যে কারণে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, সে বিষয়টি ব্যাখ্যা করবেন।

আপাতত তাকে সরাসরি না বুঝিয়ে মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে বোঝাবেন। ক্রমাগত কয়েক দিন বোঝান, দেখবেন আপনার বার্তা তিনি পেতে থাকবেন। আপনার কথা শোনার ব্যাপারে তার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। এরপর তাকে সরাসরি বোঝাবেন।

**প্রশ্ন :** আমি যদি কারো সাথে রাগ করি, তাহলে তার সাথে কথা বলতে পারি না। তবে আমি তার কোনো ক্ষতি করি না বা সমালোচনা করি না। তাকে দেখামাত্রই সেই কথাটা বা কষ্টটা মনে পড়ে। এ থেকে মুক্তি চাই।

**উত্তর :** এজন্যেই তো ক্ষমা করা প্রয়োজন। যাকে ক্ষমা করছেন তার আপনি উপকার করছেন, তা নয়। ক্ষমা করে আপনি আসলে নিজের উপকার করছেন। আপনি কষ্ট থেকে বেরিয়ে আসছেন। তাই মেডিটেশনে আলফা স্টেশনে গিয়ে যার বিরুদ্ধে যত রাগ আছে কষ্ট আছে সব লিখে মুছে ফেলে দেবেন। মুছে ফেলার সময় কল্পনা করবেন যে, মনের সমস্ত ময়লাগুলো আপনি দূর করে ফেলছেন, হালকা অনুভব করছেন।

**প্রশ্ন :** আপনি বললেন, কাউকে মনে মনে বকা দেয়া যাবে না। সামনেও কিছু বলতে পারব না। তাহলে আমার রাগকে কীভাবে সংবরণ করব?

**উত্তর :** রাগকে সংবরণ করবেন ক্ষমা করে দিয়ে। ক্ষমা করে দিলে তো রাগ থাকবে না। যে মাফ করে দিতে পারে তার কি আর রাগ থাকে? দমচর্চা করবেন, ওজু করবেন। আর মেডিটেশন করলে ধীরে ধীরে রাগ নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়ে যাবে। রাগ ভেতরে পুষে লাভ তো নেই, বরং ক্ষতি। আর সামনাসামনি রাগ দেখাতে গেলে তো ঝগড়া আরো বাড়বে। ক্ষমা করে দেন। আপনি আরামে ঘুমাবেন, ভালো থাকবেন।

**প্রশ্ন :** আমি মানুষের মন্তব্যে অনেক প্রভাবিত হই এবং কষ্ট পাই। অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে শোধরাতে পারছি না। আমার করণীয় কী?

**উত্তর :** করণীয় খুব সহজ। কারো নেতিবাচক কথায় প্রভাবিত হবেন না। এজন্যে মনে মনে তওবা তওবা বলবেন। বলবেন যে, আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রাজিম, বিতাড়িত শয়তান থেকে হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। দেখবেন, কারো মন্তব্য আপনাকে আর প্রভাবিত করছে না। আসলে অন্যের কথায় কষ্ট পাওয়ার মানে হলো নিজের নিয়ন্ত্রণ অন্যের হাতে দিয়ে দেয়া। বুদ্ধিমান মানুষ কখনো নিজের নিয়ন্ত্রণ অন্যের হাতে দেয় না।

**প্রশ্ন :** করোনাকালে লকডাউনে দীর্ঘদিন বাসায় থাকার ফলে আমার বিরক্তি খুব বেড়ে গেছে। মেজাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি। সবার সাথে সম্পর্ক খারাপ হচ্ছে। ফলে নিজেও কষ্ট পাচ্ছি। আমার করণীয় কী?

**উত্তর :** বোঝা যাচ্ছে আপনার জীবনে বড় কোনো লক্ষ্য নেই। তাই যে-কোনো ঘটনায় বিরক্ত হন এবং আপনার মেজাজটা সবসময় তেতে থাকে। যদি লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট থাকত, তাহলে লকডাউনে বাসায় থাকা অবস্থায় নতুনভাবে রুটিন করে সময়টাকে সুন্দরভাবে কাজে লাগাতে পারতেন।

পৃথিবীতে যারাই মহান হয়েছেন, বড় কাজ করেছেন, তারা প্রতিকূল পরিস্থিতি বা মানুষের আচরণ—কোনোকিছু দ্বারা প্রভাবিত হন নি। তারা সবসময় প্রো-একটিভ থেকেছেন, বিরক্তিটাকে জয় করেছেন। সাফল্যের রহস্যও কিন্তু এটাই।

যারা রি-এক্ট করেন তাদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যটা প্রবল যে, তারা নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারে না। নিজের কাজগুলোকে ফোকাস করে এগিয়ে যেতে পারে না। সবসময় অন্যের আচরণ দিয়ে প্রভাবিত হয়। অন্যের কথায় যদি মারা পড়েন, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণই যদি হারিয়ে ফেলেন, তাহলে বড় কাজ করবেন কী করে?

এজন্যে লক্ষ্য ঠিক করুন এবং নিজের কাজে ব্যস্ত হতে শিখুন। আগামী ৪০ দিন শিথিলায়ন ও রাগ-ক্ষোভ বর্জনের মেডিটেশন করুন। মেডিটেশন মানেই হলো প্রতিমুহূর্তে সতর্ক ও সচেতন থাকা, মাইন্ডফুল থাকা, বিরক্তিকে জয় করতে পারা এবং উপলব্ধির গভীরে প্রবেশ করা।

মেডিটেশন এবং কোয়ান্টাম ব্যায়ামের পাশাপাশি সবকিছুর জন্যে কৃতজ্ঞতার চর্চা করুন। পরিবারের ও চারপাশের মানুষের সাথে সুসম্পর্ক নষ্ট হয়, এমন কথা ও আচরণ থেকে সচেতনভাবে বেরিয়ে আসুন। কারণ তাদের সহযোগিতা এবং শুভকামনা আপনাকে সবসময় এগিয়ে রাখবে। আপনি রক্ষা পাবেন একাকিত্বের মহামারি থেকে।

**প্রশ্ন :** আমার কাছের এক আত্মীয়ের ছেলে মাদকাসক্ত। লেখাপড়াও ছেড়ে দিয়েছে। ওর মা-বাবা আলাদা থাকে। সে মায়ের কাছে বড় হচ্ছে। তাকে নিয়ে সবাই খুব অশান্তির মধ্যে আছি। কী করব? দয়া করে পরামর্শ দেবেন।

**উত্তর :** অসুখী পরিবার, ব্রোকেন ফ্যামিলি, ডিস্টার্বড ফ্যামিলির পরিণতি হচ্ছে, তাদের ছেলেমেয়েদের ৮০-৯০ ভাগ হয় মানসিকভাবে অসুস্থ, না-হয় মাদকাসক্ত, না-হয় অপরাধের সাথে জড়িত। আর কিছু না হলেও তাদের মধ্যে আচরণগত সমস্যা থাকে সাধারণভাবে। এটা আমরা কোয়ান্টাম মেথড কোর্সেও বলি। ১০-২০ ভাগ কোনোরকমে বেঁচে যায়। ব্রোকেন ফ্যামিলি, ডিস্টার্বড ফ্যামিলি বা অসুখী পরিবারের সন্তানদের দুঃখ ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।

এই যে অসুখী পরিবার বা ব্রোকেন ফ্যামিলি, এর মূল কারণটা কী? হযরত জালাল উদ্দিন রুমির একটা গল্প রয়েছে—তিন মুসাফিরের গল্প। একজন আরব, একজন পার্সিয়ান, একজন রোমান। একজন আরবি জানে, একজন ফার্সি জানে, আরেকজন গ্রিক। তো যেতে যেতে পথে তিন জন খুব গল্প করছে। কেউ কারো ভাষা জানে না। কিন্তু চলতে চলতে ভাষা বোঝানোর মতো একটা সম্পর্ক হয়েই যায়। যেতে যেতে রাস্তার মধ্যে তারা একটা স্বর্ণমুদ্রা পেল। সামনে বাজার।

আরব বলল, এটা দিয়ে আমরা ইনাব কিনব। পার্সিয়ান বলল, না, এটা দিয়ে আঙুর কিনব। রোমান বলল, তোমরা কী বলছ! এটা দিয়ে তো ভিটিস কিনতে হবে। তিন জনের মধ্যে তুমুল তর্ক হচ্ছে। একজন বলছে ইনাব কিনবে, একজন বলছে আঙুর কিনবে, একজন ভিটিস কিনবে। এতক্ষণ যে আনন্দ ছিল, সে আনন্দ মুহূর্তে মাটি। কলহ শুরু হয়ে গেল।

রুমি বলেন, আসলে এদের জন্যে আর কিছু নয়, প্রয়োজন ছিল একজন অনুবাদকের। কারণ আঙুর হচ্ছে ফার্সি শব্দ। আঙুরের আরবি নাম হচ্ছে ইনাব। আর গ্রিক নাম হচ্ছে ভিটিস। তিন জনই একই জিনিস কিনবে কিন্তু কেউ কারোটা বোঝে না। তাই ঝগড়া করছে।

রুমির এই গল্পটা পড়তে পড়তে মনে হলো, আমাদের পারিবারিক সব সমস্যার মূল হচ্ছে একজন আঙুর কিনবে, একজন ইনাব কিনবে, একজন ভিটিস কিনবে। অর্থাৎ সমস্যার মূল হচ্ছে একজন অনুবাদকের অভাব। যে বুঝিয়ে দেবে যে, তোমরা তিন জন যা চাচ্ছ, এটা একই জিনিস।

একটা পরিবারে মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ি, সন্তান—সবাই সম্মান নিয়ে বাঁচতে চায়। তারা চায়, তাকে একটু মমতা দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে দেখা হোক।

প্রত্যেকেই সম্মান এবং মমতাটুকু চায়। বাকি যা-কিছু—খাওয়াদাওয়া এবং অন্যান্য সব হচ্ছে বৈষয়িক বা জৈবিক ব্যাপার।

একটা পরিবারে মৌলিক যে চাওয়া—একজন স্ত্রী চায়, স্বামী তাকে একটু স্বীকৃতি দিক, একটু সম্মান করুক। তার পরিশ্রম করতে কোনো বাধা নাই। স্বামী কেবল এটাকে স্বীকার করুক, হাঁ, তুমি পরিশ্রম করছ। মন থেকে না হলেও অন্তত মুখে তা স্বীকার করুক। স্বামী চায়, স্ত্রী একটু এগিয়ে আসুক। আহারে! সারাদিন অনেক ক্লান্ত হয়ে এসেছ। সন্তানও কিন্তু এটাই চায়। আর কিছু নয়। অর্থাৎ পরিবারের কাছে আমাদের চাওয়াটা গল্পের ওই আঙুরের মতো একই জিনিস—সম্মান। পরিবারের প্রত্যেকটা মানুষ এটা চায়। গৃহকর্মী যে সে-ও চায় যে, আমি এত কাজ করে দিচ্ছি, আমাকে একটু মমতা দিক, আমার কাজের স্বীকৃতি দিক।

যখনই এই সম্মান, মমতা পাওয়া যায় না তখনই ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। এর প্রকাশ হতে পারে দুই ভাবে। ক্রোধটা প্রকাশ পেতে পারে গালিগালাজ, ভাংচুর, মারামারি রূপে। দ্বিতীয়ত, যখন ক্ষোভটা সে প্রকাশ করতে পারল না, তখন এটা দুঃখকষ্ট ও ডিপ্রেশন হিসেবে রূপ নেয়। যাকে যতটুকু সম্মান দেয়া দরকার, সেই সম্মানটুকু যখন আমরা দিতে পারি না, তখনই সমস্যার শুরু হয়। জীবনের রহস্য, বিশেষত পারিবারিক জীবনের অশান্তির জটের যে শুরু, এর ব্যাখ্যা হিসেবে রুমির এই তিন মুসাফিরের গল্পটা অপূর্ব।

তিন জন একই জিনিস চাচ্ছে, শুধু ভাষাটা ভিন্ন। অতএব ঝগড়ার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধু একজন অনুবাদকের, একজন গাইডের। প্রশ্ন করতে পারেন, তাহলে এই গাইড কে হবে? উত্তরটা খুব সহজ। যুগে যুগে মানুষের কল্যাণে স্রষ্টা যে বাণীবাহকদের পাঠিয়েছেন, তাদের শিক্ষাই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো গাইড।

# সুখী পরিবার ॥ সংসার পর্ব

- ☐ পরিবার গঠিত হয় একজন নারী ও একজন পুরুষকে ঘিরে। সাধারণত পুরুষ পরিবারের প্রধান হলেও নারীই পরিবারের প্রাণ। এই প্রাণকে কেন্দ্র করেই পরিবার টিকে থাকে।
- ☐ এক+এক = দুই। কিন্তু একের পাশে এক রাখলে হয় এগারো। এটাই পরিবার। সফল গৃহকর্তা/ কর্ত্রী এ সবকিছুর মধ্যে সমন্বয় করেন দক্ষ জাদুকরের কুশলতায়।
- ☐ নারী পুরুষের অর্ধেক নয়। পরিবারে নারী ও পুরুষ পরস্পরের পরিপূরক।
- ☐ মমতা-ভালবাসা সকল সুসম্পর্কের প্রাণ। মমতা অপরপক্ষকে বিচার করে না, বোঝার চেষ্টা করে। প্রভাবিত করে না, তার সাথে অংশগ্রহণ করে।
- ☐ প্রভাবিত করা আর অংশ হয়ে যাওয়া এক নয়। প্রাণবন্ত পরিবারের শর্ত হচ্ছে দ্বিতীয়টি। পারস্পরিক অংশীদারিত্বেই পরিবারে শান্তি আসে।
- ☐ দাম্পত্য জীবনে কোনো এক পক্ষকে ক্রমাগত অবহেলা ও অপমান করে কখনো সুখী পরিবার গঠন করা যায় না।
- ☐ পারস্পরিক মমতা, সহানুভূতি ও শ্রদ্ধাবোধ সুখী পরিবারের প্রধান শর্ত।
- ☐ পরিবারের সদস্যদেরকে কখনো বোঝা মনে করবেন না। তারাই হতে পারে আপনার দুঃসময়ের সঙ্গী।
- ☐ একজন অতিথির প্রতি আপনি যেভাবে মনোযোগী হন, একইভাবে আপনার পরিবারের সবার প্রতিও মনোযোগী হোন।
- ☐ 'কী পেতে পারি' নয়; বরং 'কী দিতে পারি'—এ চিন্তা সবসময় পারিবারিক সাফল্য ও প্রশান্তিকে আকর্ষণ করে।
- ☐ নিয়মিত স্ত্রীর শারীরিক খোঁজখবর নিন। অসুস্থ হলে নিজে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন।
- ☐ ভুল করে ফেললে নিজেই আগে 'দুঃখিত' বলুন। এতে দুঃখিত বলার পরিমাণ কমবে। অপরপক্ষ 'দুঃখিত' বলতে বাধ্য করলে পরিমাণটা বেড়ে যাবে।
- ☐ সাধারণভাবে আমরা ব্যক্তি ও তার আচরণকে এক করে ফেলি। ফলে অশান্তি সৃষ্টি হয়। আচরণ থেকে ব্যক্তিকে আলাদা করতে পারলেই সুসম্পর্ক বজায় রাখা যায়।

- মানুষ হিসেবে আপনি তখনই ভালো, যখন পরিবারের কাছে আপনি ভালো।
- অন্যের ব্যাপারে কখনোই নাক গলাবেন না।
- নেতিবাচক আবেগে মন তিক্ত হওয়ার আগেই সরাসরি কথা বলুন।
- সম্পর্কের জটিলতায় সবসময় সরাসরি কথা বলুন। কাউকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করবেন না। সম্পর্ক যত সরাসরি হবে, ভুল বোঝাবুঝি তত কমবে।
- আপনি যে কথাই বলুন না কেন—তা শ্রোতার মনে পক্ষে বা বিপক্ষে ছাপ ফেলে। তাই সবসময় সুন্দর ও শ্রদ্ধাপূর্ণ বাক্য ব্যবহার করুন। গীবত, ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও কটূক্তি এড়িয়ে চলুন।
- পারিবারিক জীবনে প্রো-একটিভ থাকুন। প্রশান্তি ও প্রাচুর্য বাড়তে থাকবে।
- আমরা সমমর্মিতা চাই কিন্তু সমমর্মী হতে পারি না। আমরা চাই 'আমাকে সবাই বুঝুক'। অথচ অপরপক্ষকে বুঝলেই সম্পর্কের ফাঁকগুলো কমে যায়।
- নিজেকে বুঝতে পারলেই আপনি অন্যকে বুঝতে পারবেন। নিজেকে বোঝার জন্যে প্রতিদিন কিছুটা সময় ব্যয় করুন।
- অপরপক্ষের পছন্দ-অপছন্দ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করুন। মনোযোগী শ্রোতা হোন। তাহলেই অন্যকে ভালোভাবে বুঝতে পারবেন।
- পরিবারে কানকথায় প্রভাবিত হবেন না। সত্য যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিন। এতে আপনার ভুল করার সম্ভাবনা কমবে।
- স্বামী-স্ত্রীর ভুল বোঝাবুঝিতে তৃতীয় পক্ষকে (আত্মীয়, বন্ধু, প্রতিবেশী) জড়াবেন না। দুজনে মিলে সমস্যার সমাধান করুন।
- স্ত্রীর যে-কোনো অভিযোগ মনোযোগ দিয়ে শুনুন। কোনো প্রস্তাব বা কথায় প্রথমেই 'না' বলা থেকে বিরত থাকুন।
- স্ত্রীকে সবসময় 'হ্যাঁ' বলুন। তার যুক্তিসঙ্গত চাওয়া পূরণ করুন। 'হ্যাঁ' বললে হারানোর কিছু নেই; কিন্তু পাওয়ার আছে অনেক কিছু।
- স্ত্রীর অর্থ ও সম্পদ ব্যয়ে তার স্বাধীনতাকে হরণ করবেন না।
- নিজের আয় সম্পর্কে প্রথমেই স্ত্রীকে সুস্পষ্ট ধারণা দিন। এতে সমঝোতা বাড়বে। অযৌক্তিক প্রত্যাশাও কমে যাবে।
- স্বামীর কাছ থেকে প্রত্যাশাকে সবসময় যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে রাখুন। বাড়তি খরচের চাপ সৃষ্টি করে স্বামীকে দুর্নীতি করতে বাধ্য করবেন না।
- নিজের হাতখরচ থেকে স্বামীর জন্যে ছোটখাটো উপহার কিনুন। নিজের অর্থ প্রয়োজনে সংসারের জন্যে খরচ করুন।

- ☐ আয় অনুসারে স্ত্রীর প্রয়োজন পূরণ করুন। সুযোগ করে নিয়ে উপহার এবং নিয়মিত হাতখরচ প্রদান করুন। তবে হাতখরচ ব্যয়ের ব্যাপারে কখনোই কিছু জানতে চাইবেন না।
- ☐ আত্মীয়স্বজনকে উপহার দেয়া বা সাহায্য করার ব্যাপারে স্বামী/ স্ত্রীকে অযৌক্তিক বাধা দেয়া থেকে বিরত থাকুন।
- ☐ কর্তৃত্বপরায়ণ স্বামী/ স্ত্রী হবেন না। নিজের মতকে অন্যায়ভাবে প্রতিষ্ঠিত না করে সত্যকে গ্রহণ করুন। সত্য আপনার বিপক্ষে গেলেও তা মেনে নিন।
- ☐ স্বামী/ স্ত্রীর প্রতি সর্বাবস্থায় বিশ্বস্ত থাকুন। একে অপরকে লুকিয়ে কোনো কাজ করবেন না।
- ☐ পেশা বা পারিবারিক সংকটে স্ত্রী/ স্বামীর সাথে খোলামেলা আলোচনা করুন।
- ☐ যে-কোনো পারিবারিক সিদ্ধান্ত সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে গ্রহণ করুন।
- ☐ নিজের স্ত্রী/ স্বামীর কল্যাণ কামনা করুন। তিনি যাতে আলোকিত মানুষ হন সেজন্যে দোয়া করুন। কারণ তাকে নিয়েই আপনার জীবন।
- ☐ স্বামী/ স্ত্রীর যে-কোনো অক্ষমতাকে সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করুন।
- ☐ স্বামী/ স্ত্রীর মা-বাবা অথবা আত্মীয়দের নিয়ে তাকে খোঁটা দেবেন না।
- ☐ আপনার স্বামী/ স্ত্রীর যোগ্যতার প্রশংসা করুন। পরিবারে তার প্রতিটি অবদানকে অকপটে স্বীকার করুন।
- ☐ জীবনসঙ্গী/ সঙ্গিনীর গুণাবলি ও তার ভালো দিকগুলো তুলে ধরুন। এতে তিনি ভুল সংশোধনে উদ্বুদ্ধ হতে পারেন।
- ☐ বাইরে কাজ আছে বলে ক্লাবে বা ‘বন্ধু’দের সাথে তাস খেলে কিংবা ফালতু আড্ডায় সময় নষ্ট না করে পারিবারিক প্রয়োজনে সময় ব্যয় করুন।
- ☐ অন্যের কাছে স্বামী/ স্ত্রীকে ছোট করবেন না বা তার বদনাম করবেন না।
- ☐ যত ব্যস্ততা থাকুক, সপ্তাহের অন্তত একটি সন্ধ্যা পরিবারের জন্যে রাখুন।
- ☐ কর্মস্থল/ বাইরের রাগ-ক্ষোভ সন্তান/ স্ত্রী/ গৃহকর্মীর ওপর প্রকাশ করবেন না।
- ☐ বাসায় থাকা আর পরিবারকে সময় দেয়া এক কথা নয়। টিভির পেছনে সময় নষ্ট না করে পরস্পরের সাথে কথা বলুন, ভাবের আদান-প্রদান করুন।
- ☐ বাসায় যখন ফিরে আসবেন, তখন পেশাগত সব ঝামেলা অফিসেই রেখে আসুন। পেশা দুশ্চিন্তা বা সমস্যা যেন পারিবারিক শান্তিকে বিঘ্নিত না করে।
- ☐ ঘরের খুঁটিনাটি ব্যাপারে স্ত্রীর কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না। গ্লাসে পানি ঢেলে খাওয়াসহ ছোটখাটো কাজ নিজেই করুন।

- ☐ বাসস্থানকে আকর্ষণীয় করে তুলুন। পরিবারের সদস্যদের নামে গাছ লাগান ও সেগুলোর যত্ন নিন। বিভিন্ন জনের নামে রোপিত গাছের যত্ন নেয়ার সময় যিনি যত্ন নিচ্ছেন তার মনে তাদের প্রতি মমতা বাড়বে। এভাবে প্রকৃতির সাথে সাথে আপনার পারিবারিক সম্পর্কও সুন্দর হয়ে উঠবে।
- ☐ অর্থ অপচয় করবেন না। হুজুগের বশে কিনলে অনুশোচনা করতে হবে।
- ☐ পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎসহ সব ধরনের অপচয়ের বিরুদ্ধে পরিবারে সচেতনতা সৃষ্টি করুন।
- ☐ স্ত্রীকে গৃহকর্ম ও সন্তান পালনে সাধ্যমতো সহযোগিতা করুন। ব্যস্ততার কারণে পারিবারিক কাজে সহযোগিতা করতে না পারলে দুঃখ প্রকাশ করুন।
- ☐ সপরিবারে দাওয়াতে অংশ নিন। বাসায় দাওয়াত করলে পুরো পরিবারকে করুন। আর শুধু স্বামী-স্ত্রীর দাওয়াতকে সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করুন।
- ☐ পুত্রবধূকে প্রতিপক্ষ না ভেবে নিজের মেয়ে মনে করুন। তার ভুলত্রুটিকে সহজভাবে নিন। পারিবারিক পরামর্শে তাকেও অংশীদার করুন।
- ☐ শ্বশুর-শাশুড়িকে নিজের মা-বাবার মতো শ্রদ্ধা করুন। স্ত্রী/ স্বামীর ভাইবোনকে নিজের ভাইবোনের মতো ভালবাসুন।
- ☐ সম্পর্কের ক্ষেত্রে অতি আবেগকে পরিহার করে বাস্তবমুখী মানসিকতার বিকাশ ঘটান।
- ☐ সকালে ঘুম ভাঙলেই ‘শোকর আলহামদুলিল্লাহ/ থ্যাংকস গড/ হরি ওম বা প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ’ বলাকে পারিবারিক রেওয়াজে পরিণত করুন।

## সুখী পরিবারের জন্যে প্রার্থনা

হে আমার প্রতিপালক!
পরিবারের সবাইকে শোকরগোজার স্রষ্টা-সচেতন
অনন্য মানুষ হওয়ার তওফিক দাও!
আমাদের সুখী সমৃদ্ধ ও দরদী পরিবারে পরিণত করো।
পারস্পরিক মমতা বাড়িয়ে দাও।
সৃষ্টির সেবা করার জন্যে সবার মেধাকে বিকশিত করো।
তোমার রহমতের ছায়ায় সুরক্ষিত হোক আমাদের পরিবার।

# পারিবারিক কিছু শুদ্ধাচার

- ☐ পরিবারে ছোট-বড় সবার সাথে সালাম বিনিময়ের অভ্যাস গড়ে তুলুন।
- ☐ বাসা থেকে বের হওয়ার সময় সম্ভব হলে মা-বাবা, স্বামী/ স্ত্রী এবং অন্য সদস্যদের বলে বের হোন। কোথায় যাচ্ছেন, কখন ফিরবেন তা-ও বলুন।
- ☐ বাসায় ফিরে আগে সবার খোঁজখবর নিন।
- ☐ ঘরে ঢুকেই বা কেউ ঘরে ফেরার সাথে সাথেই কোনো অভিমান-অভিযোগ প্রকাশ করবেন না।
- ☐ যত ব্যস্ততাই থাকুক, দিনে অন্তত একবেলা পরিবারের সঙ্গে খাবার খান।
- ☐ পারিবারিক অনুষ্ঠানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করুন।
- ☐ ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে শ্রদ্ধা করুন। অনুমতি ছাড়া কারো মোবাইল ফোন ধরবেন না। ডায়েরি, চিঠি খুলে দেখবেন না; সামনে খোলা থাকলেও পড়বেন না।
- ☐ পারিবারিক বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছতে চেষ্টা করুন। মত না মিললেও অধিকাংশ সদস্যের মতামতকে গুরুত্ব দিন এবং সেভাবে কাজ করুন।
- ☐ পরিবারে কোনো বিষয়ে বাড়াবাড়ি করবেন না। খুঁটিনাটি বিষয়ে অনড় অবস্থান নেবেন না। প্রয়োজনে ছাড় দিতে আন্তরিক হোন।
- ☐ পরিসর যত ছোটই হোক, পরিবার একটি সঙ্ঘ। তাই অপরের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনায় রাখুন।
- ☐ কাউকে হেয় করে বা খোঁচা দিয়ে কথা বলা, কূটতর্ক ও নেতিবাচক মন্তব্য করা পুরোপুরি বর্জন করুন।
- ☐ গালিগালাজ, অশ্লীল ও মন্দ কথার চর্চা পারিবারিক অশান্তির অন্যতম কারণ ও আলোকিত পরিবার গঠনে অন্তরায়। তাই পরিবারে সবসময় ভালো কথা বলার অভ্যাস করুন।
- ☐ কখনো কারো রান্নার নিন্দা বা সমালোচনা করবেন না।
- ☐ পরিবারের সদস্যদের বিশেষ দিনগুলো মনে রাখুন ও শুভেচ্ছা জানান।
- ☐ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার আলোকে পারিবারিক মূল্যবোধ গড়ে তুলুন এবং পারিবারিকভাবে সেগুলোর চর্চা করুন।

- ☐ দরজায় কড়া নাড়ার সুযোগ থাকলে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে কাউকে ডাকাডাকি করবেন না। দরজায় কড়া নাড়ুন/ কলিং বেল বাজান।
- ☐ ঘন ঘন কলিং বেল বাজাবেন না। বাসায় শিশু, প্রবীণ ও অসুস্থ কেউ থাকলে পারতপক্ষে কলিং বেল না বাজিয়ে আস্তে কড়া নাড়ুন।
- ☐ কারো মুখের ওপর শব্দ করে দরজা বন্ধ করে দেবেন না।
- ☐ দরজা-জানালা বন্ধের কাজটি সন্তর্পণে করুন।
- ☐ বিশ্রামরত কারো অসুবিধা না করে যতটা সম্ভব নীরবে কাজ করুন।
- ☐ অনুমতি ছাড়া কারো শোবার ঘরে ঢুকবেন না, বিছানায় বসবেন না। বসতে হলেও বিছানায় পারতপক্ষে পা তুলবেন না।
- ☐ অফিসের বিষয়গুলো অফিসেই রেখে আসুন। বাসায় অফিসের বিষয় নিয়ে কোনো আলাপ বা বিরক্তি প্রকাশ করবেন না।
- ☐ অপরিচিত কাউকে কারো বাসায় নিয়ে যাওয়ার আগে তার অনুমতি নিন।
- ☐ নিচতলার বাসিন্দাদের অসুবিধা হতে পারে—এমন শব্দ যেন আপনার বাসার মেঝেতে না হয় সে ব্যাপারে সচেতন থাকুন।
- ☐ প্রতিবেশীর সমস্যা হয়—এমন শব্দে অডিও প্লেয়ার বা টিভি, কম্পিউটার/ লাউডস্পিকার চালাবেন না।
- ☐ বাসায় (রান্নাঘর, শোবার ঘর, বসার ঘর, খাবার ঘর) পর্যাপ্ত ময়লা ফেলার ঝুড়ি/ বিন রাখুন। নির্দিষ্ট স্থানেই ময়লা ফেলুন।
- ☐ পরিবারের বড়দের প্রতি রাগ-ক্ষোভ-ঘৃণা পোষণ করবেন না। মনে রাখবেন, তাদের দোয়া, শুভকামনা ও সহযোগিতা জীবনের প্রতিটি বাঁকেই আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

প্রিয় পাঠক,

এ বইয়ের কোনো বিষয় সম্পর্কে আপনার কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকলে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাতে পারেন :

**মহাজাতক**
**যোগ ফাউন্ডেশন**
৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক,
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
E-mail : info@quantummethod.org.bd

# বন্ধুত্ব প্রেম বিয়ে

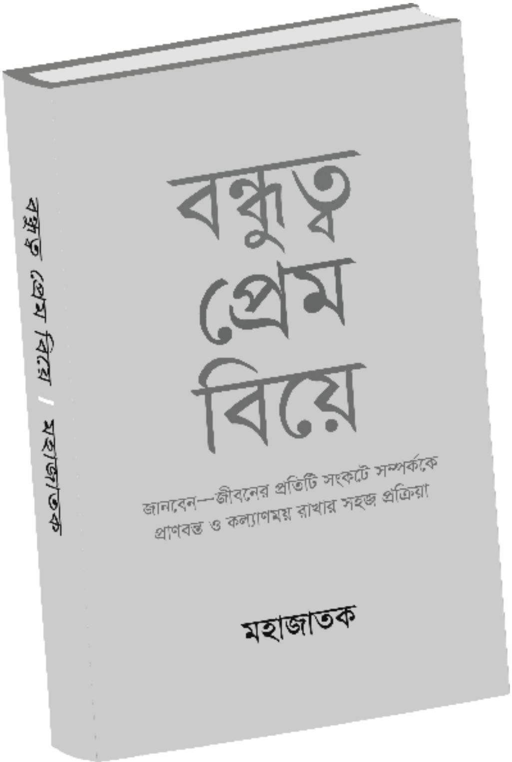


বন্ধুত্ব, প্রেম ও বিয়ে বিষয়ক বাছাইকৃত প্রশ্নের উত্তর রয়েছে এ বইতে। জীবনের প্রতিটি সংকটে সম্পর্ককে প্রাণবন্ত ও গতিশীল করার ক্ষেত্রে আপনার করণীয় জানতে বইটি সংগ্রহ করুন, পড়ুন।

## মহাজাতক

শহীদ আল বোখারী মহাজাতক বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক মেডিটেশন ও পজিটিভ লাইফস্টাইল চর্চার পথিকৃৎ। জীবনযাপনের বিজ্ঞান কোয়ান্টাম মেথডের উদ্ভাবক ও প্রশিক্ষক। পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে ৩৩ বছর ধরে একনাগাড়ে দেশজুড়ে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন।

মেডিটেশন চর্চার ইতিহাসে উদ্ভাবক কর্তৃক এককভাবে ক্লাস নিয়ে ৪৯৯+ কোর্স সম্পন্ন করা বিশ্বে এই প্রথম।

তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলা ভাষায় সর্বাধিক পঠিত নন-ফিকশন গ্রন্থ *কোয়ান্টাম মেথড*সহ তার রচিত সবগুলো বই ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। ২০১৪ সালে *আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী* এবং ২০২১ সালে *হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী* প্রকাশিত হওয়ার পর পেয়েছে বিপুল পাঠকপ্রিয়তা।

**কোয়ান্টাম** ভালো ভাবার, ভালো বলার,
ভালো করার, ভালো থাকার বিজ্ঞান।
আপাত অসম্ভবকে সম্ভব করার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া।

কী চান আপনি?
আত্মবিশ্বাস? অস্থিরতা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও
বিষণ্নতা থেকে মুক্তি? প্রশান্তি? সুস্বাস্থ্য? বর্ণিল জীবন?
উপচে-পড়া প্রাচুর্য? ঈর্ষণীয় অর্জন? সুখ?

চাওয়া যা-ই হোক, আসুন, মেডিটেশন চর্চা করুন।
মাইন্ড সেট করুন। আপনার মধ্যে বিশ্বাস ও
ইতিবাচক শক্তির স্ফুরণ ঘটবে।

আপনি অর্জন করবেন
নিজের কাজ সবচেয়ে ভালোভাবে করার সামর্থ্য।
চারপাশের মানুষ ভাবতে শুরু করবে—
আপনি সৌভাগ্যের বরপুত্র। আপনার আন্তরিক চাওয়া
স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিণত হবে পাওয়ায়।

লাখো মানুষের মতো আপনিও বলবেন—
ইনশাআল্লাহ সব সম্ভব!
আপনার কণ্ঠেও ধ্বনিত হবে—
ভালো মানুষ ভালো দেশ! স্বর্গভূমি বাংলাদেশ!

quantummethod.org.bd

978-984-35-8785-5

978-984-35-8785-5